Boighar.com

বইঘর নিবেদন

আরশিনগর

সাদাত হোসাইন

বইঘর

www.boighar.com

আরশি মাথা তুলে তাকাল। ভোলানাথের বন্ধ সেলুনের সামনে কাঁঠের খুটি। সেই খুঁটির গায়ে হাতের তালুর সমান ছোট্ট এক চিলতে আয়না। ঝাপসা হয়ে যাওয়া সেই আয়নার দিকে তাকিয়ে খানিক স্থীর দাঁড়িয়ে রইল আরশি। তারপর ধীর পায়ে আয়নাটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। আয়নার ভেতরে আবছা একটা মানুষ। গতকাল অবধি দেখে আসা সেই একই চোখ, সেই একই নাখ, সেই একই মুখ, একই চেহারা। কিন্তু গতকালের সেই আরশি আর এই মানুষটি কি এক? এই মানুষটাকে কি সে চেনে? আরশির হঠাৎ মনে হল, এই জগতে কেউ কাউকে চেনে না। এই জগত আয়নার মতন। উল্টোজগত। এখানে সবকিছু উল্টো।

www.boighar.com

এই উল্টোজগতের নাম আসলে আরশিনগর।

ISBN 978-984-91335-9-9

আরশিনগর

www.boighar.com

সাদাত হোসাইন

ভাষাচিত্র
www.boighar.com

bhashachitra

ভাষাচিত্র

আরশিনগর

সাদাত হোসাইন

www.boighar.com

প্রকাশক

খন্দকার মনিরুল ইসলাম

ভাষাচিত্র ৫০/১ পুরানা পল্টন লাইন, ২য় তলা

ঢাকা ১০০০, মুঠোফোন ০১৯৬৭ ৪০৪০৪০, ০১৬১১ ৩২৪৬৪৪

প্রথম প্রকাশ একুশে বইমেলা ২০১৫

দ্বিতীয় মুদ্রণ মার্চ ২০১৫

তৃতীয় মুদ্রণ একুশে বইমেলা ২০১৬

স্বত্ব লেখক

প্রচ্ছদ সাইফুল হালিম জেলীন

মুদ্রণ টিমওয়ার্ক

মূল্য ৪৫০ টাকা

AARSHINAGOR A Novel by Sadat Hossain

First Published February 2015

Published by **BHASHACHITRA**

50/1 Purana Paltan Line, 1st Floor, Dhaka 1000

Cell : 01967 404040, 01611 324 644

www.boighar.com

E-mail bhashachitra@gmail.com

PRICE TK 450 US $ 30

ISBN 978-984-91335-9-9

উৎসর্গ

আমার 'মামা (মা+মা)'

মো. মোহ্‌সীন উদ্দীন

www.boighar.com

মানুষটার বুকের ভেতর সত্যি সত্যি লুকিয়ে আছে

প্রবল মমতাময়ী দু'জন 'মা'

ভূমিকা

www.boighar.com

ছেলেবেলার দীর্ঘসময়জুড়ে যে ভয়ঙ্কর নেশায় বুঁদ হয়ে ছিলাম, তার নাম 'কেরছা'। কেরছা মানে, কেচ্ছা, কিস্‌সা বা গল্প। সেই কেরছা শোনার তেষ্টা এতটাই প্রবল এবং ভয়ানক ছিল যে শেষ অবধি বড়রা কেউই আর রাতে আমাকে সঙ্গে ঘুমাতে নিতে চাইতেন না। রাত জেগে ঘুম নষ্ট করে এই 'কেরছা' শোনানোর হ্যাপা কে সামলাবে! অনেকেই নানান ফন্দি-ফিকির করে পালাতে চাইতেন। তবে সবচেয়ে বড় ফন্দিটা করতেন আমার মামা। তিনি তার কেচ্ছা শুরু করতেন বাঘ আর খরগোশের কাহিনী দিয়ে। সেই কাহিনীতে বাঘের ভয়ে খরগোশ গর্তে লুকিয়েছে। গর্ত থেকে খরগোশ আর বের হচ্ছে না। মামাও আর গল্প বলছেন না। 'তারপর কী হলো' জিজ্ঞেস করলেই মামা হাসিমুখে জবাব দেন, 'কী করে বলব! খরগোশ তো এখনও গর্ত থেকেই বের হয়নি। গর্ত থেকে না বের হলে কীভাবে বলব!' বলাই বাহুল্য, গল্পের সেই খরগোশ কদাচিৎ বের হতো!

এমন নানান 'কেরছাভঙ্গে' শুরু হলো নিজেরই কেরছা বলার বয়স। অদ্ভুত ব্যাপার হলো, বাচ্চাকাচ্চাদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেরছা শুনিয়ে বসিয়ে রাখতে পারতাম। এবং সেইসব কেরছার বেশিরভাগই তাৎক্ষণিক মুখে মুখে বানানো। তারাও চোখ বড় বড় করে মুগ্ধ হয়ে শুনত। একসময় আবিষ্কার করলাম, এই কেরছাগুলো যে আমার নিজের বানানো তা আমি ভুলে যাচ্ছি। অনেক দিন পর হঠাৎ হঠাৎ মনে হতো, 'এই কেরছাটা কই যেন পড়েছি! কোন বইতে!' কিংবা মনে হতো, 'এই ঘটনাগুলো আমি কোথাও শুনেছি বা দেখেছি! এগুলো আমার বানানো না। এগুলো সত্যি! কী অদ্ভুত ব্যাপার, সত্যি এবং মিথ্যে (কল্পনা)গুলো কী বিস্ময়করভাবেই না এক হয়ে যেত! আসলে ঘটনা কী? আসলে ঘটনা কিছুই না। ঘটনা হচ্ছে প্রতিটি মানুষের মনের ভেতর অজস্র জগৎ থাকে, সেই প্রতিটি জগতের নিয়ন্তা সে নিজে। সেখানে তার অবাধ স্বাধীনতা, অসীম শক্তি, অপার অনুভূতি।

'আরশিনগর' আমার বুকের ভেতরের তেমনি একটি জগতের 'কেরছা'। যেই জগতের নিয়ন্তা আমি নিজে! অপার ক্ষমতা শুধুই আমার! কিন্তু আসলেই কি তাই!! এই পর্যন্ত এসে মনে হলো, আসলেই কি তাই? আসলেই কি একজন লেখক হয়ে উঠতে পারেন তার গল্পের মহাপরাক্রমশালী নিয়ন্ত্রক! আসলেই কি তার সৃষ্ট চরিত্রগুলোকে, গল্পগুলোকে ইচ্ছেমতো নিয়ন্ত্রণ করার পরিপূর্ণ ক্ষমতা তার থাকে? নাকি কখনও কখনও কিছু চরিত্র, কিছু ঘটনা হয়ে ওঠে স্বাধীন। নিয়ন্ত্রণহীন। অবাধ্য। সদম্ভে করে চলে যায় লেখকের নিয়ন্ত্রণের বাইরে! হয়ে ওঠে স্বাধীন এক সত্তা? আমার কিন্তু তাই মনে হয়।

'আরশিনগর' লেখকের নিয়ন্ত্রণ ভেঙে স্বাধীন হয়ে ওঠা চরিত্রের গল্প, জীবনের গল্প।

সাদাত হোসাইন

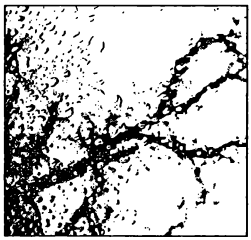

নিলুফা বানু মারা গেল সন্ধ্যাবেলা।

তার পাশে কাপড়ের পুঁটলির ভেতর শুয়ে ছিল আরশি। আরশির নাম অবশ্য তখনও রাখা হয়নি। সদ্যোজাত শিশু। নিলুফার শরীরের অবস্থা ভালো ছিল না। গত দু'দিন থেকেই তার ব্যথা উঠেছে। কিন্তু সমস্যা জটিল। বাচ্চা আছে পেটের ভেতর উল্টো হয়ে। খোদেজা দাই অভিজ্ঞ ধাত্রী। দশ গ্রামে এক নামে সবাই তাকে চেনে। প্রসবের সময় সে থাকা মানে নিশ্চিন্ত। কিন্তু নিলুফার অবস্থা দেখে খোদেজা দাই আঁতকে উঠল। তার মুখ গেল শুকিয়ে। সে নিলুফার শাশুড়ি আম্বরি বেগম আর স্বামী মজিবর মিয়াকে ডাকল। তারপর কাঁপা গলায় বলল 'বিপদ, মহাবিপদ। ডাক্তার ডাকতে হবে। ডাক্তার ডাইকা আনো।'

মজিবর মিয়া কী করবে? এই গাঁয়ের নাম যযাতিপুর। বর্ষাকালে এমনিতেই এর চারদিকে মাইলের পর মাইল জলে ডুবে থাকে। তার ওপর এ বছর বন্যার পানি বাড়ছে চারদিকে। সপ্তাহখানেক ধরে টানা বর্ষণ। কাছাকাছি ডাক্তার বলতে একমাত্র মালোপাড়ার শুকরঞ্জন ডাক্তার। তাও হাঁটা পথে মাইল পাঁচেকের পথ। মজিবর মিয়া গরু দুটোকে নাইয়ে কেবল দাওয়ায় বসেছিল ভাত খাওয়ার জন্য। ভাত খাওয়া হলো না। সে উঠে হাঁটা দিল। মালোপাড়া থেকে শুকরঞ্জন ডাক্তারকে নিয়ে পৌঁছাল গভীর রাতে। শুকরঞ্জন ডাক্তার গম্ভীর মুখে নিলুফাকে দেখলেন। নিলুফার সারা মুখ তখন নীলবর্ণ। ডাক্তার দীর্ঘ সময় শেষে ঘর থেকে বের হলেন। মজিবর মিয়াকে ডেকে আগুন চাইলেন। তারপর মুখে বিড়ি গুঁজে দিয়ে বললেন, 'যা হওয়ার হবে, মানুষের হাতে তো আর সব ক্ষমতা নাই। তবে ভগবান চাইলে অসম্ভবও সম্ভব হয়।'

শেষ অবধি অসম্ভব সম্ভব হয়েছে। আড়াই দিন বাদে নিলুফা বানু কন্যা সন্তান জন্ম দিয়েছে এবং অসম্ভবকে সম্ভব করে দিয়ে তখনও তার শ্বাস বইছে। তবে সে শ্বাস খুব ক্ষীণ। গত দু'দিনে তার টানা পানি ভেঙেছে, রক্ত গিয়েছে। ব্যথায় নীলবর্ণ নিলুফা বানুর মুখের রঙ এখন ফ্যাকাশে সাদা। তাকে কোথাও নেওয়ার উপায় নেই। আশপাশের কোথাও কোনো হাসপাতাল নেই। এই তুমুল বন্যা-বাদলের দিনে মজিবর মিয়া কী করবে সে জানে না। কিচ্ছু ভেবে পায়

না। আজ দুপুরে সে আবারও ছুটে গেছে শুকরঞ্জন ডাক্তারের কাছে। শুকরঞ্জন ডাক্তার সব শুনে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। তারপর খুব ধীরে চোখ থেকে চশমা খুলে চশমার কাচ মুছলেন। একখানা বিড়ি ধরালেন। শেষে শান্ত গলায় বললেন, 'মানুষ তো মৃত্যুর জন্যই জন্মায় মজিবর। মৃত্যু ছাড়া এই জন্মের কোনো মূল্য নাই।'

www.boighar.com

নিলুফা বানুর জ্ঞান আছে। শুধু জ্ঞানই আছে তা না, সে স্পষ্ট চিন্তাও করতে পারছে। সে দেখল, সদ্য জন্ম নেওয়া শিশুটা কাপড়ের পুঁটলির ভেতর থেকে পিটপিট করে চাইছে। সন্তানের মুখ দেখে যতটা আনন্দে আপ্লুত হওয়ার কথা ছিল, ততটা আপ্লুত বোধকরি সে হতে পারল না। মেয়ের গায়ের রঙ কি কালো? এই চিন্তা তাকে অস্থির করে ফেলল। এমনিতেই এই মেয়ে হবে মা মরা মেয়ে। তার ওপর গায়ের রঙ যদি হয় কালো, তাহলে বাকি জীবন বিপদের অন্ত থাকবে না। তার নিজের গায়ের রঙ অবশ্য ভালো। কিন্তু মেয়ে পেয়েছে বাবার গায়ের রঙ। নিলুফা বানু মৃত্যুর ঠিক আগমুহূর্তে চিন্তামুক্ত হলো। মেয়ের চোখের দিকে তাকিয়ে তার মনে হলো, এই মেয়ের গায়ের রঙ কোনো সমস্যা না। এর চোখভর্তি মায়া। এই মায়াবতী মেয়ে মমতার অদ্ভুত চাদর বিছিয়ে বিপদের সব পথ পাড়ি দেবে। সে নিশ্চিন্তে নিঃশ্বাস ছাড়ল। তারপর খানিক উঁচু হয়ে মেয়ের মুখ দেখার চেষ্টা করল। কিন্তু শরীর সাড়া দিল না। নিথর পড়ে রইল বিছানায়। নিলুফা বানুর এখন মনে হচ্ছে সে শ্বাস নিতে পারছে না। দম ভারী হয়ে আসছে। তার চারপাশে কয়েক জোড়া উৎসুক চোখ। তার শাশুড়ি, পূব পাড়ার খোদেজা দাই, বৃদ্ধ এছাহাকের মা, শেফালী বু। আর কি কেউ আছে? থাকলেও সে দেখতে পেল না। চোখ খুলে রাখতে কষ্ট হচ্ছে কিংবা ঝাপসা হয়ে আসছে দৃষ্টি। সে জানে না, মৃত্যুর আগে ঠিক কোন মুহূর্তে মানুষের দৃষ্টিশক্তি নিভে যায়! কেউ কি জানে! আচ্ছা তার স্বামী মজিবর মিয়া কই? সে কি ডাক্তার নিয়ে ফিরেছে? শুকরঞ্জন ডাক্তারের চেম্বার বহু দূরের হাঁটা পথ। সে কখন ফিরবে কে জানে! মানুষটা জানে, নিলুফা টিকবে না। সে একা কেন, সবাই জানে। শুকরঞ্জন ডাক্তারও জানে। তাও এই অবস্থায় গেছে। শুধু শুধু আবারও এতটা পথ ছুটল। মরার সময় মানুষটার মুখ দেখে মরতে পারলেও এক শান্তি। কিন্তু ততক্ষণ টিকে থাকতে পারবে বলে মনে হচ্ছে না। কোমর থেকে পা অবধি চিটচিটে রক্তে ভিজে আছে। সে বারকয়েক চেষ্টা করছিল পা নাড়াতে, কিন্তু পারল না। পুরো শরীরই প্রায় অসাড়।

কাপড়ের পুঁটলির ভেতর থেকে মেয়েটা পিটপিট করে তার দিকে তাকিয়ে আছে। নিলুফা বানুর হঠাৎ মনে হলো সেই চোখের ভেতর সে তার নিজের মুখ দেখতে পাচ্ছে। একদম স্পষ্ট পরিষ্কার! স্বচ্ছ আয়নার মতো। সে তার নাকের নাকফুলটা পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে। আচ্ছা, এটা কি কোনো বিভ্রম! তার সময় কি ফুরিয়ে এসেছে! মৃত্যুর ঠিক আগমুহূর্তে মানুষ কি নানা ধরনের বিভ্রমে আচ্ছন্ন

Boighar.com & ARS

হয়! নিলুফা বানু কিছুই বুঝতে পারল না। তবে সে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল মেয়ের চোখের দিকে। মেয়েও তাকিয়ে আছে। কেবল মাঝে মাঝে সামান্য সময়ের জন্য চোখের পাতা ফেলছে। নিলুফা বানু সেই চোখের দিকে তাকিয়ে অতি কষ্টে ফিসফিস করে বলল, 'মা রে, এমন আয়নার মতোন চোখ নিয়া জন্মাইলি। কিন্তু সেই আয়না চোখে নিজের মায়রেই তো আর দেখতে পাবি না রে মা'। মেয়ে কিছু বুঝল কিনা কে জানে। শান্ত, গভীর চোখে তাকিয়েই রইল। সে কি জানে, এই মানব জনম মা ছাড়া কি প্রবলভাবেই না বৃথা?

নিলুফা বানু কাঁদল না। সে ইশারায় শাশুড়িকে ডাকল। আম্বরি বেগম ধীর পায়ে নিলুফার কাছে এলেন। নিলুফার মনে হলো এই বৃদ্ধ মানুষটিকে তার অনেক কথা বলার আছে। সে মাতৃহারা হতে যাওয়া তার মেয়েটাকে এই মানুষটার কাছে রেখে যাচ্ছে। এই মানুষটাকে তার অনেক অনেক কথা বলার আছে। কিন্তু অতটা সময় বোধহয় তার নেই। সে প্রবল কষ্টে ঠোঁট ফাঁক করল। তারপর বিড়বিড় করে অদ্ভুত এক কথা বলল। সে বলল, 'আম্মা, এর নাম রাইখেন আরশি। এর চোখ আরশির মতোন'।

মজিবর মিয়া যখন উঠানে পা রাখল তখন ভর সন্ধ্যা।

টিপটিপ করে বৃষ্টি হচ্ছে। সন্ধ্যার আকাশ যতটা কালো হওয়ার কথা, এই আকাশ তারচেয়েও বেশি কালো। উঠানের অর্ধেকটা জুড়ে পুঁই আর ঝিঙের মাচা। মাগরিবের আজানের আগে আগেও ঝিঙে ফুলগুলোকে দিব্যি ধকধক করে জ্বলতে দেখা যায় রোজ। অথচ আজ ঝিঙেফুলগুলো যেন আবছা ছায়া হয়ে আছে। হাঁটু অবধি কাদা নিয়ে মজিবর মিয়া উঠানে এসে দাঁড়াল। টিনের ছোট চৌচালা ঘরখানা তার সামনে। টানা বৃষ্টিতে সেই ঘরের বাঁশের বেড়ার অবস্থা হাড় জিরজিরে কুঁজো বুড়ির মতোন। এই বুঝি ঝরঝর করে ঝরে পড়বে। ঘরের ভেতর থেকে তীব্র চিৎকার ভেসে আসছে। নবজাতক শিশুর চিৎকার। মজিবর মিয়ার ছুটে ঘরে যাওয়ার কথা। তার প্রথম সন্তান। কিন্তু মজিবর মিয়া ছুটে গেল না। সে শুকরঞ্জন ডাক্তারের ব্যাগ হাতে উঠানে প্যাঁচপেঁচে কাদার মধ্যে দাঁড়িয়ে রইল। অনেকক্ষণ। তারপর মাথা তুলে আকাশের দিকে তাকাল। তখন দূরে কোথাও মাগরিবের আজান হচ্ছে। কেমন গুমোট, শূন্য আকাশ। বুকের ভেতরটা ফাঁকা করে দেয়। সে দীর্ঘ সময় আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল। শুকরঞ্জন ডাক্তার এখনও আসেনি। সে মজিবর মিয়ার সঙ্গে হেঁটে তাল মেলাতে পারেনি। অনেকটা পিছিয়ে পড়েছে। কতক্ষণে এসে পৌঁছাবে কে জানে! অবশ্য কারো আসা না-আসায় এখন আর কিছু যায়-আসে না। কোনো কিছুতেই না।

জগতের হিসাব-নিকাশ বড়ই অদ্ভুত। আর এই অদ্ভুত নিকাশের বলেই আরশি বেঁচে গেল। নিলুফা বানুর মৃত্যুর দিন তিনেক বাদে এক মেঘলা দুপুরে

খোদেজা দাই আবার এসে হাজির। তার সঙ্গে অল্পবয়সী এক মেয়ে। খোদেজা দাইয়ের মেজ মেয়ের বড় মেয়ে। অল্পবয়সে বিয়ে হয়েছে। মাস ছয় হলো পুত্রসন্তানের মা-ও হয়েছে সে। সেই মেয়েকে এনে ঘরের দাওয়ায় বসাল খোদেজা দাই। তারপর আম্বরি বেগমকে ডেকে বলল, 'হুনেন ভাউজ (ভাবী), এইডা আমার মাইঝ্যা মাইয়ার বড় বেটি। নাম বিউটি। এর পোলা হইছে ছয় মাস। অহনও এর ওলান ভর্তি দুধ। বুঝলেন ভাউজ, এই হইল আল্লার লীলাখেলা! কেউ মায়ের দুধ পায় না। আর কেউ খাইয়া শেষ করতে পারে না।'

আম্বরি বেগম কোনো কথা বললেন না। খোদেজা দাই খানিক দম নিয়ে আবার বলল, 'এখন থেইকা এ প্রত্যেক দিন আইসা আইসা আপনের নাতিনরে দুধ খাওয়াইয়া যাইব।'

মজিবর অবশ্য এই প্রস্তাব শুনে রেগে গিয়েছিল। যদিও রাগের কোনো যৌক্তিক কারণ ছিল না। অতটুকু একটা বাচ্চার বাঁচা-মরা নিয়ে কথা। কিন্তু তারপরও বিষয়টা কেন যেন সে সহজে মেনে নিতে পারছিল না। আম্বরি বেগম তাকে নানানভাবে বোঝালেন। বললেন, 'মা'র দুধ ছাড়া ল্যাদা গুঁড়াগাড়া যে এক্কেলে বাঁচে না, তা না। তয় এই বয়সে দুধ খাওনডা দরকার। তোর যদি এতই ভালো না লাগে, তাইলে দুই-এক মাস পর না হয় না বইলা দিমুনে।'

মজিবর মিয়া জবাবে কিছু বলেনি। চুপচাপ মেনে নিয়েছিল। অবশ্য মাসখানেকের মাথায় বিউটি চলে গিয়েছিল তার শ্বশুরবাড়ি। ফলে এ নিয়ে আর উচ্চবাচ্যও তেমন হয়নি। তবে দুর্ভোগ বাড়তেই থাকল। সেবার সেই টানা বর্ষণ আর বানের পানি হুহু করে বাড়তে থাকল। এক রাতে মজিবর মিয়ার বাঁশের বেড়ার টিনের চৌচালা ঘরখানা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। টানা বৃষ্টিতে মাটি ক্ষয়ে গেছে। বাঁশের খুঁটিগুলো গিয়েছিল নড়বড়ে হয়ে। বন্যার পানি তখন উঠান অবধি উঠে এসেছে। আম্বরি বেগম কাপড়ের পোঁটলার মধ্যে নাতনিকে বুকে চেপে ধরে ঘর থেকে বের হলেন। মজিবর মিয়া দৌড়ে গেল উত্তরপাশের গোয়ালঘরে। গোয়ালঘরখানা দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু তার ভেতর হাঁটুসমান জল। দুটো গাই-ই সেই জলের ভেতর চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। গাভীন গাই। যেকোনো দিন বিয়োবে। মজিবর মিয়ার মনে হলো এই ঘুটঘুটে অন্ধকারেও সে গাই দুটির চোখ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। সেই চোখজুড়ে কী প্রবল অসহায়ত্ব! জগতে গরুর চোখের মতোন এমন অসহায় দৃষ্টি বুঝি আর নেই! জলের ভেতর দাঁড়িয়ে থাকা সেই অসহায় চোখের দিকে তাকিয়ে মজিবর মিয়া হঠাৎ কঠিন এক সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল। যে করেই হোক গাই দুটি তাকে বেচে দিতে হবে। এই বন্যায় গাই বাঁচানো যাবে না। অবস্থাদৃষ্টে যা মনে হচ্ছে, দিন দিন পানি আরও বাড়বে। মজিবর মিয়া জানে না, এই অবস্থায় গাইয়ের খরিদ্দার সে কোথায় পাবে! কিন্তু গাই বেচে দেওয়া ছাড়া উপায়ও নেই। নিজের হাতে বেড়ে ওঠা এই গাভীন গাই দুটি সে কী করে বেচবে! মজিবর মিয়া জানে না। কিন্তু সে কঠিন

Boighar.com & ARS

সিদ্ধান্তটা নিয়ে নিয়েছে। অতি কঠিন সিদ্ধান্ত। এই অতি কঠিন সিদ্ধান্ত তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল।

বাকি রাতটা তারা কাটাল শেফালীদের বাড়ি। মজিবর মিয়ার বাড়ির লাগোয়া বাড়ি শেফালীদের। কিন্তু গত বছরই শেফালীরা মাটি কেটে বাড়ির ভিটা উঁচু করেছে বলে বন্যার জল এখনও ছুঁতে পারেনি তাদের। পরদিন থেকে উত্তুরে হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হুহু করে বাড়তে থাকল বানের জল। গাঁয়ের মানুষদের বিপদের সীমা রইল না। আম্বরি বেগম শঙ্কিত গলায় বললেন, 'আমার জীবনে আমি এত বন্যার পানি দেখছি বলে মনে পড়ে না, তোর মাইয়া কি সর্বনাশ লইয়া জগতে আইল, কে জানে!'

মজিবর মিয়া সঙ্গে সঙ্গে মা'র কথার জবাব দিল না। সে গম্ভীর মুখে তাকিয়ে রইল গাই দুটোর দিকে। চারপাশে কোথাও ঘাসের চিহ্ন অবধি নেই। শুধু পানি আর পানি। গাইগুলো খাবে কি! কী খেয়ে বাঁচবে? সে অনেকক্ষণ শূন্য চোখে তাকিয়ে রইল। তারপর গম্ভীর গলায় আম্বরি বেগমকে বলল, 'তুমি গত বছর বন্যার সময়ও একই কথা কইছিলা মা'।

আম্বরি বেগম বললেন, 'এই বছরের মতোন বন্যা আর দেখছত?'

মজিবর মিয়া বলল, 'এইডা হাচা কথা, গত বছর দশেকের মধ্যে এমন বন্যা কেউ দেখে নাই। মানুষ না হয় বাঁচল, কিন্তু গাই-গরুর অবস্থা যে কী হইব, কে জানে!'

আসলেই, গত বছর দশেকের মধ্যে যযাতিপুর গাঁয়ের মানুষ এমন বন্যা আর দেখেনি। আশ্রয়ের জন্য মানুষের ভেতর তীব্র আতঙ্ক শুরু হলো। কেউ কেউ দূরের আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে ছুটল আশ্রয়ের জন্য। যাদের গাই-বাছুর আছে তারা ছুটল সবার আগে। অবলা প্রাণীগুলোর আশ্রয় দরকার সবচেয়ে বেশি। কিন্তু মজিবর মিয়া কই যাবে? দু'দুটি গাই, বৃদ্ধ মা, মা-মরা মেয়ে নিয়ে সে যাবে কই? সত্যি সত্যি নিজেকে অথৈ পাথারে আবিষ্কার করল সে। ততদিনে অবশ্য বড় বড় ইঞ্জিনঅলা নৌকায় রিলিফ আসা শুরু করেছে গাঁয়ে। ত্রাণ নিয়ে বিভিন্ন সংগঠন, স্বেচ্ছাসেবী দল এলো। এলো সরকারি লোকজন। তারা এসে আতাহার তালুকদারের বিশাল তিনতলা দালান বন্যার্তদের জন্য খুলে দিল। তবে ডান দিকের তিনখানা ঘর যেমন বন্ধ ছিল, তেমন বন্ধই থাকল। আতাহার তালুকদার এ অঞ্চলের নামী লোক। ধনাঢ্য ব্যক্তি। সপরিবারে শহরে থাকেন। দু'চার বছরে একবার এলে এই দালানেই ওঠেন। তখন তিনতলার ওপরের দিকের তিনখানা ঘর খুলে দেওয়া হয়। বাদবাকি সময়ে এই দালান অবশ্য খালিই থাকে। বহু বছরের পুরনো দালান। এখন আর কেউ থাকে না। ভবনের রং উঠে গেছে। এখানে-সেখানে পলেস্তরা খসে গেছে। তবুও আতাহার তালুকদার ভবনটা ভেঙে ফেলে নতুন ভবন তোলেন না। এই

ভবন তার পূর্বপুরুষদের জমিদারি শাসনের শেষ নিদর্শন। জগতের নিয়ম হচ্ছে কারণে-অকারণে, ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় মানুষ স্মৃতি পুষে রাখে। অতীত পুষে রাখে।

মজিবর মিয়ার গাই দুটোই গাভীন। সময় বিবেচনায় এর চেয়ে খারাপ আর কিছু হতে পারে না। সেদিন ছইবিহীন বড় ট্রলারে রিলিফ দিতে এলো এক স্বেচ্ছাসেবী দল। তারা লাইন ধরে বন্যার্তদের খাবার দিচ্ছে, ওষুধ দিচ্ছে। আম্বরি বেগম আর ঊনচল্লিশ দিনের আরশিকে সেই লাইনে রেখে মজিবর মিয়া গিয়ে লাফ দিয়ে ট্রলারে উঠে পড়ল। ট্রলারভর্তি তখন ব্যস্ত মানুষজন। কমবয়সী ছেলেছোকড়ারা নানান কাজ করছে। কেউ খাবার প্যাকেট করছে, কেউ ওষুধ বিলাচ্ছে। লম্বা ছিপছিপে এক ছেলে, পরনে সাদা গেঞ্জি, সাদা পাজামা, মাথায় সাদা ক্যাপ, সে ঘুরে ঘুরে কাজ তদারকি করছে। হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে, এই ছেলেই এদের নেতা। মজিবর মিয়া তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। সে কিছু বলার আগেই ছেলেটা এগিয়ে এসে বলল, 'আপনি ট্রলারে উঠে এলেন কেন? আমরা এক এক করে সবাইকেই দেব, যান, নিচে যান। নিচে নেমে লাইনে গিয়ে দাঁড়ান।'

মজিবর মিয়া হঠাৎ কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, 'স্যার, আমারে বাঁচান। আমারে বাঁচান।'

ছেলেটা অবাক চোখে খানিক তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, 'আমরা তো বাঁচানোর জন্যই আসছি। কিন্তু বাঁচা-মরার মালিক তো আর আমরা না। বাঁচা-মরার মালিক শেষ পর্যন্ত আল্লাহ।'

মজিবর মিয়া এই কথার কোনো জবাব দিল না। সে ছেলেটাকে চমকে দিয়ে তার পায়ের কাছে বসে পড়ল। তারপর দু'হাতে ছেলেটার পা জড়িয়ে ধরে বলল, 'আমার গাই দুইটা মইরা যাইব। দুইটা গাই-ই গাভীন। যেকোনো দিন বিয়াইবো। এইখানে থাকলে বাঁচব না। গাই দুইটা মরব, সঙ্গে পেটের বাছুর দুইটাও মরব।'

ছেলেটা বিরক্ত গলায় বলল, 'এইখানে মানুষ বাঁচে না, আর আপনি আছেন গরুর চিন্তায়! ছাড়েন, ছাড়েন, পা ছাড়েন।'

মজিবর মিয়া পা ছাড়ল না। সে আরও শক্ত করে পা ধরে বসে রইল। ছেলেটা নিচু হয়ে মজিবর মিয়ার হাত ছাড়ানোর চেষ্টা করল, পারল না। মজিবর মিয়া শক্ত করে পা ধরে বসে রইল। ছেলেটা কঠিন গলায় বলল, 'আরে আশ্চর্য। আপনি তো দেখি ভালো ঝামেলা শুরু করেছেন! আপনার গরু আমরা বাঁচাব কেমনে?'

মজিবর মিয়া সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'আইজ সন্ধ্যাবেলা আপনেরা যখন ফিরা যাইবেন, তখন আপনাগো ট্রলারে আমি আর আমার গাই দুইটারে একটু নিয়া নিবেন। যাওনের পথে মধুপুর স্টিমারঘাটা পড়ব। ওইখানে আমারে নামাই দিলেই হইব। ওইটা আমার মামুর দেশ। শুনছি বন্যার পানি এখনও ওইখানে

Boighar.com & ARS

তত ওঠে নাই। একবার যাইতে পারলে গাই দুইটার একটা ব্যবস্থা আমি কইরা ফেলব। আমার বড় মামু গরুর বেপারী। সে গাই গরু কেনা-বেচায় ওস্তাদ'।

আশেপাশে ততক্ষণে ভিড় জমে গেছে। সবাই বিরক্ত। কিন্তু অপেক্ষমাণ জনতা এবং মজিবর মিয়াকে চমকে দিয়ে সাদা পোশাকের ছিপছিপে ছেলেটা বলল, 'আপনি রেডি থাকেন। আমরা যাওয়ার সময় আপনাকে নিয়ে যাব।'

মজিবর মিয়া বড় বড় চোখে মাথা উঁচু করে ছেলেটার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বলল, 'স্যার, সত্যি বলতেছেন? সত্যি?'

ছেলেটা মুখে কিছু বলল না। তবে মাথা নেড়ে সায় দিল।

সন্ধ্যা নাগাদ মজিবর মিয়ারা যাত্রা করল। তার আগে বৃদ্ধ এছহাকের মা আর শেফালীকে বলে গেছে আম্বরি বেগমের দিকে খেয়াল রাখতে। একা আরশিকে নিয়ে আম্বরি বেগম কী করবেন কে জানে! তবে বিপদে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হয়, এটা মজিবর মিয়া জানে। জানে বলেই সে এত বড় সিদ্ধান্তটা নিতে পারল। এই গাই দুটি বিক্রির সিদ্ধান্ত তার মতো মানুষের জন্য সহজ ছিল না। কিন্তু বেঁচে থাকতে হলে মানুষকে কৌশলী হতে হয়। সবচেয়ে বেশি কৌশলী হতে হয় বিপদে। এখন তার ঘোর বিপদ। ঘোর বিপদে আবেগী হলে চলে না। সে আবেগ তাড়ানোর চেষ্টা করছে।

রাত কত হবে মজিবর মিয়া জানে না। তাকে নামিয়ে দেওয়া হলো মধুপুর স্টিমারঘাটায়। এখানে এককালে বড় বড় স্টিমার ভিড়ত। সেই থেকে লোকমুখে নাম হয়েছে স্টিমারঘাটা। শুধু যে ঘাটের নাম স্টিমারঘাটা হয়েছে তা না, কালে কালে এই অঞ্চলের নামই হয়ে গেছে স্টিমারঘাটা। আজকাল লোকে আর মধুপুর স্টিমারঘাটা বলে না। বলে স্টিমারঘাটা। মজিবর মিয়া ঘুটঘুটে অন্ধকারে নদীর পারের বিস্তৃত মাঠজুড়ে আড়াআড়ি হাঁটা ধরল। গাই দুটি দীর্ঘদিন হাঁটা-চলার তেমন সুযোগ পায়নি বলেই কিনা কে জানে, দুলকি চালে হাঁটা শুরু করল। এই পায়ে হাঁটা পথে তার মামা মজিদ বেপারীর বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছাতে পৌঁছাতে সকাল হয়ে যাবে। মজিবর মিয়া মূল রাস্তায় না গিয়ে, আড়াআড়ি পথ ধরেছে। এই পথে রাস্তা বলে কিছু নেই। কিন্তু মূল রাস্তার তুলনায় অর্ধেক পথ। গাই দুটোকে এই অবস্থায় অতটা পথ হাঁটাতে চায় না মজিবর মিয়া। তাড়াও দিতে চায় না। ওরা ওদের ইচ্ছেমতোই হাঁটুক। ইচ্ছেমতো দাঁড়িয়ে থাকুক কিংবা বসে খানিক জিরিয়ে নিক। মজিবর মিয়া কিছুতেই বাধা দেয় না। সে কেবল পথের দিশা ঠিক রাখে। মেঘ কেটে গিয়ে আকাশ জুড়ে তারার মেলা দেখা যাচ্ছে। হিমেল হাওয়ায় খানিক শীত শীত লাগলেও হেঁটে চলার কারণে শরীর গরম হয়ে আছে। ঠাণ্ডাটা তেমন টের পাওয়া

যাচ্ছে না। বন্যার পানি যে এ অঞ্চলেও বাড়ছে, তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। অনেক জায়গায়ই নদী হুট করে কাছে চলে এসেছে। পানি বাড়ছে বলে নিচু ফসলি জমি ডুবে যাচ্ছে। শেষ কবে মামাবাড়ি এসেছিল মনে করতে পারে না মজিবর মিয়া। তবে এই ঘাটে যখন বড় বড় স্টিমার ভিড়ত, তখনকার কথা স্পষ্ট মনে আছে তার। অতদূরের মামাবাড়ি থেকেও স্টিমারের বিকট ভেঁপু শোনা যেত। তার নানীর ছিল বাতের ব্যারাম। রোজ ভোররাতের দিকে তার ঘুম ভেঙে যেত। তারপর শুরু হতো অদ্ভুত গোঙানি। সেই গোঙানির শব্দের সঙ্গে থাকত কান্না। কান্নার দমকে দমকে সে ছড়ার মতো সুর করে কথা বলত। বেশিরভাগ কথাজুড়েই নিজের জীবন নিয়ে আল্লাহর কাছে নানান অভিযোগ। কখনও কখনও আল্লাহর বিরুদ্ধেও! নানীর এই কান্না শুনেই রোজ ভোররাতে মজিবর মিয়ার ঘুম ভেঙে যেত। নানীর সেই কান্না, গোঙানি, ছড়া কাটা সুরে সুরে অভিযোগ আর ঠিক সেই মুহূর্তেই স্টিমারের অমন বিকট ভেঁপু, সব মিলিয়ে কেমন এক অন্য জগৎ মনে হতো ছোট্ট মজিবর মিয়ার। সে কাঁথার ভেতর মাথা ডুবিয়ে চুপচাপ জেগে থাকত।

মজিবর মিয়ার মনে হলো, মানুষ যত বড় হতে থাকে, সে তত স্মৃতিকাতর হতে থাকে। নিলুফা বানুর সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল পাঁচ বছর আগে। পাঁচ বছর কখনও কখনও খুব দীর্ঘ সময়। আবার কখনও কখনও খুব অল্প। নিলুফা বয়সে তার চেয়ে বছর পনেরোর ছোট হবে। সেবার পাটের ফলন হলো বেশ। কিন্তু যযাতিপুরে অত পাট কে কিনবে? এই পাট নিয়ে যেতে হবে মোঘলগঞ্জ হাটে। গুণটানা নাওয়ে একদিনের পথ। অতটা পথ অবশ্য গুণটানাও সম্ভব না। অনুকূল বাতাস পেলে পাল তুলে দিলে কষ্ট অর্ধেকে নেমে আসে। বাদবাকি পথ বৈঠাই ভরসা। তালেব মাঝির বড় নাও। সেই নাওয়ে পাটভর্তি করে যাত্রা শুরু করল সে। সঙ্গে পূবপাড়ার হারাধন। তারা মোঘলগঞ্জে পৌঁছেছিল পরদিন ভোরে। গিয়ে দেখে পাটের দর গত বছরের তুলনায় অর্ধেক নেমে গেছে। নেমে যাওয়ার কারণও অবশ্য আছে। তখনও ভাঙাচোরা হলেও লক্কড়ঝক্কড় একখানা স্টিমার অন্তত সপ্তায় একবার আসত। যাত্রী কমে গেছিল। নদীর এখানে-সেখানে ডুবোচর উঁকি দিচ্ছে। পানি কমে যাচ্ছে। মানুষ বাসে-ট্রেনে বেশি চড়ছে। স্টিমারের মতো দৈত্য পোষায় তখন নানান হ্যাপা। এত হ্যাপা কে নেবে! তাই স্টিমারের সংখ্যা বহু আগে থেকেই কমছিল। রোজ একখানা, দু'খানার বদলে সেটা সপ্তায় এক-আধখানে এসে ঠেকেছিল। তাও যা আসত, উপকার হতো খুব। দূর-দূরান্তের চাষিরা ক্ষেতের আখ, গুড়, পাট, ধান, ডাল এনে মোঘলগঞ্জ হাটে আড়তদারদের কাছে বেচত। আড়তদাররা কেনাকাটার মৌসুম শেষে সেই কেনা পণ্যের বিশাল চালান স্টিমারে নিয়ে যেত খুলনা শহরে। সেখানে সেসব দ্বিগুণ-তিনগুণ দামে বিক্রি করত তারা। কিন্তু সেবারই শেষ সেই স্টিমারখানা এলো। তারপর হঠাৎ করে বলা নেই কওয়া নেই পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেল

Boighar.com & ARS

স্টিমার। নদীপথের এই দুর্গম এলাকা থেকে ফসল পাঠানোর তখন কী উপায়? ইঞ্জিনঅলা ট্রলারও তখন কালেভদ্রে এক-আধখানা দেখা যায়। চাষিরা পড়ল মহাবিপদে। আড়তদাররা দুম করে দাম হাঁকতে লাগল অর্ধেকেরও কম। আড়তদারদের দোষ দিয়েইবা কী হবে! স্টিমার নেই, তারাও জানে না, কী করে এসব কেনা পণ্য নিয়ে তারা শহরে যাবে! মজিবর মিয়া আর হারাধন কাকভোরে মোঘলগঞ্জ ঘাটে নাও থেকে পাট নামাল। তারপর সেই স্তূপকৃত পাটের ভেতর গোল হয়ে ঘুমিয়ে রইল। টানা পরিশ্রমে শরীর ভেঙে পড়েছে। ঘুম ভাঙল কটকটা রোদের দুপুরে। ততক্ষণে মোঘলগঞ্জ হাট ক্রেতা-বিক্রেতার ভিড়ে গমগম করছে। মজিবর মিয়া ছ'খানা আড়ত ঘুরে এসে ঘাটের কাছে স্তূপ করে রাখা পাটের মধ্যে আবার শুয়ে পড়ল। এই দামে পাট বিক্রি করার চেয়ে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া ভালো। তার মাথা কেমন আউলা-ঝাউলা লাগছে। কী করবে ভেবে পেল না মজিবর মিয়া। এই পাট নিয়ে আবার এতটা পথ ফিরে যাওয়ার কোনো মানে হয় না। সে সেই পাটের মধ্যে মুখ গুঁজে পড়ে রইল। সন্ধ্যাবেলা তালেব মাঝি তাকে ডেকে ওঠাল, তার একহাতে চিড়া-গুড়। আরেক হাতে জগভর্তি পানি। সে মজিবর মিয়ার মাথায় খানিক পানি ছিটিয়ে দিয়ে বলল, 'তোর বাপের মতো দশা করিস না রে মজিবর। এই মোঘলগঞ্জ হাটে তারেও লইয়া আসছিলাম আমি। আসনের সময় সারা পথ কী খাটাটাই না খাটল। কিন্তু যাওনের সময় ফিরা গেলাম তার লাশ লইয়া। কী হইছিল আল্লায় জানে। নাও থেকে নামার পরই বলল মাথা ঝিমঝিম করতেছে। বুকে ব্যথা। তারপর দুইবার বমি করল। তারপর সব শেষ।'

মজিবর মিয়া তার বাবার এই ঘটনা জানে। সে তখন ছোট। তার শুধু এইটুকু মনে আছে, কোমরে গামছা বাঁধা শ্যামলা লম্বা মানুষটা তাকে কাঁধে নিয়ে বড় বড় পা ফেলে নদীর ঘাটে গেল। তারপর নদীর পানিতে গা ডলে ডলে গোসল করাল। তারপর বলল, 'যাও বাজান, বাড়ি যাও। আমি মোঘলগঞ্জ হাটে যাই। তোমার জন্য লাল কোর্তা নিয়া আসব।' দু'দিন বাদে বাবা ফিরেছিল। কিন্তু বড় বড় পা ফেলে হেঁটে ফেরেনি। ফিরেছিল হোগলা পাতার মাদুরে পেঁচিয়ে লাশ হয়ে। মা উঠানে আছড়ে পড়ে চিৎকার করে কাঁদছিল। মজিবর মিয়া অনেকক্ষণ হোগলা পাতার মাদুরের ভেতরে চোখ বন্ধ করে ঘুমিয়ে থাকা মানুষটার দিকে তাকিয়ে ছিল। কিন্তু কেন যেন তার মনে হয়নি এই মানুষটাই তার সেই বাবা, যে বাবা তাকে ডলে ডলে গোসল করিয়ে বিদায় নিয়েছিল। তার মনে হয়েছিল, এই মানুষ অন্য কেউ। তার বাবা আজ, কাল বা পরশু ফিরবে। ঠিক ও রকম কোমরে লাল গামছা বেঁধে হৈহৈ করে ফিরে আসবে। তার হাতে থাকবে লাল কোর্তা। ছোট্ট মজিবর মিয়া লাশের পাশ থেকে চুপিসারে সরে গিয়েছিল। কলার মুচির খোলসগুলো পানিতে ছেড়ে দিলে কী

সুন্দর নৌকার মতো ভাসে। সে বাড়ির পাশের কলাগাছের নিচ থেকে সেগুলো কুড়িয়ে নিয়ে খেলায় মেতে উঠল।

তালেব মাঝি মজিবর মিয়াকে বসাল। তার মুখে পানির ছিটা দিল। হাতে চিড়া-গুড় ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'নে, দুইডা মুখে দে। তারবাদে পেট ভইরা পানি খা।'

মজিবর মিয়া কোনো জবাব দিল না। কিন্তু চিড়া আর গুড় নিয়ে মুখে দিল। ঢকঢক করে পেট ভরে পানি খেল। তারপর উঠে দাঁড়াল। ঠিক আজকের আকাশের মতোই আকাশভর্তি তখন তারার মেলা। সে তালেব মাঝিকে বলল, 'ও চাচা, এইখান থেইকা টরকির বন্দর কতদূর?'

তালেব মাঝি কপাল কুঁচকে বলল, 'ক্যানরে টরকীর বন্দর ক্যান?

মজিবর মিয়া বলল, 'শুনছি টরকির বন্দর যাইতে পারলে ওইখান থেইকা লঞ্চে খুলনা যাওন যায়।'

তালেব মাঝি আঁতকে ওঠা গলায় বলল, 'তুই এই মাল লইয়া এখন খুলনা যাবি?'

মজিবর মিয়া তালেব মাঝির কথার কোনো জবাব দিল না। সে বলল, 'আপনে আমারে টরকি বন্দর পর্যন্ত পৌঁছাই দিতে পারবেন কিনা বলেন?'

তালেব মাঝি খানিকক্ষণ থম মেরে বসে রইল। তারপর বলল, 'নাও লইয়া টরকি বন্দর যাওন অত সহজ হইলে এই আকালের দিনে কেউই আর মাল বেচতে মোঘলগঞ্জ আইত না। সবাই ওইখানেই যাইত। ওই গাঙ্গে যে ঢেউ, তারওপর যে বড় বড় ঘূর্ণি। বড় লঞ্চও উথাল-পাথাল হয়। কয়দিন আগেও বিয়ার নওসা, বরযাত্রীসহ বিরাট নাও ডুবছে। আর আমার এই নাও, নাওভর্তি এত মাল লইয়া যাবি সেইখানে?'

মজিবর মিয়া বলল, 'এখন নদীতে তেমন ঢেউ নাই। ভাটার টান আছে। আপনে সাহস করলে চলেন। ভাড়ার বাইরেও পাট বেচার দামের ওপর আপনে কমিশন পাইবেন।'

কমিশনের লোভে হোক আর মজিবর মিয়ার জেদের কারণেই হোক, হারাধন আর তালেব মাঝি শেষ পর্যন্ত রাজি হয়েছিল। ভালোয় ভালোয় তারা মজিবর মিয়ার সঙ্গে টরকী বন্দর পৌঁছেছিল। তালেব মাঝিকে টরকী বন্দর রেখে মজিবর মিয়া হারাধনকে নিয়ে লঞ্চে গিয়েছিল খুলনা শহরে। শহরে তখন মোঘলগঞ্জের উল্টো দৃশ্য। স্টিমার বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কৃষিপণ্যের সরবরাহ কমে গেছে। ফলে জিনিসপত্রের দাম হয়ে আছে আকাশচুম্বী। মজিবর মিয়া প্রত্যাশার চেয়েও কয়েকগুণ বেশি দামে পাট বেচে বাড়ি ফিরল। হারাধন আর তালেব মাঝিকে তাদের ভাগের টাকা দিয়েও হাতে বেশ কিছু কাঁচা পয়সা জমে গেল। গ্রামে তখন কাঁচা পয়সার বড্ড অভাব। সবার গোলাভর্তি ধান, ঘরভর্তি পাট। কিন্তু কারো হাতেই কোনো নগদ পয়সা নেই। হাটবাজারের অবস্থা বড় করুণ।

Boighar.com & ARS

গৃহস্থ চাল, ডাল, ধানের পসরা সাজিয়ে বসে থাকে। কিন্তু কেনার কেউ নেই। কে কিনবে? কী দিয়ে কিনবে? এই সময় যযাতিপুরের মানুষ যেন ফিরে গেল সেই বিনিময় প্রথার যুগে। যার গোলাভর্তি ধান আছে সে ধানের বদলে পাট নেয়। মাচার লাউয়ের বদলে কেউ মাছ নেয়। ডালের বদলে কেউ চাল নেয়। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে তেল, নুন, কাপড়ের মতো দ্রব্যের। এর বিনিময়ের ব্যবস্থা নেই। প্রায় সপ্তাহখানেকেরও পর মজিবর মিয়া যখন বাড়ি ফিরল, তখন আম্বরি বেগম শয্যাশায়ী। স্বামীর মৃত্যু পর এই হাট, বাজার, গঞ্জকে তার খুব ভয়। তারওপর ছেলে মোঘলগঞ্জ গেল দু'দিনের কথা বলে, অথচ সপ্তাহ পেরোলেও তার কোনো খবর নেই। এর মাঝে যযাতিপুরের বহু লোক মোঘলগঞ্জে গিয়েছে, কিন্তু সেখানে মজিবর মিয়া তো দূরে থাক, তালেব মাঝির নাও বা হারাধনেরও কোনো খবর কেউ জানে না। এর মধ্যে ঘটল আরেক ঘটনা, একরাতে হঠাৎ প্রবল ঝড় উঠল, সেই ঝড়ে কোথাকার কোন নাও ডুবে গেল। সেই খবর যখন আম্বরি বেগমের কানে পৌঁছাল, তিনি তখন ছেলের চিন্তায় পাগলপ্রায়। শয্যাশায়ী পাগলপ্রায় আম্বরি বেগম মজিবর মিয়াকে দেখে প্রথম যে শব্দটা বললেন, তাহলো, 'তোরে আমি বিয়া দিব। আজকেই বিয়া দিব।'

মজিবর মিয়া হতভম্ব গলায় বলল, 'কী বলো মা?'

আম্বরি বেগম বলল, 'আমি তোরে বিয়া দিব। বউ আমার কাছে থাকব। বউয়ের জন্য হইলেও তুই আর আমারে ছাইড়া কখনও দূরে যাবি না।'

মজিবর মিয়া মুখ খুলতে যাচ্ছিল। আম্বরি বেগম চেঁচিয়ে বললেন, 'পুরুষ পোলা হইল গিয়া দামড়া গরু। এদের অভ্যাস ছোটাছুটি। এদের গলায় শক্ত দড়ি দিয়া খুঁটার আগায় বাইন্ধা রাখতে হয়। না বাইন্ধা রাখলে এরা ছোটে দিগ্বিদিক। এদের দিগ্বিদিক ছোটাছুটি বন্ধ করা জরুরি। আর এদের সেই শক্ত দড়ির খুঁটা হইল ঘরের বউ।'

মজিবর মিয়াকে আম্বরি বেগম আর কিছু বলতে দিলেন না। কিছু শুনলেন না। তার ছেলে যে কী অসাধ্য সাধন করে বাড়ি ফিরেছে তাও না। তিন দিনের মাথায় মজিবর মিয়ার বিয়ে হয়ে গেল। বউয়ের নাম নিলুফা বানু। ভালো ঘরের মেয়ে। এই মেয়ের সঙ্গে মজিবর মিয়ার বিয়ে হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। কিন্তু জগতে বিচিত্র সব ঘটনা ঘটে। এক্ষেত্রেও ঘটল।

পরদিন সন্ধ্যায় তালেব মাঝি এসে হাজির। মজিবর মিয়া তখন আম্বরি বেগমকে তার পাট বিক্রির কাহিনী বলছিল। আম্বরি বেগম ছেলের এই ঘটনা শুনে তার বিয়ের বিষয়ে যেটুকু দ্বিধা ছিল তাও ঝেড়ে ফেললেন। তালেব মাঝি ঘরের দাওয়ায় বসতে বসতে বলল, 'ভাউজ, একখান ভালো মাইয়া আছে। কিন্তু তার কপাল বড় খারাপ।' www.boighar.com

আম্বরি বেগম সরু চোখে তাকালেন। তালেব মাঝি বলল, 'মাইয়ার নাম নিলুফা। ভালো ঘরের মাইয়া। মোঘলগঞ্জের মিয়াপুরের জাহাঙ্গীর মাতুব্বরের

নাতনি। মাইয়ার গায়ের রঙ ফর্সা। বিয়া ঠিক হইছিল টরকী বন্দরে। আংটিও পরাইয়া গেছিল। কিন্তু বিয়ার দিন নাও ডুবিতে নওসাসহ বরযাত্রীর সাতজন মারা গেছে।'

মজিবর মিয়া ঝট করে মাথা তুলল। তারপর বলল, 'ওইদিন মোঘলগঞ্জে বইসা আপনে বললেন না, বড় গাঙ্গে নাকি নওসা আর বরযাত্রীসহ নাও ডুবছিল, সেইটা কি তাইলে...!'

মজিবর মিয়া পুরো কথা শেষ করল না। চুপ করে গেল। তালেব মাঝিও সঙ্গে সঙ্গেই কিছু বলল না। সন্ধ্যার ক্রমশই নেমে আসা অন্ধকারে হঠাৎ যেন খানিক বিষাদ মেখে গেল। তারপর তালেব মাঝি মুখ খুলল, 'মোঘলগঞ্জ হাটেরতন মাইল পাঁচেক উত্তরে মিয়াপুর গ্রাম। ওইখানেই মাতুব্বর বাড়িতে বরযাত্রীদের যাওনের কথা ছিল। মাইয়ার নানাবাড়িতে। ওইখানেই বিয়া হওনের কথা। সকল জোগাড়যন্তর রেডি। মাইয়ার বাপ নাই। মায়ের সঙ্গে নানাবাড়ি থাকে। নানা জাহাঙ্গীর মাতুব্বর, টাকা-পয়সাওয়ালা লোক। কাঠের ব্যবসা আছে। তার চাইর পোলা। ছোটটা নতুন বিয়া কইরাই বিদাশ গেছে। আর বাকিরা এখন ব্যবসাপাতি দেখতেছে। অল্পবয়সে মেয়ে বিধবা হওনে নাতিন আর মাইয়ারে আদর-যত্নের কমতি রাখে নাই। নাতিনের জন্য ভালো পাত্রও ঠিক করছিল, আংটি পর্যন্ত পরাইয়া গেছিল।'

তালেব মাঝি খানিক সময় নিয়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ল। তারপর বলল, 'জন্ম, মৃত্যু, বিয়া আল্লাহর হাতে। বরযাত্রীরা ডুবল বড় গাঙ্গে। বিয়ার সব জোগাড়-যন্তর রেডি। এই সময় আইল এই খবর। বোঝেনই তো তাদের অবস্থা। গাঁওগ্রামে আংটি পরানি মানে মাইয়ার বিয়া হইয়া যাওন। সেই বিয়া যদি না হয়, তা হইলে অবস্থাটা ভাইবা দেখছেন? আর যে কারণেই হোউক, মাইয়া মাইনষের বিয়া একবার ভাঙলে, মানুষ নানান কথা কয়। তারওপর এতবড় ঘটনা ঘটল, মাইয়ার বাপও অল্প বয়সে মারা গেছে। লোকজন নানান ধরনের কথা শুরু করল। মাইয়ার, মাইয়ার মায়ের দোষ আছে এইসব।'

আম্বরি বেগম কী ভাবলেন কে জানে! তিনি বসা থেকে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন, 'মজিবরের বাপও তো অল্প বয়সে মরছে। এইজন্য কি আমি কুলক্ষণ নাকি তালেব? আমার দোষে কি মজিবরের বাপ মারা গেছে?'

তালেব মাঝি কোনো জবাব দিল না। আম্বরি বেগমই আবার বললেন, 'মাইয়া দেখনের কোনো ব্যবস্থা আছে?'

তালেব মাঝি বলল, 'সেই জন্যই তো আইলাম ভাউজ। আমাগো পাশের গ্রাম আলীপুরেই মাইয়ার বড় মামুর শ্বশুরবাড়ি। কয়দিন আগেই তারে এইখানে নিয়া আসছে। তারা এখন দূরের কোনো ছেলে খুঁজতেছে। ছেলের টাকা-পয়সা, বাড়ি-ঘর কিছুই তারা চায় না। তারা চায় কর্মঠ একটা ছেলে, আর চরিত্রটা জানি ভালো হয়।'

Boighar.com & ARS

পরদিন খুব ভোরে আম্বরি বেগম তালেব মাঝির সঙ্গে মেয়ে দেখতে গেল। মেয়ে দেখে তার খুবই পছন্দ হয়েছে। সে তালেব মাঝিকে বলল, এই মেয়েকে সে ছেলের বউ করতে রাজি। কিন্তু তাদের মতো দরিদ্র চাষা-ভূষার ঘরে তারা মেয়ে দেবে কিনা সেটাই প্রশ্ন!

মজিবর মিয়ার হাতে যে কিছু কাঁচা পয়সা জমেছে এ কথা তখন পাঁচ কান ছড়িয়েছে। এই আকালের দিনে মজিবর মিয়ার এমন বুদ্ধিদীপ্ত এবং সাহসী ঘটনার কথাও সবাই কম-বেশি জানে। গায়ের রঙ একটু ময়লা হলেও মজিবর মিয়া দেখতে-শুনতে ভালো। দোহারা গড়ন। নিলুফা বানুর নানা জাহাঙ্গীর মাতুব্বর বুদ্ধিমান লোক। বিধবা মেয়ে আর নাতনিকে তিনি যত আদর-যত্নই করেন না কেন তার ছেলে আর ছেলের বউরা যে দিন দিন অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে সেটা তিনি ঠিকই টের পান। তিন দিনের মাথায় মজিবর মিয়ার সঙ্গে নিলুফা বানুর বিয়ে হয়ে গেল। ঘটনা ঘটে গেল অতি দ্রুত। মজিবর মিয়া কিছু বুঝে ওঠার আগেই। কাপড়-চোপড়ে জড়ানো কিশোরী বধূ দেখে মজিবর মিয়ার কেমন অস্বস্তি হতে লাগল। সে নারীসঙ্গ বিবর্জিত মানুষ। কীভাবে বউয়ের সঙ্গে কথা বলবে, এই নিয়ে নানান দ্বিধা কাজ করে। কোথায় একটা ভয়ও যেন। সে জানে না এই ভয় কিসের! একটা জলজ্যান্ত নারী শরীর তার পাশে, কিন্তু সেই অজানা দ্বিধা আর ভয় কাটিয়ে সে সেই শরীর ছুঁতে পারে না। তার সেই ভয়-দ্বিধা কাটাল নিলুফা বানু নিজেই। এমনই এক অন্ধকার তারার রাতে নিলুফা বানু তাকে বলল, 'আপনে কি খেয়াল করছেন, আপনে আমারে তুই, তুমি কিছুই বলেন না?'

মজিবর মিয়া বলল, 'কই, বলি তো'।

নিলুফা বানু বলল, 'না, বলেন না। আপনের পানি লাগলে আপনে আমার কাছে পানি চান না। আপনে আপনার মায়েরে বলেন, ঘরে কি পানি আছে মা? গামছা লাগলে বলেন, গামছাডা যে কই রাখলাম। এখন খুঁইজা পাইতেছি না। এমন কেন করেন? আমি আপনার বিয়া করা বউ। আমারে আপনার এত ভয় কী? লজ্জা কী?'

মজিবর মিয়া এই কথার কোনো জবাব দিল না। সে বলল, 'সারাদিন অনেক খাটনি গেছে। এখন একটু ঘুমাইতে দেও।'

নিলুফা বানু আগুনের মূর্তির মতোন তার সামনে এসে দাঁড়াল। তারপর বলল, 'আইজ আপনের ঘুম নাই।'

মজিবর মিয়া বলল, 'ঘুম নাই মানে?'

নিলুফা বানু বলল, 'ঘুম নাই মানে ঘুম নাই।' এই বলে নিলুফা বানু ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ফাঁকা ঘরে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল মজিবর মিয়া। কী করবে ভেবে পেল না সে। কই গেল মেয়েটা? কতক্ষণে ফিরবে? কিন্তু অনেকক্ষণ পরও যখন নিলুফা বানু ফিরল না তখন গামছাটা গলায় জড়িয়ে সে

ঘর থেকে বের হলো। চারদিকে তখন ঘুটঘুটে অন্ধকার। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কোনো সাড়াশব্দ নেই কোথাও। পাশের ঘরে আম্বরি বেগম ততক্ষণে ঘুমিয়ে কাদা হয়ে আছেন। বাড়ির উঠানে, আশপাশে নিলুফা বানুকে খুঁজল মজিবর মিয়া। কিন্তু নিলুফা বানু কোথাও নেই। সে যেন মুহূর্তেই অন্ধকারে মিশে গেছে। শেষমেশ উপায় না দেখে মজিবর মিয়া নিচু গলায় নিলুফা বানুকে ডাকল। কিন্তু সে ডাকে নিলুফা বানুর সাড়া নেই। সে উঠান পেরিয়ে বাড়ির লাগোয়া উঁচু মাটির রাস্তায় চলে এলো। কিন্তু সেখানেও নিলুফা বানু নেই! মজিবর মিয়া ভয় পেয়ে গেল। সে এবার উঁচু গলায় ডাকল, 'নিলুফা, ও নিলুফা'।

চারপাশে ঝিঁঝিঁ পোকার একটানা শব্দ। সেই শব্দের ভেতর নিলুফা ডাকটা ডুবে গেল। এবার সে আরও উঁচু গলায় ডাকল, 'নিলুফা, নিলুফা, কই তুমি?'

নিলুফা বানু স্পষ্ট গলায় বলল, 'এই যে আমি'।

নিলুফা বানু দাঁড়িয়ে ছিল ঘরের বেড়ার গা ঘেঁষে অন্ধকারে মিশে। মজিবর মিয়া রাস্তা থেকে নেমে আবার ঘরের কাছে চলে এলো। তারপর থমথমে মুখে রাগী গলায় বলল, 'এত রাইতে এইসব কী শুরু করছো তুমি?'

নিলুফা বানু বলল, 'ওষুধে কাজ হয় কিনা দেখলাম। কাজ হইছে। কাজ না হইলে আমারে আর খুঁইজা পাওয়া যাইত না। যাই তো, তবে এইখানে না, যযাতিপুর নদীতে।'

মজিবর মিয়া বলল, 'তুমি এইসব কী বলতেছ নিলুফা?'

নিলুফা বানু বলল, 'ঠিকই বলতেছি। আপনে আমারে ভয় পান। এইটা আমি টের পাই। আপনে মনে মনে আমারে ডরান। যেই স্ত্রীরে স্বামী ভয় পায় সেই স্ত্রীর বাঁইচা থাইকা কী লাভ!'

মজিবর মিয়া বলল, 'আমি তোমারে ভয় পাব কেন?'

নিলুফা বানু বলল, 'আপনের মনের ভেতরে আমারে নিয়া অনেক চিন্তা। অনেক গোপন ভয়, আমি আসলেই অপয়া মাইয়া কিনা। আমারে বিয়া করছেন, এখন আপনারও কোনো ক্ষতি হয় কিনা! কি ঠিক বলি নাই? এত দিনে আপনে আমারে একবারও তুই, তুমি কিছু বইলাই ডাকেন নাই। আমার হাতের কিছু খান নাই। একবারের জন্যও আমারে আমার মায়ের বাড়িতেও নিয়া যান নাই। আমি সব বুঝি, সব টের পাই। আপনে রাইতে ঘুমের মধ্যে অনেক কিছু বলেন। আমি সব শুনি। আমার মায়রে নিয়া, আমারে নিয়া লোকজন নানান কথা বলে, আমি জানি। আমার বাপজান অল্প বয়সে মারা গেছে। তারওপর আমার ওইরকম একটা ঘটনা ঘটল। এইগুলা সব আপনের মনের মধ্যে ঢুইকা গেছে। আমি কী করব বলেন?'

মজিবর মিয়া নিলুফা বানুর এই কথার কোনো জবাব দিল না। সে মাথা নিচু করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। নিলুফা বানু বলল, 'আমার অনেক কষ্ট।

Boighar.com & ARS

অনেক। সবাই জানে আমি আর আমার মা আমার নানার বাড়িতে খুব শান-শওকতে আছি। খুব ভালো আছি। কিন্তু আসল খবর কেউ জানে না। আমার চার মামী আমাদের একফোঁটা সহ্য করতে পারে না। আমার নানীও নাই। নানা বুড়া মানুষ, তার হাতে এখন আর কোনো ক্ষমতাই নাই। সে কী করব? আসলে আমরা ছিলাম সেই বাড়ির...।'

নিলুফা বানু কথা শেষ করতে পারে না। সে হঠাৎ ডুকরে কেঁদে ওঠে। কাঁদতেই থাকে। সেই কান্না জড়ানো গলাতেই নিলুফা বানু বলে, 'এই দুনিয়াতে আমার আপনে ছাড়া আর কেউ নাই। কিচ্ছু নাই। কিচ্ছু না। তাই ভাবছিলাম, আইজ যদি আপনে আমারে খুঁজতে না বাইর হন, তাইলে আমি আর ঘরে ফিরা যাব না।'

নিলুফা বানু খানিক থামল। তারপর হঠাৎ খপ করে মজিবর মিয়ার ডান হাতখানা চেপে ধরে বলল, 'আপনে যখন আমারে নিলুফা বইলা ডাকলেন, যখন তুমি তুমি কইরা বললেন, ও নিলুফা তুমি কই, তখন আমার চোখে পানি চইলা আসছে। আপনার গলায় আমার জন্য দুশ্চিন্তা ছিল। আমার কী মনে হইছে জানেন? আমার মনে হইছে এই মানুষটা আমারে ভয় পাইলেও সেই ভয়ের মধ্যেই কই যেন একটু মায়াও আছে। ওইটুক মায়া থাকলে আমার আর কিছু দরকার নাই।'

নিলুফা বানু এবার আর কাঁদল না। তবে তার শরীরটা কেমন কেঁপে কেঁপে উঠল। সেই গাঢ় অন্ধকারে মজিবর মিয়া হঠাৎ নিলুফা বানুকে তার বুকের ভেতর চেপে ধরল। শক্ত করে চেপে ধরল। তার মনে হলো তার চওড়া বুকের ভেতর তুলতুলে নরম একটা কবুতর। সেই নরম কবুতরটাকে বুকের ভেতর চেপে ধরে দাঁড়িয়ে রইল সে। নিলুফার শরীরটা তখনও থেকে থেকে কেঁপে উঠছে। সে কী কাঁদছে? কাঁদলে কাঁদুক। মানব জীবনে কান্নার তুল্য কিছু নেই। মজিবর মিয়া মাথা তুলে আকাশের দিকে চাইল। আকাশভর্তি ফুলের মতোন তারা। সে সেই অগুনতি তারার ফুলের দিকে তাকিয়ে রইল। নিলুফা বানু তার বুকের ভেতর কাঁদছে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

নিলুফা বানু মরার পর থেকে আজ অবধি মজিবর মিয়া কাঁদেনি। কেন কাঁদেনি সে জানে না। মরার পরদিন নিলুফার মা এসেছিল, নানা এসেছিল। নিলুফার মা বারোমাসি রোগী। রোগবালাই তার লেগেই থাকে। মজিবর মিয়া কোনো এক অদ্ভুত কারণে নিলুফার নানা বাড়ির কাউকে পছন্দ করত না। সবচেয়ে বেশি অপছন্দ করত নিলুফার মামা আর মামীদের। নিলুফার মুখে তার মামা আর মামীদের নানামুখী বিরূপ আচরণের কাহিনী সে শুনেছিল। হয়তো এসব কাহিনী শুনেই ভেতরে ভেতরে বিষিয়ে উঠেছিল তার মন। বিয়ের পর তাই অনেক চেষ্টা

করেও নিলুফা বানু মজিবর মিয়াকে তার নানাবড়ি নিতে পারেনি। নিলুফা বানু কখনও খুব অনুরোধ করলে মজিবর মিয়া হেসে বলত, 'আরে শ্বশুরবাড়িই নাই, নানাশ্বশুরবাড়ি গিয়া কী হইব'!

নিলুফা বানুর মায়ের সঙ্গেও তার কোনো যোগাযোগ ছিল না। কথা হতো না। এমনকি নিলুফা মারা যাওয়ার পরদিন যখন তারা এলো তখনও না। মজিবর মিয়া জানে না কেন, কিন্তু সেদিন সে কারও সঙ্গে কথা বলতে পারেনি। পুরোটা সময় সে স্বাভাবিকভাবে কাজকর্ম করেছে। এই বন্যায় নিলুফার লাশ কোথায় মাটি দেওয়া হবে তা নিয়ে নানান ঝক্কি ছিল। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হলো লাশ নিয়ে যাওয়া হবে মিয়াপুর, নিলুফা বানুর নানার বাড়ি। লাশ নিয়েও যাওয়া হলো। লাশের ট্রলারে ওঠার আগমুহূর্তে মজিবর মিয়া ফিরে এলো। সে বলল, 'সে যাবে না।' এই নিয়ে নানান দিক থেকে মোটামুটি ভালো রকমের কথাবার্তা হলো কিন্তু সে গেল না। কেন গেল না তা কেউ জানে না। সে নিজেও কি জানে? আজ এই নিঃশব্দ চরাচরে, আকাশভর্তি সেই রাতের মতোন অগুনতি তারার ফুলের নিচে দাঁড়িয়ে সে হঠাৎ হুহু করে কাঁদল। তার সেই কান্নার শব্দে কিনা কে জানে, অবলা গাই দুটি মাথা ঘুরিয়ে ফিরে তাকাল। মজিবর মিয়া কাঁদল। এই নির্জন তারাভরা রাতে, খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে মজিবর মিয়া কাঁদল। তার বুকের ভেতরে কবুতরের পালকের ওমের মতোন স্পর্শ লেগে থাকা সেই অনুভূতিটুকুর জন্য কাঁদল। সেই স্পর্শে আর কখনও কেউ ছুঁয়ে দেবে না বলে কাঁদল। কিংবা সে নিজেই হয়তো জানে না সে কেন কাঁদল। এই কান্না কেউ দেখল না, কেউ শুনল না। কিন্তু যিনি এই বিশ্বচরাচর সৃষ্টি করেছেন তিনি জানেন, এই কান্না জগতের শুদ্ধতম কান্না।

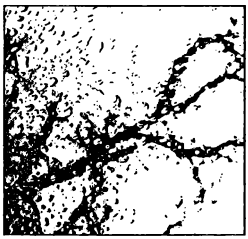

শুকরঞ্জন ডাক্তার প্রতি দুই-চার মাসে একবার ঢাকা যান। ঢাকা যাওয়ার জন্য প্রতি দুই-চার মাস পরপরই তার যে অতি গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজ থাকে, বিষয়টি মোটেই তা না। তবুও তিনি যান। যাওয়ার আগের পটভূমিকাটা অবশ্য অদ্ভুত। সেটি তার স্ত্রীর সঙ্গে তার কথোপকথন শুনলেই বোঝা যায়। এবং এই অদ্ভুত পটভূমিকা বলতে গেলে প্রতিবার একই থাকে। তিনি তার স্ত্রী সুজাতা রানীকে ডেকে বলবেন, 'তোমার প্রেসার তো দিন দিন হাই হয়ে যাচ্ছে। ব্যবস্থা তো একটা করন লাগে।'

সুজাতা রানী বলবেন, 'কী ব্যবস্থা? বয়স বাড়ছে, নানান চিন্তা-চেতনায় থাকি। প্রেসার তো বাড়বই।'

শুকরঞ্জন ডাক্তার বলবেন, 'এই হইল তোমাদের রমণীকুলের এক সমস্যা। যেই জিনিসে বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত তোমরা সেই জিনিসে দিবা সবচেয়ে কম গুরুত্ব। আর যেই জিনিসে গুরুত্ব দেওনের দরকার নাই, সেই জিনিস নিয়া সবসময় হাঙ্গামা।'

সুজাতা রানী ঠাণ্ডা গলায় বলবেন, 'হাঙ্গামা করনের অভ্যাস আমার নাই। হাঙ্গামা করনের অভ্যাস আছে আপনের। আপনে কারণে-অকারণে হাঙ্গামা করেন।'

শুকরঞ্জন ডাক্তার তখন গলার স্বর হঠাৎ উঁচুতে তুলবেন, 'কী? আমি হাঙ্গামা করি? আমি হাঙ্গামা করনের লোক? কী হাঙ্গামা করি শুনি? তোমার সঙ্গে আমার বিবাহের এই চল্লিশ বছর, আজ পর্যন্ত তোমার সঙ্গে কোনো বিষয়ে দ্বিমত করেছি? যা বলেছ, যখন বলেছ সব মাইনা নিছি। এই হইল তার প্রতিদান, না? এই হইল প্রতিদান। এখন আইসা কী বলতেছ তুমি? আমি হাঙ্গামা করি?'

সুজাতা রানী ঠাণ্ডা গলায় বলবেন, 'গলার স্বর উঁচু কইরা লাভ হইব না। আপনেরে যা বলছি, আপনে সেই কাজ করেন। আমি আর এই দেশে থাকব না। আমি ইন্ডিয়া চলে যাব। আমার এই দেশে আছে কে? মরার যুদ্ধে সব হারাইছি। মা, বাপ, ভাই, বইন, আত্মীয়-স্বজন সব। যাও কিছু ছিল, সব চইলা গেল ইন্ডিয়া। ওইখানে তারা ভালো আছে। আপনে তো আর আমার কথা

শুনবেন না। আমার কথা সেই পনের-ষোল বছর আগে যুদ্ধের সময় শুনলে ছেলেটাও এই সর্বনাশ করার সুযোগ পাইত না। এখন থাকার মধ্যে ছিল একটামাত্র মেয়ে, তারেও জামাই ইন্ডিয়া নিয়া চইলা গেল। এই পোড়ার দেশে এখন আর আমার কী আছে? আমি আর কতবার বলব যে আমি থাকব না এইখানে! আপনে ইন্ডিয়া যাওনের ব্যবস্থা করেন। ব্যবস্থা না করলে দেখবেন হাঙ্গামা কারে বলে! আমি আপনের ঘর-বাড়ি সব আগুন দিয়া পোড়াই দিব।'

শুকরঞ্জন ডাক্তার তখন বলবেন, 'এই যে দেখছ, বলছি না যে তোমার প্রেসার বাড়ছে। এই জন্যই তো বললাম। তোমার প্রেসার হাই হইলেই তুমি ঘরে আগুন দেওনের কথা বলো। এইটার একটা ব্যবস্থা করন দরকার। কখন কী দুর্ঘটনা ঘইটা যায় বলন যায় না। এই জন্যই আমি ঢাকা যাব। আজকেই যাব। একটা নতুন প্রেসার মাপার মেশিন কেনা দরকার। ঢাকার শহর ছাড়া ভালো মেশিন পাওয়া সম্ভব না। দেশটা নকল-টকলে ভইরা গেছে। ডাক্তারির জিনিসপত্র খুব সিরিয়াস বিষয়। এইগুলা ভালো জায়গা থেইকা বাইছে-বুইছা কিনতে হয়।'

শুকরঞ্জন ডাক্তার এরপর ঢাকা যাওয়ার জোগাড়যন্ত্র করতে থাকেন। ঢাকা যাওয়ার বাহানা তৈরি করতে এতকিছুর প্রয়োজন হয়তো হতো না। কিন্তু তারপরও তিনি করেন। বিষয়টা যে সুজাতা রানী বোঝেন না তা না। বরং তিনিও জানেন, শুকরঞ্জন ডাক্তার কেন ঢাকায় যাচ্ছেন। কিন্তু জেনেও না জানার ভান করেন তিনি। মানব জীবন আসলে ভানের জীবন। এখানে বেশিরভাগ সময়ই মানুষকে ভান ধরে থাকতে হয়। প্রবল কষ্ট বুকে পুষে আনন্দের ভান ধরে থাকতে হয়। প্রবল স্নেহ বুকে পুষে কঠিন মানুষের মুখোশ পরে থাকতে হয়। নিঃসঙ্গ দুই নর-নারী নানানভাবে সেই ভান ধরে যাচ্ছেন। অদ্ভুত এক পাণ্ডুলিপিতে অভিনয় করে যাচ্ছেন। তাঁদের অভিনয় যে খুব ভালো হচ্ছে তা না। তবে দর্শক হিসেবে পরস্পরের অভিনয়কে তারা মেনে নিয়েছেন।

প্রতিটা মানুষের জীবনজুড়ে থাকে অজস্র গল্প। সেই গল্পের সামান্য, খুব সামান্যই জানে অন্য মানুষ। বাদবাকি গল্পগুলো নিত্যসঙ্গী হয়ে মিশে থাকে বুকের ভেতর। মনখারাপের কোনো একলা দুপুর কিংবা নিঃসঙ্গ গভীর রাতে সেই গল্পগুলো হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়ে তাকে ডেকে তোলে। মানুষগুলো তখন সেই গল্পের সঙ্গে জীবনের হিসাব মেলায়। কিন্তু সেই হিসাব কখনই মেলে না। সুজাতা রানী এবং শুকরঞ্জন ডাক্তারের হিসাবও মেলেনি। একাত্তুর সালের মুক্তিযুদ্ধে পিঁপড়ের মতোন পিলপিল করে দেশ ছেড়েছে মানুষ। কেউ কেউ শরণার্থী হিসেবে গেছে, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আবার ফিরে এসেছে দেশে। কেউ কেউ সেই যে গেছে আর ফিরে আসেনি। এই না ফিরে আসাদের বেশিরভাগই অবশ্য হিন্দু। শুকরঞ্জন ডাক্তার দেশ ছেড়ে যেতে চাননি। তিন ভাইয়ের মধ্যে তিনিই সবার বড়। আর ভাইয়েরা যুদ্ধ শুরুর কিছুদিনের মধ্যেই

Boighar.com & ARS

দেশ ছেড়েছে। কলকাতায় শুকরঞ্জন ডাক্তারদের নানার বাড়ি। অজস্র আত্মীয়-স্বজন। সুতরাং তাদের আশ্রয়ের অভাব হতো না। কিন্তু শুকরঞ্জন ডাক্তার সবসময় গলার রগ ফুলিয়ে বলতেন, 'বাপের দেশের মাটি, দপদপাইয়া হাঁটি'।

সে সেই বাপের দেশের মাটি ছেড়ে যায়নি। কখনও যাবে বলেও মনে হচ্ছে না।

সুজাতা রানীর আত্মীয়-স্বজনও বলতে গেলে বেশিরভাগই পাশের দেশে চলে গিয়েছিল। চলে যাওয়ার আগে অবশ্য সেই বীভৎস ঘটনাটা ঘটেছিল। একাত্তুরের জুলাইয়ে সাতাশ তারিখ। রাতদুপুরে মিলিটারিদের স্পিডবোট এসে থেমেছিল রামপাড়া ঘাটে। রামপাড়া হিন্দু গ্রাম। সুজাতা রানীর বাপের বাড়ির গ্রাম। সেই গ্রাম রাতের অন্ধকারে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছিল। তারপর গাঁয়ের পর গাঁ শ্মশানের জ্বলন্ত চিতা হয়ে উঠেছিল। কী করে কী করে যেন এই মালোপাড়াটা বেঁচে গেল। মিলিটারিরা ফিরে গেল মালোপাড়া অবধি না এসেই। ফলে বেঁচে গেলেন শুকরঞ্জন ডাক্তার, সুজাতা রানীরা। কিন্তু রামপাড়ার সেই আগুনে পুড়ে মরেছে অসংখ্য ঘর, মানুষ, বাড়ি। পুড়েছে সুজাতা রানীর বাবা, কাকাদের ঘরও। সুজাতা রানীর বৃদ্ধ মা, বাবা আর ছোটবোন ঘর থেকে বের হতে পারেনি। বের হতে পারেনি আরও অনেকে। যারা বেঁচেছিল, তারা ভিটে ছেড়েছিল এক কাপড়ে, শূন্য উদরে।

সুজাতা রানী আর শুকরঞ্জন ডাক্তারের বড় ছেলে আশিষ তখন আঠার-উনিশ বছরের টগবগে তরুণ। মেয়ে আনিতার বয়স নয়। দেশ ছেড়ে যাবেন না বলে ধনুক ভাঙা পণ করলেও ছেলেটাকে নিয়ে ভীষণ ভয় ছিল শুকরঞ্জন ডাক্তারের। আশিষ সেই অল্প বয়সেই বড় বেয়াড়া হয়ে উঠেছিল। কারও সঙ্গে তেমন কথাবার্তা বলত না। তবে রামপাড়ায় সুজাতা রানীর মাসতুতো বোনের এক মেয়ে ছিল, অপলা নাম। অপলার সঙ্গে খুব মিশত আশিষ। এই নিয়ে দুই পরিবারে ঝগড়াঝাঁটি কম হয়নি। মুখ দেখাদেখি অবধি বন্ধ হয়েছিল। অপলার বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক ছিল শহরে। পাত্র বড় চাকরি করে। কিন্তু তারপরও কোথায় যেন একটা গেরো ছিল। অপলা আর আশিষের। এই একটা মাত্র মেয়ে যার সঙ্গে আশিষ হাসত, প্রাণ খুলে কথা বলত। একবার তো কেলেঙ্কারি ঘটে গেল। অপলা আর আশিষকে পাওয়া যাচ্ছিল না দু'দিন ধরে। পরে অবশ্য জানা গেল অপলা তার সেই হবু বরের আসার কথা শুনে বান্ধবীর বাড়ি পালিয়েছিল। আর আশিষ গিয়েছিল মহকুমা শহরে খ্যাপে ফুটবল খেলতে। সেখানে তাকে খেলতে দেখেছেও অনেকে। তার মানে সেই দুইদিন অপলার সঙ্গে আশিষের কোনো যোগাযোগ ছিল না। কিন্তু আসলেই ছিল কিনা কে জানে? ওই বয়সের ছেলে-মেয়েদের বিশ্বাস করা বড় কঠিন!

এই ঘটনার মাস চারেক পর রামপাড়ায় আগুন দিল পাক আর্মি। পুরোটা সময় মালোপাড়ার বিলের মাঝের রাস্তায় দাঁড়িয়ে দেখেছিল আশিষ। খোলা

মাঠের জল পেরিয়ে দূরে ওই পারে পুড়ে যাওয়া রামপাড়ার মানুষের চিৎকার। নির্বিচার ব্রাশফায়ারে জলে ঝাঁপিয়ে পড়া মানুষের শরীরের রক্তে লাল হয়ে উঠেছিল বিল। বীভৎস দৃশ্য! পুরোটা সময় ঠায় দাঁড়িয়েছিল আশিষ। সবাই তখন গাঁ ছেড়ে পালাচ্ছিল, কিন্তু আশিষকে কেউ এক পাও নড়াতে পারেনি। উঠতে-বসতে ঘাড়ের রগ বাঁকা করে কথা বলত আশিষ। সেই বয়সেই রাজ্যের বইপুস্তক পড়ে সেয়ানা হয়ে উঠেছিল সে। শুকরঞ্জন ডাক্তারের মামাতো ভাই জয়দ্বীপ তখন হুটহাট কলকাতা থেকে চলে আসত। আর তার ব্যাগভর্তি থাকত বই। সেইসব বইয়ের ভেতর ঘাড় ডুবিয়ে পড়ে থাকত আশিষ। কিন্তু ওই ঘটনার পরের ক'দিন আর বইপত্র ছুঁয়েও দেখল না সে। কারও সঙ্গে কথাও বলল না। আগস্ট মাসের পুরোটা জুড়েই সেবার ভারী বৃষ্টি হলো গাঁয়ে। টানা বৃষ্টি। তেমনই এক বৃষ্টির রাত শেষে ভোরবেলা থেকে আর আশিষকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। শুকরঞ্জন ডাক্তার জানতেন আশিষ কোথায় গেছে। তাই খুব একটা হা-হুতাশও করেননি তিনি। আশিষ ফিরেছিল দেশ স্বাধীনের পর। বাঁ পায়ের গোড়ালিতে মস্ত গর্ত নিয়ে। সে পাঁচ মাসের রণাঙ্গনের কথা কাউকে কিছু বলেনি। চুপচাপ ঘরে ঢুকে বলেছিল, 'বাবা, মা কই? খিদে পেয়েছে ভাত দিতে বল। ঘরে মুরগির ডিম থাকলে ভালো। ডিম ভেজে দিতে বল।'www.boighar.com

তারপর কী করে কী করে যেন দেশ স্বাধীনের পনের-ষোল বছর হাওয়ার বেগে কেটে গেল! আশিষ আগের চেয়ে আরও বেশি গম্ভীর হয়ে গেছে। এর মধ্যে অজস্রবার দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার দিব্যি দিয়েছেন সুজাতা রানী। সবকিছু বেঁচে দিয়ে শুকরঞ্জন ডাক্তারকে কলকাতা চলে যাওয়ার কথা বলেছেন। কিন্তু ডাক্তার তাতে গা করেনি। একসময় ধীরে ধীরে পরিস্থিতি স্বাভাবিকও হয়ে এসেছিল। কিন্তু বড় দুর্ঘটনাটা ঘটল বছর সাতেক আগে। আশিষ তখন ঢাকায় থাকে। পত্রিকায় সাংবাদিকতা করে, লেখালেখি করে। বছরে বার দুয়েক গ্রামে আসে। এসে যে খুব একটা থাকে তাও না। এই এ বেলা এলো তো ফের বেলা চলে গেল। পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কটাও কেমন বাঁধনছাড়া হয়ে গেল। শুকরঞ্জন ডাক্তার কিংবা সুজাতা রানী কেউই কারণ খুঁজে পেলেন না। আনিতাও না। লোকে বলে এক ভাই ও এক বোন হলে ভাই-বোনের সম্পর্ক খুব গভীর হয়। কিন্তু আনিতা আর আশিষের সম্পর্ক কোনোকালেই তেমন গভীর ছিল না। বয়সের পার্থক্যের কারণে হোক কিংবা অন্য কোনো কারণেই হোক, তাদের মধ্যে সম্পর্কটা হলো ছাড়া ছাড়া। বছর সাতেক আগে এক দুপুরে আশিষের চিঠি এসেছিল, সে বিয়ে করেছে। মেয়ের নাম মিলি। শুকরঞ্জন ডাক্তার খুব সহজে ধাক্কা খান না। কিন্তু এবার খেলেন। আশিষের তখন সাতাশ-আটাশ বছর বয়স। তার বিয়ের বয়সও হয়েছে। সুজাতা রানীর ইচ্ছে ছিল আশিষের বিয়ে দেবেন কলকাতায়। সেইমতো তার এক দূরসম্পর্কের আত্মীয়ের সঙ্গে কথাও এগিয়ে রেখেছিলেন। তার এই ইচ্ছের কারণ পরিষ্কার। কলকাতায়

Boighar.com & ARS

আশিষের বিয়ে হলে সুজাতা রানীর দীর্ঘদিনের কলকাতাবাসের ইচ্ছে বাস্তবায়নের পথ খানিক সহজ হয়। কিন্তু এই ধাক্কা সুজাতা রানী কীভাবে সামলাবেন?

আশিষ যে মেয়েটাকে বিয়ে করেছে, সে মুসলমান। আশিষ চিঠিতে সব বিস্তারিত লিখেছে। মেয়েটার বংশ-পরিচয়ের কথাও লিখেছে। যাতে কোনো বিভ্রান্তি না থাকে। শুকরঞ্জন ডাক্তার দীর্ঘসময় নিয়ে ধাক্কাটা সামলালেন, কিন্তু ঘটনা সুজাতা রানীর কাছে কীভাবে বলবেন, তা তিনি বুঝে উঠতে পারলেন না। চিঠি পাওয়ার তিন দিন পর সুজাতা রানী ঘটনা জানলেন। জানলেন মেয়ে আনিতার কাছ থেকে। আনিতা চিঠি পেয়েছিল বাবার প্রেসক্রিপশন লেখার প্যাডের ভেতর। তারপরের ঘটনা ভয়াবহ। সুজাতা রানী মোটামুটি পাগল হয়ে গেলেন। একবার তো কেরোসিন ঢেলে নিজের গায়ে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার উপক্রম। ঘর-বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টাও কম করেননি। আশিষ চিঠিতে লিখেছিল সে বউ নিয়ে বাড়ি আসতে চায়। কিন্তু ফিরতি চিঠিতে শুকরঞ্জন ডাক্তার যতটা সম্ভব পরিস্থিতি বুঝিয়ে বলেছিলেন। তারপরও বছরখানেক পর হুট করে একদিন চলে এসেছিল আশিষ। সঙ্গে বউ। সুজাতা রানী বিষের শিশি হাতে ঘরের দাওয়ায় বসে ছিলেন। আশিষ বাড়ি ঢুকলেই তিনি বিষ খাবেন। আশিষ অবশ্য শেষ অবধি বাড়ি ঢোকেনি। তারপর আরও ছ'বছর কেটে গেছে। আনিতার বিয়েও হয়েছে। এই শোক কাটাতেই কিনা কে জানে, আনিতার বিয়ে হয়েছে কুষ্ঠি ঠিকুজি দেখে। আশিষের ঘটনার পর থেকেই সুজাতা রানীর এই দেশের ওপর থেকে পুরোপুরি মন উঠে গেছে। আনিতাকে যে ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছেন তাদের আত্মীয়-স্বজন সবাই থাকে কলকাতায়। দু'বছর আগে পরিবার নিয়ে সেও যখন কলকাতা চলে গেল, তখন সুজাতা রানী যেন খানিক হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। তার ধারণা ছিল শুকরঞ্জন ডাক্তার এবার দেশের পাট চুকিয়ে কলকাতার পথ ধরবেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল তার উল্টোচিত্র। রাত নেই, দিন নেই, কাঠফাটা রোদ্দুর কিংবা প্যাঁচপেঁচে কাদা হলেও শুকরঞ্জন ডাক্তার দপদপিয়ে হেঁটে দিব্যি গাঁয়ে গাঁয়ে রোগী দেখে বেড়ান। মনের আনন্দে গান গান। বাজারে তার চেম্বার আছে, সারাদিন সেই চেম্বারে বসে থাকেন। কেউ ডাকলেই হাসিমুখে ছুটে যান।

আশিষের সেই যে নির্বাসনের শুরু, তার আর শেষ আছে বলে মনে হয়নি। কিন্তু স্নেহ-মমতার ঢেউ এমন দু'কূলপ্লাবী যে কখন কাকে কীভাবে ভাসিয়ে নিয়ে যায় বলা মুশকিল। আশিষের কথা এই পরিবারে বলা নিষিদ্ধ। কেউ বলেও না। আনিতা থাকতে সে মাঝে মধ্যে চেষ্টা করেছে, কিন্তু সুজাতা রানী তখন মুহূর্তেই যেন অন্য মানুষ হয়ে যেতেন। তার সারা শরীরে যেন অদৃশ্য আগুন ধরে যেত। সাক্ষাৎ উন্মাদিনী যেন!

তবে আড়ালে-আবডালে শুকরঞ্জন ডাক্তারের সঙ্গে আশিষের যোগাযোগটা ছিলই। শুকরঞ্জন ডাক্তার ধর্মকর্ম করেন। কিন্তু তা নিয়ে তার অতি মাতামাতি নেই। আশিষের বিয়ে নিয়েও তিনি নিজের পক্ষ থেকে উচ্চবাচ্য কিছু করেননি। যা করেছেন তা সুজাতা রানীর কারণেই করেছেন। একটা সময় গিয়ে সুজাতা রানীর বরফও যেন গলতে শুরু করল। তিনি সরাসরি কিছু না বললেও তার হাবভাবে সেসব বোঝা যায়। শুকরঞ্জন ডাক্তার তা বুঝলেও অবশ্য ধরা দেন না। না বোঝার ভান করেন। তাদের পরস্পরের এই ভান চলতে থাকে। এ এক অদ্ভুত কানামাছি খেলা। দু'চার মাস পরপর ঢাকা গেলেও এবার অবশ্য খানিকটা দেরিই হয়ে গেল শুকরঞ্জন ডাক্তারের। দেরি হওয়ার কারণ নিলুফা বানুর মৃত্যু। সন্তান জন্ম দিয়েই মেয়েটা মরে গেল। চারদিকে তখন টানা বর্ষা, জল-কাদার মচ্ছব লেগেছে যেন। ওই সময়টাতে মা-মরা মেয়েটার নিউমোনিয়া লেগে গেলে আর বেঁচে থাকতে হবে না। পুরো সময়টাতে শুকরঞ্জন ডাক্তার জোঁকের মতোন লেগে রইলেন। বানের জল ডিঙিয়ে সপ্তায় দুয়েকবার তার আরশিকে দেখা চাই-ই চাই। প্রথম প্রথম ভেবেছিলেন মেয়েটা টিকবে না, কিন্তু শেষ অবধি টিকে গেল। এখন আর তেমন ভয় নেই। তিনি তাই নিশ্চিন্তে গাঁ ছাড়ছেন।

শুকরঞ্জন ডাক্তার ঢাকা পৌঁছালেন পরদিন দুপুরে। আশিষ থাকে মতিঝিলের দিকে। কিন্তু আশিষের বাসার ঠিকানায় পৌঁছে তিনি হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। এর আগেও বহুবার এসেছেন। গাবতলী বাসস্ট্যান্ডে নেমে সোজা বাসে মতিঝিল। তারপরের পথটুকু তার হাঁটাপথেই মুখস্থ। কিন্তু এবার প্রায় মাস ছয় পরে এসেছেন তিনি। তাই বলে ভোজবাজির মতোন আশিষের বাসাটা নাই হয়ে যাবে, এটা কেমন কথা! শুকরঞ্জন ডাক্তারের ঘটনা বুঝতে অনেকক্ষণ সময় লাগল। যতক্ষণে বুঝলেন ততক্ষণে তিনি অবাক হয়ে দেখলেন, যে দোতলা বিল্ডিংয়ের ওপর তলায় আশিষ ভাড়া থাকত সেখানে সেই দোতলা বিল্ডিংয়ের জায়গায় বহুতল ভবন নির্মাণের কাজ চলছে। শুকরঞ্জন ডাক্তার দীর্ঘসময় সেখানে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর আশপাশের দু'চারজনকে জিজ্ঞেস করলেন, কিন্তু কেউ কোনো সদুত্তর দিতে পারলেন না। ততক্ষণে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে এসেছে। এই শহরে তিনি আর কাউকে তেমন চেনেন না। আশিষের এক বন্ধু আছে, পরিমল নাম। লালবাগের দিকে থাকে। বার দুয়েক তিনি গিয়েছিলেনও। কিন্তু তার বাসা খুঁজে পাবেন বলেও মনে হচ্ছে না। ঢাকা শহর এলে পথেঘাটে তার হাঁসফাঁস লাগে। গাঁওগ্রামে চলতে-ফিরতে তিনি যতটা স্বতঃস্ফূর্ত, ঢাকা শহরে ঠিক ততটাই দ্বিধান্বিত। রাস্তা পার হতে তার দীর্ঘ সময় লাগে। কাগজে লেখা ঠিকানার সঙ্গে মিলিয়ে

Boighar.com & ARS

বাসা খুঁজে পেতে ভারি সমস্যা হয়। পথ চলতে হুটহাট পকেটমার হয়ে যায়। কিন্তু এখন এই পড়ন্ত বিকেলে তিনি কী করবেন? কই যাবেন? কই থাকবেন?

শেষ পর্যন্ত অবশ্য শুকরঞ্জন ডাক্তারের থাকার ব্যবস্থা একটা হলো। তিনি দীর্ঘ সময় মতিঝিলের রাস্তায় এলোমেলো হাঁটলেন। একনাগাড়ে বেশিক্ষণ হাঁটাও সম্ভব না। তার হাতে তার ডাক্তারির ছোট একটা ব্যাগ। তিনি যেখানেই যান এই ব্যাগ তার সঙ্গে থাকে। বিয়েবাড়িতে গেলেও থাকে। মৃতের বাড়িতে গেলেও থাকে। সেই ব্যাগ বগলের তলায় চেপে ধরে তিনি হাঁটেন। আজ তার সঙ্গে আরও একটা পেটমোটা ব্যাগ রয়েছে। বাজারের ব্যাগের মতোন ব্যাগ। ব্যাগের ভেতর খোসা ছড়ানো নারকেল, কুমড়োর ফুল, গোটাছয়েক পেয়ারা আর বাতাবি লেবু। এগুলো যে সুজাতা রানী ছেলের জন্য আদর করে ব্যাগে গুঁজে দিয়েছেন, ঘটনা মোটেও তা না। এগুলো শুকরঞ্জন ডাক্তার নিজের হাতে গুছিয়ে ব্যাগে ভরে এনেছেন। তবে তার মতোন আলাভোলা মানুষের জানার কথা না যে আশিষের কুমড়ো ফুলের বড়া ভীষণ পছন্দ। বাইন মাছের তরকারিতে নারকেল আর এক চিলতে বাতাবি লেবু পেলে সে একাই দু'জনের ভাত গিলে ফেলতে পারে। তারপরও তিনি এগুলো যত্ন করেই এনেছেন। আনার পেছনে সেই ভানের গল্প। সেই অদ্ভুত পাণ্ডুলিপিতে অভিনয়ের গল্প। শুকরঞ্জন ডাক্তারের ঢাকায় যাওয়ার আভাস পেলেই সুজাতা রানী দিনমান আকারে-ইঙ্গিতে নানান কথা বলেন। শুকরঞ্জন ডাক্তার তা মনোযোগ দিয়েই শোনেন। না শোনার ভান করে কান খাড়া করে লক্ষ্য করেন। ঢাকায় আসার দিন যখন পেটমোটা ব্যাগ নিয়ে তিনি বাড়ি থেকে বের হন তখন সুজাতা রানী গলা উঁচিয়ে ঢের গালমন্দও করেন। কিন্তু সেসব শুনে শুকরঞ্জন ডাক্তার মনে মনে কেবল হাসেন। কারণ তিনি জানেন, তিনি বাড়ি থেকে বের হওয়া মাত্রই সুজাতা রানী ছেলের ছবি বুকে চেপে ধরে কেঁদে বুক ভাসাবেন। আর ফিরে যাওয়া মাত্রই নানান ছলছুতোয় জেনে নেবেন সেই পেট মোটা ব্যাগের ভেতরের জিনিসপত্র পেয়ে আশিষ কী করেছিল! অবশ্য ঘটনা যা ঘটে ডাক্তার তারচেয়ে ঢের বাড়িয়েই বলেন।

কিন্তু এখন এই পেটমোটা ভারী ব্যাগ নিয়ে তিনি কই যাবেন? একটা ঝুপড়ি চায়ের দোকানের সামনের বেঞ্চিতে বসে খানিক জিরিয়ে নিচ্ছিলেন শুকরঞ্জন ডাক্তার। একটা আদা চায়ের অর্ডার দিয়ে কেবল বিড়ি ধরিয়েছেন। এই মুহূর্তে বিকট শব্দে কিছু একটা ফুটল। তারপর মুহুর্মুহু স্লোগান। কী একটা রাজনৈতিক ঝামেলা। মিছিলটা খানিক আগেও চোখে পড়েনি। কোথা থেকে যেন ঝাঁকে ঝাঁকে পুলিশের ভ্যান চলে এলো। রাবার বুলেট, টিয়ার শেলে খানিক আগের শান্ত রাস্তাটা মুহূর্তেই যুদ্ধক্ষেত্র হয়ে উঠল। মিছিলকারীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলেও তারা ছড়িয়ে পড়ল আশপাশে। দূর থেকেই পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট-পাটকেল ছুড়ছে। শুকরঞ্জন ডাক্তার কী করবেন ভেবে পেলেন না। ঝুপড়ি

চায়ের দোকানি নিমেষেই দোকানের ঝাঁপ নামিয়ে ফেলল। তারপর বলল, 'কই যাইবেন, যান। দ্যাশের অবস্থাডা তো দেখছেন। রাইত-বিরাইতে কী হয় কওন যায় না।'

শুকরঞ্জন ডাক্তার চিন্তিত মুখে বললেন, 'ভাই একটা কথা বলতাম।'

দোকানি বলল, 'কী কথা? যা কওনের তাড়াতাড়ি কন। পরিস্থিতি বেশি ভালো না। একটু পরই পুলিশ সামনে যারে পাইব তারেই ধইরা গাড়িতে তুলব।'

শুকরঞ্জন ডাক্তার দোকানিকে তার বিপদের কথা খুলে বললেন। দোকানির নাম আবদুল মমিন। সে থাকে আরামবাগের দিকে এক বাসায়। বাসার নিচে গ্যারেজের মতো জায়গা, সেখানে খুপড়ি ঘরের মতোন ছোট এক ঘর। সে থাকে সেই ঘরে। সেই বাড়িতে কোনো দারোয়ান নেই। বাড়ির কলাপসিবল গেট থাকে সারাদিন বন্ধ। কেউ বাড়ি থেকে বের হলে কলাপসিবল গেটের তালা খুলে বের হয়ে আবার গেটে তালা দিয়ে দেয়। বাড়ির সবার কাছেই চাবি আছে। সুতরাং দারোয়ানের দরকার হয় না।

আবদুল মমিন বলল, 'কিন্তু এখন আপনে যাইবেন কই? শহরের অবস্থা তো তেমন ভালো না।'

শুকরঞ্জন ডাক্তার বললেন, 'সেইটাই তো বুঝতে পারতেছি না। ভালো বিপদে পইড়া গেলাম।'

আবদুল মমিন বলল, 'আপনে করেন কী? বগলে ওইটা কিসের ব্যাগ?'

শুকরঞ্জন ডাক্তার তার চিকিৎসক পরিচয় নিয়ে অতিশয় উল্লসিত। তিনি উৎফুল্ল গলায় বললেন, 'আমি ডাক্তার। গত চল্লিশ বছর ধইরা ডাক্তারি করতেছি। এই ব্যাগ আমার ডাক্তারির ব্যাগ। এর মধ্যে ডাক্তারির ছোটখাটো কিছু যন্ত্রপাতি, ওষুধপত্র থাকে। বলা তো যায় না, কখন কার কী দরকারে লাইগা যায়!'

আবদুল মমিন কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বলল, 'লগে পয়সাপাতি কিছু আছে?'

শুকরঞ্জন ডাক্তার বললেন, 'জে, আছে।'

আবদুল মমিন বলল, 'চলেন তাইলে। গরিবের হোটেলে চলেন। সত্তুইর টাকা থাকনের খরচ। তিরিশ টাকা খাওনের। খাওনের রেটটা একটু বেশি পইড়া গেল। কিন্তু কী করবেন কন, পড়ছেন বিপদে। বিপদে পড়লে পাঁচ টাকার জিনিসের দাম হয় পাঁচশ' টাকা।'

আবদুল মমিনের সঙ্গে যাওয়া ছাড়া শুকরঞ্জন ডাক্তারের আপাতত আর কোনো উপায় নেই। তাছাড়া তিনি ভেবে দেখেছেন, তার সঙ্গে তার ডাক্তারির ছোট্ট ব্যাগ ছাড়া মূল্যবান আর কিছুই নাই। সুতরাং এই লোকের সঙ্গে যাওয়া

যেতে পারে। একটা তো মাত্র রাত। সকাল হলে দেখা যাক কী করা যায়। অন্তত আশিষের বন্ধু পরিমলের খোঁজে তো একটা চেষ্টা চালানোই যায়।

আবদুল মমিনের খুপড়ি ঘরের আকৃতি ভয়াবহ। এত ছোট ঘরে মানুষ থাকতে পারে এই ধারণা শুকরঞ্জন ডাক্তারের ছিল না। কিন্তু ঘরের ভেতর কোথাও থেকে ইঁদুর পচার তীব্র গন্ধ আসছে। তাও ভাগ্য ভালো, আবদুল মমিন ঘরে ঢোকেনি। তার গায়ের গন্ধ কেমন কে জানে! সে বলেছে, সে বাইরেই থাকবে। রাতে সময়মতো ডাক্তার খাবার পেয়ে যাবে। সারাদিনের পরিশ্রমে শুকরঞ্জন ডাক্তারের খানিক ঝিমুনির মতোন চলে এসেছিল। রাত ন'টা-দশটার দিকে আবদুল মমিন খাবার নিয়ে এলো। খাবার খুবই ভালো। চিকন চালের সাদা ভাত, খাসির মাংস আর মাছ। খাবার দেখে শুকরঞ্জন ডাক্তারের মনে হলো তিনি ক্ষুধার্ত। তিনি ইঁদুরের গন্ধ উপেক্ষা করে খাবার খেলেন। খাওয়া শেষে তার মনে হলো এই ঘরে তিনি থাকতে পারবেন না। এই ঘরের এই তীব্র গন্ধ তিনি সহ্য করতে পারছেন না। এবং যে গন্ধকে এতক্ষণ তিনি ইঁদুর পচার গন্ধ ভেবেছিলেন, তা আসলে ইঁদুর পচার গন্ধ না। এই গন্ধ অন্য কিছুর। তিনি দীর্ঘদিন ধরে ডাক্তারি করছেন। এই গন্ধ তার না চেনার কথা না। ভয়ে তার সারা শরীর কাঁপতে লাগল। তার আশঙ্কা সত্যি হলো গভীর রাতে। আবদুল মমিনের সঙ্গে আরও দু'জন লোক এলো। সেই ছোট্ট কক্ষের মাপে মাপ কেটে বসানো যে চৌকিতে তিনি বসেছিলেন সেই চৌকির নিচ থেকে তারা একটা মুখবন্ধ প্লাস্টিকের বস্তা টেনে বের করল। বস্তার গা জুড়ে শুকিয়ে যাওয়া রক্তের ছোপ ছোপ দাগ। শুকরঞ্জন ডাক্তার প্রচণ্ড আতঙ্ক নিয়ে মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলেন। তিনি বুঝতে পারলেন না এই মানুষগুলো আসলে করে কী? তাকে নিয়ে তারা কী করবে? এতক্ষণে তার কাছে একটা বিষয় পরিষ্কার হয়ে গেছে, আবদুল মমিন তাকে এমনি এমনি এখানে নিয়ে আসেনি। নিয়ে আসার কোনো কারণ নিশ্চয়ই রয়েছে।

তাকে নিয়ে আসার কারণ পরিষ্কার হলো আরও খানিক পর। আবদুল মমিন এসে বলল, 'ডাক্তার সাব, ভয়ের কিছু নাই। আপনের কোনো ক্ষতি হইব না। আমরা আছি একটা বিপদে। নিজেরা নিজেরা মারামারি কইরা নিজেগো লোক খুন হইছে। রাস্তাঘাটে পুলিশের কারণে দুইদিন ধইরা লাশ সরাইতে পারি নাই। কিন্তু এখন আর না সরাইয়া উপায় নাই। লাশ বিকট গন্ধ ছড়াইতেছিল।'

আবদুল মমিন খানিক থেমে আবার বলল, 'আপনেরে আমি বিনা কারণে আনি নাই। ওপরতলায় আরও একজন আছে। তার পায়ে গুলি লাগছে। গুলি বাইর না করতে পারলে বাঁচব না। বুঝতেই পারছেন, ডাক্তার ডাকনেরও কোনো উপায় নাই। এখন আপনেই ভরসা। চলেন, আল্লাহর নাম নিয়া শুরু করবেন।'

এরা কারা, সেটা পরিষ্কার না হলেও তাকে এখানে নিয়ে আসার কারণ এতক্ষণে শুকরঞ্জন ডাক্তারের কাছে পরিষ্কার হলো। তাকে নিয়ে যাওয়া হলো

দোতলার একটা ঘরে। অন্ধকার ঘরের ভেতর তিনজন মানুষ বসে আছে। আর খাটের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে আছে একজন। কথাবার্তায় বোঝা গেল, সে-ই সম্ভবত এদের নেতা। শুয়ে থাকা মানুষটার জ্ঞান নেই। মুখ হাঁ করে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। শরীর আগুনের মতো গরম। শুকরঞ্জন ডাক্তারের কাছে যন্ত্রপাতিও তেমন কিছু নেই। কিন্তু যা ছিল তাই দিয়েই তিনি সাধ্যমতো চেষ্টা করলেন। ডাক্তার হিসেবে তার হাতযশ ভালো। গুলি বের হলো। তারপরও সেই বাড়ির দোতলায় তাকে আরও দিন চারেক থাকতে হলো। রোগী তখন কথা-টথা বলতে পারে। এতদিনে শুকরঞ্জন ডাক্তারের কাছে এদের পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে। এরা একটি চরমপন্থী কমিউনিস্ট দলের বিচ্ছিন্ন গ্রুপ। নিজেদের মধ্যে নানা বিভেদ, আভ্যন্তরীণ কোন্দলে জড়িয়ে মাও সেতুং-লেনিন-মার্কসের মতাদর্শে গড়ে ওঠা এই দলটি তখন অসংখ্য ছোট ছোট গ্রুপ এবং নেতৃত্বে ভাগ হয়ে গেছে। সরে গেছে সেই মতাদর্শ থেকেও। এখন এদের এই ছোট ছোট দলগুলো চলে তাদের নিজেদের মতাদর্শে। লাভ-লোকসানের হিসাবে। শুকরঞ্জন ডাক্তার এদের কথা জানেন। তাদের আশপাশের গাঁওগ্রাম জুড়েও হুটহাট করে এদের দেখা যায়। শ্রেণিশত্রু নিধনের নামে এই বিচ্ছিন্ন দলগুলো তখন গ্রামগঞ্জে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করছে। গুলিবিদ্ধ এই মানুষটির নাম লোকমান। সে এই চরমপন্থী কমিউনিস্ট দলের তেমনি এক বিচ্ছিন্ন গ্রুপের নেতা। বেঁটে মানুষটার থুঁতনির নিচে মস্তবড় আচিল। মোটা গোঁফ। মাথাভর্তি কালো চুল। কথা বলে ধীরে ধীরে দীর্ঘ সময় নিয়ে। প্রতিটি শব্দ আলাদা আলাদা উচ্চারণ করে। তার নামেই এই গ্রুপের নাম হয়েছে লোকমান গ্রুপ।

শুকরঞ্জন ডাক্তার যাওয়ার আগের দিন লোকমান তাকে ডেকে বলল, 'ডাক্তার আপনের কাছে আমি ঋণী হইয়া গেলাম। আমি ঋণী থাকনের মানুষ না। উপকারীর ঋণ যেমন আমি শোধ করি, অপকারীর ঋণও। যার বস্তাভরা লাশ দেখছিলেন ওইটা ছিল অর বেইমানির ঋণ শোধ। আপনের এই উপকারের ঋণও আমি কোনো একদিন শোধ কইরা দেব ডাক্তার। আমরা ওইদিকেই থাকি, গ্রাম অঞ্চলেই। ঢাকায় আসছিলাম বিশেষ কাজে। কিন্তু কাজ তো হইলই না। হইল আকাজ। মাথা গরম কইরা খুন কইরা ফালাইলাম একটা।'

লোকমান কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলল, 'আপনে যান, আবদুল মমিন আপনের যাওনের ব্যবস্থা করব। সে আমার আপন ভাইয়ের চাইতেও বড় কিছু। যদি আমি কোনোদিন মইরাও যাই, আবদুল মমিন একদিন না একদিন আপনার সঙ্গে দেখা করব। কিছু লাগলে তখন তারে বলবেন। আমি না থাকলেও সে আমার ঋণ শোধ দেব। আমি নিজের দোষে হাজারটা শত্রু বানাইছি। আমার বাঁচন-মরণের কোনো ঠিক-ঠিকানা নাই। তাছাড়া আমার মাথা গরম, বুদ্ধি-সুদ্ধিও কম। কথায় কথায় খুন-খারাবি করি। আবদুল মমিন সেইরকম না। সে অতি বুদ্ধিমান প্রাণী।' লোকমান হাসল। সময় নিয়ে হাসল।

Boiglar.com & ARS

তারপর নিচু গলায় বলল, 'আর বোঝেনই তো, এইখানে যা দেখলেন, যা শুনলেন, তা বাইরের মানুষের লগে যত কম বলা যায়, তত ভালো। সবচেয়ে ভালো একদম না বলা। শেষে নিজেরই ক্ষতি।'

লোকমান কী বলতে চেয়েছে তা না বোঝার মতোন বোকা শুকরঞ্জন ডাক্তার না। তিনি পাঁচ দিন পর বাড়ি ফিরে এলেন, কিন্তু এই বিষয়ে কাউকে কিছু বলেননি। সুজাতা রানীকেও না। খুবই স্বাভাবিক আচরণ করেছেন, যেন এই ক'দিন তিনি আশিষের বাসাতেই ছিলেন। কুমড়া ফুলের বড়া খেয়ে আশিষ কী আনন্দই না পেয়েছে, আকারে-ইঙ্গিতে তিনি এসবই বলেছেন।

তিনি আশিষের চিঠি পেলেন আরও ক'দিন পর। আশিষ নতুন বাসার ঠিকানা দিয়েছে চিঠিতে। সঙ্গে একটা খবরও। মিলির সন্তান হবে। সে তার মায়ের কাছে সন্তানের নাম জানতে চেয়েছে। শুকরঞ্জন ডাক্তারের ধারণা ছিল তিনি তার স্ত্রী সুজাতা রানীকে হাড়ে হাড়ে চেনেন। কিন্তু এই প্রথম তার মনে হলো, তিনি ধরতে পারছেন না, এই সংবাদ শুনে সুজাতা রানীর প্রতিক্রিয়া কী হবে?

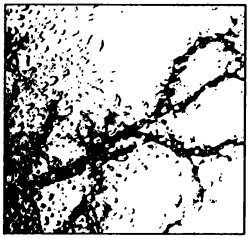

মজিবর মিয়া তার মামা বাড়ি পৌছাল ফজরের আজানের পর।

তার বড় মামা মজিদ বেপারী মানুষ হিসেবে কেমন, এটি অতি কঠিন প্রশ্ন। সে নিয়মিত ধর্মকর্ম করে। মসজিদে গিয়ে পাঁচওয়াক্ত নামাজ আদায় করে। তার বুদ্ধিসুদ্ধি উঁচু স্তরের। গরুর বেপারীদের লোকজন সাধারণত 'গরুর দালাল' বলে সম্বোধন করে। কিন্তু কোনো এক অদ্ভুত কারণে স্টিমারঘাটার লোকজন তাকে গরুর দালাল না বলে বলে বেপারী সাব। পাঁচ গ্রামের মামলা-মোকাদ্দমা সালিশ ব্যবস্থায় এলাকার চেয়ারমান, গণ্যমান্য মানুষের পাশে তাকে বসে থাকতে দেখা যায়। তখন তার কাঁধের ওপর আড়াআড়ি করে ঘিয়ে রঙের একখানা চাদর ফালানো থাকে। গায়ে থাকে ধবধবে সাদা পাঞ্জাবি। পরনে পাটভাঙা নতুন লুঙ্গি। এই সময়ে পারতপক্ষে সে কথা বলে না। বললেও সেই কথার শব্দ এত নিচু যে একহাত দূর থেকে শুনতেও হরিণের মতোন কান খাড়া করে থাকতে হয়। আবার এই মজিদ বেপারীই যখন গরুর হাটে যায় তখন পুরোপুরি অন্য চেহারা। হাঁটু পর্যন্ত গোটানো লুঙ্গি। গায়ে থাকে নীল রঙের পুরনো ঢোলা ফতুয়া। ফতুয়ার দুই পকেটভর্তি নানান কাগজপত্র। তার গলার আওয়াজ থাকে তখন বাঁজখাই। সেই আওয়াজ জুড়ে অশ্রাব্য সব ভাষা। দুই মজিদ বেপারীকে মেলানো যেমন কঠিন, কঠিন আলাদা করাও।

মজিদ বেপারী দাঁড়িয়ে ছিল কাজী বাড়ি জামে মসজিদের সামনে। তার বাড়ি থেকে খানিক দূরে। মসজিদ থেকে নামাজ শেষ করে সে কেবল বের হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে শীত-গ্রীষ্ম বার মাসই ভোরবেলা কম-বেশি কুয়াশা দেখা যায়। এখনও দেখা যাচ্ছে। হালকা মিহি কুয়াশা। কুয়াশার ভেতর থেকে দুটো গাই নিয়ে মজিবর মিয়া আসছে। মজিদ বেপারী কপাল কুঁচকে তাকিয়ে আছে। কাছে আসার আগ পর্যন্ত সে মজিবর মিয়াকে চিনতে পারেনি। ক্লান্ত মজিবর মিয়ার কোনো দিকে খেয়াল নেই। সে হাঁটছিল সম্মোহিতের মতোন। মজিদ বেপারীকে পাশ কাটিয়ে হেঁটে যাওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে সে ডাকল, 'কে? আমাগো মজিবর না?'

মজিবর মিয়া থেমে দাঁড়াল। মামাকে চিনতে তার খানিক সময় লাগল। নানা কারণেই তাদের দেখা-সাক্ষাৎ নেই দীর্ঘদিন। মজিদ বেপারীর থুঁতনির দাড়ি খানিক বড় হয়েছে। গালও খানিকটা ভেঙে গেছে। পরনে পাঞ্জাবি, মাথায় টুপি। ভোরের ঠাণ্ডা আবহাওয়ার কারণেই বোধহয় তার গলায় উলের মাফলার। মাফলার গোল করে পেঁচানো। মজিবর মিয়া বলল, 'জি মামা'।

গাই গরু নিয়ে এই সময়ে অতদূর থেকে কেউ এলে অবাক হওয়ার কথা। কিন্তু মজিদ বেপারী অবাক হলো না। সে বলল, 'বন্যার পানিতে সব তলাই গেছে?'

মজিবর মিয়া বলল, 'এখনও তালুকদার বাড়িতে পানি ওঠে নাই। ওইখানেই আমরা সবাই উঠছি। মায়রেও ওইখানে রাইখা আসছি।'

মজিদ বেপারীর বোন আম্বরি বেগমের কথা জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল, মাতৃহারা শিশু আরশির কথা জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল। কিন্তু সে এ বিষয়ে কিছুই জিজ্ঞেস করল না। সে বলল, 'গরুর বাজার দর তো এখন খারাপ। গাভীন গাই বেচা আরও লোকসান'।

মজিবর মিয়া বলল, 'দুইটাই গাভীন গাই। যেকোনো দিন বিয়াইবো। যে কিনব সে আসলে দুইটার দরে চাইরটা কিনব। আপনে চাইলে ভালো দরেই বেইচা দিতে পারবেন।'

মজিদ মিয়া এই কথার জবাব দিল না। বাড়ির দিকে হাঁটা দিল। পিছে মজিবর মিয়া। তাদের মধ্যে এই বিষয়ে আর কোনো কথা হলো না। মজিবর মিয়া সাত দিন ছিল স্টিমারঘাটা। মজিদ বেপারী দুই দিনের মধ্যে তার গাই দুটি বেচে দিল। যতটা আশা করা হয়েছিল, দাম পাওয়া গেল তার চেয়ে অনেক কম। চারদিকে বন্যার খবর। এই অবস্থায় গাই গরুর মতোন আপদ কিনে ঝামেলা বাড়ায় কে? মজিদ বেপারী গাই বিক্রির টাকা থেকে হিসাব করে তার দালালির কমিশন রাখল। বাকি টাকা মজিবর মিয়ার হাতে তুলে দিয়ে বলল, 'এই টাকা দিয়া কী করবি কিছু ভাবছোস?'

মজিবর মিয়া বলল, 'হ, ভাবছি'।

মজিদ বেপারী বলল, 'কী করবি?'

মজিবর মিয়া বলল, 'একখান ভালো ইঞ্জিনওয়ালা ট্রলার কিনব। একটু বড়সড় হইলে ভালো হয়।'

মজিদ বেপারী অনেকক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে রইল। সময় নিয়ে মুখের পান চাবালো। তারপর পানের পিক ফেলে বলল, 'তোর মাথায় বুদ্ধি তো ভালো। এইটা আমার ধারণা ছিল না। যা-ই হোক, কিন্তু এই টাকায় তো অত বড় ট্রলার পাবি না।'

মজিবর মিয়া বলল, 'আপনে চাইলে পাব।'

মজিদ বেপারী বলল, 'এইটা কেমন কথা? আমি তো আর আল্লাহ-খোদা না যে আমি চাইলেই সব হইব।'

মজিবর মিয়া কথা বলল না। মাথা নিচু করে বসে রইল। মজিদ বেপারি খানিক থেমে তার শেষ কথা বলল, 'তোর হাতে যেই টাকা আছে তা দিয়ে এত কিছু সম্ভব না, আমি যে এখন তোরে টাকা দেব, সেই অবস্থাও আমার নাই। আমার চারপাশে নানান বালা-মুসিবত। লাইলির কথাও তো মনে হয় শুনছস। এই জিনিস নিয়া আমি আছি মহা যন্ত্রণায়।' সে কথা শেষ করে উঠে দাঁড়াল। তারপর বাঁশের আড়ার সঙ্গে ঝোলানো কালো ছাতাটা হাতে নিয়ে গটগট করে বেরিয়ে গেল।

মজিদ বেপারীর স্ত্রী লাল আটার রুটি বানিয়েছে। এই বাড়িতে সপ্তাহে একদিন সকালে রুটি হয়। আজ সেই দিন। সঙ্গে পাতলা ঝোল করে লাউ ভাজি। সেই লাউ ভাজি আর রুটি নিয়ে এলো লাইলি। লাইলি মজিদ বেপারীর ছোট মেয়ে। দেখতে শুনতে খুবই ভালো। ধবধবে ফর্সা গায়ের রঙ। মাথাভর্তি চুল। চেহারার মধ্যে বয়সের তুলনায় একটা ভারিক্কি ভাব। তবে তাতে তার সৌন্দর্য ঢাকা পড়েনি। বরং বেড়েছে। লাইলী প্লেট রাখতে রাখতে বলল, 'আপনে আইজকাই চইলা যাইবেন?'

মজিবর মিয়া বলল, 'সেইটা এখনও মামার ওপর নির্ভর করে।'

লাইলি বলল, 'এখনও বাজানের ওপর নির্ভর করে? বাজান তো শেষ কথা বইলাই দিছে। সে এক কথার মানুষ।'

মজিবর মিয়া বলল, 'দুনিয়াতে এক কথার মানুষ বলতে কিছু নাই।'

লাইলি বলল, 'আপনার ধারণা বাজান আপনারে টাকা দেব?'

মজিবর মিয়া বলল, 'হু, আমার ধারণা দেব।'

লাইলি বলল, 'আপনার ধারণা ভুল। বাজান কাউরে টাকা দেয় না।'

মজিবর মিয়া বলল, 'না দিলে না দেব। ট্রলার আমি কিনবই।'

লাইলি বলল, 'কীভাবে কিনবেন? আপনার কাছে টাকা আছে?'

মজিবর মিয়া বলল, 'কীভাবে কিনব জানি না, তয় কিনব।'

মজিবর মিয়া চুপচাপ খাওয়া শেষ করল। তার খাওয়া শেষ হওয়া অবধি লাইলি বসে থাকল তার সামনে। লাইলির সম্ভবত এই মানুষটার জন্য খানিক মায়া লাগছে। এত বড় মানুষটার চোখ-মুখ শুকিয়ে গেছে। যদিও লাইলি জানে তার নিজের মন খুব অস্থির প্রকৃতির। হুট করে কিছু দেখে তার মন দ্রবীভূত হয়, আবার খানিক বাদে সেই জিনিসের দিকে তার ফিরেও তাকাতে ইচ্ছে হয় না। কাউকে হুট করে ভালো লেগে গেলে তার জন্য সে জীবন দিয়ে দিতে পারে, কিন্তু কিছুক্ষণ বাদেই আবার তাকে চোখের সামনেও দেখতে ইচ্ছা করে না। নাম শুনলেও গা রি রি করে। তার এই অস্থির মানসিকতার কারণেই কিনা কে জানে, আশপাশের সবাই বলে সে মেয়ে খারাপ। খারাপ মেয়ে বলার

Boighar.com & ARS

যৌক্তিক কারণও অবশ্য আছে। এই তো কিছুদিন আগেই কাজী বাড়ির মক্তবের হুজুরের সঙ্গে সে পালিয়ে গিয়েছিল। হুজুরের নাম হাবিব। হাবিব হুজুর পড়াত কাজী বাড়ির জামে মসজিদের মক্তবে কিন্তু লজিং থাকত মজিদ বেপারীর বাড়িতে। হুজুরের বয়স অল্প। তারা তিন মাস পালিয়ে ছিল। তিন মাস পর লাইলি বাড়ি ফিরে এসেছে। লজিং হুজুর হাবিবের খবর কেউ জানে না। লাইলি যে এবারই প্রথম পালিয়েছিল তা না। এর আগেও একবার এই ঘটনা ঘটিয়েছিল। সেবার ছিল পূবপাড়ার কেরামত মুন্সীর ছেলে রবিউল। রবিউল ঢাকায় টেইলার্সের দোকানে কাজ করত। টেইলার্সের দোকানে কাজ করার কারণেই হয়তো তার নিজের পোশাক-আশাকও থাকত ফিটফাট। লাইলির জন্য সে সুন্দর সুন্দর জামা বানিয়ে আনত। লাইলির পোশাক-আশাকের ভারি শখ। সে সেই ছেলের সঙ্গে পালিয়ে গেল। কিছুদিন বাদে আবার ফিরে এসেছে।

লাইলি খাবারের এঁটো থালাবাসন নিয়ে উঠে যাওয়ার আগে বলল, 'আপনের মাইয়া কেমন আছে?'

মজিবর মিয়া বলল, 'কেমনে বলব কেমন আছে? সে তো আমার কাছে নাই।'

লাইলি বলল, 'তার গায়ের রং কেমন হইছে? মায়ের মতোন না আপনার মতোন কুচকুইচ্যা কালা?'

মজিবর মিয়া মিথ্যা বলল, সে বলল, 'তার মায়ের চেয়েও বেশি ধলা হইছে।'

লাইলি বলল, 'আমার চেয়েও?'

মজিবর মিয়া চুপ করে রইল। তার মামা মজিদ বেপারীর খুব ইচ্ছা ছিল লাইলির সঙ্গে তার বিয়ে হোক। কিন্তু লাইলির বিষয়ে আম্বরি বেগমের কোনো আগ্রহ ছিল না। এই নিয়েই ভাই-বোনের মধ্যে দীর্ঘদিনের শীতল সম্পর্ক। মজিবর মিয়া অবশ্য ঠিকঠাক নিজেকে বুঝে উঠতে পারে না বলেই জানে না, লাইলির প্রতি তার আসলে কোনো আসক্তি ছিল কিনা! তবে মাঝে মাঝে মনে হয় ছিল। যদিও সে লাইলির সঙ্গে কখনই তেমন কথাবার্তা বলেনি কিন্তু এটা সত্য, বহুবার যযাতিপুর থেকে শুধু লাইলিকে দেখার উদ্দেশ্যেই সে স্টিমারঘাটা এসেছে। মজিবর মিয়া জানে, লাইলি তার রূপ এবং গায়ের রঙ নিয়ে খুব উচ্ছ্বসিত। এজন্যই সে আরশির গায়ের রঙের প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গেল। দুপুর নাগাদ মজিদ বেপারী বাড়ি ফিরল। মজিবর মিয়ার সঙ্গে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা হলো। সেই আলাপ-আলোচনার বিষয়বস্তু কী তা তারা ছাড়া আর কেউ জানল না। তবে দিন সাতেক বাদে দেখা গেল মজিবর মিয়া যযাতিপুর গাঁয়ে ফিরেছে। সে নৌকা বা কোনো স্বেচ্ছাসেবক দলের ট্রলারে চেপে গাঁয়ে ফেরেনি। সে গাঁয়ে ফিরেছে তার নিজের বড় ট্রলারে চেপে। এই ট্রলারের মালিক সে নিজে। মজিদ বেপারি শেষ অবধি তাকে টাকা দিয়েছে। টাকার অঙ্ক সে সময়ের তুলনায়

www.boighar.com

অনেক। সেই টাকায় মজিবর মিয়া টেকসই বড় ট্রলার কিনেছে। মজিদ বেপারি নিজে সব কিছু তদারকি করে ব্যবস্থা করেছেন। তার সঙ্গে মনাই নামের ষোল-সতের বছরের এক ছেলেকে দিয়ে দিয়েছেন। মনাই ট্রলার চালনায় দক্ষ। তার নিজের না থাকলেও দীর্ঘদিন সে অন্যের ট্রলারে কাজ করেছে। রোদে পুড়ে ট্রলার চালানোর কারণেই কিনা কে জানে, মনাইর গায়ের রং কুচকুচে কালো। সে মজিবর মিয়ার নতুন ট্রলারের হাল ধরে দাঁড়িয়ে আছে। ট্রলার এসে ভিড়ল তালুকদার বাড়ির ঘাটে। সবাই হৈহৈ করে ছুটে এলো। কিন্তু এসে দেখল এটা কোনো ত্রাণের ট্রলার না। এটা মজিবর মিয়ার নিজের ট্রলার। মজিবর মিয়া ট্রলার থেকে নামল। তার মা আম্বরি বেগমও কিছু বুঝলেন না। তিনি নাতনি আরশিকে বুকে চেপে ধরে দাঁড়িয়ে আছেন।

ভয়াবহ সেই বন্যা দীর্ঘ সময় ধরে থাকল।

এই দীর্ঘ সময়ে সব মানুষ যখন পানিবন্দি হয়ে সময় কাটাল, মজিবর মিয়া তখন ছুটে বেড়াল মোঘলগঞ্জ থেকে টরকী বন্দর, টরকী বন্দর থেকে স্টিমারঘাটা, স্টিমারঘাটা থেকে রাজপুর, বৈদ্যরঘাটসহ নানান জায়গা। সে যে একা ঘুরে বেড়াল, কিংবা অকারণে ঘুরে বেড়াল তা না। চারদিক থেকে তার বড় ট্রলারখানার তখন খুব চাহিদা। বিভিন্ন সংগঠন, ত্রাণবাহী দল মজিবর মিয়ার ট্রলার ভাড়া করা শুরু করল। মজিবর মিয়া তাদের সঙ্গে বিভিন্ন এলাকায় খ্যাপে যায়। প্রায় রোজ দিনই তার খ্যাপ থাকে। কাঁচা টাকা জমতে থাকে পকেটে। যতদিনে বন্যা শেষ হয় ততদিনে বন্যাক্রান্ত এলাকাজুড়ে মোটামুটি দুর্ভিক্ষের অবস্থা। চারদিকে ভয়াবহ অভাব। খাদ্য নেই, ওষুধ নেই, আশ্রয় নেই। মজিবর মিয়া অবশ্য কোনো কিছু নিয়েই বিচলিত হয় না। সে ঠাণ্ডা মাথায় পয়সা খরচ করে। মানুষ তখন কাজের অভাবে হন্যে হয়ে উঠল। কিন্তু কোথাও কোনো কাজ নেই। কে কাজ দেবে? মজিবর মিয়া এই সময়ে তার ভাঙা ঘরখানা মেরামত করল। কাঠমিস্ত্রিদের মজুরিও এখন অন্য সময়ের তুলনায় অনেক কমে গেছে। মানুষের পেটে ভাতই নেই। কাঠমিস্ত্রি কে নেবে? ফলে এই আকালের দিনে কাজ পেয়ে কাঠমিস্ত্রিরা মোটামুটি বর্তে গেল। তারা কাজও করল দীর্ঘ সময় নিয়ে। ঘরখানা দাঁড়িয়ে যেতে মজিবর মিয়া মনোযোগ দিল জমির দিকে। তার নিজের কোনো জমি নেই। সে অন্যের জমি বর্গা চাষ করত। স্বাভাবিক নিয়মেই বন্যার পরের মৌসুমে ফসল ভালো হয়। কারণ বন্যার সময় জমিতে প্রচুর পলি পড়ে। পলি পেয়ে লকলক করে বেড়ে ওঠে ফসল। মজিবর মিয়া জানে, এই ফসল যখন উঠবে তখন সেই ফসল ওঠার মৌসুমটা হবে তার জন্য আরেকটা সুবর্ণ সুযোগ। গাঁয়ের মানুষ এবার অন্যান্য বারের তুলনায় অনেক বেশি ফসল পাবে এবং যথারীতি এই ফসল বিক্রি করতে তাদের যেতে হবে

www.boighar.com

মোঘলগঞ্জে। এতদিন ফসল বহনে তাদের একমাত্র ভরসা ছিল সাধারণ নৌকা। এই নৌকায় মোঘলগঞ্জ যেতে-আসতে দীর্ঘ সময় লাগে। কিন্তু এবার তার আছে ইঞ্জিনওয়ালা বড় ট্রলার। ফলে সময় লাগবে অর্ধেকেরও অনেক কম।

পরের দু'বছরে মজিবর মিয়া মোটামুটি দাঁড়িয়ে গেল। বিঘা পাঁচেক জামিও কিনে ফেলল। এই দু'বছরে তার ট্রলারখানা যেন আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ হয়ে ধরা দিল তার কাছে। যখন যা চাইছে, ঠিক তখনই যেন তাই তার হাতে তুলে দিচ্ছে ট্রলারখানা। তবে এতদিনে গাঁয়ে আরও দু'খানা ট্রলার হয়েছে। তালেব মাঝি তার নৌকা বেচে দিয়েছিল আর হারাধন কী করে যেন কিছু টাকা জোগাড় করেছিল, তারা দু'জনে মিলে একখানা ছোট ট্রলার কিনেছে। দু'জনে একসঙ্গে খ্যাপ মারে। পয়সা ভাগ করে নেয়। আরেকটা কিনেছে পাশের গাঁয়ের শহিদুল। এই ট্রলারগুলো তারটার মতো এত বড় না হলেও মানুষজনের কাজ চলে যায়। তবে তাতে মজিবর মিয়ার অসুবিধা কিছু হয় না। সে তার ট্রলারে আজকাল আর ছোটখাটো খুচরা কাজ করে না। এই কাজগুলো ওরাই করে।

সময় যেতে লাগল। বেড়ে উঠতে লাগল আরশিও। আরশির বেড়ে ওঠাটা অদ্ভুত। শিশুদের যে বয়সে বোল ফুটতে শুরু করে, সে বয়সে তাদের প্রথম শব্দ হয় 'মা, মাম্মা, ম্মাম্মা...'। সহজ শব্দ। আরশির প্রথম শব্দটা হলো কঠিন। অতি কঠিন। সে আম্বরি বেগমকে দেখলেই ঠোঁট গোল করে বলা শুরু করল 'ব্বু, ব্বুব্বু...'। মজার ব্যাপার হচ্ছে, আম্বরি বেগমও তখন নাতনির মতো করেই ব্বু, ব্বুব্বু বলার চেষ্টা করেন। কিন্তু তার সামনের দিকের দুটো দাঁত নেই। সেই দাঁতহীন মুখে শব্দটা তেমন জুতসই হয় না। ফুক করে বাতাস বের হয়ে যায়। তবে আম্বরি বেগম তা নিয়ে ভাবেন বলেও মনে হয় না। তিনি পাখির মতোন করে নাতনির ঠোঁট নিয়ে নেন তার পান খাওয়া লাল ঠোঁটের ভেতর। তারপর অদ্ভুত শব্দে বলার চেষ্টা করেন, 'ব্বু ব্বুব্বু'।

মজিবর মিয়া দিন-রাত হন্যে হয়ে পয়সার পিছে ছোটে। অবিরাম অক্লান্ত পরিশ্রম। রাত কিংবা দিন, ঘর কিংবা বাহির কোনো হিসাবই যেন মজিবর মিয়ার কাছে আর আলাদা করে ধরা পড়ে না। মজিবর মিয়া টের পায়, গাঁয়ে ক্রমশই গুরুত্বপূর্ণ মানুষ হয়ে উঠছে সে। নানান বিচার-আচারে গাঁয়ের লোকজন তাকে ডাকে। সে যে ডাক পেলেই সুড়সুড় করে ছুটে যায় তা কিন্তু না। সে বরং খুব ভেবেচিন্তেই পা ফেলে। কোনো বিষয়ে মতামত দেওয়ার আগে দশবার ভাবে। সে জানে, গাঁয়ের মানুষ মানেই অখণ্ড অবসর আর আড্ডা। এই অবসর-আড্ডায় তাদের মস্তিষ্কজুড়ে কিলবিল করে নানান ভাবনা, গল্প। তাতে ভালো যতটা আছে, খারাপ আছে তারচেয়ে দশগুণ বেশি। মজিবর মিয়া তাই সতর্ক পা ফেলে। একের ভালো অন্যের সহ্য হয় না, এটা মজিবর মিয়া জানে। তার ক্রমশই আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়ে ওঠাটাও যে অনেকের সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে

যাচ্ছে, মজিবর মিয়া তা টের পায়। এটা সে সবচেয়ে ভালো টের পেল গত জুমাবার লতু হাওলাদারের কথায়। লতু হাওলাদার এলাকার গণ্যমান্য মানুষদের একজন। বছর দুই আগেও লতু হাওলাদারের জমিতে বর্গা চাষ করত মজিবর মিয়া। তাদের বাড়ির নানান কাজকর্মও করে দিত। সেদিন জুমার নামাজ শেষে ইমাম সাহেব মিম্বরের ওপর দাঁড়িয়ে দীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন, 'সম্মানিত হাজেরিন, আমি আপনাদের এলাকায় বহুদিন থেকে আছি। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানিতে পাঁচওয়াক্ত নামাজ পড়াই। সকালে মক্তবে বাচ্চাকাচ্চাদের আমপারা পড়াই, কোরআন শিক্ষা দেই। এইসব কাজ আল্লাহর দ্বীনের জন্যই করা উচিত। বিনিময় হিসেবে টাকা-পয়সার কথা ভাবা উচিত না। কিন্তু আমি বহুদূর থেকে এই এলাকায় এসেছি। বাড়িতে আমার স্ত্রী আছে, এক পুত্র সন্তান ছিল, তারে আল্লাহ নিয়া গেছে। আমার স্ত্রী দীর্ঘদিন অসুস্থ ছিল, তার নানান খরচপাতি। তার মা থাকে তার সঙ্গে। তাদের জন্য অল্প-বেশি হইলেও কিছু টাকা-পয়সা আমার পাঠাইতে হয়। হাদিয়া হিসাবে আপনেরা আমারে যা দেন, তাতে পরিবার-পরিজন নিয়া আমার যে খুব ভালো চলে, তা কিন্তু না। টেনেটুনেই চলে। তারপরও আল্লাহপাক ভালো-মন্দ মিলায়ে কোনোরকম চালাই নিছিল।'

www.boighar.com

এই পর্যায়ে এসে ইমাম আকরাম হোসেন খানিক থামলেন। মজিবর মিয়া অবশ্য ততক্ষণে ঘটনা বুঝে ফেলেছে। এই মসজিদও আতাহার তালুকদারের পূর্বপুরুষদের করা মসজিদ। পুরনো আমলের ডিজাইনে বিশাল উঁচু ছাদ আর মোটা থামের মসজিদ। জুমার দিনে মসজিদভর্তি মুসল্লিরা। তারা সবাই উসখুস করছিল। মোনাজাত হলেই তারা বের হয়ে যাবে। কারণ তারা জানে, হুজুর এখন কী বলবে! এতদিন পর্যন্ত আতাহার তালুকদার নিজেই মসজিদের হুজুরের বেতন শহর থেকে পাঠাতেন। কিন্তু দীর্ঘদিন থেকে আতাহার তালুকদারের সঙ্গে গাঁয়ের যোগাযোগটা তেমন নেই। তাই লতু হাওলাদার, সোবহান কাজি, জালাল কাজী, দুলাল মেম্বারদের মতো গাঁয়ের প্রধানরা মিলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, হুজুরের যা বেতন তা তারাই দেবেন। কিন্তু সেই কথা তারা রাখতে পারেননি। না রাখতে পারার কারণও অবশ্য আছে। এই যযাতিপুর গাঁয়ে ধান, চাল, ডাল দিয়ে কারো পাওনা শোধ করা যত সহজ, নগদ টাকায় তা নিয়মিত শোধ করা ততটাই কঠিন। হুজুরের বেতন দীর্ঘদিন থেকে বাকি পড়েছিল। ফলে পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত হয়েছিল, গাঁয়ের লোকেরা যে যার সামর্থ্য অনুযায়ী প্রতিমাসে কিছু না কিছু টাকা দেবে। বাকিটা লতু হাওলাদার, সোবহান কাজি, দুলাল মেম্বারদের মতোন সামর্থ্যবানরা দিয়ে দেবেন। কিন্তু মাসের পর মাস চলে গেছে, হুজুরের বেতন হিসেবে কোনো টাকা আর জমা পড়ে না। ইমাম সাহেব কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করে আবার বললেন, 'গত পাঁচ মাস ধইরা আমি আপনেদের কাছ থেইকা কোনো বেতন পাই নাই। একটা টাকাও না। আমি না

হয় আপনাদের এর-ওর বাড়ি ঘুরে ঘুরে খানাখাদ্য জোটাই কিন্তু একবার চিন্তা কইরা আপনেরাই বলেন আমার পরিবারের কী অবস্থা! তারা কী খেয়ে, কী পইরা বাঁইচা আছে! আপনেরাই একটু বিবেচনা কইরা বলেন।'

পুরো মসজিদজুড়ে পিনপতন নীরবতা। কেউ কোনো কথা বলল না। মজিবর মিয়া ততক্ষণে বুঝে গেছে, সমাজের সবার সামনে নিজেকে আরও খানিক প্রমাণ করার এই তার সুযোগ। সবার দীর্ঘ নীরবতার পর মজিবর মিয়া হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। তারপর বলল, 'আপনেরা কেউ কিছু মনে না করলে আমি একখান কথা বলতে চাই।'

কেউ কিছু মনে করল কিনা বোঝা গেল না, তবে কেউ কোনো আপত্তি করল না। মজিবর মিয়া নিজ থেকেই বলা শুরু করল, 'আপনেদের আপত্তি না থাকলে এখন থেকে মক্তবের হুজুরের বেতনের অর্ধেকটা আমিই দেব। বাকিটা না হয় আপনেরা দিলেন। হুজুরের রেগুলার বেতন পাওন দরকার। তার পরিবার-পরিজন আছে। কী বলেন হুজুর?'

ইমাম সাহেব কিছু বলার আগেই উপস্থিত মুসল্লিদের বড় অংশ সম্মিলিত কণ্ঠে মজিবর মিয়ার প্রস্তাব সমর্থন করল। হুজুর নিজেও যেন এই প্রস্তাবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন। কারণ তিনি জানেন, যযাতিপুর গাঁয়ে বহু বড় বড় গৃহস্থ থাকতে পারে, নামী-দামি লোক থাকতে পারে, কিন্তু এই মুহূর্তে এই গাঁয়ে নগদ পয়সার আসল মানুষ মজিবর মিয়া এবং সে এক কথার মানুষ। সুতরাং সে যখন বলেছে, তখন তার বেতনের বড় একটা অংশ আল্লাহর ইচ্ছায় নিশ্চিন্ত।

নামাজ শেষে মজিবর মিয়া মসজিদ থেকে বের হলো। বাইরের আকাশটা যেন একটু মরা। দুপুরের সময় হলেও রোদটা তেমন ঝাঁঝাল না। হেমন্তের শুরু, তবে গাঁওগ্রামে মোটামুটি শীতের একটা ভাব চলে এসেছে। সে ক্ষেতের আইল ধরে আড়াআড়ি হাঁটছিল। লতু হাওলাদারের বাড়ির পাশের ধান ক্ষেতে তখনও কামলারা কাজ করছে। মজিবর মিয়া পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিল, লতু হাওলাদার যে এত দ্রুত নামাজ শেষ করে চলে এসেছে তা সে খেয়াল করেনি। লতু হাওলাদারই তাকে ডাকল, 'কী খবর নয়া মহাজন সাব?'

মজিবর মিয়ার বুঝতে খানিক সময় লাগল যে লতু হাওলাদার তাকেই ডাকছে। যখন বুঝল, সে ঘাড় ঘুরিয়ে দাঁড়াল, 'চাচাজান, আমারে ডাকেন?'

লতু হাওলাদার বলল, 'এই তল্লাটে তুমি ছাড়া মহাজন বইলা আর কারে ডাকব? কার এত পয়সা আছে যে তারে মহাজন ডাকন যায়?'

মজিবর মিয়া বুদ্ধিমান মানুষ। লতু হাওলাদারের কথার ধরন এবং ক্ষোভের কারণ কিছুই তার বুঝতে বাকি রইল না। তবুও সে না বোঝার ভান করে বলল, 'কী হইছে চাচাজান?'

লতু হাওলাদার বলল, 'কী আর হইব? পাশার দান পাল্টাইছে। দুই দিন আগেও যে আমার এই কামলাগো লগে ক্ষ্যাতে কামলা দিত, বাড়িতে

ফুটফরমায়েশ খাটত, সে এখন আইসা আমার ওপরে ভরা মজলিসে টেক্কা দেয়। আমার মান-ইজ্জত কিন্যা লয়।'

মজিবর মিয়া বলল, 'চাচাজান, এইসব আপনে কী বলেন? আমি কি আমার আগের কথা কিছু ভুলছি? আপনেরা না থাকলে এই মজিবর মিয়া আর তার মা কই গিয়া থাকত? আপনেরা কাম-কাইজ দিছেন, বাজান মরণের পর মায়, ডাঙর হওনের পর আমি, সেই কাজকামের ওপরই তো বাঁইচা ছিলাম চাচাজান।'

লতু হাওলাদার বলল, 'ওইসব বইলা আর কী হইবোরে মজিবর। টাকার অনেক গুণ। মানুষের চেহারা-সুরত পাল্টায় দেয়। তয় অভ্যাস পাল্টাইতে পারে না।'

মজিবর মিয়া কারো সঙ্গে কোনো বিবাদে যেতে চায় না। এইজন্যই সে লতু হাওলাদারের পায়ে পাড়া দিয়ে ঝগড়া করার প্রবণতা দেখেও এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। কিন্তু তার শেষ বাক্যটাতে সে নতুন কিছুর গন্ধ পেল। ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'আপনার শেষ কথাটা বুঝলাম না চাচা?'

লতু হাওলাদার তার মুখ নিয়ে এলো মজিবর মিয়ার কানের কাছে। একদম কাছে। তারপর সাপের মতোন হিসহিসে গলায় বলল, 'বউডারে ডাক্তার না দেখাইয়া ক্যান মারছস, সেইটা জানি না বুঝছস? সব জানি, সব। ছোটলোকের জাতের অভ্যাস বইলা কথা। লোভের জন্য করতে পারে না, এমন কোনো কাম নাই! একখান ট্রলারের জন্য বউডারে ডাক্তার-কবিরাজ না দেখাইয়া মারলি? তারপর নিজের মামা মজিদ বেপারীর কাছ থেইকা টাকা নিলি তার বেশ্যা মাইয়াটারে বিয়া করনের কথা বইলা? সেই টাকায় ট্রলার কিন্যা মহাজন হইছস না? মহাজন? অনেক টাকা? মসজিদে সবার সামনে নিজের হ্যাডম দেখাইলি? দেখাইলি যে লতু হাওলাদাররা শেষ? সবকিছু খুব সহজ, না? অত সহজ না মজিবর। কিছুই অত সহজ না।'

লতু হাওলাদার থামল। যেন মজিবর মিয়ার প্রতিক্রিয়া দেখতে চাইল, তারপর ঠিক সঙ্গে সঙ্গেই সে আবার শুরু করল, 'তো এখন কী করবি? নিজের মাইয়াডারেও খুন করবি? খুন না কইরাইবা কী করবি? না হইলে তো ধলা কদুর মতোন ওই দুশ্চরিত্রা মামাতো বইনেরে বিয়া কইরা ঘরে তুলতে পারবি না! কী পারবি?'

মজিবর মিয়ার মনে হলো তার সারা শরীর প্রবল ঘৃণায় রি রি করে কাঁপছে। চোখ লাল হয়ে উঠেছে। শরীরজুড়ে যে শীত শীত ভাবটা ছিল, তা মুহূর্তেই দূর হয়ে গেল। কপালজুড়ে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে। সে একবার ভাবল সে কিছু বলবে। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিল। কারণ মজিবর মিয়া জানে, এখন এখানে থাকলে সে নিজেকে আর নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবে না। ভয়াবহ কিছু একটা ঘটে যেতে পারে। সে কিছুই ভোলেনি। লতু হাওলাদারের নোংরা চেহারার কথা সে ভোলেনি। কী মিথ্যা অপবাদ দিয়ে তার

Boighar.com & ARS

মা আম্বরি বেগমকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিল লতু হাওলাদারের বড় স্ত্রী সে তাও ভোলেনি। লতু হাওলাদার সবকিছু জেনেও নিজের নোংরা চেহারাটা লুকাতে চুপ করে ছিল। এইটুকু ছোট্ট মজিবর মিয়া দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছে। তারপর কাঁদতে কাঁদতে মায়ের আঁচল ধরে লতু হাওলাদারের বাড়ি থেকে বের হয়েছিল। যেন চোখের ভেতর ভেসে ওঠা জ্বলজ্বলে দৃশ্য। সে কিচ্ছু ভোলেনি। তবে সময় এখনও আসেনি। মজিবর মিয়া সব মনে রেখেছে।

মজিবর মিয়া বাড়ি ঢুকল ক্লান্ত হয়ে। চারপাশে রোদ মরে এসেছে। তেষ্টায় তার গলা শুকিয়ে আসছে। কিন্তু উঠানে পা রেখেই সে থমকে দাঁড়াল। আম্বরি বেগম হয়তো কোথাও গেছেন। বাড়ির উঠানে বছর দুই বয়সের ছোট্ট মেয়েটা বসে আছে। আরশি। আরশির হাতে এক টুকরো খাবার। পিঠা বা পাউরুটি ধরনের কিছু একটা হবে। তিনটা ধাড়ি ধাড়ি কুকুর আরশিকে মাঝখানে রেখে তার চারপাশে চক্রাকারে ঘুরছে আর ঘোৎ ঘোৎ শব্দ করছে। ভয়ঙ্কর দৃশ্য। একটা আড়াই বছরের বাচ্চার জন্য মহা ভয়ঙ্কর। কিন্তু অবাক করা ব্যাপার হলো আরশি কাঁদছে না। সে কুকুরগুলোর সঙ্গে সঙ্গে বসে থেকেই পায়ে ভর দিয়ে ঘুরছে। কালোর ওপর সাদা গোল ফুটকিওয়ালা কুকুরটা হঠাৎ সামনের পা দিয়ে আরশির হাতের খাবারের ওপর খামচি দিল। কিন্তু আরশি চোখের পলকে খাবার সমেত হাতখানা সরিয়ে নিল। কুকুরটা মুহূর্তে খেপে উঠল। মস্ত হাঁ করে ভয়ঙ্কর শব্দে তীব্র চিৎকার দিল। আরশি এবারও কাঁদল না, তবে ভয়ে কুঁকড়ে গেল। তার সারা শরীর কেঁপে কেঁপে উঠল। কুকুরটা আরও এক পা এগোতে যাচ্ছিল। তার চোখজুড়ে প্রবল হিংস্রতা। মজিবর মিয়া উঠানের মাচার ওপর থেকে বাঁশের মোটা কঞ্চিটা টেনে বের করল। তারপর চোখের পলকে ছুটল। কুকুরটার কাছে পৌঁছানোর আগেই সপাটে হাতের কঞ্চিখানা ছুড়ে মারল। একটা শক্ত লাথি বসাল পেট বরাবর। ক্যাৎ শব্দে কুকুরটা ছিটকে পড়ল হাতখানেক দূরে। বার দুই ঘেউ ঘেউ করে ডাকল। তারপর উল্টোপথে হাঁটা ধরল। বাকি দুটো কুকুরও কুইকুই করে পিছু নিল তার। মজিবর মিয়া আরশির দিকে ফিরল। মেয়েটা মাথা উঁচু করে তার দিকে তাকিয়ে আছে। তার চোখভর্তি কী কে জানে। কিন্তু মজিবর মিয়া দীর্ঘসময় সেই চোখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর ধীরে হাঁটু গেড়ে মেয়েটার পাশে বসল। একটা হাত বাড়িয়ে আলতো করে মেয়েটার গাল ছুঁয়ে দিল। আর কী হলো, তীব্র শব্দে শরীর কাঁপিয়ে কেঁদে উঠল ছোট্ট আরশি। তার ছোট ছোট ফোলা ফোলা ঠোঁটজোড়া জুড়ে যেন রাজ্যের অভিমান। যেন অজস্র অভিযোগ। যেন কারও এই অতটুকু স্পর্শের জন্যই সে এতক্ষণ তার সব ভয়, সব অভিযোগ, অভিমান আর কান্না জমিয়ে রেখেছিল। দু'হাতে মেয়েটাকে তুলে দাঁড় করাল মজিবর মিয়া। মেয়েটার সারা শরীরভর্তি ধুলো-মাটি। মুখভর্তি সর্দির দাগ, ময়লায় মলিন মুখ। মজিবর মিয়ার হঠাৎ কী হলো, সে শক্ত করে মেয়েটাকে বুকের সঙ্গে জাপটে ধরল। এইটুক

একটুখানি শরীর। যেন মজিবর মিয়ার বুকের সঙ্গে মিশে গেল। যেন ওই চওড়া বুকের ভেতর থেকে অতুটুকু ওই শরীরটাকে আর খুঁজে বের করা যাবে না। কখনই না। www.boighar.com

মজিবর মিয়া দীর্ঘ সময় আরশিকে বুকের সঙ্গে চেপে ধরে দাঁড়িয়ে রইল। দীর্ঘ সময়। তারপর পানিতে কাপড় ভিজিয়ে মেয়েটার সারা শরীর মুছে দিল। মুখের ময়লা, সর্দি মুছে দিল। তারপর সুন্দর একটা জামা পরাল। তারপর মেয়েটাকে কাঁধের ওপর বসিয়ে বিকেল হয়ে আসা রোদের তেরছা আলোয় হেঁটে চলে এলো নদীর পাড়ে। নদীর এদিকটা সুনসান নীরব। আরশি বাবার কাঁধের দু'পাশে পা ঝুলিয়ে বসে আছে আর মাঝে মাঝে মুখে অদ্ভুত শব্দ করছে। মজিবর মিয়া দীর্ঘসময় চুপচাপ সেই নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে রইল। এই পুরোটা সময় সে নিলুফা বানুর মৃত্যু নিয়ে ভাবল। ভাবল তার মৃত্যুর পরের সময় নিয়েও। প্রত্যেকটা জিনিস সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ভাবল এবং একটা সময় গিয়ে মজিবর মিয়ার মনে হলো, পুরো ঘটনায় অদ্ভুত কিছু বিষয় খুঁজে পাচ্ছে সে। বিষয়গুলো আসলেই সে আগে ভাবেনি। কিন্তু সেগুলোকে এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগও আসলে নেই। নিলুফা বানুর মৃত্যু এবং মৃত্যু পরবর্তী ঘটনার সঙ্গে বিষয়গুলো এমন গভীরভাবে মিশে ছিল যে সেগুলোকে এতদিন আলাদা করে খুঁজে পাওয়া যায়নি। কিন্তু আজ লতু হাওলাদারের কথায় সেই বিষয়গুলো পুরো ঘটনার ভেতর থেকে যেন ক্রমশই বীভৎস নখর জাগিয়ে বেরিয়ে আসছে! মজিবর মিয়া আবিষ্কার করল, নিলুফা বানুর প্রসবকালীন জটিলতায় তার ভূমিকা বরং অদ্ভুতরকমের আপত্তিকরই ছিল। ওই পুরো সময়টায় সে আসলে নিজেকে একপ্রকার গুটিয়েই রেখেছিল। মানুষ হিসেবে সে মোটেই বুদ্ধিহীন না, বরং আর দশজনের চেয়ে খানিকটা হলেও তীক্ষ্ণ চিন্তার মানুষ সে। কিন্তু নিলুফা বানুর প্রসবকালীন সেই ভয়াবহ সময়টাতে সে ছিল আশ্চর্যরকম নিস্পৃহ এবং নিষ্ক্রিয়। খোদেজা দাই কিংবা শুকরঞ্জন ডাক্তারের কথা শুনেই একটা মানুষকে অমন বিনা চিকিৎসায়, বিনা চেষ্টায় মরতে দেওয়ার মানুষ কি আসলেই সে? সে কি চাইলেই নিলুফা বানুকে কোথাও না কোথাও নিয়ে যেতে পারত না? নিশ্চয়ই পারত। অন্তত চেষ্টা তো করতে পারত। কিন্তু সে কোথাও যায়নি। এমনকি চেষ্টাও করেনি। সে কি অবচেতনভাবেই নিলুফা বানুর মৃত্যুর অপেক্ষায় ছিল?

ওপরের ঘটনাটি যদি সত্যি হয় তাহলে তার দ্বিতীয় ভাবনাটি আবার অনেকটাই বিপরীত। কারণ সে জানে, নিলুফা বানুর মৃত্যুর পর থেকেই সে তার কন্যা সন্তানটির প্রতি অবিচার করে এসেছে। আরশির প্রতি সে তার নিজের আচরণ এবং অনুভূতি নিয়েই সম্ভবত দ্বিধান্বিত ছিল। সে কি অবচেতনভাবেই নিলুফা বানুর মৃত্যুর জন্য আরশিকে দায়ী করে এসেছে? সে কি এই ভেবে এসেছে যে আরশিকে জন্ম দিতে গিয়েই নিলুফা বানু মারা গেছে? যদি তা-ই হয়

তাহলে কোনোভাবেই নিলুফা বানুর মৃত্যু তার কাছে কাঙ্ক্ষিত হতে পারে না। বরং সেটি অনেক বেশি কষ্টের। অনেক বেশি আঘাতের। তাহলে?

মজিবর মিয়ার কেমন হাঁসফাঁস লাগে। তার মনে হচ্ছে সে সবকিছু কেমন গুলিয়ে ফেলছে। তার দমবন্ধ লাগে। অন্ধকার গাঢ় হয়ে আসতে মজিবর মিয়া বাড়ির পথ ধরল। ক্লান্ত আরশি ততক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে। তবে এতক্ষণে একটা বিষয়ে মজিবর মিয়া নিশ্চিত হয়ে গেল যে সে এই ছোট্ট মেয়েটার প্রতি এতদিন ধরে একধরনের প্রবল অবিচার করে এসেছে। গত আড়াইটা বছর এই মেয়েটা বলতে গেলে আম্বরি বেগমের কাছেই বেড়ে উঠেছে। বাবা হিসেবে সে কিছুই করেনি। আসলে বুকের গভীরে কোথায় যেন সে তীব্রভাবে অনুভব করত, এই ছোট্ট মেয়েটাকে পৃথিবীর আলো দেখাতে গিয়েই জীবনের আলো নিভে গিয়েছিল নিলুফা বানুর। আজ এই হেমন্তের বিষণ্ন সন্ধ্যায় মজিবর মিয়ার হঠাৎ মনে হলো, এই ছোট্ট শিশুর শরীরটাজুড়ে কোথাও না কোথাও নিলুফা বানু রয়ে গেছে। রয়ে গেছে সে নিজেও। এই ছোট্ট মানুষটা তাদের ভালোবাসার সৃষ্টি। সে সেই শিশিরভেজা মেঠোপথের ঘাসে হেঁটে যেতে যেতে ঘুমন্ত আরশির মুখভর্তি করে মমতার অজস্র রেখা এঁকে দিল।

আর ঠিক তখনই তার স্টিমারঘাটার কথা মনে পড়ে গেল। মনে পড়ে গেল তার বড় মামা মজিদ বেপারির কথা। মনে পড়ে গেল টাকার অভাবে ট্রলার কিনতে না পারা সেই হতাশার দিন শেষে নেমে আসা রাতের কথা। মজিদ বেপারি তার দহলিজের দরজা বন্ধ ঘরে ট্রলার কেনার টাকা তুলে দিয়েছিল তার হাতে। সেই টাকায় ট্রলার কিনে বাড়ি ফিরেছিল সে। যেই ট্রলার তাকে দু'হাত ভরে দিয়েছে, দিচ্ছে। সেই ট্রলারের কাছে তার অশেষ কৃতজ্ঞতা। কৃতজ্ঞতা থাকা উচিত বড় মামা মজিদ বেপারির প্রতিও। কিন্তু তার মনে পড়ে গেল আরও একটা কথা, সেই টাকার বিনিময়ে মজিদ বেপারির দেওয়া শর্তের কথা। সেই শর্তের নাম লাইলি! মজিবর মিয়ার জীবনের আরেক গল্প। গল্প আরশির জীবনেরও।

www.boighar.com

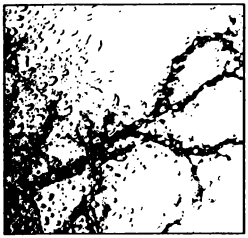

মিলি বসেছিল বারান্দায় ইজি চেয়ারে হেলান দিয়ে। আজ তার মন ভালো।

তার পায়ের কাছে ফালি ফালি রোদ। বারান্দার গ্রিলের ছায়ায় সেই রোদে অদ্ভুত সুন্দর নকশা হয়েছে। মিলি বাচ্চাদের মতোন খানিক পরপর সেই রোদের ভেতর পা মেলে দেয়। পরক্ষণেই আবার সরিয়ে নেয়। তার ধবধবে ফর্সা পায়ে কী সুন্দর আলপনা ফুটে ওঠে। আবার মিলিয়ে যায়। এই খেলাটা ভালো লাগছে মিলির। আপাতত তার কাজকর্ম নেই। অফিস থেকে লম্বা ছুটি নিয়েছে সে। তার পেটের ভেতর বাচ্চাটা যখন নড়াচড়া করে, মিলির খুব অবাক লাগে। এই এতটুকু পেটের ভেতর আস্ত একটা মানুষ! ভাবতেই কেমন লাগে।

আশিষ অবশ্য যেমন ছিল তেমনই। গভীর রাত করে বাড়ি ফেরে। মিলি টেবিলে খাবার নিয়ে বসে থাকে। তাদের কথাবার্তা হয় খুবই সাধারণ। আশিষ হাত-মুখ ধুয়ে এসে খাবারের টেবিলে বসে। তারপর প্লেটে ভাত নিতে নিতে বলে, 'কী অবস্থা তোমার? শরীর কেমন?'

মিলি বলে, 'শরীর ভালোই। তবে কিছু খেতে ইচ্ছে করে না।'

আশিষ বলে, 'ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলেছ?'

মিলি বলে, 'ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলতে হলে তো ডাক্তারের কাছে যেতে হবে।'

আশিষ বলে, 'তো গেলেই তো হয়। সারাদিন তো বাসায়ই থাকো।'

মিলি বলে, 'আমার একা একা ডাক্তারের কাছে যেতে ইচ্ছে করে না।'

আশিষ সঙ্গে সঙ্গে এই কথার কোনো জবাব দেয় না। সে চুপচাপ ভাত খাওয়া শেষ করে গামছায় হাত মুছতে মুছতে বলে, 'কাল সকালে আমি তোমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব। এখন ঘুমাতে চলো।'

www.boighar.com

মিলি কিছু বলে না। ঘুমাতেও যায় না। সে জানে আশিষ কাল ভোরেও তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে না। বরং ভুলে যাবে। তার কিছুই মনে থাকে না। সে থাকে এক অদ্ভুত ঘোরের জগতে। আশিষের সেই ঘোরের জগৎ সম্পর্কে মিলির কোনো ধারণা নেই। মিলি অজস্রবার জানতে চেয়েছে। আকারে-ইঙ্গিতে, সরাসরি। কিন্তু লাভ হয়নি। আশিষ তার নিজের কথা কাউকে

বলেনি। মিলির মাঝে মাঝে মনে হয়, আশিষকে সে একটা ঘোরের বসে ভালোবেসেছে। সেই ঘোরটা আগে যেমন সবসময় থাকত, এখন তেমন নয়। মাঝে মাঝে পুরোপুরি কেটে যায়, তারবাদে কিছুদিন আবার জেঁকে বসে। কিন্তু আশিষ হয়তো তাকে কখনই কোনোভাবেই ভালোবাসেনি। আসলে আশিষ বোধহয় ভালোবাসতেই জানে না। না মা-বাবা, বোন বা অন্য কাউকে। আশিষের সঙ্গে সম্পর্কটাও তার নিজের তরফ থেকে। চুপচাপ গম্ভীর চেহারার ছেলেটাকে তার অসম্ভব ভালো লাগত। কথা বলতে গিয়ে দেখল, এ তো রীতিমতো বিদ্যের জাহাজ! এখনও একটু পা টেনে টেনে হাঁটে, পায়ের শুকিয়ে যাওয়া ক্ষতটার কারণেই। ছেলেটা অত অল্প বয়সেই মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিল! মিলির প্রেমে পড়তে সময় লাগেনি। তার বাবা-মা কেউ দেশে নেই। মাস্টার্স শেষ করে তারও চলে যাওয়ার কথা ছিল লন্ডনে। কিন্তু আর যাওয়া হলো কই? সে চিঠিতে সব জানিয়েছিল। হয়তো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগেই নিজের দিক থেকেও ভাবনার আরও অনেক কিছুই ছিল, কিন্তু অতকিছু ভাবার মেয়ে সে নয়। প্রেমটাও হয়ে গেল। তারপর বিয়েও। দু'জন মানুষ একসঙ্গে থাকছে দীর্ঘ সময়। কিন্তু সম্পর্কটা কখনও স্বামী-স্ত্রীর হয়ে ওঠেনি। রয়ে গেছে সেই আগের মতোই। পাশাপাশি থাকছে, কিন্তু খুব কাছাকাছি হয়তো নয়। আবার দূরেরও নয়।

আজ মিলির মন ভালো হওয়ার কারণটা ভীষণ অন্যরকম। গত রাতেও আশিষ গভীর রাতে বাড়ি ফিরেছিল। তারপর সেই একই কথোপকথন। মিলি জানত আজও আশিষ তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে না। রোজকার মতোই দিব্যি ভুলে যাবে। মিলিও মনে মনে জেদ চেপেছিল, আর যা-ই হোক, সে ডাক্তারের কাছে যাবেই না। ঘুম থেকে উঠে সে দেখল, যা ভেবেছিল ঠিক তাই। আশিষ ঘরে নেই। বের হয়ে গেছে কখন! মিলির আজকাল আর এ নিয়ে মন খারাপ হয় না। সে ঘুম থেকে উঠে চুলায় চা বসাল। বারান্দায় খানিক দাঁড়িয়ে রইল। একটা চড়ুই এসে দাঁড়িয়েছে বারান্দার গ্রিলে, তার সঙ্গে কতক খুনসুটি করল। চড়ুইটা রোজ আসে। কেমন একটা অদ্ভুত চেনা-জানা হয়ে গেছে যেন। কাছে গেলেও উড়ে যায় না। যেন সে জানে, এই মানুষটা তার কোনো ক্ষতি করবে না। কত সহজ এই চেনা-জানা। অথচ মানুষ! পাশাপাশি এক দীর্ঘ মানবজনম, তারপরও চেনা হয় না, জানা হয় না। রয়ে যায় দূরের মানুষ। অজানা মানুষ।

মিলির মন ভালো হয়ে গেল ড্রেসিং টেবিলের দিকে তাকিয়ে। সেখানে তাজা দুটো গোলাপ। টকটকে লাল। একটা ছোট্ট চিরকুট। চিরকুটের ঠিক মাঝখানে গোটা গোটা অক্ষরে আশিষের লেখা, 'আজ বহুদিন বাদে ভোরের প্রথম আলোয় দীর্ঘসময় তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। মনে হলো,

আমার বুকের ভেতরের জমে থাকা একটা কঠিন বরফ সেই থেকে গলে গলে যাচ্ছে।'

মিলি এই চিরকুটের গভীর কোনো অর্থ খুঁজতে চেষ্টা করল না। কী বরফ জমে আছে, তাও জানতে চাইল না। তার শুধু মনে হতে লাগল, আজকের সকালটা অন্যরকম। ভীষণ অন্যরকম। এই অন্যরকম সকালটা যতটা সম্ভব দীর্ঘসময় ধরে এমন অন্যরকমই থাকুক। ভীষণ অন্যরকম।

আশিষ এলো দুপুরের পর। তড়িঘড়ি করে তারা ডাক্তারের কাছে গেল। সন্ধ্যায় খেতে গেল একটা রেস্টুরেন্টে। রাতে বাসায় ফিরল দেরি করে। দিনটা কেমন সেই চড়ুই পাখির মতোন ফুড়ুৎ করে উড়ে গেল। এমন দিনগুলো এত ছোট হয় কেন! রাতে বিছানায় মিলিকে ডাকল আশিষ। তারপর কথাটা বলল, 'তুমি কি অপলার কথা কিছু জানো? বাবা কিছু বলেছিলেন হয়তো।'

মিলি দীর্ঘক্ষণ আশিষের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, 'তেমন কিছু না, তবে তোমার বাবা প্রথম যেবার আমাদের বাসায় এলেন, তখন কিছু একটা বলেছিলেন। তোমার খুব ভালো বন্ধু ছিল। মেয়েটা তোমাদের দূরসম্পর্কের কোনো আত্মীয়। মাসতুতো বোন বা এই ধরনের কিছু।'

আশিষ বলল, 'অপলা আমার ভালো বন্ধু ছিল এইটুকু বাবা ঠিক বলেছিলেন। বাকিটুকু হয়তো এড়িয়ে গিয়েছেন। অপলাকে আমি ভালোবাসতাম। আমাদের সম্পর্কটা খুব সহজে ভেঙে যাওয়ার মতো কিছু ছিল না। সেই বয়সে আবেগটাও হয়তো অনেক বেশি ছিল। তবে আমার ধারণা আবেগের বাইরেও কিছু একটা ছিল। জগতে অপলা ছাড়া আর কিছু নিয়ে আমি তখন ভাবতাম না। কিন্তু আমরা জানতাম স্বাভাবিক নিয়মে আমাদের সম্পর্কটা হবে না। কিন্তু ছেড়ে দেওয়ার কথাও ভাবিনি কোনোদিন।' www.boighar.com

আশিষ একটু থামল। টেবিলের ওপরে সিগারেটের প্যাকেট পড়ে আছে। একটা সিগারেট ধরাবে কিনা ভাবছে। কিন্তু মিলির এই অবস্থায় সিগারেট ধরানো ঠিক হবে না। সে আবার বলা শুরু করল, 'অপলার বিয়ে ঠিক হয়েছিল। ভালো পাত্র, বড় চাকরি করে। আসলে এটা এড়ানোর কোনো উপায় আমাদের জানা ছিল না। অনেকবার পালিয়ে যাওয়ার কথা ভেবেছি, কিন্তু অপলাই আমাকে নানাভাবে বুঝিয়ে থামিয়েছে। সেবার অপলাদের বাড়িতে সেই ছেলের আসার কথা। সবাই বলছিল, অপলাকে দেখতে আসবে। কিন্তু আমরা ঠিকই জানতাম, সে এলেই বিয়েটা হয়ে যাবে। আমাদের আর কোনো উপায় রইল না। আগের রাতে অপলাকে নিয়ে আমি পালিয়ে যাই। গভীর রাতে অপলার বান্ধবী সীমাদের বাড়িতে গিয়ে উঠেছিলাম আমরা। সীমাদের বাড়ি জেলা শহরের কাছাকাছি। আমি তখন সেখানকার এক কলেজেই পড়ি। বাড়ি থেকে

Boighar.com & ARS

অতদূর বলে নিয়মিত ক্লাস করতে পারতাম না। কিন্তু ভালো ফুটবল খেলতাম বলে কলেজে একটা পরিচিতি ছিল। বন্ধু-বান্ধবও ছিল অনেক। কথা ছিল কলেজের হোস্টেলে আমার কোনো বন্ধুর সঙ্গে আমি থাকব। পরের দিন অপলাকে নিয়ে চলে যাব কোথাও। কিন্তু সে রাতেই সীমার নানী মারা গেল। সীমাদের বাড়ির সবাই রাতেই রওনা হয়ে যায় ওর নানীবাড়ি। অপলার কারণে অত রাতে আর সীমার যাওয়া হলো না। কথা ছিল, সীমা ভোর হলেই ওর ছোট ভাইয়ের সঙ্গে চলে যাবে। আমাদের জন্য এটা ছিল এক অভাবনীয় সুযোগ। সেই রাতে সীমাদের বাসায় আমি আর অপলা এক সঙ্গেই থেকে যাই।'

আশিষ আবারও খানিক থামল। তারপর জগ থেকে গ্লাসে ঢেলে জল খেল। তারপর আরও কিছুটা সময় নিয়ে বলল, 'একসঙ্গে ছিলাম মানে, সেই রাতে উই হ্যাড ফিজিক্যাল রিলেশন। পরদিন পালিয়ে যাওয়ার বিষয়ে আমরা কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলাম না। কোথায় যাব? কার কাছে যাব? তখন অপলা একটা বুদ্ধি দিল। সে বলল, আর পালিয়ে যাওয়ার দরকার নেই। এখানে আরেকদিন থেকে বাড়ি ফিরে যাব। যেই মেয়ে কাউকে কিছু না জানিয়ে দুইদিন বাড়ির বাইরে থাকে, তার আর যা-ই হোক, শিগগিরই বিয়ে হওয়ার আর সুযোগ নেই। অপলার কথা সত্য। পরদিন সে বাড়ি ফিরে গেল। তার বিয়ে এর মধ্যে ভেঙে গেছে। ভয়াবহ ঝামেলা হলো এই নিয়ে। তারপর মাসখানেকের মধ্যে পরিস্থিতি মোটামুটি শান্ত হলো। কিন্তু তখনই শুনলাম মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার মতোন এক খবর। অপলা জানাল সে প্রেগন্যান্ট! আমার তখন দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য অবস্থা। আমি কী করব জানি না। নানানরকম পরিকল্পনা মাথায় আসে, কিন্তু কিছুই কাজ করে না। সম্ভবত অপলার মা বিষয়টা জেনে গিয়েছিলেন। এক দুপুরে নির্জন বাড়িতে চুলার খড়িকাঠ দিয়ে বেদম পিটিয়েছেন ওকে। তারপর সিদ্ধান্ত দিলেন ভ্রূণটাকে নষ্ট করে ফেলতে হবে। কিন্তু অপলা সোজা দাঁড়িয়ে গেল, যা ঘটার ঘটুক, এই ভ্রূণ সে নষ্ট করবে না। সে নষ্টও করেনি। একাত্তুরের সাতাশে জুলাই রাতে পাক আর্মি ওদের গ্রামে আগুন লাগিয়ে দিল। সেই আগুনে পুড়ে মরেছে সে। মাইলখানেক দূরে, এক খোলা বিলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমি সেই আগুনে পুড়ে যাওয়া গ্রাম দেখেছি! আমি ঠায় দাঁড়িয়ে ছিলাম। মনে হচ্ছিল আমি একটা ঘোরের মধ্যে চলে গিয়েছি। আমার মনে হচ্ছিল আমি অপলার চিৎকার শুনছি। তীব্র চিৎকার। এমনকি ওর পেটের ভেতরের সেই ভ্রূণ শিশুটির চিৎকারও শুনছি। কিন্তু আমি কেবল দাঁড়িয়ে দেখেছি, আর কিচ্ছু করতে পারিনি। কিচ্ছু না। সেই চিৎকার আজ অবধি আমার সঙ্গে রয়ে গেছে। আমার মাথার ভেতর।'

আশিষ যেন এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলল। তার শরীরজুড়ে ঘাম। চোখ জোড়া যেন ক্রমশই টকটকে লাল হয়ে উঠছে। স্বামীর এমন অতীত স্মৃতি শুনে একজন স্ত্রীর প্রতিক্রিয়া কী হওয়া উচিত মিলি জানে না। কিন্তু সে হঠাৎ

www.boighar.com

আশিষের মাথাটা টেনে তার বুকের ভেতর নিয়ে নিল। তারপর শক্ত করে জড়িয়ে ধরে রাখল দীর্ঘসময়। তারপর আশিষের একটা হাত টেনে নিয়ে তার স্ফীত পেটের ওপর রাখল। আশিষের নিষ্কম্প হাতখানা যেন জড়ো হয়ে পড়ে রইল। কিন্তু মিলির সেই স্ফীত পেটের ভেতর থেকে তাদের ক্রমবর্ধিষ্ণু অস্তিত্ব হঠাৎ নড়ে উঠল। একটা শিশু। মায়ের উদর থেকে কী অবলীলায় তার হাত, পা কিংবা শরীর নেড়ে তার অস্তিত্বের, তার অধিকারের জানান দিচ্ছে। আশিষ চুপ করে উঠে বসল। অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল মিলির পেটের দিকে। মাঝে মাঝেই নড়ে উঠছে পেটের বিভিন্ন অংশ। বহু বহুকাল পর যেন আশিষ চোখ মেলে চাইল। সে আস্তে করে তার কান চেপে রইল মিলির পেটে। অদ্ভুত সব শব্দ। অদ্ভুত সব স্পন্দন।

এ যেন জীব-জগৎ ও সৃষ্টির এক অপার রহস্য।

সুজাতা রানী খবর শোনার পর কী করবেন? এই নিয়ে শুকরঞ্জন ডাক্তার নানান জল্পনা-কল্পনা করেছেন। কীভাবে তাকে খবরটা দেবেন, সেটা নিয়েও অসংখ্যবার ভেবেছেন। কিন্তু কোনো সমাধান পেলেন না। সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতেই কয়েকটা দিন কেটে গেল। অবশেষে এক বিকেলে সুজাতা রানীর কাছে কথাটা পাড়লেন তিনি। সুজাতা রানী রান্নাঘরে তরকারি কুটছিলেন। বেলা প্রায় পড়ে এসেছিল। তখনও রান্নাবান্না হয়নি। আলো থাকতে থাকতে রান্না শেষ করার তাড়া। শুকরঞ্জন ডাক্তার কাঠের ছোট জলচৌকিখানা নিয়ে সুজাতা রানীর গা ঘেঁষে বসলেন। ইনিয়ে-বিনিয়ে নানান কথা বললেন। তারপর এক ফাঁকে প্রসঙ্গটা তুললেন। প্রসঙ্গটা তুললেন মানে সরাসরিই খবরটা দিলেন। অদ্ভুত ব্যাপার হলো, খবর শুনে সুজাতা রানীর মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া হলো না। তিনি যা করছিলেন ঠিক তাই করছেন। মাথা তুলে তাকালেন না অবধি। শুকরঞ্জন ডাক্তার দীর্ঘসময় সুজাতা রানীর দিকে তাকিয়ে রইলেন। কিন্তু কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলেন না। তার খানিক সন্দেহ হতে লাগল, সুজাতা রানী ঠিকঠাক মতো সংবাদটা শুনেছেন তো? তার সন্দেহ কাটল উঠে যেতে যেতে। তিনি জলচৌকি থেকে উঠে দাঁড়াবেন, ঠিক এই মুহূর্তে চকচকে ধারাল বঁটিতে কীভাবে যেন হাত কেটে ফেললেন সুজাতা রানী। হয়তো অন্যমনস্কতায়। দরদর করে তাজা রক্ত ঝরে পড়ছে তরকারির গামলায়। সুজাতা রানী কোনো শব্দ করলেন না। ডান হাতের কাটা আঙুল চেপে ধরে বসে রইলেন। শুকরঞ্জন ডাক্তার অদ্ভুত দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ সুজাতা রানীর দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে ত্রস্ত পায়ে ব্যান্ডেজের বাক্সটা আনতে ঘরে ছুটলেন।

শুকরঞ্জন ডাক্তার জানেন, সুজাতা রানীর হাতের কাটা ক্ষতের ব্যান্ডেজের চেয়েও এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি যেটি দরকার তাহলো তার বুকের ভেতর যে

Boighar.com & ARS

ক্ষতটা রয়েছে তার ব্যান্ডেজ। কিন্তু সেই ব্যান্ডেজের খবর শুকরঞ্জন ডাক্তারের জানা নেই!

সুজাতা রানী আর শুকরঞ্জন ডাক্তারের মধ্যে আশিষকে নিয়ে আর কোনো কথা হলো না। তারা দিব্যি যে যার মতো নিজেদের কাজ করে যেতে লাগলেন। শুকরঞ্জন ডাক্তার খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে পাশের ছোট বাজারে তার চেম্বারে যান। ফেরেন দুপুরে। ক'টা খেয়ে একটু গড়িয়ে নেন। তারপর আবার চেম্বার। কেউ ডাকলে মাঝে মাঝে দূরের কোনো গাঁয়ে রোগী দেখতে ছোটেন। একঘেয়ে নিরামিষ জীবন। কিন্তু এই জীবন নিয়ে শুকরঞ্জন ডাক্তারের কোনো আক্ষেপ নেই। তিনি বরং আর আট-দশজন মানুষের চেয়ে সুখী। তাকে পাঁচ গাঁয়ের মানুষ একনামে চেনে। শুকরঞ্জন ডাক্তার এদের কাছে ঘরের মানুষ। এরা হয়তো তাকে টাকা-পয়সা তেমন দিতে পারে না। তবে বাড়ির লাউটা, মুলাটা নিয়ে এসে উঠানে হাজির হয়। পান খাওয়া লাল দাঁত বের করে হেসে বলে, 'কইগো ডাক্তারসাব, ফাসকেলাস মুলা অইছে এইবার ক্ষ্যাতে। আগে আপনে খাইয়া টেস করবেন, হেরবাদে ক্ষেতের বাদবাকি মুলা তুলুম।'

শুকরঞ্জন ডাক্তার চরম বিরক্ত মুখে সেই মুলা হাতে নেন। তারপর তিক্ত গলায় বলেন, 'খালি মুলা খাওয়াইলে পেট চলব আমার? মানুষ মরলেও তো আর তোমাদের বাড়িতে যাওন যাইত না। কয়বারের ভিজিটের টাকা বাকি সেই খেয়াল আছে?'

পানখাওয়া লাল দাঁতের মানুষগুলো অবশ্য এ নিয়ে মোটেও চিন্তিত না। তারা বরং দাঁত বের করে হাসে। সেই হাসিতে লজ্জা লজ্জা ভাব ফোটানোর প্রবল চেষ্টা। তবে চেষ্টা করলেও তাতে বিন্দুমাত্র লজ্জা ফুটে ওঠে না। যা ফুটে ওঠে, তার নাম নির্মল আনন্দ। একজন শুকরঞ্জন ডাক্তারকে পাশে পাওয়ার আনন্দ। তাদের এই হাসির অর্থ যে শুকরঞ্জন ডাক্তার বোঝেন না, তা না। কিন্তু বাইরে ধরা দেন না। ধরা দিলেই সর্বনাশ। এরা আরও মাথায় চড়ে বসবে। তিনি যা করেন তা হলো গম্ভীর মুখে কড়া গলায় ধমক-ধামক দিয়ে এদের বিদায় করেন। তারপর দূর থেকে এদের চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে থাকেন। কী আনন্দ নিয়েই না মানুষগুলো ফিরে যাচ্ছে! শুকরঞ্জন ডাক্তারকে কিছু দিতে পারার আনন্দ! তাদের কাছে এর চেয়ে আনন্দের আর কী হতে পারে!

শুকরঞ্জন ডাক্তারের কাছে মনে হতে থাকে, একটা মানব জনম এমন কেটে গেলে ক্ষতি কী! কী ক্ষতি!

এবারের শীতটাও জাঁকিয়ে বসেছে। রাত জেগে সুজাতা রানী কী সব সেলাই করেন। প্রতি বছর শীতেই করেন। উলের মোজা, কানটুপি, সোয়েটার। নানান কিছু। এবারও কিছু একটা করছেন হয়তো। শুকরঞ্জন ডাক্তার অবশ্য অতসব খেয়াল করেন না। তিনি যা খেয়াল করেন তা হলো সুজাতা রানীর মতিগতি। কিন্তু সুজাতা রানীর মতিগতি আজকাল আর বোঝার উপায় নেই। তিনি সেই যে মুখে কুলুপ এঁটেছেন আর খোলার নাম-গন্ধ নেই। না আগের মতো ঝগড়া করছেন, না অভিমান করছেন। না কথায় কথায় দেশ ছেড়ে কলকাতা যাওয়ার কথা বলছেন। তিনি সময়মতো রান্নাবান্না করেন। বাড়ির কাজকর্ম করেন। বাদবাকি সময় চুপচাপ ঠাকুর ঘরে থাকেন। ধর্মীয় বই-পুস্তক পড়েন। রাত হলে সেলাই। শুকরঞ্জন ডাক্তারের সঙ্গে তার কথাবার্তা যে একদম হয় না, তা না। হয়, তবে তা প্রয়োজনে। কলকাতা থেকে আনিতার চিঠি আসে নিয়মিত। সুজাতা রানী চিঠি পড়ে নিজেই জবাব লেখেন। শুকরঞ্জন ডাক্তার সেই চিঠি পোস্ট করে আসেন। চিঠিতে সুজাতা রানী কী লিখেছেন তা জানতেও চান না। ধীরে ধীরেই দু'জনের সব কৌতূহল যেন মরে যাচ্ছে। যেন ঘরের ভেতরের জীবনটা রোজ একটু একটু করে থেমে যাচ্ছে।

সেই মরে যেতে যাওয়া জীবন হঠাৎ করেই জেগে উঠল অদ্ভুত এক ঘটনায়। সেদিন ডাক্তারির সেই ছোট ব্যাগখানা খুঁজে পাচ্ছিলেন না শুকরঞ্জন ডাক্তার। সুজাতা রানীও বাড়িতে নেই, কোথাও গিয়েছেন। ফলে তাকে যে কিছু জিজ্ঞেস করবেন সে উপায়ও নেই। সারা ঘরে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও ব্যাগটা পেলেন না ডাক্তার। শেষ পর্যন্ত চোখ পড়ল সুজাতা রানীর সেলাইয়ের সরঞ্জামাদি রাখার রঙচঙা চটের বড় ব্যাগটার ওপর। ব্যাগটা খুলতে যাবেন, এই মুহূর্তে তার মনে পড়ল ডাক্তারির ছোট ব্যাগটা তো তিনি গতকাল চেম্বারেই রেখে এসেছেন। তারপরও কী মনে করে সুজাতা রানীর সেলাইয়ের ব্যাগটা খুললেন তিনি। ভেতরে উলের কাঁটা, উল, সুতোসহ নানান জিনিসপত্র। সেই জিনিসপত্রের ভিড়েও তার কৌতূহল বাড়াল কমলা রঙের ছোট্ট একটুকরো উলের কাপড়। প্রথমে অনেকক্ষণ তিনি বুঝতেই পারলেন না এই কাপড়ের টুকরোটা আসলে কী? অনেকক্ষণ বাদে তিনি বুঝলেন সেই অতটুকু উলের কমলা রঙের কাপড় আসলে একপাটি ছোট্ট মোজা! প্রবল বিস্ময় নিয়ে তিনি সেই মোজা পাটির দিকে তাকিয়ে রইলেন। বহু বছরবাদে, তিনি মনে করতে পারেন না, কত বছর, তবে বহু বহু বছরবাদে তার চোখের কোল ভিজে উঠল। ঝাপসা হয়ে উঠল। তিনি সেই ভিজে ওঠা ঝাপসা চোখে খুব যত্ন নিয়ে ব্যাগের ভেতরটা খুললেন। খুব ছোট ছোট আরও অনেকগুলো কাপড়, শীতের জামা, ছোট্ট টুপি, নবজাতক শিশুর কাঁথা। আরও কত কী! তার মনে হলো, জগতে মানুষের বেঁচে থাকার অজস্র কারণ থাকতে পারে তবে সেই কারণগুলোর ভেতর

শ্রেষ্ঠতম কারণ হলো ভালোবাসা। তিনি দীর্ঘসময় ধরে সেই কাপড়ের টুকরোগুলো হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

তিনি আসলে দাঁড়িয়ে রইলেন জগতের বিস্ময়কর সব ভালোবাসা নিয়ে।

www.boighar.com

মাসকয়েক পরের ঘটনা। মিলির প্রসবের সময় প্রায় আসন্ন। সেদিন ডাক্তার দেখিয়ে মিলিকে নিয়ে আশিষ ফিরছিল। ডাক্তার বলেছে মিলির সব রিপোর্টই বেশ ভালো। বেশ কিছুক্ষণ হলো সন্ধ্যা ঘনিয়েছে। সোডিয়াম লাইটের আলো এড়িয়েও নির্জন রাস্তার এখানে-সেখানে আবছা অন্ধকারের ছোপ। সবকিছু আগের মতো থেকেও এমন মুহূর্তগুলো হুট করে কেমন যেন মন খারাপের মুহূর্ত হয়ে যায়। একজোড়া নিঃশব্দ নর-নারী দীর্ঘসময় রিকশায় বসে রইল পাশাপাশি। তারপর হঠাৎ মিলি বলল, 'আচ্ছা আশিষ, ধরো বাবুটা জন্ম দিতে গিয়ে আমি মরে গেলাম। তখন তুমি কী করবে?'

আশিষ ঝট করে মুখ ফেরাল, তবে সঙ্গে সঙ্গেই কিছু বলল না। অনেকক্ষণ মিলির মুখে দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর সময় নিয়ে বলল, 'এটা কেন বললে?'

মিলি ঠোঁটের কোনায় মৃদু চোরা হাসি ঝুলিয়ে রেখে বলল, 'না এমনি, জানতে ইচ্ছে হলো।'

আশিষ বলল, 'নাহ, এমনি জানতে ইচ্ছে হয়নি। তুমি আমাকে বল, কথাটা কেন বললে?'

মিলি বলল, 'এটা সব মেয়েই হয়। এই সময়টায় কেবল মনে হয়, সে যদি মরে যায়। তার যদি কিছু হয়ে যায় তাহলে বাবুটার কী হবে? তার স্বামী কী করবে? কেমন ভয় ভয় লাগে।'

আশিষ শান্ত গলায় বলল, 'কিন্তু তুমি সেসব ভেবে প্রশ্নটা করোনি মিলি। তুমি কেন প্রশ্নটা করেছ, আমার মনে হয় সেটা আমি জানি।'

এবার মিলি চুপ করে রইল। সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না। তারপর দীর্ঘসময় নিয়ে বলল, 'আমার দোষ নিও না আশিষ, প্লিজ। আমি জিনিসটা মাথা থেকে তাড়িয়ে দিতে চাইছি। কিন্তু পারছি না। বিষয়টা এমন না যে ঘটনাটা নিয়ে আমার ভেতরে কোনো ক্রোধ আছে, কোনো ক্ষোভ আছে। কিন্তু কিছুতেই মাথা থেকে তাড়াতে পারছি না। আমার কেবল মনে হচ্ছে, আমিও যদি মরে যাই, তাহলে কি তুমি আমাকে অপলার চেয়ে বেশি ভালোবাসবে? অপলার মতো করে আমার জন্যও কি অমন দীর্ঘ সময় ধরে...।'

মিলি কথা শেষ করল না। থেমে গেল। আশিষ অন্ধকারে শক্ত করে মিলির একটা হাত ধরল। খুব শক্ত করে ধরে রাখা তার সেই হাতের ভেতর মিলির হাতটা কেমন থেকে থেকে কেঁপে উঠছিল। বাকিটা পথ কেউ আর কোনো কথা

বলল না। কেমন ঝুপ করে মন খারাপের অদ্ভুত বিষাদ নেমে এলো তৃষ্ণার্ত দুটি মানব মনে।

আশিষদের বাসা নিচতলায়। ভ্যান-রিকশা-টেম্পো চলার সরু রাস্তাটা থেকে বা দিকে ছোট্ট একটা গলি ঢুকেছে। গলির মাথায় এক চিলতে মাঠ। সেই মাঠের সঙ্গেই বাসা। সামনে দুটো ছোট্টধাপের সিঁড়ি, তারপর দরজা খুললেই ঘর। আশিষ রিকশা থেকে নেমে ভাড়া চুকাতেই কপাল কুঁচকে তাকাল। বাসার সামনের লাইটটা নষ্ট। সেখানটায় আশপাশের বাসাবাড়ির জানালার ফাঁক গলে আসা আলোয় অদ্ভুত এক আলোছায়া। সেই আলোছায়ার নকশায় দরজার সামনের সিঁড়িতে কেউ বসে আছে। খুব কাছে আসার আগ পর্যন্ত আশিষ চিনতে পারল না। যখন চিনল, মুহূর্তের জন্য প্রবলভাবে চমকে উঠল সে। সিঁড়িতে বসে আছে তার বাবা শুকরঞ্জন ডাক্তার! তার সঙ্গে বিশাল বিশাল ব্যাগ। তবে আশিষের চমকে ওঠার কারণ শুকরঞ্জন ডাক্তার না। তার চমকে ওঠার কারণ বাবার পাশে বসে থাকা মানুষটা। শুকরঞ্জন ডাক্তারের পাশে লম্বা চাদর জড়িয়ে নির্বিকার মুখে বসে আছেন সুজাতা রানী! তার মা।

তারপরের ঘটনাগুলো ঘটল খুবই দ্রুত। এই ঘটনা অতি নাটকীয় হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বাস্তবে ঘটল তার উল্টো। মা-ছেলের মধ্যে তেমন কোনো কথা হলো না। সবচেয়ে ভয়ে ছিল মিলি। তার জন্যই যতসব ঝামেলা। সুজাতা রানী অবশ্য মিলিকে কিছু বললেন না। কোনো চেঁচামেচি না। কথাবার্তাও না। তিনি প্রথমেই যেই কাজটা করলেন তা হলো ঘরের চারপাশে কীসব ছিটিয়ে দিলেন। রান্নাঘরের জিনিসপত্র গোছালেন। রাতে রান্নার সময় বাড়ি থেকে আনা তরিতরকারি দিয়ে নানান পদের রান্না শুরু করলেন। শুকরঞ্জন ডাক্তার গভীর আগ্রহ নিয়ে ড্রইংরুমে বসে পত্রিকা পড়ছেন। তার চশমার পাওয়ারে বোধহয় সমস্যা হয়েছে, তিনি খানিক পরপর সেই পত্রিকার কাগজ ছিঁড়ে চশমার কাচ মুছছেন। আশিষ আবার কেন যেন ঘর থেকে বেরিয়েছে। মিলি পড়েছে মহাবিপদে। সে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছে না তার কী করা উচিত! আশিষও কিছু না বলেই বের হয়ে গেল। তার কি রান্নাঘরে যাওয়া উচিত? মানুষটা একা একা রান্না করছে। অনেক ভেবেচিন্তে সে রান্নাঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। সুজাতা রানী তাকে খেয়াল করলেন না। তিনি উল্টোদিকে ফিরে রান্না করছেন। মিলির কি তাকে ডাকা উচিত? কিন্তু সে কী বলে ডাকবে? সে তো কখনও এই মানুষটিকে দেখেওনি। সে শুধু জানত, এই মানুষটা তাকে দেখলে বিষ খাবেন। কিংবা গায়ে আগুন দিয়ে পুড়ে মরবেন। তার জন্যই এই মানুষটি নিজের পেটের ছেলেটাকে পর্যন্ত বছরের পর বছর দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। কী করবে সে?

তার কিছু করতে হলো না। যা করার করলেন সুজাতা রানীই। তিনি গম্ভীর এবং কঠিন গলায় বললেন, 'এই মাইয়া, দরজার সামনে দাঁড়াইয়া থাকবা না। যাও ঘরে যাও। রান্নাঘরের এইসব ঝাল, মশলা, কালিঝুলির মধ্যে দাঁড়াই থাকনের কিছু হয় নাই। ঘরে যাও। আর এই হইল রান্নাঘরের ছিরি! একটু পরিষ্কার কইরা রাখন যায় না?'

মিলি কিছু বলল না। সে সেই দরজা ধরে দাঁড়িয়েই রইল। সে কিছুতেই বুঝতে পারছে না, তার কান্না পাচ্ছে কেন? সে এই কঠিন হৃদয় মহিলার সামনে বসে কিছুতেই কাঁদতে চায় না। কিছুতেই না। কিন্তু সে কাঁদল। মুখ চেপে ধরে কাঁদল। সুজাতা রানী আবারও কঠিন গলায় ধমকে উঠলেন, 'আমার সামনে বসে ফ্যাচফ্যাচ কইরা কাঁদবা না। আমার ফ্যাচফ্যাচ কইরা কান্দা মাইয়া মানুষ পছন্দ না। কথায় কথায় ফ্যাচফ্যাচ করে কান্দা মাইয়া মানুষ ভালো হয় না।'

তিনি কথার মাঝখানে সামান্য বিরতি দিয়ে উনুনে টগবগ করে ফুটতে থাকা কড়াইয়ের তেলে কিছু একটা ফেললেন। তারপর আবার বললেন, 'আর মাথার চুল খুইলা রাখছ কেন? এই সময় চুল খুইলা রাখবা না। চুলে তেল দেও না কতদিন। যাও ঘরে যাও।'

মিলি ঘরে গেল। সুজাতা রানী রান্নাবান্না শেষ করে দীর্ঘ সময় ধরে মিলির মাথায় তেল দিয়ে দিলেন। এই সময় তাদের মধ্যে টুকটাক কথাবার্তা হলো। সেসব কথাবার্তার বেশিরভাগই মিলির অনাগত সন্তান আর এই সময়ে তার নানান ধরনের রীতিনীতি মানা নিয়ে। রাতে খাবার টেবিলে কেউ তেমন কোনো কথা বলল না। সুজাতা রানী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সবার প্লেটে খাবার তুলে দিলেন। খাওয়া শেষ হতে এঁটো বাসন-কোসন নিজে হাতেই ধুলেন। তবে মিলি দাঁড়িয়ে রইল রান্নাঘরের দরজা ধরে। সবাই ঘুমাতে গেল গভীর রাতে। সেই রাতে আশিষের বুকের ভেতর ছোট্ট বাবুই পাখির মতোন গুটিশুটি মেরে ঘুমিয়ে রইল মিলি। সন্ধ্যাবেলা রিকশায় বাড়ি ফেরার পথে অপলাকে নিয়ে প্রবল মন খারাপের কথা আর মনেই রইল না। অন্ধকার রাতজুড়ে সেই বাসার দেওয়ালের প্রতিটি ইটও যেন টের পাচ্ছিল, মানুষ হয়ে জন্ম নেওয়া কী ভীষণ আনন্দের! কী ভীষণ বিস্ময়ের!!

পরের মাসের প্রথম সপ্তায়ই মিলির ছেলে হলো। ছেলের নাম রাখা হলো সকাল। সবাই ভেবেছিল নাম নিয়ে সুজাতা রানী হৈচৈ করবেন। কিন্তু তিনি কিছুই করলেন না। শুকরঞ্জন ডাক্তার তার কাছে এসে বললেন, 'ছেলের নাম কী রাখবা?'

সুজাতা রানী গম্ভীর গলায় বললেন, 'ছেলের নাম আমি কেন রাখব? ছেলের নাম রাখবে ছেলের মা-বাবা।'

শুকরঞ্জন ডাক্তার বললেন, 'না মানে, আশিষ চাইছিল, ছেলের নামটা তুমি রাখো।'

সুজাতা রানী নাম রাখার ব্যাপারে কোনো আগ্রহ দেখালেন না। তার সব আগ্রহ নাতিকে নিয়ে। নাতির গায়ের রং হয়েছে ধবধবে ফর্সা। এই নিয়ে তার মধ্যে চাপা আনন্দ কাজ করছে। অবশ্য এই আনন্দ তিনি কারো কাছে প্রকাশ করছেন না। এমনিতেই এদের বহু লাই দেওয়া হয়েছে। শুধু লাই দেওয়া হয়েছে তাও না। দেব না দেব না করেও লাই দিয়ে মাথায় তুলে ফেলা হয়েছে। তবে কেউ আশেপাশে না থাকলেই তিনি কটাস করে নাতির কপালে চুমু খাচ্ছেন।

ছেলের নাম রেখেছে মিলি। সন্ধ্যারাতের দিকে তার ব্যথা উঠেছে। বাচ্চা হলো সকালের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে। সে আশিষকে ডেকে চুপি চুপি বলল, 'আমি যদি আমার ছেলের নাম রাখতে চাই, তুমি কি রাগ করবে?'

আশিষ বলল, 'রাগ করব কেন?'

মিলি বলল, 'না মানে তুমি তো গ্রামে চিঠি দিয়ে মাকে নাম রাখার জন্য বলেছিলে।'

বিষয়টি যে আশিষ ভুলে গিয়েছিল তা না। কিন্তু এই মুহূর্তে মিলিকে সে সেটা বলতে পারছিল না। তার ভয় ছিল নাম রাখা নিয়ে না আবার কোনো ঝামেলা হয়। তবে সুজাতা রানী এই নিয়ে কোনো আগ্রহ না দেখাতে বিষয়টা সহজই হয়ে গেল। ছেলের নাম হয়ে গেল সকাল। মিলি অবশ্য বলে 'সকাল বেলার পাখি'। সময় যাচ্ছিল। সকাল বেলার পাখি বেড়ে উঠছিল তরতর করে। সুজাতা রানী আর গাঁয়ে ফেরার নাম করছিলেন না। শুকরঞ্জন ডাক্তার আসা-যাওয়ার মধ্যে ছিলেন। তিনি প্রায়ই একা একা মালোপাড়া এসে ঘুরে যাচ্ছিলেন। দিন কেটে যাচ্ছিল ফুরফুরে হাওয়ার মতোন। সেই হাওয়ায় শিষ কেটে যাচ্ছিল সুখের বাঁশি। বেড়ে উঠছে সকাল নামের সুখের সেতু। এই গল্পের আরেক প্রান্তে তখন বেড়ে উঠছিল আরও একটি শিশু। সেই শিশুর নাম আরশি।

আমরা এখন শুনব তার গল্প।

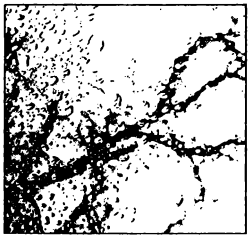

আরশি চার বছরে পড়েছে। এই বয়সের শিশুদের ওপর তাদের আশপাশের মানুষদের প্রভাব থাকে প্রবল। কিন্তু আরশির ওপর কার প্রভাব পড়েছে সেটা নিশ্চিতভাবে বোঝা যাচ্ছে না। তার ওপর যদি কারও প্রভাব পড়ে থাকে, সেটা হওয়ার কথা তার দাদী আম্বরি বেগমের। কারণ এই চার বছরের পুরোটা সময় সে ছিল আম্বরির বেগমের ছায়ায়। আম্বরি বেগম খুব ভোরে ঘুম থেকে ওঠেন। উঠে নামাজ পড়েন। তারপর উঠান ঝাঁট দেন। আগের রাতের এঁটো বাসন-কোসন মাজেন। রান্না বসান। ততক্ষণে আলো ফুটতে থাকে চারপাশে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, এই পুরো সময়টা বলতে গেলে আরশিও জেগেই থাকে। কিন্তু তার যেন কারো কাছে কোনো বায়না নেই, আহ্লাদ নেই। সে এই সময়টা গম্ভীর মুখে আম্বরি বেগমের কাজকর্ম দেখে। ছোট বাচ্চারা ঘুম থেকে উঠে আশপাশে কাউকে না দেখলে প্রথম যে কাজটা করে, তাহলো ঠোঁট ফুলিয়ে কেঁদে ফেলা। আরশি সচরাচর ঘুম থেকে উঠে কাঁদে না। সে চুপচাপ তার পাশের ফাঁকা জায়গাটার দিকে খানিকক্ষণ এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। তারপর ধীরে-সুস্থে একা একা চৌকি থেকে নামে। টুকটুক করে হেঁটে দরজার কাছে যায়। দরজার পাল্লা ধরে দীর্ঘসময় দাঁড়িয়ে থেকে বু আম্বরি বেগমকে খোঁজে।

তার ভয় বলতে এক অন্ধকার। সন্ধ্যা নামতেই সে আম্বরি বেগমের আঁচল ধরে ঘুরঘুর করতে থাকে। আম্বরি বেগমের তখন অনেক কাজ। রান্নাবান্না শেষ করে বাইরের জিনিসপত্র গোছানো। হাঁস-মুরগি খোপে তোলা। শুকাতে দেওয়া কাপড়-চোপড় ঘরে নেওয়া। আরও কত কী! সেই সময়টা আরশি তাকে ছাড়তে চায় না। আম্বরি বেগমের তখন ভারি বিরক্ত লাগে। সারাদিন যে মেয়েটা এতটুকু বিরক্ত করে না, সন্ধ্যে নামতেই সে যেন কেমন হয়ে যায়। ভয়ে জড়সড়। এই সময়টা আরশিকে কোলে নিয়ে কিংবা শাড়ির আঁচল ধরে গায়ের সঙ্গে লেপ্টে থাকা আরশিকে নিয়ে হেঁটে হেঁটেই কাজকর্ম সারতে হয়। দিনের বাদবাকি সময়টা আরশি নিজের মতোন বাড়ির এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়ায়। খিদে লাগলে আম্বরি বেগমের কাছে এসে স্পষ্ট উচ্চারণে বলে, 'বু, খিদা'।

আম্বরি বেগম তখন একটা প্লেটে খানিক ভাত মাখিয়ে দেন। সঙ্গে শিম, লাউ, ডাল যা-ই থাকুক না কেন, আরশি চুপচাপ খেয়ে নেয়। তারপর আবার টুকটুক করে হেঁটে ঘুরে বেড়ায়। মাঝে মাঝে নিজে নিজে কথা বলে, গুনগুন করে গান গায়। আম্বরি বেগম কখনও কখনও কাজের ফাঁকেই দূর থেকে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখেন। তারপর কিছুক্ষণ কপাল কুঁচকে তাকিয়ে থাকেন। মাঝে মাঝে কাছে এসে বসে দু'হাতে আরশিকে কাছে টেনে নিয়ে আদুরে গলায় বলেন, 'কী হইছে বু? শইল খারাপ লাগে?' www.boighar.com

আরশি তার ছোট্ট হাতে আম্বরি বেগমের নাক চেপে ধরে ছেড়ে দেয়। আবার ধরে, আবার ছেড়ে দেয়। কোনো এক অদ্ভুত কারণে এই খেলাটা তার খুব পছন্দ।

আম্বরি বেগম আরশির হাত চেপে ধরে বলেন, 'শইলডা খারাপ লাগেনি আমার বু'র?'

আরশি অবশ্য তার প্রশ্নে গা করে না। উত্তরও দেয় না কোনো। সে আম্বরি বেগমের হাতের মুঠো থেকে তার হাত ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। হাত ছাড়াতেই আবার সেই নাক চেপে ধরে ছেড়ে দেওয়ার খেলা। আম্বরি বেগম এই ছোট্ট মেয়েটাকে যেন বুঝতে পারেন না। জগতের কোনো কিছুতেই যেন তার কোনো অভিযোগ নেই, অনুযোগ নেই। যেন এখানে রোদ হোক, বৃষ্টি হোক কিংবা ঝড় হোক, সে ভালো থাকবে তার নিজের মতোন করেই। আম্বরি বেগম এমন সময় হঠাৎ হঠাৎ তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা আরশিকে বাজপাখির মতোন ছোঁ মেরে বুকের ভেতর নিয়ে নেন। তারপর আরশির ফোলা গালের পুরোটাকে ঠোঁটের ভেতর টেনে নিয়ে অদ্ভুত ভঙ্গিতে চুমু খান। যেন আরশি গ্লাসে রাখা শীতল জল আর তিনি কোনো তৃষ্ণার্ত পথিক। এক চুমুকেই সবটুকু গিলে ফেলে তেষ্টা মেটাতে চান। আরশি অবশ্য নির্বিকার ভঙ্গিতে আবার মগ্ন হয়ে যায় তার নিজের ভুবনে। ওই একটা বেড়াল বা ছাগল ছানা, একটা তুলতুলে মুরগির ছা, একটা প্রজাপতি কিংবা গাছ থেকে ঝরে পড়া একটা রঙিন পাতা। কত কিছুই যে তার দেখার আছে! সে দেখেও। দিনমান ধরে শুধু দেখে।

আজ ভোরেও যখন গাছগাছালির ফাঁকফোকর দিয়ে সূর্যের আলো তেরছা হয়ে এসে পড়ছে উঠানে, তখন আরশি এসে দাঁড়াল দরজায়। প্রবল আলস্য নিয়ে দুটো মুরগি বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে উঠানে। খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে এটা-সেটা। একটা দোয়েল এসে রান্নাঘরের বেড়ার পাটখড়ির ওপর সামান্য সময়ের জন্য বসল। তারপর আবার ফুড়ুত করে উড়ে গেল। আরশি তার বড় বড় চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে। বাড়ির পেছনে বড় চালতা গাছ। সে গুটিগুটি পায়ে হেঁটে সেই চালতা গাছের তলায় যায়। ধবধবে সাদা ফুল ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। সে ঘুরে ঘুরে ফুল কুড়ায়। মাঝে মাঝে অবাক চোখ মেলে মাথা তুলে চালতা গাছের দিকে তাকায়। আকাশের দিকে তাকায়। ঘাসফড়িংয়ের দিকে

Boighar.com & ARS

তাকায়। তার চোখজুড়ে রাজ্যের বিস্ময়। এই বিস্ময়ের ঘোর যেন কিছুতেই কাটতে চায় না। বরং যত দেখে ততই বাড়ে। তার অবশ্য এখন বিস্মিত হওয়ারই বয়স। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই বিস্ময়ের ঘোর ক্রমশই কাটতে থাকে। মানুষ যত বড় হতে থাকে তার বিস্মিত হওয়ার ক্ষমতাও তত নষ্ট হতে থাকে।

উঠানের পাশের খোলা রান্নাঘরে আম্বরি বেগম রান্না করছিলেন। আরশি এসে তার গা ঘেঁষে দাঁড়াল। আম্বরি বেগম তখন চুলোয় শুকনো পাতা আর খড়িকাঠ গুঁজে দিচ্ছিলেন। গনগনে আগুনে ভাত ফুটছে। এমনিতে সকালবেলা পান্তা পানিতেই কেটে যায়। কিন্তু মজিবর মিয়া বাড়ি নেই প্রায় দিন পনের হলো। সে তার ট্রলারের বান্ধা কাজের ছেলে মনাইকে সঙ্গে নিয়ে খ্যাপে গেছে মোঘলগঞ্জ। বড় খ্যাপ। যযাতিপুর গাঁয়ে হাট বসবে। আতাহার তালুকদার দীর্ঘদিন পর গাঁয়ে ফিরেছেন। তার স্ত্রী নেই। বছর পাঁচেক হয় মারা গেছেন। দুই ছেলে আর এক মেয়ে। মেয়ের বিয়ে হয়েছে, সে স্বামীর সঙ্গে দেশের বাইরে থাকে। ছোট ছেলে ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। সে গাঁয়ে এসেছে তার বড় ছেলে আফজাল, ছেলের বউ রুবিনা আর নাতনি রুপাইকে নিয়ে। তারা উঠেছেন আতাহার তালুকদারের সেই তিনতলা পুরনো ভবনে। যেখানে বন্যার সময় আশ্রয় নিয়েছিল গাঁয়ের মানুষ। সঙ্গে কাজকর্মের লোকজন। আতাহার তালুকদার এসেই প্রথম যেটা বলেছেন, সেটা হলো যযাতিপুরের রাস্তার মাথায় নদীর ধারে যে চাতালের মতোন জায়গা রয়েছে সেখানে হাট বসবে। পায়ে হেঁটে অত দূরের রামপাড়া, মালোপাড়া, কিংবা আলীপুরে যাওয়ার কষ্টের চেয়ে এখানে হাট হলে গাঁয়ের মানুষের সুবিধা। দু'চারখানা দোকানপাট দিয়ে হাটের শুরু। সেই দোকানপাট আর হাটের জিনিসপত্র মোঘলগঞ্জ থেকে আনার কাজ পেয়েছে মজিবর মিয়া। মজিবর মিয়ার আজ ফেরার কথা।

আম্বরি বেগম আরশির শরীরে হাত দিয়ে চমকে উঠলেন, আরশির গাভর্তি জ্বর। এত জ্বর নিয়ে মেয়েটা চুপচাপ গুটিগুটি পায়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে! তিনি আরশিকে কোলে টেনে নিলেন। তারপর ফিসফিস করে বললেন, 'খালি পায় হাঁটো ক্যান বু? তোমার বাবায় না তোমার জন্য লাল টুকটুক স্যান্ডেল আনছে?'

আরশি কথা বলল না। মাথা এলিয়ে দিল আম্বরি বেগমের ঘাড়ে। আম্বরি বেগম কী করবেন বুঝে উঠতে পারছেন না। জ্বর উঠলে আগে তারা নিজেরাই নানান দাওয়াই দিতেন। রোগীকে ভাত খেতে দিতেন না, পানি খেতে দিতেন না, গোসল করতে দিতেন না। আরও কত কী? কিন্তু শুকরঞ্জন ডাক্তার বলে পুরাই উল্টা কথা। এই জন্যই নিজ থেকে কিছু করতে গেলে আজকাল তিনি খুব ভয়ে থাকেন। কী করতে কী করে ফেলেন। পরে যদি আবার কোনো ক্ষতি-টতি হয়ে যায়! তবে আম্বরি বেগম একটা কাপড় ভিজিয়ে আরশির গা মুছে দিলেন। ভাত না দিলেও খানিক গুড় আর মুড়ি খেতে দিলেন আরশিকে। কিন্তু আরশি

যতটুক মুখে দিল, ফেলে দিল তার শতগুণ বেশি। দুপুর নাগাদ তার জ্বর বেড়ে আগুন হয়ে গেল। আম্বরি বেগমের দিশেহারা লাগতে লাগল। তিনি পাশের বাড়ির শেফালিকে ডেকে আনলেন। শেফালি গায়ে হাত দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'ও চাচী, অরে তো ডাক্তারের কাছে নেওন লাগব!

আম্বরি বেগম নিস্প্রভ গলায় বললেন, 'এখন ডাক্তার কই পাইমু। শুকরঞ্জন ডাক্তারের বাড়ি হেই মালোপাড়া। কত দূর! অত দূর এহন কারে পাঠামু?'

শেফালি বলল, 'পাঠাইলেও লাভ হইত না। শুকরঞ্জন ডাক্তার এহন গাঁয়ে নাই। সে ঢাকার শহর গেছে।'

আম্বরি বেগম করুণ গলায় বলল, 'ও শেফালি, এখন তাইলে উপায় কী?'

শেফালী বলল, 'মজিবরের না আইজ আসনের কথা, সে কখন আসব?'

আম্বরি বেগম বললেন, 'তার তো দুপুরের মইধ্যে আসনের কথা। কিন্তু দুপুর তো গড়াইয়া গেল!'

দুপুর গড়িয়ে গেলেও মজিবর মিয়ার কোনো খবর নেই। আরশির অবস্থা দেখে আম্বরি বেগম নিজেই অসুস্থ বোধ করতে লাগলেন। পরপর কয়েকবারই এমন হল যে তিনি ছুটে ঘরের বাইরে গেলেন। প্রতিবারই তার মনে হলো, মজিবর মিয়া যেন ফিরে এসেছে। যেন উঠানে দাঁড়িয়ে তাকে মা মা বলে ডাকছে। কিন্তু মজিবর মিয়া আসেনি। বিকেলের দিকে শেফালি গিয়ে এছাহাকের মাকে ডেকে আনল। এছাহাকের মা অশীতিপর বৃদ্ধা। কিন্তু চলনে-বলনে এখনও টনটনে শক্ত। গাঁয়ের সব বাড়ির বিপদে-আপদে তিনি হাজির। নিলুফা বানুর মৃত্যুর সময়েও ছিলেন। সেই বানের সময় মজিবর যখন গাই নিয়ে স্টিমারঘাটা গেল, তখনও আতাহার তালুকদারের বাড়িতে আম্বরি বেগমের সঙ্গে তিনি ছিলেন। কোনো এক অদ্ভুত কারণে তিনি পাশে থাকলে বিপদাপন্ন মানুষগুলো খানিক সাহস পায়। তার নাম আসলে কেউ জানে না। তার একমাত্র ছেলে এছাহাক। সেই থেকে তিনি এছাহাকের মা নামেই পরিচিত। এছাহাকের মা এসে বললেন, 'মসজিদের ইমাম সাবরে কাউরে দিয়া ডাইকা আনাও।'

শেফালি বলল, 'ইমাম সাবরে ক্যান? সে কী করব? সে কি ঝাড়-ফুঁক দিয়া জ্বর নামাইব?'

এছাহাকের মা বললেন, 'সে কী করব, সেইটা সেই জানে! তারে ডাইকা আনাও।'

ইমাম সাহেব আসলেন মাগরিবের নামাজেরও অনেক পর। তার এত দেরি হওয়ার কথা না। খবর শোনার সঙ্গে সঙ্গে তার ছুটে আসার কথা। মজিবর মিয়ার কাছে সে নানা কারণে কৃতজ্ঞ। তার বেতনের একটা বড় অংশের টাকা তাকে মজিবর মিয়া দেয়। এবং সে প্রত্যেক মাসের এক তারিখে সেই টাকা হাতে পায়। এই গাঁয়ে তার এত বড় উপকার আর কেউ করেনি। সে খবর পেয়েছে আসরের নামাজের পরপর। কিন্তু তখন আতাহার তালুকদারের নতুন

Boighar.com & ARS

হাট শুরুর মিলাদ ও দোয়া শুরু হবে। মিলাদ শেষে নদীর পারে মাগরিবের নামাজ হবে জামাতে। গাঁয়ের বেশিরভাগ লোকই সেখানে হাজির হয়েছে। সেই জামায়াতে ইমামতি করার দায়িত্ব তার। তিনি মিলাদ শেষ করলেন। মাগরিবের নামাজ পড়ালেন। তারপর দীর্ঘ মোনাজাত শেষ করে বের হলেন। ইমাম সাহেব ছাত্রজীবনে এক ফার্মেসিতে কিছুদিন কাজ করেছিলেন। ফলে ওষুধপত্র সম্পর্কে তার একআধটুক ধারণা রয়েছে। তিনি যতদিন এ গ্রামে এসেছেন, ততদিনে টুকটাক সেসব বিদ্যে কাজে লাগানোর চেষ্টাও করেছেন। কিন্তু এ গাঁয়ে ওষুধপত্র বড় দুর্লভ বলে পরামর্শে খুব একটা কাজ হয় না। এছাহাকের মা ঘটনাটা জানেন বলেই হয়তো তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। তিনি ঘরে ঢুকে আরশির পাশে বসলেন। আরশির শরীর জুড়ে তখন প্রবল জ্বর। তিনি আরশির কপালে হাত রেখে চমকে গেলেন। এইটুক বাচ্চার শরীরে এতটা জ্বর থাকতে পারে এটা তার ধারণায়ও ছিল না! ইমাম সাহেব চিন্তিত মুখে আরশির চোখ দেখলেন। জবা ফুলের মতোন টকটকে লাল চোখ। ইমাম সাহেব কী করবেন ভেবে পেলেন না। তিনি আম্বরি বেগমকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কিছু খাইতে দিছেন ওরে?'

আম্বরি বেগম বললেন, 'ভাত দেই নাই। গুড়-মুড়ি দিছিলাম। সামান্য খাইছে। আর সব ফালাই দিছে।'

ইমাম সাহেব বললেন, 'বমিটমি কিছু করছে?'

তিনি কথা শেষ করতে পারলেন না। আরশি আম্বরি বেগমের কোল ভাসিয়ে বমি করল। সামান্য যতটুকু খাবার আর পানি ছিল পেটে তা সেই বমির সঙ্গে বেরিয়ে এলো। বার দুই খিঁচুনিও হলো। তারপর হঠাৎ বিছানায় নেতিয়ে পড়ল আরশি। আম্বরি বেগম গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে কেঁদে উঠলেন, 'ও আল্লাহ, ও আল্লাহ, আল্লাহ গো। ও বু, ও আমার কইলজার টুকরা বু। আমার সোনা মানিক। বু গো, ও বু...'।

এছাহাকের মা আর শেফালি শক্ত হাতে আম্বরি বেগমকে ধরে রাখলেন। ইমাম সাহেব আরশির বুকে হাত রাখলেন। খুব ধীরে হৃদস্পন্দন হচ্ছে। এশার আজানের সময় হয়ে গেছে। ইমাম সাহেব এখন আর অতদূর হেঁটে মসজিদে গেলেন না। তিনি উঠানেই জায়নামাজ পেতে নামাজ আদায় করলেন। নামাজ শেষে আল্লাহর কাছে দীর্ঘ মোনাজাত করলেন। তারপর জায়নামাজ থেকে উঠে দাঁড়িয়ে এছাহাকের মাকে ডেকে বললেন, 'মুরব্বি, হায়াত-মউতের মালিক আল্লাহপাক, তবে তিনি দুনিয়াতে নানান উসিলা পাঠান। আমি জানি না আমি যেই উসিলার জন্য এখন যাইতেছি, তাতে কাজ হবে কিনা। তবে আমারে একটা চেষ্টা করতে দেন। আপনেরা থাকেন এইখানে। কোথাও যাইয়েন না।'

ইমাম সাহেব অন্ধকারে হারিয়ে গেলেন। ঘরের ভেতর কেরোসিনের কুপির অদ্ভুত আলো। সেই আলোয় তিনজন মানুষ চুপচাপ বসে আছেন। পৃথিবীর অসহায়তম তিনজন মানুষ। তীব্র আতঙ্কে দীর্ঘতম প্রতীক্ষায় কাটছে প্রতিটি

মুহূর্ত। তাদের কারো মুখে কোনো ভাষা নেই, শব্দ নেই। ছয়জোড়া ভয়ার্ত চোখ তাকিয়ে আছে মাতৃহারা ছোট্ট এক শিশুর দিকে। তারা জানে না, এই শিশুটির ভেতর তখন কী চলছে! তারা জানে না, কী বার্তা নিয়ে কাল সকালের আলো ফুটবে! আম্বরি বেগমের অবস্থা সবচেয়ে ভয়াবহ। তিনি কথা বলতে পারছেন না। বোবা চোখে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন আরশির দিকে। তার চোখের কোল বেয়ে জলের স্রোত নামছে। শরীরটা থেকে থেকে কেঁপে উঠছে।

ইমাম সাহেব ফিরলেন গভীর রাতে। দরজার পায়ের শব্দ পেয়েই আম্বরি বেগম পাগলের মতোন ছুটে এলেন। কিন্তু দরজার কাছে এসে তিনি থমকে দাঁড়ালেন। তার ধারণা ছিল ইমাম সাহেব অভাবনীয় কোনো সমাধান নিয়ে আসবেন। কিন্তু ইমাম সাহেব এসেছেন একা। শূন্য হাতে। আম্বরি বেগমের হঠাৎ মনে হলো এই অন্ধকার রাতে জগতের নিঃস্বতম মানুষটি হচ্ছেন তিনি। জগতের সবচেয়ে রিক্ত, নিঃসঙ্গ এবং অভিশপ্ত মানুষ। তীব্র আতঙ্ক আর কষ্টে তার বুকের ভেতরটা যেন দুমড়ে-মুচড়ে পিষে যাচ্ছিল। তিনি সর্বহারা মানুষের মতোন শূন্য দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইলেন। কিন্তু ইমাম সাহেবের পেছনের অন্ধকারের ভেতর থেকে দুটি ছায়ামূর্তিকে বেরিয়ে আসতে দেখে মুহূর্তের জন্য থমকে গেলেন আম্বরি বেগম। ছায়ামূর্তি দুটি কাছে আসতেই তিনি চমকে উঠলেন। শাড়ির ওপর চাদর জড়ানো এক নারী। তার সঙ্গে আতাহার তালুকদারের বাড়ির এক জওয়ান কামলা। এই কামলাকে আম্বরি বেগম চেনেন। গাট্টাগোট্টা শরীরের খাঁটো করে ছেলেটার নাম বাচ্চু। আতাহার তালুকদারের জমিজিরেত দেখাশোনা করে। বাচ্চুর এক হাতে তেল চকচকে লাঠি, আর অন্য হাতে হারিকেন। আম্বরি বেগম বিভ্রান্ত চোখে তাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

ইমাম সাহেব বললেন, 'চাচী আম্মা, উনি তালুকদার সাবের বড় পুত্র আফজাল সাবের স্ত্রী। উনার নাম রুবিনা। উনি পাস করা বড় ডাক্তার। আল্লাহপাকের অশেষ রহমত। উনি খবর শোনামাত্র ছুইটা আসছেন। এখন দেখা যাক কী হয়। বাকি আল্লাহ ভরসা।'

আম্বরি বেগম ইমাম সাহেবের কথা বুঝলেন কিনা বোঝা গেল না। তবে তিনি তীব্র চিৎকারে রুবিনার পায়ের কাছে আছড়ে পড়লেন। তারপর জড়ানো গলায় বলতে লাগলেন, 'মা রে, ওমা। আপনে আমার মা। আপনে আমার মা। আমার নাতনিডারে বাঁচান মা। আমার মা মরা এতিম মাইয়াডারে বাঁচানগো মা। মাগো। ও মা। ও মা।'

রুবিনা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সে বুঝে উঠতে পারছিল না কী করবে। ইমাম সাহেবও না। তাদের এই হতভম্ব দশা থেকে উদ্ধার করল শেফালি। সে আম্বরি বেগমকে টেনে সরিয়ে নিল। রুবিনা দ্রুতপায়ে ঘরের ভেতর ঢুকল। ইমাম সাহেব দাঁড়িয়ে আছেন উঠানে। বাচ্চু খানিক দূরে অন্ধকারে গিয়ে বিড়ি

Boighar.com & ARS

ধরিয়েছে। ইমাম সাহেব উঠানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে মনে মনে দোয়া-দরুদ পড়ছেন। বড় দুঃসাহস নিয়ে তিনি আজ তালুকদার বাড়ি গিয়েছিলেন। এত রাতে তালুকদার বাড়ির বউকে ঘরের বাইরে বের হতে বলা দুঃসাহসের ব্যাপার। তিনি সেই দুঃসাহসী কাজটাই করেছেন। নানা কারণে দেশের অবস্থা হঠাৎ অস্থির হয়ে উঠেছে। যার আঁচ লেগেছে প্রত্যন্ত গাঁওগ্রামেও। আতাহার তালুকদার এবার লম্বা সময়ের জন্য গাঁয়ে এসেছেন। তার গাঁয়ে আসার পেছনে অন্যতম প্রধান কারণও অবশ্য দেশের এই অবস্থা। তিনি নতুন কোনো পরিকল্পনা নিয়েই এসেছেন। তিনি জানেন আগের সেই রমরমা অবস্থা আর তালুকদারদের নেই। তাছাড়া আশপাশের অনেক অঞ্চলের মানুষই এখন তালুকদারদের কর্তৃত্ব অগ্রাহ্য করতে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। এ গাঁয়ের বাইরেও বিভিন্ন অঞ্চলে তালুকদারদের বহু জমিজমা রয়েছে। দূর-দূরান্তের সেসব জমিজমা নিয়েও হরহামেশা ঝামেলা লেগেই আছে। তালুকদারদের প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য শত্রুর সংখ্যাও দিনদিন বেড়েই চলেছে। সুতরাং এ অবস্থায় এত রাতে তালুকদার বাড়ির বউকে বাড়ির বাইরে আসতে বলার অনুরোধ দুঃসাহসেরই ব্যাপার। ইমাম সাহেব অতি সূক্ষ্ম আশা নিয়ে গিয়েছিলেন। আতাহার তালুকদারের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি হাউমাউ করে কান্না শুরু করে দিলেন। আতাহার তালুকদার হতভম্ব গলায় বললেন, 'কী হয়েছে ইমাম সাহেব? কাঁদছেন কেন?'

ইমাম সাহেব ঘটনা খুলে বললেন। আতাহার তালুকদার দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সময় দেখলেন। তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে বললেন, 'আমার নাতনি রূপাই ঠাণ্ডা-জ্বরে কাহিল হয়ে পড়েছে। ওঘরে ঘুমাচ্ছে। বড় বউমা বোধহয় তাকে ঘুম পাড়াচ্ছে। মেয়েটা গ্রামে আসার পর খুব যন্ত্রণা করছে। আপনি একটু বসেন ইমাম সাহেব। আমি দেখছি কী করা যায়?'

তার নাতনির নাম রূপাই। আরশির কাছাকাছি বয়স। রূপাই ঘুমিয়ে পড়েছিল। আতাহার তালুকদার এত রাতে রুবিনাকে বাইরে যাওয়ার অনুমতি দিতে ভেতর থেকে সায় পাচ্ছিলেন না। কিন্তু রুবিনা ঘটনা শুনে বলল, 'বাবা, আমি যাব। আপনি চিন্তা করবেন না। রূপাই ঘুমাচ্ছে। ও ঘুমাক। আমি মেয়েটাকে দেখেই চলে আসব।'

কিন্তু রুবিনা আরশিকে দেখেই চলে আসতে পারল না। তার থাকতে হলো সারারাত। ইমাম সাহেব উঠানে দাঁড়িয়ে দোয়া-দরুদ পড়ছিলেন। রুবিনা শুকনো মুখে বেরিয়ে এসে বলল, 'ইমাম সাহেব, আপনাকে বললে হয়তো বুঝবেন। মেয়েটার এক ধরনের মেনিনজাইটিস হয়েছে। ব্রেইনে ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন। ওর ঘাড় শক্ত হয়ে গেছে। শরীরেও খিঁচুনি হচ্ছে। আশপাশে ওষুধের দোকান বা ক্লিনিক থাকলে এটা খুব ভয়ের কিছু না। কিন্তু এই গাঁয়ের

অবস্থা বিবেচনায় এটি ভয়ঙ্কর খারাপ খবর। ওকে এখুনি ইনজেকশন দিতে হবে, এখুনি।'

ইমাম সাহেব ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন। এই রাতে তিনি ইনজেকশন কই পাবেন? কিন্তু এই কথা তিনি রুবিনাকে বললেন না। তিনি রুবিনার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আল্লাহ চাইলে সব সম্ভব, ব্যবস্থা একটা করে ফেলব ইনশাআল্লাহ।' এই বলে তিনি হাঁটা দিলেন। অন্ধকারে মিশে যাওয়া মানুষটার দিকে তাকিয়ে রুবিনা বিড়বিড় করে বলল, 'ইনজেকশন না পেলে মেয়েটাকে বাঁচানো যাবে না। বাঁচানো যাবে না।'

ইমাম সাহেব ফিরলেন ফজরের আজানের সময়। এই পুরো রাত শেফালি আর এছাহাকের মায়ের সঙ্গে রুবিনা বসে ছিল আরশির পাশে। আরশির দেহে প্রাণ আছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। সে মৃত শিশুর মতো বিছানায় পড়ে আছে। আম্বরি বেগমের অবস্থাও শোচনীয়। তিনি খানিক পরপর 'আমার বু, আমার বু' বলে চিৎকার দিয়ে জ্ঞান হারাচ্ছেন। আতাহার তালুকদার রুবিনাকে নিতে লোক পাঠালেন। কিন্তু রুবিনা গেল না। মাঝরাতে রুবিনার স্বামী আফজাল তালুকদার নিজে চলে এলো। রুবিনা তাও গেল না। সে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাকে ফেরত পাঠাল। ইমাম সাহেব যখন ইনজেকশন নিয়ে মজিবর মিয়ার বাড়ি ফিরলেন, রুবিনার তখন তন্দ্রার মতো লেগে এসেছিল। ইমাম সাহেব রুবিনাকে দেখে হকচকিয়ে গেলেন। তার ধারণাও ছিল না, রুবিনা সারারাত মজিবর মিয়ার ঘরে বসে থাকবে! রুবিনা ইমাম সাহেবকে দেখে বলল, 'কিছু ব্যবস্থা হয়েছে ইমাম সাহেব?'

ইমাম সাহেব বললেন, 'ব্যবস্থা হয়েছে মা জননী। তবে আমি কি বেশি দেরি করে ফালাইছি?'

www.boighar.com

ক্লান্ত রুবিনা মুহূর্তের জন্য চমকে গিয়ে ইমাম সাহেবের দিকে তাকাল। ইমাম সাহেব তাকে মা জননী বলে ডাকছে কেন! কিন্তু কোনো কথা বলল না সে। ইমাম সাহেবের হাত থেকে ইনজেকশনটা নিয়ে আবার ভেতরে চলে গেল। ইমাম আকরাম হোসেন সুবহে সাদিকের সেই অদ্ভুত রহস্যময় আলোয় উঠানের মাঝখানে নামাজে বসলেন। নামাজ শেষে দীর্ঘ মোনাজাতে তিনি আরশির সুস্থতার জন্য দোয়া করলেন। দোয়া করলেন রুবিনার জন্যও। মোনাজাতের শেষ অংশে তিনি কাতর কণ্ঠে বললেন, 'হে আল্লাহ, এই উত্তম কাজের জন্য তুমি তাকে প্রাপ্য প্রতিদান দিও, আমীন।'

আরশি সে যাত্রা টিকে গেল।

মজিবর মিয়া পরদিনও ফিরল না। তবে সে লোক মারফত খবর পাঠিয়েছে, আরও কিছু মালের অর্ডার পাওয়ায় তার ফিরতে দিন চারেক দেরি হবে। তার ওপর মোঘলগঞ্জে তার সঙ্গে বড় মামা মজিদ বেপারীর দেখা হয়েছে। কী কাজে যেন ফেরার পথে তাকে স্টিমারঘাটা মামা বাড়ি যেতে হবে।

Boighar.com & ARS

আম্বরি বেগম মনে মনে যারপরনাই বিরক্ত হলেন। কিন্তু কিছু বললেন না। আরশির অসুস্থতার বিষয়ে কোনো খবরও পাঠালেন না। তিন দিন বাদে সকালের রোদে তিনি মাদুর পেতে বসেছিলেন। তার কোলের ভেতর ক্লান্ত আরশি চুপচাপ শুয়ে ছিল। শুকনো মুখ, শীর্ণ শরীর। আম্বরি বেগম আরশিকে বললেন, 'ওক দিয়া সব ফালাই দিওনা বু। চাইরটা খাইয়া লও। নাইলে শইলে জোর পাইবা না।'

আরশি চুপচাপ শুয়েই থাকল। জবাব দিল না। খেলও না কিছু। রাস্তা থেকে বাড়ি ঢোকার সরু পথ ধরে কেউ বাড়ি ঢুকছিল। তাদের কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে, কিন্তু ঘরের আবডাল থাকায় দেখা যাচ্ছিল না কিছু। মানুষগুলো উঠানে আসতেই আম্বরি বেগমের চোখে-মুখে আনন্দময় বিস্ময় খেলে গেল। তালুকদার বাড়ির ডাক্তার বউ রুবিনা এসেছে! তার সঙ্গে ফুটফুটে পরীর মতোন এক মেয়ে। আম্বরি বেগম কী করবেন ভেবে পেলেন না। তিনি আরশিকে কোল থেকে নামিয়ে উঠতে যাচ্ছিলেন। রুবিনা দূর থেকেই বলল, 'উঠতে হবে না। আপনি বসেন।'

ফুটফুটে পরীর মতো মেয়েটা রূপাই। রুবিনার মেয়ে। আরশির চেয়ে বছরখানেকের বড়। সে গুটিগুটি পায়ে হেঁটে এসে আরশির পাশে বসল। তারপর যেন কতদিনের চেনা, এমন গলায় বলল, 'তোমার নাম আরশি? মা বলেছে!'

আরশি জবাব দিল না। কিন্তু কৌতূহলী চোখ তুলে তাকাল। রূপাই বলল, 'জানো, আমাদের না নতুন একটা বাবু হয়েছে। উম, না, না। একটা না, তিনটা।' সে আঙুলের কড় গুনে দেখাল। তারপর আবার বলল, 'তুমি এভাবে শুয়ে আছো কেন? চল, তোমাকে নতুন বাবুগুলো দেখাই।'

রুবিনা এতক্ষণ দাঁড়িয়েই ছিল। সে এবার মাদুরের একপাশে বসতে বসতে খানিক কঠিন গলায় বলল, 'একদম না রূপাই। দেখছো না, ও কত রোগা হয়েছে। জ্বর থেকে উঠল যে কেবল। ওর এখন বিশ্রাম দরকার।'

রূপাই মায়ের কথায় মুখ ভার করে চুপ করে রইল। রুবিনা আম্বরি বেগমকে বলল, 'আমার এই মেয়ের কথা আর বলবেন না। অতবড় বাড়িতে সে একা। তার বয়সী তো আর কেউ নেই। সারাদিন যন্ত্রণা দিতে দিতে আমার মাথা খারাপ করে ফেলে। কোথাকার কোন বেড়াল এসে বাড়িতে তিনটা বাচ্চা দিয়েছে, সেই নিয়ে রাত-দিন হুল্লোড়'।

আম্বরি বেগম রূপাইর মাথায় হাত রাখতে রাখতে বললেন, ' ছোট মানুষ, যাই দেখে, আনন্দ।'

রুবিনা বলল, 'এটা অবশ্য ঠিক বলেছেন। ছোটরা সবকিছুতেই আনন্দ পায়। আর বড়দের ক্ষেত্রে ঘটনা ঘটে উল্টো। তারা সবকিছুতে পায় কষ্ট। বড়দের জগৎ জুড়ে থাকে নানানরকম কষ্ট।'

আম্বরি বেগম অতিথিদের কী খেতে দেবেন, কী বলবেন, কীভাবে কৃতজ্ঞতা জানাবেন এই নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কিন্তু রুবিনা তাকে নিরস্ত করল। তারা কিছুক্ষণ থাকল। রুবিনা আরশির খোঁজখবর নিল। রূপাই নানাভাবে চেষ্টা করল আরশির সঙ্গে ভাব জমাতে। কিন্তু আরশি তেমন সাড়া দিল না। তারা যতক্ষণে গেল, ততক্ষণে সূর্য মাথার ওপরে চলে এসেছে। আরশি ক্লান্ত হয়ে আরেক দফা ঘুমিয়ে পড়েছে। আরশিকে ঘরে রেখে আম্বরি বেগম গেলেন রান্না বসাতে।

মজিবর মিয়া ফিরল সন্ধ্যাবেলা। আরশি তখনও ঘুমাচ্ছে। আম্বরি বেগম মজিবর মিয়ার সঙ্গে তেমন কথা বললেন না। ঘরের মেঝেতে মাদুর বিছিয়ে তাকে ভাত দিলেন। মজিবর মিয়া ভাত খেতে বসল না। সে বসে রইল ঘুমন্ত আরশির পাশে। দীর্ঘসময় বসে রইল। মেয়েটা বেঘোরে ঘুমাচ্ছে। তবে ঘুমের ভেতর মাঝে মাঝে তার ঠোঁট কাঁপছে। চোখের পাতা কাঁপছে। বড় বড় নিঃশ্বাসের সঙ্গে তার বুক ওঠানামা করছে। মজিবর মিয়া এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। একবারের জন্যও চোখের পাতা ফেলল না পর্যন্ত। কতক্ষণ এমন বসে ছিল সে জানে না। তবে সে আবিষ্কার করল তার গাল বেয়ে খুব ধীরে কিছু একটা নেমে আসছে। মজিবর মিয়া হাতের উল্টোপিঠে গাল মুছতে গিয়েও মুছল না। জলের ফোঁটাটা দীর্ঘসময় নিয়ে গড়িয়ে চিবুকের কাছে এসে খানিক থামল। জমল। তারপর বড় হলো। তারপর টুপ করে ঝরে পড়ল ঘুমন্ত আরশির গালে। মজিবর মিয়া ঘুমন্ত কন্যার গালের ওপর জ্বলজ্বল করতে থাকা পিতার চোখের অশ্রুফোঁটা মুছল না। তাকিয়ে রইল।

পরের দুটো বছর চলে গেল অতি দ্রুত। যযাতিপুরে হাট বসল। হাট জমেও উঠল। জমে না ওঠার কারণও অবশ্য ছিল না। গাঁয়ের মূল রাস্তার মাথায় ওই চাতালে ছোটখাটো বাজার বসছিল বেশ ক'বছর ধরেই। পাশেই যযাতিপুর নদী। ওই গোল চাতালের মতোন জায়গাটুকুতেই গৃহস্থরা তাদের ক্ষেতের বেগুন, শিম, লাউ, মুলা নিয়ে বসে যেত। জেলেরা নদী থেকে মাছ নিয়ে বসে যেত। বেচাবিক্রি যে খুব হতো, তা না। তবুও পায়ে হেঁটে অত দূরের রামপাড়া, মালোপাড়া, কিংবা আলীপুরে যাওয়ার কষ্টের চেয়ে এই বেশ। বাজার একটু একটু জমে উঠছিল। বন্যা-বাদলা না হলে যযাতিপুর জায়গা হিসেবে লোভনীয়। একটু নিচু বিল এলাকা এই যা সমস্যা। বৃষ্টি হলেই জলের আধার হয়ে যায়। তা নাহলে নদী পার হয়ে মাইল সাতেক দক্ষিণে যেতে পারলেই মূল পাকা সড়কে পৌঁছে যাওয়া যেত। জায়গার নাম রাঙ্গারোড। রাঙ্গারোডে রোজ রোজ বড় গাড়ি-ঘোড়া না চললেও রিকশা-ভ্যান হরহামেশাই চলে। মাঝে মধ্যে বড় দুয়েকখানা বাস, টেম্পোও দেখা যায়। তবে তা কালেভদ্রে। যযাতিপুরের

Boighar.com & ARS

মানুষের সমস্যা হচ্ছে ওই রাঙ্গারোড অবধি যাওয়া। বর্ষায় নদী হু হু করে বেড়ে যায়। তারপর নদী পেরুলেও বাকি পথ ভারি অগম্য। ভালো রাস্তা নেই বলে জমি-জিরাতের মাঝখান দিয়ে প্যাঁচপেঁচে কাদা-জলের দুর্গম পথ। শুকনো মৌসুমেও যে খুব সুবিধা তা নয়। রাস্তা নেই বলে অতদূর পায়ে হাঁটা পথ এড়িয়ে মানুষজন নৌকা ট্রলারের দূরের পথই ধরে।

নদীর ওধারে রাঙ্গারোড অবধি উঁচু একখানা পাকা সড়ক হলে অবশ্য বেশ হতো। বাজারটাও জমে উঠত। দোকানপাট উঠত। ব্যবসা-বাণিজ্য হতো। ধুমধাম করে যযাতিপুরের চেহারাটাই পাল্টে যেত। কিন্তু যযাতিপুরের জন্য সেটা কে করবে? শেষপর্যন্ত এই হাটের মাধ্যমে সেই শুরুটা তো হলো! হাটের সিদ্ধান্ত আতাহার তালুকদারের। তিনি বিচক্ষণ দূরদর্শী মানুষ। পূর্বপুরুষের সেই দোর্দণ্ড প্রতাপ আর নেই। কিন্তু সামনে আবার সুযোগ বোধহয় আসি আসি করছে। দেশের রাজনৈতিক অবস্থার পটপরিবর্তন হতে যাচ্ছে, এটা আতাহার তালুকদার দিব্যি টের পাচ্ছেন। তাই ছেলেকে নিয়ে এলাকায় একটা শক্ত অবস্থান পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা। সময় পাল্টেছে। আগে গাঁওগ্রামে যুগ যুগ ধরে মানুষ কোনো একটা পরিবারের কর্তৃত্ব, আনুগত্য মেনে নিত। কিন্তু এখন সময় পাল্টেছে। যযাতিপুর এবং এর আশপাশের অনেক গাঁয়েও এখন নতুন নতুন মানুষ মাথা গজাচ্ছে। এই সঙ্কেত আতাহার তালুকদার পেয়েছেন। কিন্তু তিনি জানেন, সময় থাকতে সিদ্ধান্ত এবং ব্যবস্থা নেওয়া কত কাজের। তার এই ব্যবস্থার একটি হচ্ছে যযাতিপুরে হাট বসানো। তিনি তার বড় পুত্র আফজাল তালুকদারকে দিয়ে এই যযাতিপুরের আশপাশের পুরো এলাকাজুড়ে তালুকদারদের সেই আগের দিন ফিরিয়ে আনার ছক কষছেন।

রুবিনা এই দুই বছরে বেশিরভাগ সময় শহরেই থেকেছে। মাঝে মাঝে রূপাইকে নিয়ে এসেছে। কিছুদিন থেকে আবার চলে গেছে। দুই বছরে যযাতিপুরের চেহারাও পাল্টাতে শুরু করেছে। সকাল হলেই লোকজন হাটে গিয়ে বসে। দোকনে চা-বিড়ি খায়। বাড়ির আনাজপাতি বেচাবিক্রি করে। বিকেলের অবসরে হাটজুড়ে মানুষের আড্ডা গল্পের আসর বসে। নদীর ঘাটে ট্রলারের সংখ্যা বেড়েছে। মোঘলগঞ্জ ছাড়াও নদীপথে সহজে যাওয়া যায় এমন ছোট-বড় হাট বাজারের সঙ্গে যোগাযোগ, ব্যবসা বাড়ছে। যযাতিপুরে যেন একটা পরিবর্তনের ঢেউ লেগেছে। হাটে দোকানের সংখ্যাও বেড়েছে। হাটের জমির মালিক আতাহার তালুকদার হলেও তিনি বেশিরভাগ জমিই নামমাত্র মূল্যে স্ট্যাম্পে সই করে দোকান তোলার জন্য ভাড়া দিচ্ছেন। যাতে করে যাদের নিজেদের খরচে দোকান তোলার সামর্থ্য আছে, তারা যেন দোকান তুলতে পারে। যাদের সামর্থ্য আছে, তারা কিনে নিচ্ছে। এই সুযোগে মজিবর মিয়াও প্লট কিনে দোকান তুলে ফেলল। বড় দোকান। সে বুঝতে পারছিল,

নদীতে ট্রলারের সংখ্যা বাড়ছে। সুতরাং প্রতিযোগিতাও বাড়বে। আগের সেই একচ্ছত্র সুযোগ আর নেই। www.boighar.com

মজিবর মিয়া কৃষিপণ্যের আড়ত দিয়ে দিল। গাঁয়ের কৃষকরা চাল, ডাল, পাট তার কাছে বিক্রি করে। সে সপ্তাহ কিংবা মাস শেষে সেগুলো তার নিজের ট্রলারে করে নিয়ে গিয়ে মোঘলগঞ্জে বিক্রি করে আসে। মনাই তার সঙ্গেই আছে। সেই কবে ট্রলারের সঙ্গে নিয়ে এসেছিল, এখনও সঙ্গেই লেগে আছে। মনাই পাশে থাকায় সবকিছুই খানিক সহজ হয়ে এসেছে মজিবর মিয়ার জন্য। মজিবর মিয়া তার আড়তের সামনে বিশাল সাইনবোর্ডও ঝুলিয়েছে। সাইনবোর্ডে বড় বড় করে লেখা 'আরশি চাল ডাল পাটের আড়ত। এখানে খুচরা ও পাইকারি দরে মালামাল ক্রয়-বিক্রয় করা হয়।'

গাঁয়ের অনেকেরই ধারণা মজিবর মিয়া জাদু-টাদু কিছু একটা জানে! সে যা-ই করে, তাতেই তার তরতর করে উন্নতি হয়। এ যেন পরশপাথর। স্পর্শ করলেই সোনা। তার আশপাশে যে শত্রুর অভাব রয়েছে তা কিন্তু না। তার উন্নতির প্রতি ধাপেই শত্রু বাড়ছে। শুধু সেই লতু হাওলাদার একাই না। শত্রু বাড়ছে আশপাশে সব জায়গাতেই। মানুষের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা সে অন্যের ভালো দেখতে পারে না। মজিবর মিয়ার এমন তরতর করে বেড়ে ওঠায় অনেকেরই চোখ টাটায়। তবে মজিবর মিয়া জানে চোখ-কানটা খোলা রাখতে হবে। তা সে রাখেও।

তবে একজন মনে মনে শঙ্কিত হন, এমন তরতর করে বেড়ে ওঠা অশুভ লক্ষণ। জীবনে বাধা-বিপত্তি থাকতে হয়। ব্যর্থতা থাকতে হয়। ব্যর্থতা ছাড়া যে সফলতা আসে, সেই সফলতা ভঙ্গুর। যেকোনো সময় তা ঝরঝর করে ভেঙে পড়তে পারে। সেই একজনের নাম আম্বরি বেগম। সন্তানের উন্নতিতে সব মা-ই আনন্দে আত্মহারা হন। কিন্তু আম্বরি বেগম ক্রমশই শঙ্কিত হয়ে উঠছেন। আরশি হওয়ার বছর থেকেই মজিবর মিয়াকে তার হঠাৎ হঠাৎ কেমন অচেনা মানুষ মনে হয়। বিশেষ করে গাভীন গাই দুটো বেঁচে ট্রলার নিয়ে স্টিমারঘাটা থেকে ফেরার পর থেকে। তিনি কিছু বলতেন না, কিন্তু মজিবর মিয়া কোথাও খুব দ্রুত বদলে যাচ্ছে, এটা তিনি টের পেতেন। আজকাল সেই পরিবর্তনটা আরও প্রকট হয়েছে। তিনি প্রায়ই মজিবর মিয়াকে চিনতে পারেন না। মজিবর মিয়া ছুটছে এক অদ্ভুত নেশার পেছনে।

সেই নেশার নাম অর্থ। সেই নেশার নাম ক্ষমতা।

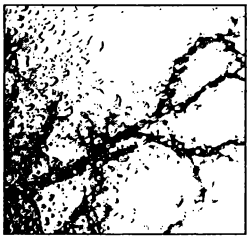

লতু হাওলাদার পরশ্রীকাতর মানুষ।

মজিবর মিয়ার সঙ্গে সেই বাদানুবাদের পর থেকে সে নানান উপায় খুঁজেছে, কিন্তু কোনোটাতেই ঘায়েল করার জুতসই কোনো উপায় খুঁজে পায়নি। তবে লতু হাওলাদার একটা বিষয়ে নিশ্চিত, মজিবর মিয়ার সেই ট্রলার কেনার ঘটনায় তার বড় মামা মজিদ বেপারীর কোনো বিষয় ছিল। বিষয় ছিল উচ্ছন্নে যাওয়া মামাতো বোন লাইলিকে নিয়েই। কিন্তু এরপর বছরখানেক কেটে গেলেও সেই বিষয়ে সে আর কিছু আবিষ্কার করতে পারেনি। তার ধারণা ছিল লাইলিকে বিয়ে করার শর্তেই মজিবর মিয়াকে ট্রলার কিনে দিয়েছিল মজিদ বেপারি। এই নিয়ে বাতাসে ভেসে আসা কিছু কানকথাও সে শুনেছে। কিন্তু এরপর বছর ঘুরে এলেও এই নিয়ে আর কোনো তথ্য বা খবর সে পায়নি। তবে নিলুফা বানুর মৃত্যু সংক্রান্ত ব্যাপারে সে মজিবর মিয়াকে যা বলেছিল তা ছিল মূলত তাকে উসকে দেওয়ার চেষ্টা। তার ধারণা ছিল এই নিয়ে মজিবর মিয়া হৈ-হট্টগোল করবে। তখন সে নিলুফা বানুর মৃত্যুর বিষয়টি সামনে নিয়ে এসে কোনো কূটচাল চালবে। কিন্তু মজিবর মিয়া এই নিয়ে আর কিছুই করেনি। বরং একদম চুপচাপ হয়ে গিয়েছিল। এরপরও তার সঙ্গে মজিবর মিয়ার অনেকবার দেখা হয়েছে, কথা হয়েছে, কিন্তু মজিবর মিয়া যেন আগের কথা ভুলেই গেছে। সে এমনভাবে কথা বলেছে যেন তার সঙ্গে কখনও কিছু হয়নি। সে আগের মতোই বিনয় দেখিয়েই কথা বলেছে।

মজিবর মিয়া যখন ক্রমশই ফুলে-ফেঁপে উঠছে পয়সায়, সম্মানে, খানিকটা প্রভাবেও, তখন লতু হাওলাদারের ঘোর দুঃসময়। আতাহার তালুকদার তখন গাঁয়ে এসে কেবল হাট দিয়েছে এবং সেই হাট ধীরে ধীরে জমেও উঠছে। লতু হাওলাদার তখন পড়ল আরও বড় বিপাকে। নগদ পয়সা যাদের হাতে আছে তারা দিন দিন ডিঙিয়ে যেতে লাগল গাঁয়ের ভূস্বামী এবং এতদিনকার প্রভাবশালী সম্পন্ন গৃহস্থদের। এই নিয়ে দিন-রাত নিজের ভেতর ভেতর পুড়ে যাচ্ছিল লতু হাওলাদার। এক গভীর রাতে সে ঘুম থেকে উঠল। কিছুতেই ঘুমাতে পারছিল না সে। সারা শরীর জুড়ে অস্বস্তি। মন জুড়ে অস্থিরতা। দীর্ঘ

সময় ধরে খোলা উঠানে হেঁটে বেড়াল। তারপর শেষ রাতের দিকে বড় ছেলে মোস্তফাকে ডেকে ওঠাল। মোস্তফা ঘুম ভাঙা বিরক্ত মুখে উঠে এলো। লতু হাওলাদার আচমকা বলল, 'তোরে আমি বিদাশ পাঠামু।'

এত রাতে কাঁচা ঘুম ভেঙে ওঠা মোস্তফার ঘটনা বুঝতে সময় লাগল, সে বলল, 'কই পাঠাইবেন?'

লতু হাওলাদার বলল, 'বিদাশ পাঠামু।'

মোস্তফা চোখ কচলে খানিক তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, 'কোন দ্যাশে পাঠাইবেন?'

লতু হাওলাদার বলল, 'কুয়েত। কুয়েতি দিনারের বহুত দাম বাংলাদেশে। আমি তোরে কুয়েত পাঠামু।'

মোস্তফা বলল, 'কুয়েত পাঠাইতে অনেক টাকা লাগে। এত টাকা আপনে কই পাইবেন?'

লতু হাওলাদার বলল, 'সেইটা আমি বুঝব। কিন্তু কথা এইটাই। তুই খোঁজ খবর লাগা।'

মোস্তফা অবশ্য খোঁজখবর লাগাল না। তার এসব ভালো লাগে না। সে বিয়ে করেছিল, কিন্তু সারাদিন বসে থাকে, কাজকর্ম কিছু করে না দেখে বউ চলে গেছে। তার অভ্যাস তবু পাল্টায়নি। সে বসেই রইল। কিন্তু লতু হাওলাদার বসে রইল না। সে জমি বিক্রির চেষ্টায় লেগে গেল। অবশ্য এত টাকার জমি কেনার লোক পাওয়া সহজ কথা না। আড়ালে-আবডালে আতাহার তালুকদারের সঙ্গে সে তার নিজের একধরনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা খুঁজে পেতে চেষ্টা করে। এটা একধরনের মানসিক শান্তিও হতে পারে। তবে সে নিজের সামাজিক অবস্থান নিয়ে যারপরনাই উদ্বিগ্ন। যদিও সে জানে, এই গাঁয়ে তার জমি কেনার মতো সামর্থ্য একজনেরই আছে, সেই একজন হলো আতাহার তালুকদার। কিন্তু সে আতাহার তালুকদারের কাছে যেতে চায় না। তবে কোনো উপায় না পেয়ে অনেক ভেবেচিন্তে সে শেষ পর্যন্ত আতাহার তালুকদারের কাছেই গেল। আতাহার তালুকদার দীর্ঘ সময় নিয়ে তার কথা শুনলেন। তারপর ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'দেখো লতু মিয়া, ওইসব দেশে এখন ছেলে পাঠানো বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। নানান ঝামেলা চলছে। শুনেছি কিছুদিন আগে যুদ্ধ-টুদ্ধও হয়েছে। এই মুহূর্তে ছেলে পাঠানো কি ঠিক হবে?'

লতু হাওলাদার বলল, 'কিন্তু লোকজন তো যাইতেছে।'

আতাহার তালুকদার বললেন, 'লোকজন যেখানে যাবে, তুমিও সেইখানে যাবা?'

লতু হাওলাদার বলল, 'দরকার হইলে যাব।'

আতাহার তালুকদার বললেন, 'মানুষ টাকা-পয়সার জন্য অনেক মন্দ জায়গায়ও যায়, আজেবাজে কাজ করে। তুমিও করবা? কিছু মানুষ তো থাকেই

Boighar.com & ARS

যারা টাকা-পয়সার জন্য জাহান্নামে যেতে হলে সেইখানেও যাবে। টাকা-পয়সার প্রতি এত লোভ ভালো না লতু মিয়া। তোমার তো কোনোকিছুর অভাব নাই লতু মিয়া। না খেয়ে তো মরতেছো না। মরতেছ?'

লতু হাওলাদার কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তাকে থামিয়ে দিয়ে আতাহার তালুকদার ভারী গলায় বললেন, 'আমি জমিজমা কিনব না লতু। আমার অত টাকা নেই। অন্য কোনো বিষয় থাকলে বল। আর লোভটা একটু কমাও। এত লোভ ভালো না।'

এই কথার পর আর কথা চলে না। লতু হাওলাদার ভীষণ অপমানিত বোধ করল। সেই সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করল, যে করেই হোক মোস্তফাকে সে বিদেশ পাঠাবেই। তা সে পাঠালও। মজার ব্যাপার হচ্ছে, মোস্তফাকে বিদেশ পাঠাতে তাকে যে সাহায্য করল, তার নাম মজিবর মিয়া। যযাতিপুর হাটে তখন কেবল আড়ত তুলছে মজিবর মিয়া। দুপুরে কাঠমিস্ত্রিরা কাজ করছে। এমন সময়ে মনাই এসে বলল, 'ভাই, আপনারে লতু হাওলাদারের পোলা মোস্তফা ডাকে।'

মজিবর বলল, 'ডাকাডাকির কী আছে? মোস্তফারে বল এইখানেই চইলা আসতে।'

মনাই বলল, 'আমি বলছি, কিন্তু সে বলে কী না কী কথা, এই মিস্ত্রিদের সামনে বইসা বলতে পারব না।'

মজিবর মিয়া বিরক্ত মুখে গেল। সব শুনে সে বলল, 'এত টাকা তো আমার নাইরে মোস্তফা। তাছাড়া যেই অল্প কয়টা টাকা জমাইছিলাম, তা এই আড়ত তুলতে গিয়াই প্রায় শেষ।'

মোস্তফা বলল, 'তোর তো আর সব টাকার ব্যবস্থা করতে হইব তা না। আব্বায় আরও কাস্টমার দেখছে, তোর কাছে আসতে শরম পাইতেছে। তোরে নাকি একদিন কী না কী বলছিল। বুঝসই তো, এতগুলা টাকা একজনে দেওনের মতোন অবস্থা যযাতিপুরে কার আছে?'

মজিবর মিয়া বলল, 'হ, সেইটা ঠিক কথা। তো তোর পরিকল্পনাটা কী?'

মোস্তফা বলল, 'আব্বা চাইর-পাঁচজন কাস্টমার জোগাইছে। এখন তুই যদি বিঘা চারেক জমি কিনস, তাইলেই হইয়া যায়। জমি ভালো। এই হাটের সঙ্গেই। সোনার জমি। কম দামেই পাবি।'

মজিবর মিয়া জমি কিনল। চার বিঘা জমিই কিনল। মোস্তফাও চলে গেল বিদেশে। মজিবর মিয়া জমি কেনায় লতু হাওলাদার যে খুব খুশি হলো তা না। বরং সে ভেতরে ভেতরে এটাকে তার আরও একটা পরাজয় হিসেবেই নিল। তার যে জমিতে একসময় মজিবর মিয়া কামলা খেটেছে, পেটে-ভাতে খেটেছে, সেই জমিতে মজিবর মিয়া যখন মনাইকে সঙ্গে নিয়ে ছাতা মাথায় ঘুরে বেড়ায় তখন লতু হাওলাদারের বুকের ভেতরটা দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে। সে মনে মনে তীব্র প্রতিহিংসায় জ্বলতে থাকে আর দিন গুনতে থাকে সময়ের। মোস্তফা

বিদেশ গিয়েছে, তার সময়ও এলো বলে। সে অপেক্ষা করতে জানে। নিজের সময়ের অপেক্ষা। সে অসময়ে কিছু করে না। লতু হাওলাদার অপেক্ষায় রইল।

এর মাসখানেক বাদে এক রাতে ভাত খেতে বসে আম্বরি বেগমকে অতিগুরুত্বপূর্ণ কথাটা বলল মজিবর মিয়া। বলার আগে দীর্ঘসময় নিয়ে ভূমিকা টানল। আম্বরি বেগম কথাটা শুনে চমকালেন না। ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'লাইলিরে বিয়া করনের বদলে ট্রলার পাইলি?'

মজিবর মিয়া বলল, 'লাইলিরে বিয়া করনের বদলে ট্রলার পামু কেন মা? আমার গাই বেচার টাকা ছিল না?'

আম্বরি বেগম বললেন, 'তোর গাই বেচা টাকায় ট্রলার হইত না মজিবর। বড়জোর বড় একখান নৌকা হইতো।'

মজিবর মিয়া বলল, 'কোনো উপায় ছিল না মা। ওই বন্যায় গাভীন গাই দুইডা নিয়া কী করতাম? কই যাইতাম?

আম্বরি বেগম বললেন, 'তাই বইলা লাইলিরে বিয়া করনের শর্তে রাজি হইয়া মজিদের কাছ থেইকা টাকা নিবি তুই? তুই লাইলিরে চিনস না? ওর খাসলত জানস না?'

মজিবর মিয়া অনেকক্ষণ কোনো কথা বলল না। চুপচাপ ভাত খাওয়া শেষ করল। তারপর হাত-মুখ ধুয়ে গামছায় হাত মুছে আম্বরি বেগমের মুখোমুখি বসল। আম্বরি বেগম মজিবর মিয়ার বসার ধরন দেখেই বুঝেছেন, মজিবর মিয়া তাকে কিছু বলবে। আম্বরি বেগম তার আগেই বললেন, 'তুই আর কী বলবি মজিবর! বুড়া হইছি দেইখা তো আর আন্ধা হই নাই। তোর বাপ মরণের পর থেইকা তোরে কোলে-পিঠে কইরা মানুষ করছি। কোনোদিন ভাবি নাই সেই পোলারে কোনোদিন আমার চিনতে অসুবিধা হইব। তুই যেইদিন প্রথম সেই ট্রলার নিয়া আইলি, ওইদিনের পর থেইকাই তোরে আর আমি চিনতে পারি নারে মজিবর। রাইত-দিন খালি পয়সা পয়সা করস। মা মরা ওইটুক মাইয়া, তার দিকে চোউখ তুইলা চাওনের সময় নাই তোর। তার ওপর এমন সর্বনাশা কামডা কেমনে করলি?'

মজিবর এবার গম্ভীর এবং শান্ত গলায় কথা বলা শুরু করল, 'শোন মা, আমি না ভাইবা-বুইঝা কিছু করি নাই। অনেক ভাইবা-বুইঝাই সিদ্ধান্তটা নিছি। নিলুফা যেই সময় মরল, ওই সময় থেইকাই আমার মাথায় চিন্তাটা ঢুকছে মা। তুমিই তো দেখছ, নিলুফার মা, নানারে আমি মুখের ওপর বইলা দিছি, আরশি আমার কাছেই থাকব। এখন কথা হইল, আমি জোয়ান পোলা। তোমার কাছে কী কমু মা, আমার তো একটা বিয়া-শাদি করন লাগব। একদিন না একদিন ঘরে আরশির সৎ মা আইবই। সৎ মা কখনও ভালো হয় দেখছো?'

Boighar.com & ARS

আম্বরি বেগম বললেন, 'ও, তুই বলতেছস লাইলি খুব ভালো হইব? আরশিরে কইলজার ভেতর ভইরা রাখব? ওইটারে আমি হাড়ে হাড়ে চিনি, একটা আস্তা ইবলিশ।'

মজিবর মিয়া বলল, 'না মা, আমি সেই কথা বলি না। আমার চিন্তা অন্য। আমি চিন্তা করলাম, যারেই আমি বিয়া করি, সে-ই আইসা আরশিরে সহ্য করতে পারব না। তারও পোলাপান হইব। সমস্যা আরও বাড়ব। আরশি মাইয়া মানুষ, তরতর কইরা বড় হইয়া যাইব। বিয়া-শাদি দিতে হইব। সৎ মা ঘরে থাকলে পরিস্থিতি কত খারাপ হইতে পারে সেইটা আমি জানি মা। তাই ট্রলারটা কেনার কথা চিন্তা করছিলাম। আমি জানতাম, ওই অবস্থায় বড়সর একখান ট্রলার যদি কিনতে পারি আর আল্লাহ যদি সহায় থাকে, তাইলে আর চিন্তা নাই। আমার হাতে কাঁচা পয়সা আইবই আইব। আর হাতে পয়সা থাকলে আমি আগেভাগেই আরশির একটা ব্যবস্থা কইরা ফেলব। তারপর বিয়া-শাদি করলেও এক দিক দিয়া নিশ্চিন্ত।'

আম্বরি বেগম যেন মজিবর মিয়ার কথা কিছুই বুঝলেন না। তিনি উৎকণ্ঠিত গলায় বললেন, 'আগেভাগেই ব্যবস্থা! কী ব্যবস্থা?'

মজিবর মিয়া বলল, 'যযাতিপুর হাটে যে আড়ত দিছি, সেই আড়ত আমি আরশির নামে দলিল কইরা লেইখা দিছি। লতু হাওলাদারের কাছ থেইকা যেই জমি কিনছি, সোনার জমি। সেই জমিও আরশির নামেই কিনছি। এখন ধরো আমি বিয়া করলাম, আরশির ঘরে সৎ মাও আইল, কিন্তু সে জানল, এই মাইয়া অসহায় না। এই মাইয়ার নামে বহু টাকা-পয়সার সম্পত্তি আছে। সে তখন আরশিরে কিছু বলনের আগে দুইবার ভাবব। বড় মামা যখন আমারে বলল যে সে চায় আমি লাইলিরে বিয়া করি। তখন সঙ্গে সঙ্গেই আমি রাজি হই নাই মা। সে আমারে বলল, শুধু এই এক শর্তেই সে আমারে ট্রলার কিনতে টাকা দেবে। স্টিমারঘাটায় লাইলির নানান ঘটনা আছে। ওইখানে তারে বিয়া দেওয়া কঠিন। বড় মামা ধুরন্ধর লোক। সে জানে, আইজ করি, কাইল করি, আমি তো বিয়া করব। তখন সে আমারে ওই শর্ত দিল। আমি যদি লাইলিরে বিয়া করি তাইলে সে আমারে টাকা দেবে। অনেক চিন্তা-ভাবনা কইরা আমি রাজি হইছি। তবে তার আগে আমিও তারে একটা শর্ত দিছিলাম। আমি বলছিলাম, আমি রাজি, তয় আমারেও সময় দিতে হইব। লাইলিরে আমি নিয়া যামু আরও তিনবছর পর। আমারে তিনবছর সময় দিতে হইব। মামায় রাজি হইছিল। কিন্তু আমি দেখলাম তিনবছরেও আমি কিছুই করতে পারি নাই। এইজন্যই আমি সেইবার মাল আনতে গিয়া আরও কিছু সময় নিতে স্টিমারঘাটা গেছিলাম।'

মজিবর মিয়া সামান্য থেমে স্থির গলায় বলল, 'এখন লাইলিরে আননের সময় হইছে মা। কথা দিয়া কথার বরখেলাপ আমি করতে পারব না।'

আম্বরি বেগম স্থির হয়ে মজিবর মিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কোনো কথা বললেন না। মজিবর মিয়া ধীরপায়ে উঠে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে গেল। আম্বরি বেগম সেই খোলা দরজার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তার বুকের ভেতর কেমন করে উঠল। সেই করে ওঠায় অপ্রত্যাশিত আবিষ্কারের আনন্দ যেমন আছে, আছে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশঙ্কাও।

এর কিছুদিন বাদে মজিবর মিয়া আরও একটা জিনিস কিনল। সেই জিনিসের নাম সাইকেল। তার দিন দুই বাদে দেখা গেল হারাধন আর মনাই মিলে বাড়ির পাশের নিচু খোলা মাঠে মজিবর মিয়াকে সাইকেল চালানো শেখাচ্ছে। মজিবর মিয়া হঠাৎ সাইকেল কেন কিনল, এই নিয়ে আশপাশে বিস্তর গবেষণা। কিন্তু কেউ কোনো কারণ খুঁজে পেল না। অন্য কেউ এই কাজ করলে তাকে হুট করে বোকা বলে দেওয়ার লোকের অভাব হতো না। কিন্তু মানুষটা মজিবর মিয়া বলেই হয়তো, গ্রামের লোকজন নীরব কৌতূহল নিয়ে অপেক্ষা করছিল। অপেক্ষার প্রহর ফুরাল তারও মাসখানেক পর। আরশির বয়স তখন ছয়। সে বেশিরভাগ সময়ই চুপচাপ থাকলেও কথা বলে স্পষ্ট উচ্চারণে। মজিবর মিয়ার অক্ষরজ্ঞান থাকায় আরশিকে সে মাঝে মাঝে বর্ণমালার সঙ্গে পরিচিত করার টুকটাক চেষ্টাও করেছে। কিন্তু আরশির তাতে খুব একটা আগ্রহ আছে বলে মনে হয়নি। এর কয়েকদিন পর এক ভোরে যযাতিপুরের মানুষ দেখল নীল রঙের ফ্রক পরা আরশি তার বাবা মজিবর মিয়ার সাইকেলের সামনে বসে আছে। মজিবর মিয়া সাইকেলে টুংটাং বেল বাজিয়ে গাঁয়ের মেঠোপথ ধরে ছুটল। সেই ছোটা গিয়ে থামল পাঁচ মাইল দূরের মালোপাড়া গাঁয়ের মালোপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের নাম বাবু যশোদা জীবন দে। তবে গাঁয়ের লোকজন তাকে যশোদা স্যার বলেই ডাকে। মজিবর মিয়া তার রুমের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, 'স্যার আদাব।'

যশোদা স্যার মাথা নেড়ে কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে রইলেন। তার চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। ঘিয়ে রঙের পাঞ্জাবি আর সাদা ফতুয়া পরনে। মাথার চুল কমে গেছে, তবে এখনও পুরোপুরি টাক পড়েনি। পড়বে বলেও মনে হয় না। তিনি রোজ সকালে উঠে প্রথম যে কাজটি করেন, তাহলো শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা বারো মাসই উঠানে উদোম শরীর হয়ে সারা শরীরে সরিষার তেল মাখেন। তার ধারণা এতে শরীর ভালো থাকে। তা তার শরীর আছেও ভালো। শুকরঞ্জন ডাক্তারের গ্রাম হওয়া সত্ত্বেও স্যার যশোদা জীবন দে'কে দেখতে শুকরঞ্জন ডাক্তারকে দেখতে তাকে কখনও তার বাড়ি যেতে হয়নি। দিব্যি সুস্থ-সবল মানুষ। সরিষার তেল মালিশপর্ব শেষ করে তিনি মিনিট দুই হেঁটে নদীর ঘাটে যান। তারপর মাথা ডুবিয়ে স্নান করেন। এই তার নিত্যদিনের শুরুর চিত্র। কথা কম বলেন।

Boighar.com & ARS

প্রথম যৌবনে স্ত্রী মারা যাওয়ার পর আর বিয়েশাদিও করেননি। ছেলেপুলেও নেই। সুতরাং বাড়িতে যতক্ষণ থাকেন, কথাবার্তারও খুব একট দরকার পড়ে না। তার ধারণা, বেশি কথা বলা মানুষ ঘনঘন রোগে-দুর্ভোগে পড়ে। তিনি চোখের ইশারায় মজিবর মিয়াকে ভেতরে ঢুকতে বললেন। মজিবর মিয়া ভেতরে ঢুকে বলল, 'স্যার, আমারে চিনছেন? আমি যযাতিপুরের মজিবর মিয়া।'

যশোদা স্যার বললেন, 'কী চাই?'

মজিবর মিয়া বলল, 'স্যার আমারে চিনেন নাই?'

যশোদা স্যার বললেন, 'তোমারে চিনি কি চিনি না, এই কথা জিজ্ঞাস করার জন্য যযাতিপুর থেকে আসছ?'

মজিবর মিয়া বলল, 'না, স্যার। অন্য কাজে আসছি।'

যশোদা স্যার বললেন, 'তাইলে কাজের কথা বল।'

মজিবর মিয়া বলল, 'স্যার, এইটা আমার মাইয়া, আরশি। এ ছয় বছরে পড়ছে। এর মা নাই। জন্মের সময় মারা গেছে। আপনের কাছে নিয়া আসছি, এরে অক্ষরজ্ঞান দেবেন।'

যশোদা স্যার মুহূর্তের জন্য আরশির দিকে তাকালেন। চোখ ফিরিয়ে নিতে গিয়েও নিলেন না। তিনি দীর্ঘসময় আরশির চোখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। গভীর কাজল কালো চোখের মেয়ে। গায়ের রঙ শ্যামবর্ণ। কিন্তু এত ছোট বাচ্চার চোখে কাজল দিয়েছে কে? যশোদা স্যার বললেন, 'এই বয়সেই মেয়ের চোখে কাজল দেওয়ার কী দরকার? এরা ন্যাচারাল বিউটি, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, এদের তেমনই থাকা উচিত।'

মজিবর মিয়া বলল, 'স্যার, কাজল কে দেব? এর মা নাই, থাকে বু'র কাছে। সে এইসব জিনিস বোঝেও না। এর চোখই এইরকম।'

যশোদা স্যার বললেন, কিন্তু স্কুলে নতুন ভর্তির সময় তো শেষ। আর অতদূর থেকে এ কি প্রত্যেকদিন আসতে পারবে?'

মজিবর মিয়া বলল, 'পারবে স্যার। আমি সাইকেলে কইরা রোজ দিয়া যাব। আবার নিয়া যাব।'

যশোদা স্যার বললেন, 'এরে আপাতত ভর্তি করনের দরকার নাই। গুড়ি ওয়ানে নিয়া বসাইয়া দাও। আমি অন্য শিক্ষকদের বলে দেব। আগে স্কুলে আসা-যাওয়ার, অন্যদের সঙ্গে মেশার অভ্যাস তৈরি হোক।'

গুড়ি ওয়ান মানে ক্লাস ওয়ানেরও আগের ধাপ। গুড়ি ওয়ানের পর থাকে বড় ওয়ান। তারপর ক্লাস টু। মজিবর মিয়া আরশিকে গুড়ি ওয়ানে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিয়ে এলো। সকাল ১০টা থেকে স্কুল শুরু। ১২টায় ছুটি। সে বারটা পর্যন্ত বসে রইল। আরশি গম্ভীর মুখে ক্লাস থেকে বের হয়ে বাবার কাছে গেল। মজিবর মিয়া বলল, 'ইশকুল কেমন লাগল মা?'

আরশি স্পষ্ট গলায় বলল, 'বু যামু।'

মজিবর মিয়া মেয়েকে কোলে তুলে নিয়ে সাইকেলের সামনে বসাল। তারা বাড়ি ফিরল দুপুরের পরপর। আম্বরি বেগম মজিবর মিয়াকে দেখেই চিৎকারে বাড়ি মাথায় তুললেন, 'এইটুক দুধের গ্যাদা মাইয়া। তারে সে জজ-বারিস্টার বানাইব। নিজে নাম লেখতে কলম ভাঙে দশটা, আর মাইয়ারে বানাইব জজ-বারিস্টার।'

মজিবর মিয়া বলল, 'মা তুমি খ্যাপো কেন? অক্ষরজ্ঞান দরকার আছে না?'

আম্বরি বেগম বললেন, 'তোর অক্ষরজ্ঞানের খ্যাতা পুরি। এট্টুক এক মাইয়া, সে প্রত্যেকদিন ওই সাইকেলের রডে ঝুইলা সেই মালোপাড়া যাইব? ওই শরীলে কুলাইব? ক্যা, জজ-বারিস্টার বানাইলে আরও পরে বানান যাইব না? সে কি পলাইয়া যাইতেছে নাকি?'

মজিবর মিয়া এই কথার কোনো জবাব দিল না। সে ভাত খেয়ে কাজে বেরিয়ে গেল। দিনের বাকিটা সময় মুহূর্তের জন্যও মুখ থামল না আম্বরি বেগমের। তবে দিন কয়েক বাদে গাছের পেয়ারাটা, কামরাঙ্গাটা, জামরুলটা তিনি গুঁজে দিতে থাকলেন আরশির হাতে। আর ফিসফিস করে বলতে থাকলেন, 'বু, ক্ষিদা লাগলে ইশকুলে গিয়া খাইয়া নিও। আর মাস্টারসাবরা যা কইব, মন দিয়া শুনবা। বাড়িতে আইসা রাইতের বেলা বুর টোকরের মধ্যে ঢুইক্যা বু'রে শুনাবা? ঠিক আছে বু?'

আরশি ডান দিকে মাথা নাড়ে। তার স্কুল ভালো লাগে কিনা বোঝা যায় না। সে ক্লাসের পেছনের দিকে কোনো এক বেঞ্চিতে গিয়ে চুপচাপ বসে থাকে। সারা ক্লাসরুম জুড়ে বাচ্চারা যখন হৈচৈ করে আরশি তখন জানালা দিয়ে চুপচাপ তাকিয়ে থাকে বাইরে। দূরে একটা ছাগল। তার চারপাশ জুড়ে তিড়িংবিড়িং করে লাফাচ্ছে দুটো ছানা। আরশি সেদিকে নিমগ্ন হয়ে তাকিয়ে থাকে। ক্লাসে তার কোনো বন্ধু নেই। হওয়ার কথাও না। সে কথা কম বলেই কিনা কে জানে, ক্লাসের আর বাচ্চারা তাকে খুব একটা পছন্দ করে না। সেদিন স্কুল ছুটি শেষে আরশি ক্লাস থেকে বের হচ্ছিল, পেছন থেকে কেউ একজন হঠাৎ তার পায়ের সামনে পা পেতে দিল। আরশি তাল সামলাতে না পেরে ছিটকে পড়ল শান বাঁধানো মেঝেতে। থুঁতনির নিচে খানিক কেটেও গেল তার। রক্ত বের হলো দরদর করে। খবর পেয়ে যশোদা স্যার দৌড়ে এলেন। মজিবর মিয়া এলো। স্কুলের অন্য সব স্যাররা এলো, দপ্তরী এলো। যে ছেলেটা পা পেতে দিয়েছিল, তাকেও ধরে আনা হয়েছে। যশোদা স্যার বললেন, 'এই বিচ্ছু ছেলে পা মেরেছে, তাই না?'

ছেলেটা বয়স করে স্কুলে ভর্তি হয়েছে। আর সব বাচ্চার চেয়ে বয়সে সে অনেক বড়। ক্লাসে সে সবাইকে তার বড়ত্ব দেখিয়ে খানিক হম্বিতম্বিও করে। আর সব বাচ্চারা তা মেনেও নেয়। কিন্তু যশোদা স্যারের অমন অগ্নিচক্ষু দেখে

সে ভ্যা করে কেঁদেই দিল। যশোদা স্যার তার বাহু চেপে ধরে বলল, 'এই ছেলেই তো, না? এই ছেলে?'

আরশি ততক্ষণে উঠে মজিবর মিয়ার কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে। সে কিছুক্ষণ ছেলেটার দিকে তাকিয়ে থাকল। ওই অতটুকু মেয়ে, ছোট্ট আরশি, ঠিক বড়দের মতোন স্থির এবং নিষ্কম্প গলায় বলল, 'ও দেইখা দেয় নাই।'

যশোদা স্যার কঠিন গলায় বললেন, 'দেখে নাই মানে?'

আরশি এবার আর স্যারের সঙ্গে কোনো কথা বলল না। সে মজিবর মিয়ার কাঁধের কাছে মাথা এগিয়ে নিচু গলায় বলল, 'ও ইচ্ছা কইরা দেয় নাই আব্বা, আমিই দেখি নাই।'

মজিবর মিয়া সামান্য সময়ের জন্য চুপ করে রইল। তারপর যশোদা স্যারকে বলল, 'থাউক স্যার বাদ দেন, পোলাপান মানুষ, বোঝে নাই।'

ফেরার পথে পুরোটা সময় ধরে মজিবর মিয়া খুবই অন্যমনস্ক হয়ে রইল। তার সাইকেলখানা দুবার এবড়ো-খেবড়ো পথে ছোটখাটো গর্তে পড়তে পড়তে তীব্র ঝাঁকুনি খেল। মজিবর মিয়া হঠাৎ সাইকেল থামিয়ে আরশিকে নিয়ে পথের ধারে বিছিয়ে রাখা শুকনো খড়ের ওপর বসল। বাবা আর মেয়ে দীর্ঘ সময় সেখানে চুপচাপ বসে রইল। কেউ কোনো কথা বলল না। তারপর আবার বাড়ির পথ ধরল তারা। পরের দিনগুলো কাটতে লাগল একটু অন্যরকম। বাবা মেয়েতে পথে যেতে যেতে টুকটাক কথা হতে থাকল। মজিবর মিয়া যেমন জিজ্ঞেস করে, 'তুমি কারো সঙ্গে কথা বলো না কেন মা?'

আরশি অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, 'কই? বলি তো।'

মজিবর মিয়া বলে, 'মাগো, এই বলা, সেই বলা না।'

আরশি বলে, 'তাইলে কোন বলা?'

মজিবর মিয়া বলে, 'তুমি তো জানোই আমি কোন বলার কথা বলছি।'

আরশি বলে, 'আব্বা, বলা? না বালা?'।

মজিবর মিয়া বলে, 'বালা কি জিনিস?'

আরশি ফিক করে হেসে দিয়ে বলে, 'আমাদের ক্লাসের শিউলী বালা।'

মজিবর মিয়াও হাসে। তার তখন মনে হয়, এই বেঁচে থাকা তুমুল আনন্দময়। অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে আরশি কখনও তার মা'র কথা জিজ্ঞেস করে না। তার ক্লাসের অন্য সহপাঠীদের মায়েদের কথা শোনেও না। কখনই না। কত কত ঘটনা ঘটে রোজ। এক ঝকঝকে সকালের দিন হঠাৎ দুপুরের আগে ভাগে মেঘ ছেয়ে হয়ে গেল মুখভার সন্ধ্যা। আরশিকে নিয়ে স্কুল থেকে ফেরার পথে তুমুল বৃষ্টি। সেই বৃষ্টির জল পেয়ে কাঁচা মাটির রাস্তা মুহূর্তে হয়ে উঠল প্যাঁচপেঁচে কাদার দুর্গম পথ। এই কাদায় সাইকেল চালানো অসম্ভবের চেয়েও বেশি কিছু। সাইকেলের দুই চাকায় আঠার মতোন লেগে থাকতে লাগল দলা দলা আঠালো কাদা। মজিবর সাইকেল চালাবে কী? পায়ে হেঁটে সাইকেল টেনে

নেওয়াই অসাধ্য হয়ে উঠল। আরশিকে সাইকেলের সিটে বসিয়ে খানিকক্ষণ নিজের পায়ে হেঁটে টেনে নিয়ে চলার চেষ্টা করল। কিন্তু সেটাও দুঃসাধ্য। আরশি এভাবে সিটের ওপর বসে থাকতে পারছিল না। তার ওপর ওই অতটুক পথ বৃষ্টিতে ভিজেই ঠাণ্ডা লেগে হাঁচি উঠতে শুরু করেছিল তার। ক্লান্ত মজিবর মিয়া কী করবে ভেবে পাচ্ছিল না। বৃষ্টি শেষ হওয়া অবধি যে কোথাও অপেক্ষা করবে, সে উপায়ও নেই। কারণ, বৃষ্টি থামলেও রাস্তার এই কাদা-জল এক-দু'দিনে শুকাবে না। তার ওপর, তাকে বিকেলের আগেই ফিরতে হবে আড়তে। শেষ অবধি মাঝপথে পরিচিত এক বাড়িতে সাইকেল রেখে সে বাড়ির পথ ধরল।

তুমুল বৃষ্টিতে ভেসে যাওয়া চরাচরে বাবার কাঁধের দু'পাশে পা ছড়িয়ে বসে আছে নীল ফ্রক পরা ছোট্ট এক মেয়ে। তার হাতে বিশাল ছাতার মতোন এক গাড় সবুজ কচুপাতা। সে সেই কচুপাতা ধরে আছে মাথার ওপর। মজিবর মিয়া হেঁটে চলছে মেঠো পথ ধরে বাড়ির দিকে। হঠাৎ হঠাৎ কোথাও বজ্রপাত হচ্ছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। মজিবর মিয়া সঙ্গে সঙ্গে মেয়েকে কাঁধ থেকে নামিয়ে বুকের সঙ্গে চেপে ধরে আড়াল করার চেষ্টা করছে। সময় যাচ্ছে, যাচ্ছে বৃষ্টির ফোঁটা, ঘাস জল কাদার পথ, যাচ্ছে মহাকালের আরও কিছু মুহূর্ত। কিন্তু জগতে এর চেয়ে সুন্দর দৃশ্য আর কী আছে! এরচেয়ে প্রগাঢ় বন্ধনের আর কী আছে? এর চেয়ে গভীরতম অনুভূতির ছুঁয়ে যাওয়া আর কী আছে! www.boighar.com

মজিবর মিয়া সেই তুমুল বৃষ্টিতে ভিজে তিন মাইল পথ পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরল। এই পথের প্রতিটি বৃষ্টির ফোঁটা, প্রতিটি পায়ের ছাপ, প্রতিটি মুহূর্তই কি চুপচাপ মজিবর মিয়ার বুকের গভীরে সযত্নে ডুবে থাকল না? কিংবা ছোট্ট আরশির? কে জানে থাকবে কিনা! তবে এমন অজস্র গল্পরা রোজ জমা হতে থাকল। মজিবর মিয়া আর আরশির এই রোজকার গল্পে কত কত কথা যে জমা হয়! কত কত স্মৃতির পাতা যে ভারী হয়! এই দুই গভীর কিংবা অগভীর অস্তিত্বের তা জানা হয়ে ওঠে না। যে জানে, তার নাম সময়। সময় অপেক্ষায় থাকে সময়ের এই ভীষণ আঁচড়ের দাগ নিয়ে। কোনো একদিন তা নিভৃত রাতের কান্না হবে। হাসি হবে। সুখ-দুঃখ হবে। মানব জীবন কি অদ্ভুত খেয়ালে বাঁধা থাকে সময়ের অমিত আঁচড়ে!

লাইলি এলো আরও বেশ কিছুদিন পর। বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা বলতে কলেমা পড়া। ইমাম সাহেব এসে কলেমা পড়িয়ে গেলেন। আর কাউকে কিছু তেমন বলাও হয়নি। তবে এখন দেখা যাচ্ছে এই বিয়ের কথা আগেভাগেই সবাই কম-বেশি জানে। মজিদ বেপারি তার স্ত্রী আর লাইলিকে নিয়ে এসেছিল। বিয়ে শেষে করে ফিরে গেছে। এই নিরানন্দ বিয়েতে সবচেয়ে বেশি আনন্দ যে

পেয়েছে, তার নাম আরশি। সদা গম্ভীর আরশি তার বাবাকে কখনও এই অবস্থায় দেখেনি। ধবধবে সাদা পাঞ্জাবি পরা। মাথায় টুপি। সঙ্গে লাল টুকটুকে শাড়ি পরা সুন্দরী এক মেয়ে। সে অতি আনন্দে সেই মেয়ের কোলে গিয়ে উঠে বসেছে। লাইলি আরশিকে বুকে চেপে ধরে চুমোয় চুমোয় গাল ভরিয়ে দিল। আরশি বলল, 'আমি তোমারে কী ডাকব?'

লাইলি বলল, 'মা ডাকবাগো সোনা। আমারে তুমি মা ডাকবা।'

আরশি অদ্ভুত ভঙ্গিতে ঠোঁট ফাঁক করে ডাকল, 'মা'।

লাইলি আবারও আরশিকে শক্ত করে বুকের সঙ্গে চেপে ধরে রাখল। তারপরের দিনগুলো কেটে গেল ঝিরিঝিরি বাতাসে শান্ত নদীর মৃদু ঢেউয়েদের মতোন। স্নিগ্ধ, শান্ত, পূর্ণ। মজিবর মিয়ার ঘর-দোর উঠান, বাড়ি যেন ঝলমলে আলোয় হেসে উঠল। লাইলি হয়ে উঠল এই অদ্ভুত আলোর উৎস। মজিবর মিয়া অবাক হলেও স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল। সে মোনাজাতে দাঁড়িয়ে আল্লাহর কাছে দীর্ঘ সময় নিয়ে শোকরিয়া জানাল। তার মনে হলো লাইলিকে নিয়ে কী ভয়ঙ্কর সব দুশ্চিন্তাই না তার ছিল! একটা কুৎসিত কদাকার চেহারা নিজের ভেতর এঁকে নিয়েছিল সে। মাঝে মাঝে সেসব ভেবে সে নিজেই খুব লজ্জিত হয়। সেদিন রাতে ঘটল এক অদ্ভুত ঘটনা। মজিবর মিয়া গভীর রাত করে বাড়ি ফিরল। ক্লান্ত, বিধ্বস্ত। সে এসে ক'টা খেয়েই শুয়ে পড়ল। কিন্তু শেষ রাতের দিকে সে লাইলিকে কাছে টানল। লাইলি ঘুমের ঘোরে বলল, 'কী?'

মজিবর মিয়া বলল, 'একটু কাছে আসো।'

লাইলি ঘুম জড়ানো গলায় বলল, 'কাছেই তো আছি।'

মজিবর মিয়া বলল, 'আরও কাছে।'

লাইলি চট করে জেগে উঠল। তারপর বলল, 'আর কত কাছে?'

মজিবর মিয়া বিরক্ত গলায় বলল, 'থাউক, আসন লাগব না।'

লাইলি ঘুরে মজিবর মিয়ার বুকের কাছে ঘনিষ্ঠ হলো। তারপর গলার কাছে মুখ নিয়ে বলল, 'এইটা কাছে আসনের সময়?'

মজিবর মিয়া বলল, 'বললাম তো, লাগব না।'

লাইলি ঘনিষ্ঠ হলো। মজিবর মিয়াও জেগে উঠল। সে তখন উন্মাদ প্রায়। চূড়ান্ত মুহূর্তে লাইলি বলল, 'এইটা কিন্তু আমার জন্য বিপদের সময়। আপনের কাছেও তো কিছু নাই। ডাক্তারের দোকান থেইকা তো ওইগুলা কিছু আনেনও নাই। ওইগুলা ছাড়া যদি কিছু হইয়া যায়?'

মজিবর মিয়া খেপে গেল। বলল, 'তুই আমার বিয়া করা বউ। তোর পেটে আমার বাচ্চা আইলে কার কী?'

লাইলি হাঁ হাঁ হাঁ করে হাসল। বলল, 'সব পুরুষ মানুষই এই সময়ে বুদ্ধি সুদ্ধি হারাই ফালায়। তখন চিন্তা খালি এই একটাই।'

মজিবর মিয়া বিরক্ত গলায় বলল, 'কী হইছে? বল আমারে।'

লাইলি মজিবর মিয়ার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'এখন না, আরও কয়টা বছর যাউক। আরশি আরেকটু বড় হউক। এখন একটা বাচ্চা হইলে ওর দেখভাল করতে পারব না। ও তো মায়ের আদর-যত্ন পায় নাই। অরে একটু আদর-যত্ন করি। তারপর ভাবন যাইব।' কিছুক্ষণ থেমে সে মজিবর মিয়ার নাক চেপে ধরে বলল, 'কাইল আপনে ওইগুলা নিয়াইসেন, কাইল হইব নে।'

মজিবর মিয়া হতভম্ব হয়ে সেই অন্ধকারেও লাইলির মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর ঝট করে লাইলিকে চেপে ধরল বুকের ভেতর। বলল, 'বউরে, আমার ভাগ্য, আল্লাহয় তোরে আমারে দিছেরে বউ। আমার ভাগ্য। আমার সারা জীবনের ভাগ্য।'

সময় কেটে যাচ্ছে। গম্ভীর আরশি আজকাল আর তেমন গম্ভীর থাকে না। একা একা কথা বলে না। সে সারাক্ষণ থাকে লাইলির সঙ্গে। আম্বরি বেগম ডাকলেও কাছে যায় না। মাঝে মাঝে আম্বরি বেগমের মন খারাপ হয়ে যায়। কিন্তু তিনি খুশিও হন। এমন সৎ মা ভাগ্যের ব্যাপার। আরশি কি ভাগ্য নিয়ে জন্মেছে তা স্বয়ং সৃষ্টিকর্তাই জানেন। তবে তার সৎ মা ভাগ্যের তুলনা হয় না। তিনি রোজ আল্লাহর কাছে করজোড়ে প্রার্থনা করেন। কাঁদেন। বলেন, 'হে পরওয়ারদেগার তোমার কাছে হাজার শোকর। এখন যদি তুমি আমারে নিয়া যাও, তাতেও আমার কোনো আফসোস নাইগো আল্লাহ। তোমার রহমত বোঝা বড় দায়।'

সময় যেন খানিক বেশি গতিতেই কেটে যাচ্ছে। অবশ্য সুখের সময়েরা দ্রুত কেটে যায় এই যেন জগতের নিয়ম। তেমনি কেটে যাচ্ছিল মজিবর মিয়া-লাইলির দিন। আরশির দিন। আম্বরি বেগমের দিন। এমনি এক সুখের দিন। থম মারা শান্ত নির্জন দুপুর। আম্বরি বেগম চুলায় ভাত বসাতে এসে দেখেন খড় বা শুকনো পাতা কিছুই নেই। বাড়ির পেছন দিকটার নিচু জমি এ সময়ে শুকনো খটখটে মাঠ হয়ে থাকে। তিনি একটা চটের বস্তা আর ঝাড়ু হাতে সেই মাঠ পেরিয়ে খানিকটা সামনে গিয়ে রেইন্ট্রি আর মেহগনি গাছে ঘেরা বহু পুরনো, পরিত্যক্ত বসতভিটার জঙ্গলে ঢুকলেন। এখানে এককালে কোনো হিন্দু বসতবাড়ি ছিল। আম্বরি বেগম বিয়ের পর এই বাড়ি আসা অবধি দেখছেন এই পরিত্যক্ত বসতভিটা এমন নির্জনই পড়ে আছে। বড় বড় ঘন গাছপালা এবং আগাছা থাকায় জায়গাটা অন্ধকার। পুরনো বাড়ি ও মন্দিরের ধ্বংসস্তূপ আছে। চারপাশের নিচু মাঠের তুলনায় এই পরিত্যক্ত ভিটা অনেক উঁচুতে। এখন সাপখোপের আস্তানা বলে কেউ আর আজকাল এদিকে আসে না। বাড়ির কাছাকাছি হওয়ায় শুকনো পাতা, ডালপালা লাগলে আম্বরি বেগম প্রায়ই এখানে চলে আসেন। আজও এসেছেন।

Boighar.com & ARS

পরিত্যক্ত ভিটেবাড়ির এখানে-সেখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে শুকনো পাতা। তিনি পাতা কুড়িয়ে এক জায়গায় স্তূপ করে রাখতে শুরু করেছেন। স্তূপটা জমে প্রায় বড় হয়ে এসেছে, এই মুহূর্তে তিনি জিনিসটা দেখলেন। লাল ছোপছোপ রক্তে ভিজে আছে শুকনো পাতা। তিনি প্রথমে ঘটনা বুঝতে পারেননি। ভেবেছিলেন শেয়াল-টেয়াল হয়তো কোনো বাড়ি থেকে হাঁস-মুরগি ধরে এনে খেয়েছে। কিন্তু তিনি সেই রক্ত লক্ষ্য করে এগোলেন। ছোপছোপ রক্ত চলে গেছে ভাঙা মন্দির পেরিয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত বসতবাড়ির ভাঙা কাঠামোর দিকে। তিনি কয়েক পা এগিয়েই পাথরের মতোন জমে গেলেন। একটা লাশ! একটা মানুষের লাশ। শুকনা লম্বা মানুষটার থুঁতনির নিচ পর্যন্ত রক্তে ঢেকে আছে। মাথাভর্তি সুন্দর চুল। সেই মাথার মাঝামাঝি ফাঁক হয়ে মগজ বের হয়ে আছে। হাত পিছমোড়া করে বাঁধা। গলায় হলুদ রঙের উলের মাফলার। গায়ে লাল সোয়েটার। ভয়াবহ নৃশংস খুন!! এখানে-সেখানে জমাটবাঁধা রক্ত। চারদিকে মাছি ভনভন করছে। তবে এখনও কোনো গন্ধ নেই। আম্বরি বেগম চিৎকার দিতে গিয়েও দিলেন না। তার হঠাৎ কেন যেন মনে হলো এই শান্ত নিরুপদ্রব গাঁয়ে কোনো এক ভয়ঙ্কর অশুভ সময় আসছে। এই অশুভ ভয়ঙ্কর সময়ে ভয় পেলে হবে না। আতঙ্কিত হলে হবে না। মাথা খাটিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় সিদ্ধান্ত নিতে হবে। চলতে হবে খুব সাবধানে। তিনি কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে সেখানে দাঁড়িয়ে রইলেন। মুহূর্তের জন্য তার মনে হলো, তিনি ভুল কিছু দেখেননি তো! কিন্তু খানিক বাদে চোখ খুলে তিনি দেখতে পেলেন সেই একই দৃশ্য। তিনি চিৎকার করলেন না। তাড়াহুড়ো করলেন না। ধীরে-সুস্থে বস্তার ভেতর স্তূপ করে রাখা শুকনো পাতা ভরে বাড়ির পথে পা বাড়ালেন। চুলায় পানি বসিয়ে এসেছেন। দ্রুত রান্না বান্না শেষ করতে হবে।

উঠানে পা দিয়েই থমকে গেলেন আম্বরি বেগম। আরশি গড়াগড়ি খাচ্ছে উঠানের ধুলোয়। তার সামনে রুদ্রমূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে ফুঁসছে লাইলি। লাইলির হাতে খড়িকাঠের টুকরো। অবাক আরশি কাঁদছে না। তবে বড় বড় চোখ মেলে তাকিয়ে আছে তার নতুন মায়ের দিকে। তার সেই বড় বড় চোখ ভর্তি বিভ্রম। বিস্ময়। অবিশ্বাস! আম্বরি বেগমকে দেখেই সে দৌড়ে এসে তাকে জড়িয়ে ধরল। কাঁদল না। তবে তার শরীর কাঁপছে থরথর করে। আম্বরি বেগমকে দেখেও কিছু বলল না লাইলি। বেপরোয়া পা ফেলে সদম্ভে ঘুরে চলে গেল ঘরের ভেতর। www.boighar.com

আম্বরি বেগম হাঁটু গেড়ে আরশির সামনে বসলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হইছে বু?'

আরশি কোনো কথা বলল না। সে আম্বরি বেগমের বুকের ভেতর মাথা গুঁজে দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। অনেকক্ষণ। আম্বরি বেগমও আর কথা বললেন না। বসে রইলেন যেমন ছিলেন ঠিক তেমনই। দীর্ঘসময়। তারপর খুব ধীরে, আরশি আম্বরি বেগমের হাত ছাড়িয়ে হেঁটে গেল সেই চালতা গাছের তলায়। সেখানে একা একা ঘুরে বেড়ালো দিনের বাকিটা সময়। আম্বরি বেগম রান্না চড়ালেন। দিন শেষে রাত হলো। লাইলি সারাদিনে আর ঘর থেকে বের হলো না। গভীর রাতে মজিবর মিয়া ঘরে ফিরল। বের হয়ে গেল পরদিন খুব ভোরে। এই দুই দিনে মজিবর মিয়ার সঙ্গে কোনো কথাও হলো না আম্বরি বেগমের। লাইলিও সারাদিন শুয়ে থাকল বিছানায়। কারও সঙ্গে কারও কোনো কথা নেই। আরশি তার মতোন ঘুরে বেড়াতে থাকল এখানে-সেখানে। ফুরফুরে দখিনা হাওয়ায় যে বাড়ি স্পন্দিত হচ্ছিল, তাই যেন থম মেরে রইল ঝড়ের পূর্বাভাসের মতোন। দুই দিনের দিন সন্ধ্যায় মজিবর মিয়ার সঙ্গে কথা হলো আম্বরি বেগমের। আম্বরি বেগম বাসন-কোসন নিয়ে ঘরে ফিরছিলেন। এই মুহূর্তে মজিবর মিয়া তাকে থামাল। তারপর খবরটা দিল, 'মা, লাইলি পোয়াতি হইছে। ওর দিকে একটু আলাদা কইরা খেয়াল রাইখো।'

আম্বরি বেগম কিছু বললেন না। মাগরিবের আজান হচ্ছে। তিনি কাপড়ের আঁচল মাথায় টেনে দিয়ে ঘরে গেলেন। এখনও বাতি দেওয়া হয়নি ঘরে। সন্ধ্যার বাতি দিতে হবে।

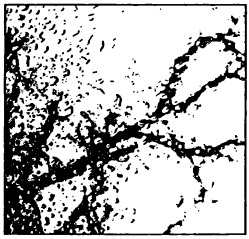

গভীর রাত। নৌকার একটানা ছলাৎ ছলাৎ শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। কালো চাদরে মোড়া ছয়টি ছায়ামূর্তি অন্ধকারে খোলা নৌকায় জড়সড় হয়ে বসে আছে। একজন ফস করে দিয়াশলাইয়ের কাঠিতে আগুন জ্বালিয়ে সিগারেট ধরাল। মুহূর্তের আলোতেই মানুষটার চেহারা স্পষ্ট হয়ে উঠল, সেই লোকমান গ্রুপের প্রধান লোকমান। শুকরঞ্জন ডাক্তার যার পা থেকে গুলি বের করেছিলেন। লোকমান এখনও খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে। তার সঙ্গে আবদুল মমিন ছাড়াও আরও চারজন রয়েছে। সে অন্ধকারে আবদুল মমিনকে ডেকে বলল, 'আমাদের পার্টি চাইছিল শ্রেণিশত্রু খতম করতে। সমাজে ধনী-গরিবের ভেদাভেদ কমাই আনতে। কিন্তু এখন তো আমরা নিজেরা নিজেদের খতম করতেই ব্যস্ত। যে যারে পারি খতম করি।'

আবদুল মমিন বলল, 'আন্দোলনে নেতা দরকার। পার্টিতে কোনো নেতা নেই। সবাই এখন নেতা। নেতা না থাকলে আন্দোলনও থাকে না।'

লোকমান বলল, 'যোগ্য নেতা না থাকলে সবাই নিজেরে নেতা ভাবব এইটাই স্বাভাবিক। এজন্যই নিজেদের মধ্যে নিজেরা খুনাখুনি কইরা ধ্বংস হইয়া গেলে হইব না। আন্দোলনের জন্য নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দিতে হইব। এইবার থেকে শুরু হইব আমাদের আসল যুদ্ধ। আইজ রাইত থেকেই। আজকে টরকি বন্দরে যতগুলা বড় চাউল ডাইলের মজুদ আছে, আড়ত আছে, সবগুলা লুট হইব। কৃষিপণ্য মজুদ করা চলব না। এরা কৃষিপণ্য মজুদ করে রাইখা দাম বাড়ায়। না খাইয়া মরে গরিব মানুষ। এইগুলা লুট কইরা কাইলকের মধ্যেই চরাঞ্চলের গরিব মানুষের মধ্যে বিলাই দিতে হইব।'

আবদুল মমিন বলল, 'কিন্তু লোকমান ভাই, আপনি আর আমি চাইলেই তো হইব না। এই অঞ্চলে এখন আমাদের মধ্যেই গ্রুপ আছে আরও চাইর-পাঁচটা। এরা কেউ কাউরে দেখতে পারে না। একজন আরেকজনের ছায়া দেখলেও গুলি করে। আপনে কেমনে কাজ করবেন?'

লোকমান বলল, 'হাবিব, আজাহার আর মোছাব্বেরের গ্রুপ লইয়া চিন্তা করিস না। সময়মতো আমার সঙ্গে আইসা ভিড়ব। ঝামেলা করব সুলতান আর গালকাটা বশির। তো কী আর করা, যুদ্ধে যখন নামছি, সব তো আর এমনে

এমনেই হইব না। কূটনীতি, রাজনীতি যেমন থাকব, যুদ্ধও থাকব। যে মুখের কথা শুনতে চায়, তারে মুখের কথা বলতে হবে। আর যে বুলেটের কথা শুনতে চায়, তারে বুলেটের কথাই শোনাইতে হবে।'

আবদুল মমিন কোনো কথা বলল না। সে সিগারেটে শেষ টান দিয়ে বলল, 'সবাই রেডি হও। আমরা ঘাটে আইসা পড়ছি।'

সেই রাতে টরকি বন্দরের তিনখানা বড় চাল-ডালের আড়ত লুট হলো। বন্দরের কুলিরা ঘুমায় লঞ্চঘাটে। তাদের ঘুম থেকে জাগিয়ে নিয়ে আসা হলো। বস্তায় বস্তায় লুটের মাল তোলা হলো ঘাটে সার বেঁধে থাকা ট্রলারে, নৌকায়। পরের দিন তিনেকের মধ্যে বিভিন্ন চরাঞ্চলের দরিদ্র মানুষের মধ্যে এই চাল-ডাল বিতরণ করা হলো। দেশের রাজনৈতিক অবস্থা তখন ভীষণ দোলাচলে। ফলে পুলিশ প্রশাসন কেউ তেমন এগিয়ে এলো না আড়তদার বা মজুদদারদের নিরাপত্তায়। পরের ক'দিনে লুট হলো ছোট-বড় আরও কয়েকটা হাট, সম্পন্ন গৃহস্থ বাড়ি, মজুদদারদের বাড়ি, আড়ত।

সপ্তাহদুয়েক পরে লোকমানের দল হামলা চালাল মোঘলগঞ্জে। সেখানে আড়তদার আর দোকানিরা পাহারা বসিয়েছিল। কিন্তু লোকমানের সশস্ত্র দলের কাছে সেই পাহারা বেশিক্ষণ টিকল না। দুই আড়তদার খুন হলো। লাশ পরে থাকল নদীর ঘাটে। কেউ ছুঁয়ে দেখারও সাহস পেল না। কিন্তু এই জনপদ জুড়ে সত্যিকারের অস্থিরতা আর আতঙ্ক নেমে এলো এর পরপরই। মৃত দুই আড়তদারের একজন হলো অন্য গ্রুপ গালকাটা বশিরের শ্বশুর। গালকাটা বশিরই লোকমানের সবচেয়ে বড় শত্রু। ফলে তারপরের ছ'মাসে আন্ডারগ্রাউন্ড এই চরমপন্থী দলটা মূলত ভাগ হয়ে গেল দুই ভাগে, লোকমান গ্রুপ আর গালকাটা বশির গ্রুপ। বাদবাকি গ্রুপগুলো এই দুই গ্রুপে ভিড়ে গেল। এদের সম্পর্কটা হয়ে গেল সাপে-নেউলে। এরা কেউ কাউকে দেখতে পারে না। পরস্পরের ছায়া মাড়াতে পারে না। এরা কথা বলে বুলেটের ভাষায়। বিভিন্ন জায়গায় রোজ খুনাখুনি হতে লাগল। লাশ পড়তে লাগল। দুই দলেরই জনবল কমতে লাগল। ফলে শুরু হলো অন্য খেলা। পার্টিতে যোগ দেওয়ার জন্য দুই গ্রুপই গ্রামে গ্রামে হাটে-বাজারে সদস্য সংগ্রহে নেমে পড়ল। যুবকদের আহ্বান জানিয়ে লিফলেট বিতরণ শুরু হলো। যারা স্বেচ্ছায় যোগ দিল না, তাদের ওপর নানান হুমকি-ধমকি শুরু হলো। বলপ্রয়োগ শুরু হলো। আবার এক গ্রুপে যোগ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে হয়ে উঠল অন্য গ্রুপের জাতশত্রু। শক্তি বাড়াতে দরকার হয়ে পড়ল অর্থের। ফলে শুরু হলো নির্বিচার চাঁদাবাজি, লুট, অপহরণ, খুন, মুক্তিপণ আদায়।

এই চুপচাপ নিস্তরঙ্গ বিশাল প্রত্যন্ত অঞ্চলজুড়ে শুরু হলো ভয়ঙ্কর এক ত্রাসের রাজত্ব!

মোস্তফার ভাগ্য ভালো। সে বিদেশ যাওয়ার মাস তিনেকের মধ্যেই টাকা পাঠানো শুরু করেছে। পরপর দুই কিস্তি টাকা হাতে পেয়েই লতু হাওলাদারের

Boighar.com & ARS

মুখের হাসি একান-ওকান বিস্তৃত হলো। সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বিষাদাক্রান্তও হলো। তার বাপ-দাদার কালের জমিতে এখন অন্য মানুষ হেঁটে বেড়ায়। চাষাভূষার দল। যারা একসময় তার বাড়িতে ফুটফরমায়েশ খাটত, তারা এখন তার জমির মালিক। তাদের কাছে তাকে জমি বিক্রি করতে হয়েছে। এই রূঢ় বাস্তবতা সে মেনে নিতে পারল না। তার ওপর কিছুদিন থেকেই বাতাসে গুঞ্জন ভাসছে, নদীর ওইপার থেকে রাঙ্গারোড পর্যন্ত নাকি উঁচু সড়ক হবে। শুধু তাই না, যযাতিপুরে নাকি ইলেক্ট্রিসিটিও আসবে। এই দুটি ঘটনার যেকোনো একটা ঘটলেই কিস্তিমাত! আর দুটো ঘটলে তো যযাতিপুর ভেল্কিবাজির মতো পাল্টে যাবে। বাড়ি-ঘর, জমি-জমার দাম বেড়ে যাবে তরতর করে। ওই চার বিঘা জমি তখন হবে সোনার দামে দাম। অথচ সে কিনা তা বেচে দিল পানির দরে! যে করেই হোক এই জমি তার ফেরত চাই-ই চাই। মোস্তফা টাকা পাঠাতে শুরু করেছে। দিন ফিরতে আর বাকি কী তার? তবে সামান্য সন্দেহ রয়ে গেছে তার মনে। তা হলো, অন্য যারা টুকটাক জমি কিনেছে, তাদের কাছ থেকে কিছু বেশি পয়সাপাতি দিয়ে জমি ফেরত পাওয়া গেলেও মজিবর মিয়া জমি ফেরত দেবে বলে মনে হয় না। বেশি টাকা দিলেও না। ক'টা বেশি টাকার লোভে এই সোনার জমি ফেরত দেওয়ার লোক সে না। মজিবর মিয়া অতি বুদ্ধিমান মানুষ। যা করে হিসাব করেই করে। তাহলে উপায় কী? ওই জমির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় লতু হাওলাদার তার বুকের বাঁ পাশে চিনচিনে ব্যথা টের পায়। এই ব্যথা ক্রমশই বাড়তে থাকে। অস্থির লাগতে থাকে তার। কী উপায়ে জমি ফেরত পাওয়া যেতে পারে এই চিন্তায় তার ঘুম হয় না। একবার ভেবেছিলেন আতাহার তালুকদারকে বলবেন। তিনি গ্রামের মাথা হিসেবে বললে মজিবর মিয়া হয়তো কথাটা নাও ফেলতে পারে। কিন্তু পরক্ষণেই সেই চিন্তা বাদ দিয়ে দিল সে। না, আতাহার তালুকদারের কাছে আর যাবে না সে। আতাহার তালুকদারের সঙ্গেও বোঝাপড়া বাকি আছে তার।

অনেক ভেবেচিন্তে পরদিন ভোরে লতু হাওলাদার নিজেই চলে গেল মজিবর মিয়ার কাছে। সে সাধারণত যযাতিপুরের এই নতুন হাটে আসে না। কিন্তু আজ এলো। খুব সকাল সকালই এলো। মজিবর মিয়া তখনও আড়তে আসেনি। মনাই কেবল দোকান খুলে ঝাঁট দিচ্ছে। লতু হাওলাদার বলল, 'কী রে ছ্যামড়া, মজিবর কই?'

মনাই বলল, 'সে এখনও আসে নাই। কাইল অনেক রাইত কইরা বন্দর থেইকা বাড়ি ফিরছে। এখনও ঘুম থেইকা উঠে নাই মনে হয়।'

লতু হাওলাদার বলল, 'হ, এখন তো সে সাহেব হইছে। সাহেবি চাল-চলনই আলাদা।'

মনাই কোনো জবাব দিল না সে তার কাজ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। লতু হাওলাদার বসে রইল দোকানের সামনের টুলে। মজিবর মিয়া আড়তে এলো আরও খানিক পর। সে লতু হাওলাদারকে দেখেই সালাম দিল। শশব্যস্ত হয়ে

বলল, 'আরে চাচা আপনে এইখানে বইসা আছেন কেন? আসেন, গদিতে উইঠা আসেন।'

লতু হাওলাদার বলল, 'না না। মালিক ছাড়া আর কারো দোকানের গদিতে বসন ঠিক না। ক্যাশের সামনেও বসন ঠিক না। এতে ব্যবসার অমঙ্গল হয়।'

মজিবর মিয়া বলল, 'আরে আসেন চাচা, কিচ্ছু হইব না। আর এই দোকানের মালিক আমি একলাই নাকি? মনে করেন আপনারা সবাই এই দোকানের মালিক। আসেন আসেন।'

মজিবর মিয়া খুব করে বললেও লতু হাওলাদার গদিতে উঠে বসল না। সে ইনিয়ে-বিনিয়ে নানান কথা বলল। মোস্তফার কথা বলল। মোস্তফা যে টাকা পাঠানো শুরু করছে তাও বলল। তবে তা ফুলিয়ে-ফাপিয়ে কয়েকগুণ বাড়িয়ে বলল। বলার সময় তীক্ষ্ণ চোখে মজিবর মিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে তার প্রতিক্রিয়া বোঝার চেষ্টা করল। কিন্তু কিছু পেল বলে মনে হলো না। শেষমেশ বলল, 'মজিবর, তুই তো আমার পোলার মতোন। তোর কাছে আবার লজ্জা-শরম কী? আমি আইছি তোর কাছে মাফ চাইতে।'

মজিবর মিয়া আঁতকে ওঠা গলায় বলল, 'কী বলেন চাচা! আপনে কিসের জন্য আমার কাছে মাফ চাইবেন?'

লতু হাওলাদার নরম গলায় বলল, 'আমি সেইদিনের কথা আর ভুলতে পারি নাইরে মজিবর। সেই যে জুমার নামাজে ইমাম সাবের বেতন তুই দিবি শুইনা তোরে কত উল্টাপাল্টা কথা শোনাইলাম। তখন অনেক রাগ হইছিলোরে ব্যাটা। কত কথাই না তোরে শোনাইলাম। বয়স হইলে মাইনষের আক্কেল-পছন্দ কইমা যায়। কখন কী কয় নিজেও জানে না। বোঝেও না। আমারও হইছে সেই দশা। তুই কিছু মনে রাখিস নারে বাপ!'

মজিবর মিয়া বলল, 'আরে না চাচা! আমি তো সেইটা কবেই ভুইলা গেছি। সেই কথা কী আর মনে থাকে!'

লতু হাওলাদার বলল, 'থাকেরে থাকে। চাইলেই কি সব ভুইলা যাওন যায়? যায় না। কেউ যদি কাউরে একটা থাপ্পড় দেয়, যে দেয় সে কয়দিন পরই ভুইলা যায়। কিন্তু যে খায়, সে কোনোদিনও ভুলে না। আমি জানি, তুইও ভুলস নাই। এই জন্যই মাফ চাইতে আসছি।'

মজিবর মিয়া হাসিমুখে বলে, 'না চাচা। আমি ভুইলা গেছি। সবাই যদি সব কিছু মনে রাখে, একই কিসিমের হয়, তাইলে দুনিয়া চলব কেমনে কন?'

লতু হাওলাদার বলল, 'এইটা একটা হক কথা বলছস। তুই মানুষ ভালো। ভালো মানুষ দেইখাই আয়-উন্নতি করতে পারছস। না হইলে দশ গ্রামে তোর মতোন এমন তরতরাইয়া আয়-উন্নতি আর কেডা করতে পারছে? কেউ পারে নাই। আল্লাহর ইচ্ছায় সামনে তোর আয়-উন্নতি আরও হইব। এই বইলা গেলাম, দেখিস।'

মজিবর মিয়া এই কথার পিঠে আর কোনো কথা বলল না। মৃদু হাসল কেবল। খানিক চুপচাপ থেকে লতু হাওলাদার আবার বলল, 'একটা কথা বলতে চাইছিলাম মজিবর। তুই কেমনে না কেমনে নেস। এইজন্য সাহস করতে পারতেছি না। কিন্তু কথাটা বলন বড় দরকার।'

মজিবর বলল, 'আমার কাছে কথা বলতে আবার সাহসের কী আছে চাচা? যা মনে চায় মন খুইলা বইলা ফালান।'

লতু হাওলাদার বলল, 'শুনলিই তো, মোস্তফা আল্লাহর ইচ্ছায় এখন ভালো টাকা-পয়সা রুজি করে। এর মধ্যেই কয় কিস্তিতে টাকাও পাঠাইছে। এখন তোর কাছে আসছি একটা আবদার লইয়া।'

মজিবর মিয়া বলল, 'এইটা তো খুবই ভালো খবর চাচা। তা আপনের আবদারটা কী?'

লতু হাওলাদার বলল, 'আমার জমিটা তো বেশিদিন হয় নাই তুই কিনছস। এই তো, বছরও ঘোরে নাই! এখন তুই রাজি থাকলে জমিটা আমি আবার কিন্যা নিতে চাই। বুঝসই তো, বাপ-দাদার আমলের জমি। নিজের ভেতরই কেমন খচখচ করতেছে। এই জমিটা বেচন আমার ঠিক হয় নাই রে। কিন্তু কী করব বল! উপায় তো ছিল না।'

মজিবর মিয়া সঙ্গে সঙ্গে কোনো জবাব দিল না। লতু হাওলাদারই আবার বলল, 'মোস্তফাও বিদাশ থাইকা চিঠি পাঠাইছে। বলছে, তোরে বললে তুই না করবি না।'

মজিবর মিয়া বলল, 'ও এই কথা চাচা। তা জমিটা তো আমি কিনতেও পারতাম না চাচা। আপনারা বেচলেন বইলাই কিনলাম। কিন্তু চাচা, একটা ঝামেলা হইয়া গেছে।

লতু হাওলাদারের বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল। সে সরু চোখ করে তাকিয়ে বলল, 'কী ঝামেলা?'

মজিবর মিয়া বলল, 'শুনছেন মনে হয়। যযাতিপুরে ইলেক্ট্রিকের লাইন আসতেছে। নদীর ওইপাড়ে নাকি আবার পাকা সড়কও হইব। একেবারে রাঙ্গারোড পর্যন্ত। এইগুলা হইলে যযাতিপুর হাটের অবস্থা দেখবেন কী বিশাল বড় হয়! এই হাট তখন আশপাশের আরও অনেকদূর পর্যন্ত ছড়াইয়া যাইব। এখন ওই জমিটা পড়ছে একদম হাটের সঙ্গেই। আমার একটা পরিকল্পনা হইছে কারেন্ট লাইন আইলেই আমি ওইখানে ধান ভানার একটা মেশিন বসামু, যাতে ঘরে ঘরে আর কষ্ট কইরা দিন-রাত ঢেঁকিতে ধান ভানতে না হয়। একটা স'মিল দেওনের কথাও ভাবতেছি। ওই জায়গার মতোন সোনার জায়গা আর কই পামু কন?'

লতু হাওলাদার যেন দপ করে নিভে গেল। কিন্তু হাল ছাড়ার মানুষ সে না। মুখে হাসি রেখেই সে বলল, 'আরে ধুর! এইসব কানকথায় বিশ্বাস রাখলে চলে! নদীর ওইপারে পাকা উঁচা সড়ক হইব, এই কথা শুনতেছি সেই ল্যাংটা কাল

থেইকা। কই? কিছু হইছে? একটা পায়ে হাঁটনের কাঁচা রাস্তা পর্যন্ত হয় নাই। তারপর বন্যা-বাদলা হইলে মাটি সব ধসাইয়া নিয়া যাইব। তুই বুদ্ধিমান মানুষ, এইসব গুজবে কান দিলে হইব? হইব না। আর কারেন্ট আসন কি এতই সোজা কথা রে মজিবর?'

মজিবর মিয়া এই কথার কোনো জবাব দিল না। সে তার আড়তের হিসাবের খাতা দেখছে। সে আড়তে না থাকলেও মনাই যে গুছিয়ে কাজ করছে, তা এই হিসাবের খাতা দেখলেই বোঝা যায়। এই ছেলের ওপর নির্দ্বিধায় ভরসা করা যায়। লতু হাওলাদার এবার গলার স্বর নিচু করে প্রায় ফিসফিস করে বলল, 'এইসব কথায় বিশ্বাস কইরা সুযোগটা হারাইস না মজিবর।'

মজিবর মিয়া বলল, 'কী সুযোগ চাচা?'

লতু হাওলাদার বলল, 'তুই কি মনে করছস যেই দামে তোর কাছে জমি বেচছি সেই একই দামে জমি কিনতে চাই? তুই যে আমারে কী ভাবস না মজিবর! এইটুক আক্কেল জ্ঞান আমার আছে। তোরে আমি জমির দাম বাড়াই দিমু।'

মজিবর মিয়া বলল, 'চাচা, আপনি বুঝতেছেন না। জমিটা আমার লাগব। আপনি যত টাকাই দেন, জমিটা আমি বেচব না।'

লতু হাওলাদার দমল না। সে আরও উজ্জীবিত গলায় বলল, 'তুই বুঝতেছস না মজিবর, তোরে আমি কত দাম দিব! তুই যেই দামে জমি কিনছস, আমি তোরে তার দেড়গুণ দাম বেশি দিব। একবার চিন্তা কইরা দেখ, মাত্র কয়টা মাস। তোর লাভের হিসাবটা করলি না?'

মজিবর মিয়া বলল, 'চাচা, আমি যে লাভের হিসাবটা ভালোই বুঝি এইটা তো আপনি জানেন। আমি জমি বেচব না চাচা।'

লতু হাওলাদার খানিকটা ম্রিয়মাণ হলেও হাল ছাড়ল না। বলল, 'আরে বাবা, ঠিক আছে। যা তোরে ডাবল দাম দিব। এইবার তো আর কোনো কথা থাকল না। নাকি? আমার কথাটা একবার ভাইবা দেখ, কয়টা মাত্র মাসের লইগা, একই জমি, কত বড় লোকসানে কিনতে চাইতেছি। তাও কী জন্য? শুধু বাপ-দাদার জমি বইলা। এই জমি লইয়া কি আমি কবরে যামু ক? ল ল রাজি হইয়া যা বাপ। ধর এইটা এই বুড়া লতু চাচার একটা আবদার। একটা অনুরোধ।'

মজিবর মিয়া বলল, 'চাচা আপনে আমারে অন্য কোনো একটা অনুরোধ করেন। আমি রাখনের চেষ্টা করব, কথা দিলাম। কিন্তু এই অনুরোধটা আর কইরেন না চাচা। এই অনুরোধটা রাখতে পারব না।'

হঠাৎ করেই যেন লতু হাওলাদারের বাঁধ ভাঙল। সে বসা থেকে এক ঝটকায় উঠে দাঁড়াল। তারপর উত্তেজিত গলায় বলল, 'অনেক দেমাগ বাড়ছে তোর মজিবর। একটা কথা বলি কান দিয়া শোন, বেশি দেমাগ ভালো না।

Boighar.com & ARS

আমার বাড়ির বান্দি আছিল তোর মায় আর তুই। এখন খুব লাট বাহাদুর হইছস না? দেখি তুই কত বড় লাট বাহাদুর হইছস!'

মজিবর মিয়া ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'আমারে নিয়া যা বলার বলেন চাচা। আমার মা'রে নিয়া কিছু বইলেন না।'

লতু হাওলাদার লাফ দিয়ে তার সামনে এসে দাঁড়াল। তারপর আগের মতোই উত্তেজিত গলায় বলল, 'কেন? বললে কী করবি? কী করবি হ্যাঁ? তোর মা যে আমার বাড়ি মাইন্দার খাঁটছে, এইটা এই গ্রামে সকলেই জানে।'

মজিবর মিয়া হাতের খাতাটা রেখে চুপচাপ লতু হাওলাদারের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর শান্ত কিন্তু কঠিন গলায় বলল, 'আপনে এইখান থেকে যান। নাইলে কোনো একটা অঘটন ঘটতে পারে।'

লতু হাওলাদার সাপের মতোন হিসহিস করে বলল, 'কী? আমারে মারবি? মার, মার। দেখি তোর কত বড় হ্যাডম হইছে।' সে আরও দু'পা সামনে আগাল, তারপর মজিবর মিয়ার মুখের কাছে মুখ নিয়ে প্রায় ফিসফিস করে বলল, 'কেন? বাকি ঘটনা শুনবি না? আমার বড় বউ, মোস্তফার মা তোর মা আম্বরি বেগমরে বাড়ি থেইকা কেন খেদাই দিছিল সেই কেচ্ছা শুনবি না?'

www.boighar.com

মজিবর মিয়া থাপ্পড়টা মারল প্রচণ্ড শক্তিতে। সে নিজেও জানে না, কতটা শক্তিতে সে থাপ্পড়টা মেরেছে। লতু হাওলাদার বয়স্ক মানুষ। শীর্ণ পাতলা শরীর। যেন মুহূর্তে বাতাসে ভেসে গেল। চোখের পলকে ছিটকে পড়ল দোকানের সামনে রাখা টুলের কোনায়। তারপর মাটিতে। টুলের ধাক্কায় কপালের বাঁ পাশের খানিকটা জায়গা কেটে দরদর করে রক্ত বেরোল। লতু হাওলাদার কিছুক্ষণ ঠিক তেমনই পড়ে রইল মাটিতে। বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে উঠতে সময় লাগল তার। যখন উঠে বসল, তখন তার চোখ জুড়ে রাজ্যের বিস্ময়! মজিবর মিয়া তাকে চড় মারতে পারে, এটা তার বিশ্বাস হচ্ছে না। সে ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি এই ঘটনা ঘটতে পারে! এমন অবিশ্বাস্য ব্যাপার তার দূরতম কল্পনাতেও ছিল না। কিন্তু এখন কী করবে সে? বিভ্রান্ত, হতবিহ্বল লতু হাওলাদার এদিক-সেদিক তাকাল, আর কেউ দেখেনি তো এই দৃশ্য! আশপাশে কাউকে না দেখে খানিক স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল সে। তারপর ঝট করে উঠে দাঁড়িয়ে কাপড়ের ধুলো ঝাড়ল। খুব ধীরে গলার মাফলার দিয়ে কপালটা মুছল। তারপর একবার, মাত্র একবার সে মজিবর মিয়ার দিকে তাকাল। তার দৃষ্টি জুড়ে তখন ভয়ঙ্কর নিস্তব্ধতা। সাপের চোখের মতোন ঠাণ্ডা দৃষ্টি! লতু হাওলাদার তারপর ঘুরল। বাঁ পায়ে ভর দিয়ে সময় নিয়ে ঘুরল। কিচ্ছু বলল না মজিবর মিয়াকে। কাউকে কিচ্ছু না। খুব ধীরে পা ফেলে সে যযাতিপুরের হাট থেকে বেরুল। একবারের জন্যও আর পিছু ফিরে তাকাল না। একবারও না।

কাকতালীয় হলেও এর সপ্তাহ খানেক পর ঠিক একই রকম আরও একটা ঘটনা ঘটল।

লাইলি শেষ রাতের দিকে মজিবর মিয়াকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে বলল, 'আমি স্বপ্ন দেখছি, ভালো স্বপ্ন।'

মজিবর মিয়া ঘুম জড়ানো গলায় বলল, 'সকালে বইল, এখন ঘুমাও।'

লাইলি কঠিন গলায় বলল, 'না, এখনই শুনতে হইব।'

মজিবর মিয়া রাজ্যের বিরক্তি নিয়ে উঠে বসল। লাইলি বলল, 'আমি স্বপ্ন দেখছি, আমার পোলা হইব।'

মজিবর মিয়া হাই তুলতে তুলতে বলল, 'ভালো স্বপ্ন। শেষ রাইতের স্বপ্ন সত্য হয়। তোমার স্বপ্ন সত্য হইব।'

লাইলি বলল, 'কী বিষয়? আপনের কথা শুইনা মনে হইল আপনে খুশি হন নাই?'

মজিবর মিয়া বলল, 'খুশি হব না কেন? পোলা-মাইয়া যাই হোউক। সন্তান হইব, এইটাই তো বাপ-মায়ের জন্য খুশির খবর!'

লাইলি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'না, পোলা আর মাইয়া এক জিনিস না। পোলা হওন মানে সে বংশের বাতি। বংশের পরিচয়।'

মজিবর মিয়া আবারও হাই তুলল, 'আচ্ছা বুঝছি। চল এখন ঘুমাই। সকাল সকাল অনেক কাজ আছে আমার।'

লাইলি বলল, 'না, এখন ঘুমান যাইব না। আপনার সঙ্গে আমার জরুরি কথা আছে।'

মজিবর মিয়া আবারও হাই তুলতে তুলতে বলল, 'আল্লাহরস্তে এখন ঘুমাও। আমি চইলা যাইতেছি না। জরুরি কথা কাইলও বলন যাইব।'

লাইলি কঠিন গলায় বলল, 'না, এখনই বলতে হইব।'

প্রবল বিরক্তি নিয়ে উঠে বসল মজিবর মিয়া, 'বল তোমার জরুরি কথা।'

লাইলি সঙ্গে সঙ্গেই কিছু বলল না। খানিকক্ষণ অন্ধকারে থম মেরে থেকে বলল, 'আপনের জমিজমা নাকি সব কিছু আরশির নামে?'

মজিবর মিয়া বলল, 'এই কথা তোমারে কে বলল?'

লাইলি বলল, 'যেই বলুক, কথা সত্য কিনা?'

মজিবর মিয়া বলল, 'ঘরের মেয়েছেলের সঙ্গে আমি জমি-জমা, ধন-সম্পত্তি নিয়া কথা বলি না। তোমার থাকা-খাওয়া, ভরণ-পোষণের বিষয়ে যদি কোনো সমস্যা থাকে সেইটা আমারে বলবা, আমি দেখব।'

লাইলি যেন অন্ধকারে সাপের মতোন ফণা তুলল, 'ঘরের মেয়েছেলে না, আমি এখন এই বংশের পোলার মা। এইগুলা আমার জানন দরকার আছে। আমার পোলা এই বংশের বাতি। সবকিছুতে তার অধিকার হইব আগে, তারপর অন্য কেউর।'

Boighar.com & ARS

মজিবর মিয়া যথেষ্ট বিস্মিত হয়েছে। শুধু বিস্মিতই না, সে এই শেষরাতের জমাট অন্ধকার আর গাঢ় নৈঃশব্দে মোটামুটি ভালো রকমের ধাক্কা খেয়েছে। সে বলল, 'লাইলি, আমার সন্তানদের নিয়া চিন্তাভাবনা আমারে করতে দাও। তোমার চিন্তা তুমি কর।'

লাইলি খপ করে মজিবর মিয়ার বাহু ধরল। তার হাতের নখ ঢুকে যাচ্ছে মজিবর মিয়ার বাহুর মাংস চিরে। কিন্তু সেদিকে তখন তার কোনো খেয়াল নেই। সে এবার গলার স্বর উঁচু করে বলল, 'আমার চিন্তাই আমি করতেছি। সব দরদ তো ওই এক মাইয়ার জন্য। আমি কি বুঝি না? আমি সব বুঝি। আমারে আনছেন তো খালি শরীলের গরম কমানোর জন্য। কিন্তু লাইলিরে আপনে চেনেন নাই। লাইলি কিন্তু কচি মাইয়া না। যা বুঝাইবেন সে তাই বুঝবে, এইটা ভাবলে ভুল করবেন।'

মজিবর মিয়ার হঠাৎ রাগ উঠে গেল। কিন্তু পাশের ঘরে আম্বরি বেগম শুয়ে আছেন, আরশি শুয়ে আছে। এই মুহূর্তে উচ্চবাচ্য করা যাবে না। সে গলা নামিয়ে বলল, 'দেখ লাইলি, তুমি খামোখা চিন্তা করতেছ। আমি শুধু আরশির কথা কেন ভাবব? তোমার পেটে যে আইতেছে, সেও তো আমার সন্তান। আমি একজনের জন্য আরেকজনরে ঠকাব কেন? এইটা কোন ধরনের কথা? আরশির নামে যা আছে, আছে। এর বাইরেও তো আমার কিছু আছে, না কী?'

লাইলি বলল, 'অত কিছু আমার বোঝনের কিছু নাই। আরশি মাইয়া মানুষ, তার সম্পত্তির কী দরকার? দুইদিন পর বিয়া দিলে শ্বশুরবাড়ি যাইব। শেষ। আপনে কাইলই অর নামে যা আছে সেইগুলা আমার পেটের সন্তানের নামে লিখা দিবেন।'

এবার সত্যি সত্যি রাগ লাগছে মজিবর মিয়ার। সে কড়া গলায় বলল, পেটের সন্তানের নামেও জমি লিখা দেওন যায় না কী?'

লাইলি বলল, 'যায়। আমি না জাইনা-শুইনা কথা বলি না।'

মজিবর মিয়া বলল, 'এতকিছু তোমারে কে বলল লাইলি?'

লাইলি বলল, 'কে বলল, সেইটা তো আপনার জাননের দরকার নাই। আপনারে যেইটা বলছি, আপনে সেইটা করেন। আমার কথা কিন্তু একটা। আর এই সম্পত্তি আপনেরও না। এই সম্পত্তিতে আপনের চাইতেও আমি আর আমার সন্তানের হক বেশি।'

মজিবর মিয়া অবাক গলায় বলল, 'মানে?'

লাইলি বলল, 'আমার বাপের টাকা দিয়া ট্রলার কিনছেন, সেই ট্রলারের টাকায় সম্পত্তি জুড়ছেন। এই সম্পত্তিতে আমার হক সবচেয়ে বেশি। আর আরশির নামে যা যা করছেন, তার দাম আপনার বাদবাকি সবকিছুর চাইতেও কয়েকগুণ বেশি। এইগুলা আমি জানি না, ভাবছেন? লতু হাওলাদারের কাছ থেইকা যেই জমি কিনছেন, ওই জমির দাম, আড়তের দাম, এইগুলা হইছে

সোনারখনি। আপনে কাইলই এইগুলা লেইখা দেওনের ব্যবস্থা করবেন। এই আমার এক কথা!'

মজিবর মিয়া সঙ্গে সঙ্গেই কোনো কথা বলল না। সে বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে গেছে। সে হঠাৎ তুমি থেকে তুইতে নেমে এলো, 'আগে আমারে বল, এইসব কথা তোরে কে শিখাই দিছে, কে ঢুকাইছে তোর মাথায়? কে বলছে এইগুলা তোরে?'

লাইলি বলল, যে-ই বলুক। আমারে চিনতে ভুল কইরেন না আপনে। আমি কিন্তু মাইয়া ভালো না। এইডা স্টিমারঘাটার সকলে জানে। আমি ভালো হওনের জন্যই আপনার সঙ্গে আইছি। আমারে খারাপ বানায়েন না।'

মজিবর মিয়ার হঠাৎ মাথায় রক্ত চড়ে গেল। সে অন্ধকারে সপাটে চড় বসালো লাইলির গালে। লাইলি ছিটকে পড়ল বিছানায়। মজিবর মিয়া গেঞ্জিটা টেনে নিয়ে দরজা খুলে পা বাড়াল প্রায় সকাল হয়ে আসা আবছা ভোরের আলোতে। একবারও পেছনে ফিরে তাকাল না সে। পেছনে ফিরে তাকালে মজিবর মিয়া হয়তো দেখতে পেত, ঘরের এই অন্ধকারেও লাইলির চোখ দু'খানা ভাটার আগুনের মতোন গনগন করে জ্বলছে!

আম্বরি বেগম সেই লাশের কথা কাউকে বলেননি। খুব কষ্টে আটকে রেখেছিলেন পেটে। বাড়ির কাছেই জঙ্গলের ভেতর একটা মানুষের লাশ পড়ে আছে, সেটা জেনেও কাউকে কিছু না বলে দু-তিনটা দিন কাটিয়ে দেওয়া সহজ কথা না। আম্বরি বেগম রাতে ঘুমাতে পারতেন না। অদ্ভুত এক ভয় গেঁড়ে থাকত বুকের ভেতর। সারাদিন কাজের ফাঁকেও তিনি অবচেতনভাবেই কান খাড়া করে থাকতেন ওই পরিত্যক্ত বাড়ির জঙ্গলের দিকে। যদি কিছু শোনা যায়। যদি কেউ লাশটা পায়। অবশেষে লাশটা পাওয়া গেল। পাওয়া গেল তার তিনদিন পর। লাশ পচে তখন তীব্র গন্ধ ছড়াচ্ছে। যযাতিপুরের হাটে নেওয়ার পর জানা গেল এই লাশ এই গাঁয়ের কারও না। একে কেউ চেনেও না। কিন্তু কথা হলো চেনা-জানা নেই, এমন একজন মানুষের লাশ এই গাঁয়ে অমন পরিত্যক্ত বাড়িতে কেন থাকবে? আর যযাতিপুরে লাশ পড়ার ঘটনা নেই বললেই চলে। এককালে চর দখলের লড়াই হতো, তখন গণ্ডায় গণ্ডায় লাশ পড়ত। অবশ্য তা পড়ত প্রকাশ্যে। কিন্তু এমন গুপ্তহত্যা! পুরো গাঁয়ে যেন আতঙ্কের শীতল স্রোত বয়ে গেল। খুন! জ্বলজ্যান্ত একটা মানুষ খুন হয়ে গেল, অথচ কেউ জানল না, শুনল না। এমনকি এত বড় গাঁয়ের কেউ তাকে চেনেও না!

লাশটাকে অজ্ঞাত হিসেবেই মাটি দেওয়া হলো। থানা-পুলিশ পর্যন্ত হলো না। জানাজার নামাজ পড়ালেন ইমাম আকরাম হোসেন। ইমাম সাহেবের তখন থাকার নতুন জায়গা হয়েছে। এতদিন তিনি মসজিদেই থাকতেন। এর-ওর

Boighar.com & ARS

বাড়ি থেকে টিফিন ক্যারিয়ারে করে খাবার দিয়ে যাওয়া হতো। কিন্তু মোস্তফা বিদেশ যাওয়ার পর থেকে লতু হাওলাদার তার বাড়ির দহলিজ ঘরে ইমাম সাহেবকে লজিং থাকার স্থায়ী ব্যবস্থা করে দিয়েছে।

লাশ মাটি দেওয়ার সপ্তাহখানেক বাদে এক গভীর রাতে ইমাম সাহেবের লজিং বাড়ির দরজায় ঠক ঠক শব্দ হলো। ইমাম সাহেবের অভ্যাস রাতে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়া। কিন্তু বেশ ক'দিন ধরেই শুয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ভয়াবহ সব দুঃস্বপ্ন দেখছেন। ঘুম ভাঙছে চিৎকার করে। এইজন্য তিনি ঠিক করেছেন, ঘুমাবেন গভীর রাত করে। তার আগে বসে বসে কোরআন তেলাওয়াত করবেন। আজও বসে বসে কোরআন তেলাওয়াত করছিলেন। এই সময় ঠক ঠক শব্দ। ইমাম সাহেব খানিক বিস্মিত হলেন, এত রাতে কে! তিনি দরজা খুলে অবাক হয়ে দেখলেন দুই অচেনা নারী দাঁড়িয়ে আছে। একজন মা, আরেকজন মেয়ে। তারা এসেছে সপ্তাহখানেক আগে অজ্ঞাত হিসেবে মাটি দেওয়া সেই লাশের খোঁজে।

মেয়েটার নাম আমেনা। আমেনার স্বামী দীর্ঘদিন বিদেশ ছিল। সে দেশে এসেছে মাস তিনেক হয়। দিন দশেক আগে বাড়ি থেকে তার স্বামীকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল কয়েকজন লোক। তারপর থেকে আর তার স্বামীর কোনো খোঁজ নেই। গতকাল সকালে যযাতিপুরে অজ্ঞাত লাশ পাওয়ার খবর শুনে বহুদূরের মিয়াপুর গ্রাম থেকে এসেছে তারা। মোঘলগঞ্জের কাছাকাছি মাইল পাঁচেক উত্তরে মিয়াপুর গ্রাম। মজিবর মিয়ার নানাশ্বশুর বাড়িও সেই গ্রামে। নিলুফা বানু সেখানেই তার নানা বাড়িতে বড় হয়েছে। তার মৃত্যুর পর তাকে কবরও দেওয়া হয়েছে সেখানেই। যদিও মজিবর মিয়া কখনও সেই গ্রামে যায়নি। কোনো এক অজানা কারণে নিলুফা বানুর মা, নানা জাহাঙ্গীর মাতুব্বর কিংবা মামাদের কাউকেই ঠিক পছন্দ করে উঠতে পারেনি মজিবর মিয়া। ফলে মিয়াপুর গ্রামে কখনও যাওয়াও হয়নি তার। নিলুফা বানুর নানাবাড়ির কারও সঙ্গে তার কোনো সম্পর্কও নাই। নিলুফা বানুর মৃত্যুর পর সেই সম্পর্ক তো পুরোপুরিই নেই হয়ে গেছে। খুবই অদ্ভুত ব্যাপার, মিয়াপুরের কথা শোনামাত্রই এসব কথাই প্রথম মাথায় এলো ইমাম আকরাম হোসেনের। তিনি অবাক গলায় বললেন, 'এই গ্রামের মজিবর মিয়ার নানাশ্বশুর বাড়িও তো মোঘলগঞ্জে। মাতুব্বর বাড়ি।'

আমেনা কিংবা আমেনার মা কেউই এই কথার জবাব দিল না। তবে লতু হাওলাদারের ততক্ষণে ঘুম ভেঙে গেছে। এত রাতে দহলিজ ঘর থেকে নারী কণ্ঠের শব্দ! লতু হাওলাদার ভারি অবাক হয়েছে। সে সদ্য ঘুম ভাঙা চোখে গুটি গুটি পায়ে দহলিজের কাছাকাছি এসে অন্ধকরে গা ঢাকা দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে সে যতটুকু শুনল, তাতে কিছু ঘটনা তার কাছে পরিষ্কার হলো না। মোঘলগঞ্জের মিয়াপুর থেকে যযাতিপুর আসতে বড়জোর একদিন লাগার কথা। কিন্তু গতকাল সকালে খবর পেয়ে এরা এসে পৌঁছেছে আজ এই

গভীর রাতে! কারও স্বামী মারা যাওয়ার ভয় কিংবা চিন্তা থাকলে লাশ পাওয়ার খবর জানার সঙ্গে সঙ্গে রওনা হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু এরা এত দেরি করল কেন? আর যদি দেরি হয়েও থাকে, এরা ইমাম সাহেবের কাছে কেন এসেছে? মজিবর মিয়ার সঙ্গে এদের কোনো সম্পর্ক নেই তো! অনেকগুলো প্রশ্ন নিয়ে লতু হাওলাদার দহলিজ ঘরে ঢুকল। দু'জন আতঙ্কিত এবং ভীতসন্ত্রস্ত নারীকে রাতের বাকিটা সময় সে কঠিন জেরার মধ্যে রাখল। ঘটনা পরিষ্কার হলো ফজরের আজানের পরপর। পুবাকাশ কেবল ফর্সা হয়ে এসেছে, ঠিক সেই মুহূর্তে দেখা গেল কৌতূহলোদ্দীপক এক দৃশ্য!

লতু হাওলাদারের বাড়ির পেছনের খোলা ফসলের মাঠ দিয়ে চারটি ছায়ামূর্তিকে তার বাড়ি লক্ষ্য করে হেঁটে আসতে দেখা গেল। ছায়ামূর্তিদের সবার গায়েই কালো চাদর। তারা পেছনের সরু পথে বাড়ির উঠানে ঢুকল। তারপর উঠানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে উঁচু গলায় লতু হাওলাদারকে ডাকল। লতু হাওলাদার ততক্ষণে অনেক ঘটনাই জেনেছে। শুনেছে। অনেক কিছুই তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। মোঘলগঞ্জের দিকে ইদানীংকালে চরমপন্থী দলটার বিচ্ছিন্ন গ্রুপগুলোর উপদ্রব খুব বেড়েছে। এখানে-সেখানে খুনখারাবি হচ্ছে। ধরে নিয়ে গিয়ে মুক্তিপণ আদায় করা হচ্ছে। ভয়াবহ অবস্থা। যযাতিপুরের সঙ্গে আশেপাশের অঞ্চলগুলোর যোগাযোগ ব্যবস্থা খুব খারাপ বলেই হয়তো এতদিনেও তারা এই গ্রামে খুব একটা আসেনি। কিন্তু সেই অজ্ঞাত লাশ ছিল এই অঞ্চলে তাদের আগমনের সুস্পষ্ট বার্তা। বিপদ ঘনিয়ে আসার পূর্বাভাস। এতদিন কেউ তা ধরতে না পারলেও আমেনার কথাবার্তা শোনার পর লতু হাওলাদারের কাছে এখন তা দিনের আলোর মতোই পরিষ্কার।

আমেনার স্বামীকে টাকার বিনিময়ে ধরে নিয়ে গিয়েছিল লোকমানের গ্রুপ। এ অঞ্চলে এই দুটো গ্রুপই আজকাল এইসব ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। অর্থসঙ্কট প্রকট হওয়ায় টাকার বিনিময়ে আজকাল তারা অহরহ মানুষ খুনও করছে। আমেনার বর্ণনা আর যযাতিপুরে পাওয়া লাশের বর্ণনা মিলিয়ে নিশ্চিত হওয়া গেল যে এই লাশ আমেনার স্বামীরই।

লতু হাওলাদার উঠানে এসে দাঁড়াল। চাদর গায়ের সেই চারজন লোকমান গ্রুপের লোক। এদের সঙ্গে এই মুহূর্তে লোকমান নেই। তবে আবদুল মমিন আছে। সে লতু হাওলাদারকে বলল, 'আপনি লতু হাওলাদার?'

লতু হাওলাদার বলল, 'জে জনাব, আমি লতু হাওলাদার।'

আবদুল মমিন বলল, 'দুইখানা স্ত্রী থাকার পরও ঘরে বিধবা যুবতী মেয়ে-ছেলে আটকে রাখছেন খবর পাইছি। এইজন্য দেখতে আসলাম, আপনি কত বড় তেজওয়ালা ঘোড়া?'

লতু হাওলাদার বিনয়ে গলে গিয়ে বলল, 'কী যে বলেন জনাব। আমি জানতাম, আপনারা আসবেন, এই জন্যই তাদের আর যাইতে দেই নাই।'

আবদুল মমিন সরু চোখে তাকিয়ে বলল, 'মাশআল্লাহ। আপনি তো দেখি খুবই সজ্জন মানুষ। তা খাওন-দাওনের ব্যবস্থা কী? খাওন-দাওনের ব্যবস্থা করেন। খাসি জবাই করেন।;

লতু হাওলাদারের চুপসানো মুখখানা কোনো এক ভবিষ্যৎ ভাবনায় মুহূর্তেই উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে দহলিজ ঘরের চৌকিতে নতুন বিছানার চাদর পেতে দিল। মেঝেতে বিছিয়ে দিল দস্তরখান। পুকুর থেকে মাছ ধরা হলো, গাছ থেকে কাঁদি কাঁদি ডাব পাড়া হলো, খাসি জবাই হলো। দুপুরের দিকে ভরপেট খাওয়া-দাওয়া হলো। খাওয়া শেষে আবদুল মমিন লতু হাওলাদারকে একান্তে ডেকে নিয়ে বলল, 'আমেনার স্বামীরে আমরা খুন করি নাই। খুন করার কথাও ছিল না। আমরা তারে টাকার বিনিময়ে ধইরা আনছিলাম। যারা তারে ধইরা আনতে বলছিল, তাদের সঙ্গে বিদাশ বইসাই কীসব টাকা-পয়সার লেনদেনের ঝামেলা ছিল। তারে আটকাইয়া রাইখা ভয়-টয় দেখাইয়া ঝামেলা বন্ধ করনের কথা ছিল। কিন্তু সে কিছুতেই কোনো কথা শুনতেছিল না। এদিকে আমেনা থানা-পুলিশ করাতে আমরা পড়ছি মহা ঝামেলায়। পুলিশ মাঝে মাঝে এইখানে-সেইখানে হানা দেয়। এখন এইরকম একটা হাত-পাও বান্ধা মানুষ লইয়া এইখান থেকে সেইখানে নড়ন-চড়ন খুব ঝামেলার। আমরা তখন চাইছিলাম, ঝামেলা ছাইড়া দিতে। সেই জন্যই আমেনার কাছে কিছু টাকা-পয়সাও চাওয়া হইছিল। কিন্তু সেও তো দিল না। তো সেইদিন রাতে আমরা মোঘলগঞ্জ থেইকা আরও দূরে ভেতরের কোনো চরের দিকে চইলা যাইতে চাইছিলাম। কিন্তু পথে গালকাটা বশিরের গ্রুপের সঙ্গে শুরু হইল গোলাগুলি। আমেনার স্বামীর হাত-পাও তখন বান্ধা ছিল, ঠিকমতো নড়াচড়াও করতে পারে নাই। অন্ধকারে গালকাটা বশিরের গ্রুপ গুলি করছে, গুলি লাগছিল তার মাথায়। আমরা তখনও বুঝি নাই জখম কতটা গুরুতর। বুঝছি যযাতিপুর আইসা। ট্রলার থেইকা নামাইতে গিয়া দেখি মাথা দুইভাগ হইয়া গেছে। মারা গেছে গুলি লাগার সঙ্গে সঙ্গেই।'

আবদুল মমিন একটু থামল। তারপর আবার বলল, 'এখন ব্যাপারটা হইতেছে, এইখানে যে লাশ পাওয়া গেছে, এই খবর এখনও থানা-পুলিশ হয় নাই। আর হইলেও পুলিশ এতদূর আসব না। কারণ এমনিতেই চাইরদিকে নানান ঝামেলা। এখন আমেনা যাতে এই লাশের খবর নিয়া কোনো ধরনের বাড়াবাড়ি না করে, এইটাই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। আর খুনটাও আমরা করি নাই। এইটা একটা দুর্ঘটনা।'

লতু হাওলাদার হঠাৎ বলল, 'আপনারা তো তাইলে ভালো ঝামেলায় পড়ছেন।'

আবদুল মমিনের চোখ যেন ধক করে জ্বলে উঠল। সে বলল, 'ঝামেলা! ঝামেলার কিছু নাই। আমেনারে ডাকেন।'

আমেনাকে ডাকা হলো। আমেনার সঙ্গে কথা বলার আগে প্রথমবারের মতো আবদুল মমিন তার গা থেকে চাদর সরাল। তার শরীরের সঙ্গে আড়াআড়ি করে বাঁধা একটা শটগান। আমেনা নিজের চোখে কখনও অস্ত্র দেখেনি। আতঙ্কে তার সারা শরীর যেন অবশ হয়ে এলো। আবদুল মমিন তাকে শান্ত গলায় পুরো ঘটনা খুলে বলল। তারপর বলল, 'আশা করি তুমি বুঝতে পারছ, এই ঘটনা আমরা ঘটাই নাই। আমরা কোনো ঝামেলাও চাই না। যেইটা ঘটছে, সেইটা একটা দুর্ঘটনা। কিন্তু যা-ই হোক, এই দুর্ঘটনায় আমাদেরও তো হাত আছে। আমরা তাই চাইতেছি, তুমি চুপচাপ বাড়ি চইলা যাও। ঝামেলা করলে তো আর তোমার স্বামী ফিরা আসব না, আসব?' www.boighar.com

আমেনা তার মাকে নিয়ে লতু হাওলাদারের বাড়ি ছাড়ল আরও ঘণ্টাখানেক পর। তাদেরকে বাড়ি পৌঁছে দিল আবদুল মমিনের লোক। দেশের রাজনৈতিক অবস্থা তখন ধীরে ধীরে স্থিতিশীল হচ্ছে। এ সময় দেখা গেল হঠাৎ হঠাৎ মোঘলগঞ্জের আশপাশের এলাকায় পুলিশের ছোটখাটো অভিযান চলা শুরু হয়েছে। এ অঞ্চলের চরমপন্থী দলটার বিচ্ছিন্ন এই গ্রুপ দুটো তখন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে গা ঢাকা দেওয়ার চেষ্টায়। থানা কিংবা জেলা শহরের আশপাশের এলাকা থেকে তারা সরে যেতে থাকল আরও প্রত্যন্ত গাঁওগ্রামের দিকে। দুর্গম চরাঞ্চলের দিকে। এই অবস্থায় আবদুল মমিন একদিন লতু হাওলাদারকে বলল সে তার চার-পাঁচজন লোক নিয়ে কিছুদিন লতু হাওলাদারের বাড়িতে থাকতে চায়। তাদের বড় দলটা আছে অন্য অঞ্চলে। সেই দলের সঙ্গে রয়েছে দলের প্রধান লোকমান নিজে। লতু হাওলাদার এই প্রস্তাব শোনার সঙ্গে সঙ্গে বিগলিত হাসি হেসে বলল, 'মেহমান পাওয়া অতি সৌভাগ্যের ব্যাপার। আপনেদের মতোন মানুষ যে আমার মতো এই অধমের বাড়িতে থাকার প্রস্তাব দিছেন, এইটা আমার সৌভাগ্য। আপনেদের যতদিন ইচ্ছা নিজের বাড়ি মনে কইরা থাকবেন।'

আবদুল মমিন দলবল নিয়ে গেঁড়ে বসল লতু হাওলাদারের বাড়ির দহলিজ ঘরে। ইমাম সাহেবকে আবার ফিরে যেতে হয়েছে মসজিদে। মাঝে মাঝে আবদুল মমিন দু'চার-দশদিনের জন্য দলবল নিয়ে উধাও হয়ে যায়। আবার ফিরে আসে। লতু হাওলাদার তার সাধ্যমতো চেষ্টা করে তাদের আতিথেয়তা দেওয়ার। আবদুল মমিনের ধারণা ছিল লতু হাওলাদার তাদের কাছে কিছু চাইবে। সে বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই তাদের আশ্রয় দিয়েছে। এমন সেবা-যত্ন করছে। কিন্তু মাসখানেক চলে গেলেও লতু হাওলাদার যখন কিছুই বলল না তখন আবদুল মমিন খানিক বিভ্রান্ত বোধ করতে লাগল।

তার তো মানুষ চিনতে ভুল হওয়ার কথা না। তাহলে?

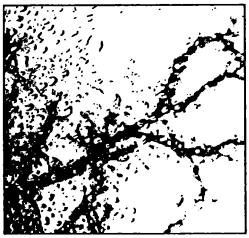

মিলি শুয়ে ছিল অবেলায়। ঘুম ভাঙতেই দেখে সকাল তার মাথার নিচ থেকে বালিশ টেনে নিয়ে তার ওপর ঘোড়ায় চড়ার ভঙ্গি করে বসে আছে। আর মুখে অদ্ভুত উচ্চারণে টগবগ টগবগ শব্দ করছে। সকালের বয়স এখন চার। মিলিকে চোখ মেলতে দেখেই সে বলল, 'আমি ভেবেছি তুমি মরে গেছ।'

মিলি চোখ সরু করে তাকাল, 'কী বলছ এসব?'

সকাল বলল, 'হু'।

মিলির মন খারাপ হয়ে গেল। সকাল পেটে আসার পর থেকেই এই এক রোগ হয়েছে তার। যখন-তখন মন খারাপ হয়ে যায়। কান্না পেয়ে যায়। এমন হয়ে গেল কেন সে! সে তো আগে কখনই এমন ছিঁচকাদুনে ছিল না। তার এই স্বভাব আরও বেড়েছে সকাল হওয়ার পর থেকে। সকাল যত বড় হচ্ছে, মিলির এই অতি স্পর্শকাতর মনোভাব তত বাড়ছে। তবে তার এই স্পর্শকাতরতার পুরোটা জুড়েই শুধু সকাল। একবার খোলা দরজা পেয়ে হামাগুড়ি দিয়ে সামনের মাঠে বেরিয়ে গিয়েছিল সকাল। উল্টে পড়ে গিয়ে ইটের টুকরোয় সামান্য আঘাতও পেয়েছিল। এই ঘটনার পর মিলি চাকরি-বাকরি ছেড়ে দিয়ে পুরোপুরি গৃহিণী হয়ে গেল। যদিও সুজাতা রানী থাকার কারণে তাকে বলতে গেলে ঘরের কাজ কিছুই করতে হয় না। কিন্তু তার সমস্যা হচ্ছে সে সকালকে ছেড়ে এক মুহূর্তও থাকতে পারে না। তাকে কিছুক্ষণ না দেখলেই তার দমবন্ধ লাগে। হাঁসফাঁস লাগে। সারাক্ষণ ভয় হতে থাকে, এই বুঝি সকালের কিছু হলো!

আজ সকালকে নিয়ে খেলতে খেলতেই সে অবেলায় ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুমের ভেতর একটা বাজে স্বপ্নও দেখেছে। সকালকে নিয়েই। এটা অবশ্য নতুন কিছু না। সে রোজই সকালকে নিয়ে উল্টাপাল্টা স্বপ্ন দেখে। সবচেয়ে বেশি দেখে খোলা দরজা দিয়ে সকাল ঘর থেকে বের হয়ে যাচ্ছে। তাকে কেউ আটকাচ্ছে না। এবং তারপর সকালকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু আজ খুব বেশি মন খারাপ হয়েছে সকালের কথায়। সে চোখ মেলে তাকাতেই সকাল বলল যে সে ভেবেছে মিলি মারা গেছে। কিন্তু মা মারা গেলে ছেলের উচিত কান্নাকাটি করা, কষ্ট পাওয়া। কিন্তু সকালের ভেতর সে এমন কিছুই দেখল না।

বরং সে মনের আনন্দে ঘোড়া চালাচ্ছিল। মিলির মাঝে মাঝে মনে হয়, সে ছাড়া জগতের আর সবকিছুর জন্যই সকালের টান আছে। এই ভেবে সে মনে মনে ভীষণ কষ্টও পায়। কিন্তু কী করবে? সকাল এখনও এইটুক এক বাচ্চা ছেলে। তার ওপর কষ্ট পেয়ে কী হবে! তবে মিলির বিশ্বাস, সকাল যত বড় হবে, মায়ের কষ্ট সে ততই বুঝবে। কিন্তু আজ তার একটু বেশিই মন খারাপ হলো। সে বলল, 'মা মারা গেলে তুমি একটুও কষ্ট পাবে না, বাবা?'

সকাল নির্বিকারভাবে বলল, 'পাব তো!'

মিলি বলল, 'কিন্তু মা মরে গেছে ভেবেও তো তুমি একটুও কষ্ট পাচ্ছ না। মনের আনন্দে ঘোড়া চালাচ্ছ!'

সকাল বলল, 'এটা পঙ্খিরাজ ঘোড়া মা। দিদিমা যে বলল, দুষ্টু দৈত্যরা মানুষের আত্মা নিয়ে গিয়ে আটকে রাখে। তখন রাজপুত্তুর পঙ্খিরাজ ঘোড়ায় করে গিয়ে নিয়ে আসে। আমি তো সেই জন্যই যাচ্ছি। কিন্তু দেখো তো মা, আমার ঘোড়াটা না কিছুতেই উড়ছে না!

এইটুকু এক কথা! কিন্তু তাতেই মিলির চোখে পানি এসে গেল। সকাল তার কথা ভেবেই দিদিমার কাছে শোনা রূপকথার গল্পের মতোন পঙ্খিরাজে চড়ে মায়ের আত্মা ফিরিয়ে আনতে যেতে চাচ্ছিল। ইশ! এতটুকু বাচ্চা একটা ছেলে। কিন্তু কী সুন্দর ভাবনা! আর মার জন্য কী টান! মুহূর্তেই মিলির মন ভালো হয়ে গেল! সে সকালকে খপ করে টেনে ধরে বুকের মধ্যে নিয়ে নিল। তারপর দলাই-মলাই করে চুমু খেতে থাকল। বাকিটা দিন তার কাটল প্রজাপতির মতোন। ফুলে ফুলে, রঙে রঙে, উড়ে উড়ে।

শুকরঞ্জন ডাক্তার বহুদিন গাঁয়ে যান না। বহুদিন মানে সত্যিকার অর্থেই বহুদিন। সাত-আট মাসের কম হবে না। বাড়িঘরে তালা মেরে এসেছেন সেই কবে! তার বুকের ভেতরটা কেমন শুকিয়ে থাকে। এই শহর তার ভালো লাগে না। কিন্তু উপায় কী! হঠাৎ করেই গ্রামগঞ্জে যা শুরু হয়েছে! তাতে তিনি নিজেই যেতে ভরসা পান না। আর সুজাতা রানী তো আছেনই। তিনিও পইপই করে বলে দিয়েছেন, আপাতত আর মালোপাড়া না। ফলে তার কাজের মধ্যে কাজ হলো সকালে ঘুম থেকে উঠে পার্কে হাঁটতে যাওয়া, বাসায় এসে পত্রিকা পড়া। আর সারাদিন ঘরে বসে থাকা। নাতি সকালকে খুব একটা কাছে পান না। মিলি পুরোটা সময় তাকে আষ্ঠেপৃষ্ঠে আগলে রাখে। শুকরঞ্জন ডাক্তার বহুদিনের পুরনো ডাক্তার। তিনি অনেক কিছুই হুট করে ধরে ফেলতে পারেন। ইদানীং তার মাঝে মাঝেই মনে হয়, মিলি কি অসুস্থ! এই অসুস্থতা শারীরিক না, মানসিক। তার চোখের দিকে তাকালে শুকরঞ্জন ডাক্তার বিষয়টা টের পান। কেমন ঘোরলাগা এক দৃষ্টি। এক মুহূর্তের জন্য সকালকে চোখের আড়াল হতে

Boighar.com & ARS

দিতে চায় না। বিষয়টা শুকরঞ্জন ডাক্তার কাউকে বলেনওনি। তবে তিনি গভীরভাবে মিলির দিকে খেয়াল করেন। দিন দিন তার আশঙ্কা তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। মিলি হুট করে চাকরি ছেড়ে দিল। আজকাল বলতে গেলে সে তার রুম থেকে বেরই হয় না। প্রথম প্রথম সুজাতা রানী এই নিয়ে খানিক গাইগুই করলেও এখন আর কিছু বলেন না। তবে সকাল দাদী বলতে অজ্ঞান। সে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে তার দাদীকে। দাদী থাকলে তার আর কিছু চাই না। মিলি চাইলেই তাই সকালকে পুরোপুরি নিজের কাছে রাখতে পারে না। দাদীর কাছে আসতে চাইলে তাকে আটকে রাখার সাধ্য কারো নেই। এই নিয়ে সুজাতা রানীর মনে আলাদা একটা তৃপ্তি আছে। খানিক চাপা অহঙ্কারও আছে।

www.boighar.com

মিলি আজকাল মাঝে মাঝেই অদ্ভুত অদ্ভুত সব কাজ করে বসে। অন্যরা হয়তো বিষয়গুলো নিয়ে আলাদাভাবে ভাবে না। কিন্তু শুকরঞ্জন ডাক্তার খুব সূক্ষ্ম চোখে বিষয়গুলো দেখেন। আজ আশিষ বাসায় ফিরল গভীর রাতে। সে মিলিকে ডাকলও না। একা একা খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। পরদিন অফিস ছিল না বলে তার ঘুম ভাঙল দেরি করে। কিন্তু উঠে দেখে বাসায় হুলস্থুল কাণ্ড! রাতে বাসায় ঢুকে সে দরজা বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিল। নিশ্চয়ই বড় কোনো বিপদ হতে পারত! কিন্তু হয়নি। মিলি এই নিয়ে সারাদিন নানা কাণ্ড করল। তার ধারণা সকাল খোলা দরজা দিয়ে রাতে বাইরে বেরিয়ে যেতে পারত। নানাভাবে আশিষ সারাদিনে মিলিকে বোঝাল। শেষ পর্যন্ত মিলি শান্ত হলেও সমস্যা কমল না। বরং বাড়ল। পরদিন থেকে রাতে মিলির ঘুম পুরোপুরি নেই হয়ে গেল। সে মিনিট দশেক পরপর ঘুম থেকে উঠে দরজা বন্ধ কিনা দেখতে যায়। তাকে হাজারবার বুঝিয়েও কোনো লাভ হলো না। সারারাত জেগে সে দরজা পাহারা দিতে থাকল। আর দিনভর ঘুমাতে থাকল। এতে সুজাতা রানীর অবশ্য সুবিধা হয়েছে। তিনি দিনের পুরোটা সময়ই সকালকে কাছে পাচ্ছেন। কিন্তু ক্রমশই চিন্তিত হয়ে উঠছেন শুকরঞ্জন ডাক্তার। তিনি একদিন চুপি চুপি আশিষকে বললেনও। আশিষ বলল, 'কী বল বাবা?'

www.boighar.com

শুকরঞ্জন ডাক্তার বলল, 'আমার কাছে অস্বাভাবিক লাগছে বিষয়টা। তোর কাছে লাগছে না?'

আশিষ খানিক চুপ থেকে বলল, 'একদমই যে লাগছে না, তা না। কিন্তু তোমার মতো করে ভেবে দেখিনি।'

শুকরঞ্জন ডাক্তার বললেন, 'কিন্তু বিষয়টা বেড়ে যাওয়ার আগেই কিছু একটা করা দরকার।'

আশিষ বলল, 'তোমার কী মনে হয় বাবা, ও মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন?'

শুকরঞ্জন ডাক্তার বললেন, 'না, তা হবে কেন? তবে কোনো একটা সমস্যা হচ্ছে। সমস্যাটা বাড়ার আগেই থামাতে হবে।'

শেষ পর্যন্ত আশিষ ওর এক সাইকিয়াট্রিস্ট বন্ধুর কাছে নিয়ে গেল মিলিকে। মিলি এসবের কিছুই জানত না। কিন্তু আশিষের সাইকিয়াট্রিস্ট বন্ধু খুব চমৎকারভাবেই পুরো বিষয়টা নিয়ে মিলির সঙ্গে কথা বলল। মিলি তাকে জানাল যে তার মায়েরও খানিকটা এই সমস্যা আছে। প্রবল অস্থিরতা। অতিরিক্ত টেনশন, যা শেষদিকে ভয়াবহ আকার ধারণ করেছিল। আশিষের বন্ধু মিলিকে নানান কিছু বোঝাল। একটা সময় মিলি তার কথা মেনেও নিল! এরপর মিলিকে তার কাছে আরও দু'দিন নিয়ে গেল আশিষ। কিছু ওষুধপত্রও দিল। এবং অবাক করা বিষয় হচ্ছে মিলির অস্থিরতা ধীরে ধীরে অনেকটাই কমে গেল। মাঝে মাঝে একটু-আধটু পাগলামি করলেও মিলি তখন প্রায় স্বাভাবিক। সে একদিন নতুন চাকরিতেও জয়েন করল।

আশিষের সাইকিয়াট্রিস্ট বন্ধুকে একদিন দাওয়াত দিয়ে আনা হলো বাড়িতে। খাওয়া-দাওয়ার পুরোটা সময় খুবই আনন্দ হলো। গল্পগুজব হলো। একপর্যায়ে সে বলল, 'আপনারা কিছুদিনের জন্য গ্রাম থেকে ঘুরে আসতে পারেন। এতে মিলির জন্য ভালো হবে।'

এই কথায় সবচেয়ে আনন্দিত যিনি হলেন, তার নাম শুকরঞ্জন ডাক্তার। তিনি করুণ দৃষ্টিতে সবার দিকে তাকালেন। সুজাতা রানী গম্ভীর মুখে বললেন, 'ঠিক আছে, আগে আশিষ আর বউ দেখুক, তারা সময় করতে পারে কিনা!'

শুকরঞ্জন ডাক্তার দীর্ঘদিন এমন সুখের খবর শোনেননি। তিনি প্রবল আনন্দ নিয়ে রাতে ঘুমাতে গেলেন। সকাল প্রথমবারের মতো গাঁয়ে যাবে এই আনন্দে সারারাত তার ভালো ঘুম হলো না। যতটুকু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়েছেন, ততক্ষণই নানান উল্টাপাল্টা স্বপ্ন দেখলেন। তবে সেই স্বপ্নের বেশিরভাগই সুখস্বপ্ন!

Boighar.com & ARS

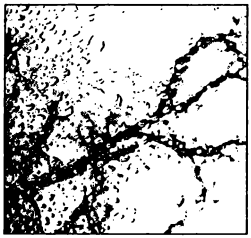

আতাহার তালুকদার বসে আছেন তার ঘরের সামনের বারান্দার রেলিংয়ে। পাশে বসে আছে তার নাতনি রুপাই। রুবিনা দু'দিন হয় ঢাকা থেকে এসেছে। রুপাইয়ের স্কুল বন্ধ। এবার থাকবে কিছুদিন। সাতসকালে স্ত্রী রুবিনাকে নিয়ে আফজাল তালুকদার বের হয়েছেন। অবশেষে গাঁয়ে ইলেক্ট্রিসিটি আসার একটা ব্যবস্থা বোধহয় করা গেল। আফজাল সেই কাজেই জেলা শহরে গিয়েছে। সঙ্গে নিয়ে গেছে রুবিনাকে।

রুপাই খুব যন্ত্রণা করছে। তার মাথায় হাজার হাজার প্রশ্ন। সে একের পর এক প্রশ্ন করেই যাচ্ছে। আতাহার তালুকদারের অবশ্য সেদিকে খেয়াল নেই। তিনি একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন তার সামনের বিস্তৃত প্রান্তরের দিকে। এই মুহূর্তে তার সঙ্গে আর রুপাইয়ের সঙ্গে এই একটা দিক দিয়ে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। রুপাইয়ের মতো তার মাথায়ও হাজারটা প্রশ্ন। পরিত্যক্ত হিন্দু ভিটেবাড়িতে সেই অজ্ঞাত লাশ পাওয়ার পর থেকেই রোজ নানান প্রশ্ন এসে ভিড়েছে তার মাথায়। কিছু প্রশ্নের উত্তর তিনি নিজে নিজেই আবিষ্কার করছেন। কিছু প্রশ্নের উত্তর তিনি খুঁজে পাচ্ছেন না। তিনি যে লক্ষ্য নিয়ে যযাতিপুর এসেছিলেন, তা যে পুরোপুরি ঠিক পথে এগোচ্ছে, তাও না। আবার তিনি যে পুরোটাই ভুল পথে এগোচ্ছেন তাও না। তার ইচ্ছে ছিল যযাতিপুর লোকসমাগমের কেন্দ্রবিন্দু একটা জায়গা করা এবং নিয়ন্ত্রণটা তার হাতে রাখা। তিনি খুব সফলভাবে সেটা করতে পেরেছেন। হাটটা জমে উঠেছে। পাশে নদী থাকায় ধীরে ধীরে বড় বন্দর হওয়ার দিকেও এগিয়ে যাচ্ছে। এখন এই হাটের ওপরই বলতে গেলে পুরোপুরি নির্ভরশীল হয়ে উঠেছে এই এলাকার মানুষ। শুধু এই এলাকার না, যযাতিপুরের আশপাশের মানুষও। তিনি হাটের কোনো নাম দেননি। লোকজন যযাতিপুর হাট বললেও আতাহার তালুকদারের বা তালুকদার হাট নামেও পরিচিত হয়ে উঠেছে জায়গাটা। এটা তার পরিকল্পনা সফল হয়ে ওঠার একটা বড় উদাহরণ। তিনি জানেন, এই হাট টিকে থাকবে সহস্র বছর, সঙ্গে টিকে থাকবেন তিনিও, তালুকদার বংশও। তিনি এখন চেষ্টা করছেন নদীর ওপারের মাইল সাতেক রাস্তার একটা অনুমোদন নেওয়ার। সমস্যা হচ্ছে

www.boighar.com

সরকারে ক্ষমতা বদলেছে। নতুন যারা এসেছে তাদের অনেকের সঙ্গেই তার চেনা-জানা নেই। আফজাল একা কতদূর কী করতে পারবে, তা তিনি জানেন না। তবে আফজালের চেনা-জানা কিছু বন্ধু-বান্ধব তো আছেই। দেখা যাক কী হয়! কিন্তু লাশের ঘটনাটা কী?

লাশ মাটি দেওয়ার ব্যবস্থাও তিনিই করেছেন। কিন্তু বিষয়টি তার কাছে পরিষ্কার না। লোকমান গ্রুপ আর গালকাটা বশিরের গ্রুপের কথা তিনি শুনেছেন। তবে তিনি এ বিষয়েও নিশ্চিত ছিলেন, হুট করে এতদূরে তারা আসবে না। কিন্তু লাশটা তাহলে এখানে কী করে এলো? তিনি অনেক ভেবেছেন, জবাব পাননি। অন্য জায়গা থেকে খুন করে লাশ এখানে ফেলে রাখার কোনো যৌক্তিকতা নেই। আর অচেনা অজানা কাউকে এখানে এনে খুন করার কি কারণ! কী মনে করে আতাহার তালুকদার রূপাইয়ের হাত ধরে হাটতে বের হলেন। তাদের সঙ্গে বের হলো বাচ্চুও। উদ্দেশ্যহীনভাবে হাঁটলেন অনেকটা সময়। রুপাই হঠাৎ বলল, 'দাদাভাই, তুমি আরশিকে চেন?'

আতাহার তালুকদার কপাল কুঁচকে বললেন, 'আরশি? কোন আরশি?'

রুপাই বলল, 'মা তো রোজ আরশির কথা বলে আমাকে ভয় দেখায়। বলে আমি না পড়লে, না খেলে, না ঘুমালে মাও আরশির মায়ের মতোন মরে যাবে।'

আতাহার তালুকদার তারপরও মনে করতে পারলেন না। তিনি আবারও জিজ্ঞেস করলেন, 'কোন আরশি?'

রূপাই বলল, 'ওমা! তুমি ভুলে গেছ! কেন? মনে নেই, সেবার মা যে দেখতে গেল!'

আতাহার তালুকদারের এবার মনে পড়ল। বয়স বেড়ে গেছে। কতকিছুই আজকাল হুটহাট ভুলে যান। তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, চিনব না কেন?'

রূপাই বলল, 'তুমি কি জানো ও আমার বন্ধু? অবশ্য রাগী বন্ধু, ও কারও সঙ্গেই কথা বলে না।'

আতাহার তালুকদার বললেন, 'ও তোমার বন্ধু হতে যাবে কেন? ও থাকে এখানে, আর তুমি থাক শহরে। তাছাড়া এক-দুই দিনের পরিচয়েই কেউ কারো বন্ধু হয় না।'

রূপাই কিছু বলতে যাচ্ছিল। এই মুহূর্তে লোকগুলোকে চোখে পড়ল আতাহার তালুকদারের। আড়াআড়ি ক্ষেতের আইল ধরে হেঁটে যাচ্ছে দশ-বারোজন লোক। ভোর হলেও রোদ উঠে গেছে। কিন্তু এই অসময়েও মানুষগুলোর গায়ে চাদর। আতাহার তালুকদার বাচ্চুকে ডেকে বললেন, 'এরা কারা?'

বাচ্চু বলল, 'বুঝতেছি না স্যার। আগে তো কোনোদিন দেখছি বলে মনে পড়ে না।'

আতাহার তালুকদার বললেন, 'এদের ডাকো।'

Boighar.com & ARS

বাচ্চু গলার স্বর উঁচু করে তাদের ডাকল। কিন্তু তারা কেউ সেই ডাকে সাড়া দিল না। বাচ্চু বলল, 'স্যার আমি দৌড়াইয়া যাব? গিয়া ডাইকা নিয়া আসব?'

আতাহার তালুকদার বলল, 'না। কিন্তু খোঁজ লাগাও এরা কারা?'

বাচ্চু সন্ধ্যা নাগাদ খোঁজ বের করে ফেলল। আতাহার তালুকদার খবর শুনে কপাল কুঁচকালেন। আফজাল আর রুবিনা জেলা শহর থেকে ফিরেছে। তিনি তাদের দু'জনকেই ডাকলেন। আতাহার তালুকদার আফজালকে বললেন, 'ইলেক্ট্রিসিটির বিষয়টা কনফার্ম হওয়ার পরই তুমি ঢাকা চলে যাবে।'

আফজাল তালুকদার বলল, 'এখানে কাজ শেষ বাবা?'

আতাহার তালুকদার বললেন, 'আপাতত শেষ। নেক্সট সেন্ট্রাল ইলেকশনটা গুরুত্বপূর্ণ। আমার টার্গেট ছিল ওটাই। এই বিশাল অঞ্চলের মানুষের কাছে ভোট চাওয়ার কিছু কারণ এখন আমাদের আছে। নদীর ওপারে রাঙ্গারোড পর্যন্ত রাস্তাটা করে ফেলতে পারলে সেই কারণটা আরও জোরাল হতো। তুমি ওটার জন্য ঢাকায় বসেই চেষ্টা কর।'

রুবিনা হঠাৎ বলল, 'কোনো সমস্যা, বাবা?'

আতাহার তালুকদার খানিকক্ষণ থম মেরে থেকে বললেন, 'না, সমস্যা না। তবে যেটা বলেছি সেটা কর।'

সেই রাতে আতাহার তালুকদার তার বাড়ির সামনে বাচ্চুর সঙ্গে আরও চারজনকে পাহারায় বসালেন। তিনি জেগে রইলেন সারারাত। কিন্তু ঘটনা ঘটল পরদিন। পরদিন রাত ৯টা-১০টার দিকে ইমাম আকরাম হোসেন গিয়ে হাজির হলেন তালুকদার বাড়ির গেটে। বাচ্চু বলল, 'এত রাইতে কী চান?'

ইমাম সাহেব বললেন, 'তালুকদার সাবের বিপদ। তার সঙ্গে আমি একটু কথা বলব।'

বাচ্চু বলল, 'সকালে আসেন, সে এখন ঘুমায়।'

ইমাম সাহেব বললেন, 'এখন ঘুমানোর সময় না। জাইগা থাকনের সময়। তারে খবর দাও, জরুরি।' www.boighar.com

বাচ্চু কী করবে ভেবে পাচ্ছিল না। এই সময় আতাহার তালুকদার নিজে ওপর থেকে ডাক দিলেন। বাচ্চু ইমাম সাহেবকে নিয়ে আতাহার তালুকদারের কাছে গেল। আতাহার তালুকদার ঠাণ্ডা চোখে ইমাম সাহেবকে পর্যবেক্ষণ করলেন। তারপর বললেন, 'বলেন ইমাম সাহেব।'

ইমাম সাহেব খানিক দম নিয়ে বললেন, 'আপনের বড় বিপদ তালুকদার সাব। লতু হাওলাদার আপনেরে খুন করার পরিকল্পনা করতেছে। শুধু আপনেরে একা না। এইখানে আপনার পরিবারের যারা আছে, সবাইরেই।'

আতাহার তালুকদার এই খবর আশা করেননি। তিনি ভেতরে ভেতরে রীতিমতো বড়সড় একটা ধাক্কা খেয়েছেন। লতু হাওলাদার কেন তাকে খুন

করার পরিকল্পনা করবে! লতু হাওলাদারের সঙ্গে তো তার কোনো ঝামেলা নেই। তিনি নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'ঘটনা খুলে বলেন।'

ইমাম সাহেব বললেন, 'আশপাশের যেইসব এলাকায়, চরাঞ্চলে আপনার জমিজিরাত নিয়া দ্বন্দ্ব ছিল, এরা সবাই এক হইছে। এদের সবাইরে গত মাস দুই ধইরা এক করতে ছিল লতু হাওলাদার। এরা সবাই জানে, মামলা-মোকদ্দমা কইরা এইসব জমি আপনের কাছ থেইকা তারা নিতে পারব না। তার ওপর এদের অনেকের হাতেই এখন নানানভাবে কাঁচা পয়সা আছে। এরা এখন যেকোনো উপায়েই হোক শুধু জমি বাড়াইতে চায়। কিন্তু এইটাও জানে আপনে কোনোদিনও জমি বেচবেন না। এতদিন আপনে ঢাকা ছিলেন। সবাইর ধারণা ছিল আপনে আর এলাকায় আসবেন না। কিন্তু এখন তো দেখা যাইতেছে উল্টা ঘটনা। এদিকে আপনার ছেলে আফজাল সাবরে আপনি গ্রামে আইনা যেইসব কাজ করতেছেন, তাতে দিনকে দিন তারা আরও ভয় পাইতেছে। লতু হাওলাদার এতদিন ধইরা এইসবই বুঝাইছে। তাদের এক করছে।'

আতাহার তালুকদার ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'এতকিছু আপনি জানলেন কী করে? আর আমার যদি ভালোই চান, তাহলে এসব বলতে আজ এলেন কেন? এতদিন কী করছেন?'

ইমাম সাহেব বললেন, 'যা জানার আজকেই জানছি। এর আগে লোকমান গ্রুপের কয়েকজন লোক মাঝে মাঝে লতু হাওলাদারের বাড়িতে থাকত। কিন্তু সেইটার সঙ্গে আপনার কোনো সম্পর্ক আছে এইটা আমি ভাবি নাই। কিন্তু আজ সব পরিষ্কার হইল। আমি এতদিন থাকতাম মসজিদে। জরুরি এক কাজে এশার নামাজ শেষে বাড়িতে গেছি। গিয়া দেখি বাড়িভর্তি লোক। কমপক্ষে দশজন হইব। সবাই লোকমান গ্রুপের। এরা এখন আছে নানান বিপদে। হাতে টাকা-পয়সাও নাই। ফলে পয়সার জন্য হেন কোনো কাজ নাই, যা এরা এখন করতে পারে না। আর এই সুযোগটাই নিছে লতু হাওলাদার। সে তাদের বুঝাইছে, এই এলাকায় আপনার কাছে যত নগদ টাকা-পয়সা আছে, তা আর কারও কাছেই নাই। আপনেরে খুন করতে পারলে এদের আর পয়সার চিন্তা করতে হইব না। আর পুরো কাজ হইলে তারাও তো টাকা দিব।'

আতাহার তালুকদার মিনিটখানেক চুপ করে বসে রইলেন। তারপর নরম গলায় বললেন, 'ইমাম সাহেব, আমি এখন কী করব?'

ইমাম সাহেব সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন না। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'আল্লাহপাক মানুষের ভালো কাজের খুব গুরুত্ব দেন তালুকদার সাব। প্রতিদানও দেন। কর্ম কখনও বিফলে যায় না।'

আতাহার তালুকদার ইমাম সাহেবের কথা বুঝতে পারলেন না। তিনি বললেন, 'এখন এই কথার মানে কী ইমাম সাহেব! আপনার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

Boighar.com & ARS

ইমাম সাহেব বললেন, 'আপনার বুঝতে হইব না তালুকদার সাব। আপনে সবাইরে রেডি হইতে বলেন। এখুনি যযাতিপুর ছাড়তে হইব। আমি আসতেছি।'

আতাহার তালুকদারকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই বাতাসের বেগে বেরিয়ে গেলেন ইমাম আকরাম হোসেন। আতাহার তালুকদার বুঝতে পারছিলেন না এই বিপদে তিনি কী করবেন! তিনি নিজের জন্য চিন্তা করেন না। তার চিন্তা রুবিনা, আফজাল আর রূপাইয়ের জন্য। কিন্তু ইমাম সাহেবকে কি বিশ্বাস করা ঠিক হচ্ছে? তালুকদার সাহেব আর ভেবে সময় নষ্ট করলেন না। আফজালকে ডেকে পুরো ঘটনা খুলে বললেন। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গোছগাছ করতে বললেন। ঘণ্টাখানেক পর ইমাম সাহেব হাজির হলেন মজিবর মিয়াকে সঙ্গে নিয়ে। আতাহার তালুকদার অবাক চোখে ইমাম সাহেবের দিকে তাকিয়ে রইলেন। ইমাম সাহেব বললেন, 'মজিবর মিয়ার ট্রলার নিয়া মনাই ঘাটে অপেক্ষা করতেছে। আপনেরা তাড়াতাড়ি বাইর হন। মজিবর মিয়া আর আমিও আপনাদের সঙ্গে যাব। মোঘলগঞ্জ পর্যন্ত পৌঁছাই দিয়া আসব।'

আতাহার তালুকদার কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেলেন। ইমাম সাহেবই বললেন, 'তালুকদার সাব, আল্লাহপাক মানুষের ভালো কাজের প্রতিদান দেন। সেইদিন রুবিনা আম্মাজান মজিবর মিয়ার মাইয়া আরশির জন্য যা করছে, রাত-দিন, বিপদ-আপদ না ভাইবা যেমনে ছুইটা গেছিল। আর আজ মজিবর মিয়া ঠিক একইভাবে ছুইটা আসছে। মজিবর মিয়া দুইদিন পর এই এত রাইতে কেবলমাত্র মোঘলগঞ্জ হাট থেইকা ট্রলার নিয়া ফিরছে। আমি তার বাড়িতে গিয়া দেখি সে ভাত খাইতে বসছে। কিন্তু ঘটনা শোনামাত্র সে ছুইটা আসছে। ভাতও খায় নাই। আল্লাহপাকের কী চমৎকার হিসাব!'

আতাহার তালুকদার কোনো কথা বললেন না। সবাই গোছগাছ করে বের হওয়ার ঠিক আগমুহূর্তে রুবিনা বলল, 'কিন্তু ইমাম সাহেব, আপনার আর মজিবর মিয়ার আমাদের সঙ্গে যাওয়া ঠিক হবে না। ওরা এসে আমাদের না পেলে বদ্ধ উন্মাদ হয়ে যাবে। আর তখন আপনারা দুইজনই যদি গ্রামে না থাকেন, বিষয়টা পানির মতো পরিষ্কার হয়ে যাবে। আমরা আমাদের নিজেদের জন্য আপনাদের এত বড় বিপদে ফেলতে পারি না।'

খুবই যুক্তিসঙ্গত কথা। কিন্তু ইমাম সাহেব কিংবা মজিবর মিয়া, দুইজনের কেউই এই কথা মেনে নিতে চাইল না। নানান যুক্তিতর্কের চেষ্টা করল। মজিবর মিয়া বলল, 'আমি দুইদিন আগে গেছিলাম মোঘলগঞ্জ। আইজ এই এত রাইতে ফিরছি। আমি যে বাড়ি ফিরছি এই কথা কেউ জানেও না। এখন আমি গেলে কোনো অসুবিধা নাই। সবাই জানে আমি মোঘলগঞ্জেই আছি। তয় হুজুরের সমস্যা হইব। কারণ সে থাকে মসজিদে। আমার কথা হইছে, আমি যাই। হুজুর থাকুক। সে এখন গিয়া চুপচাপ ঘুমাইয়া পড়ব মসজিদে। ফজরের নামাজের

সময় ঘুম থেইকা উইঠা আজান দিয়া মসজিদে নামাজের ইমামতি করাইব। সকালে মক্তবে বাচ্চা-কাচ্চাদের পড়াইব। তাছাড়া এই রাইতে নদীপথে হুজুরের গিয়া তো কোনো লাভও নাই। আমার যাওন দরকার, কারণ পথঘাট আমি চিনি। এখন বাদবাকি আপনাদের বিবেচনা।'

রুবিনা বলল, 'মজিবর মিয়া ঠিক কথাই বলেছে।'

সবকিছু গোছগাছ করা হলো অতিদ্রুত। ট্রলারেও ওঠা হলো। সবার শেষে ট্রলারে উঠল রুবিনা। সে ইমাম আকরাম হোসেনকে ডেকে বলল, 'ইমাম সাহেব আপনাকে আমার অনেক কিছু বলার ছিল, কিন্তু এই মুহূর্তে কিছুই বলার খুঁজে পাচ্ছি না। সেইদিন মজিবর মিয়ার বাড়িতে ভোরবেলা আরশির জন্য আপনি যখন ইনজেকশন নিয়ে ফিরলেন, তখন হঠাৎ আমাকে মা জননী বলে ডাকলেন। আমি খুব অবাক হয়েছিলাম। আজও অবাক হয়েই ফিরে যাচ্ছি। তবে কোনো একদিন আবার নিশ্চয়ই আপনার সঙ্গে আমার দেখা হবে। এটা আমার কার্ড, এখানে আমার অফিসের ঠিকানা লেখা আছে। কোনোদিন ঢাকায় এলে চলে আসবেন। সেদিন অনেক কথা বলব আপনার সঙ্গে। এখন বিদায় দেন।'

রুবিনা তার কার্ড দিল ইমাম সাহেবকে। মজিবর মিয়া তাদেরকে নিয়ে ট্রলার ছাড়ল। রুপাই তখনও ঘুমিয়ে। সে জানলই না কী হয়ে গেল এই অন্ধকার কালো রাতে। তাদেরকে মোঘলগঞ্জে পৌঁছে দিয়ে পরদিন রাতে বাড়ি ফিরল মজিবর মিয়া। এসে সারারাত ধরে সে ঘুমাল। পরদিন ভোরে উঠে আড়তে গেল। চারপাশে সবকিছু স্বাভাবিক। শুধু একটা জিনিস ছাড়া, সেটা হলো, আতাহার তালুকদারের বিশাল বাড়িতে উঠে বসেছে লোকমান গ্রুপের লোকজন। তারা মাঝে মাঝে বাজারে আসে। লোকজন ভীতসন্ত্রস্ত চোখে তাকায়।

আতাহার তালুকদার, আফজাল, রুবিনারা ঢাকায় পৌঁছাল দুইদিন পর। চতুর্থদিন দুপুরে বুকে চিনচিনে ব্যথা উঠল আতাহার তালুকদারের। সেই ব্যথা আর সারল না, বাড়তেই থাকল।

আতাহার তালুকদার মারা গেলেন সেদিনই রাত আড়াইটায়।

Boighar.com & ARS

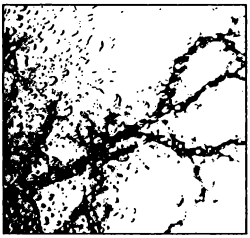

আশিষ আর মিলি, দু'জনেরই ছুটির ব্যবস্থা হয়েছে।

শুকরঞ্জন ডাক্তারের আনন্দ যেন আর ধরছে না। তার মনে হচ্ছে তিনি কয়েক যুগ পর বাড়ি যাচ্ছেন। মনে মনে তিনি একটা পরিকল্পনাও করে ফেলেছেন। বাড়িতে গিয়েই তিনি অসুস্থ হওয়ার ভান ধরবেন। সেই অসুস্থতার ওষুধ হচ্ছে গাঁয়ের খোলা আলো-হাওয়া। দেখা যাক তার এই ভান কাজে দেয় কিনা। কাজে দিলে এবার লম্বা সময়ের জন্য থেকে যেতে চেষ্টা করবেন। সবচেয়ে ভালো হতো আশিষ আর মিলিকে রেখে দিতে পারলে। সকাল তাহলে এই বয়স থেকেই বেড়ে ওঠার আসল মজাটা পেত। শহরে বাচ্চাদের শৈশব বলে কিছু থাকে নাকি! কিন্তু তিনি জানেন, এটা সম্ভব না। মিলি আর আশিষের পক্ষে গ্রামে ফিরে যাওয়া কিছুতেই সম্ভব না। শুকরঞ্জন ডাক্তার আগে থেকেই যাওয়ার বন্দোবস্ত শুরু করেছেন। জিনিসপত্র গোছাচ্ছেন। আর আঙুলে কর গুনছেন, ছুটির তারিখ আসতে আর কতদিন বাকি!

আজকাল গ্রামের গল্প শুনে শুনে সকাল তার কাছেও আসা শুরু করেছে। সে যা-ই শোনে, চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে বলে, 'সত্যি!!' তখন তার ডান হাত মাথায় চলে যায়। এই দৃশ্য দেখতে কী যে ভালো লাগে শুকরঞ্জন ডাক্তারের! তিনি এমন সব গল্প বলার চেষ্টা করেন, যা শুনে সকাল বারবার চোখ গোল করে 'সত্যি' বলে বিস্ময়ে মাথায় হাত দেবে! আজ সারাদিনে তার এই ইচ্ছা অসংখ্যবার পূরণ হয়েছে। গাঁয়ে যাওয়ার আর দু'দিন মাত্র বাকি। শেষদিকে এসে শুকরঞ্জন ডাক্তারকে যেন গাঁয়ের নেশা পেয়ে বসেছে। সারাদিনে মালোপাড়া, যযাতিপুর, রামপাড়ার কত কত গল্প যে তিনি বলেছেন! এইসব গল্প সকালের অচেনা, সে যা শোনে তাতেই মুগ্ধ। শুকরঞ্জন ডাক্তার বললেন, 'মাছ চিন দাদা ভাই, মাছ?'

সকাল বলল, 'চিনি, ফিশ। এফ আই এস এইচ।'

শুকরঞ্জন ডাক্তার বললেন, 'একটা মাছের নাম আছে কই মাছ।

সকাল ফিক করে হেসে দিয়ে বলল, 'কই মাছ? এটার ইংরেজি কী, হোয়্যার ফিশ? হি হি হি!'

সকালের উত্তরে শুকরঞ্জন ডাক্তারও হাসলেন। সকাল একটা-দুটো নতুন ইংরেজি শব্দ শিখেছে। তাই পরিচিত কোনো শব্দ পেলেই সেগুলো সে ইংরেজিতে বলার চেষ্টা করে। এটা তার কাছে একধরনের খেলা। এখন সে কই মাছকে বানিয়েছে হোয়্যার ফিশ!

শুকরঞ্জন ডাক্তার বললেন, 'এই মাছের একটা মজার ব্যাপার আছে। এরা শুধু সাঁতারই কাটে না। কানে ভর দিয়া মাটিতে হাঁটতেও পারে।'

সকাল মাথায় হাত তুলে সত্যি বলতে বলতেও থেমে গেল। মাছ কীভাবে হাঁটে, তাও আবার কানে, এটা তার বোধগম্য হলো না। শুকরঞ্জন ডাক্তার নানাভাবে বোঝানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু সে কোনো কিছুই শুনল না। শেষমেশ সকালকে সুজাতা রানীর কাছে দিয়ে শুকরঞ্জন ডাক্তার সেই ভরদুপুরে বের হলেন বাইরে। তার হাতে প্লাস্টিকের বাজারের ব্যাগ। তিনি আশপাশের বাজারে তন্নতন্ন করে জীবন্ত কই মাছ খুঁজলেন, কিন্তু পেলেন না। ওই ভরদুপুরে বেশিরভাগ মাছের বাজারই বন্ধ। তবে তিনি হাল ছাড়ার পাত্র না। তার চোখ-মুখ জুড়ে গভীর উত্তেজনা, সকাল জীবন্ত কই মাছের হেঁটে যাওয়া দেখে কী রকম করবে! কী প্রতিক্রিয়া দেখাবে! এই দৃশ্য ভেবে ভেবে শুকরঞ্জন ডাক্তার বারবার শিহরিত হচ্ছিলেন! তিনি জীবন্ত কই মাছ পেলেন সন্ধ্যার আগে আগে। বাসায় ফিরলেন সন্ধ্যার পর। ফিরে দেখেন আশিষ বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। এই অসময়ে আশিষ বাসায় কেন! কোনো অঘটন নয়তো! শুকরঞ্জন ডাক্তার দৌড়ে ঘরে ঢুকলেন। বাজারের ব্যাগ রেখে সুজাতা রানীকে ডাকলেন। কিন্তু সুজাতা রানীর বদলে এলো আশিষ। সে ম্লান মুখে বলল, 'বাবা একটা ঝামেলা হয়ে গেছে।'

শুকরঞ্জন ডাক্তার উৎকণ্ঠিত মুখে বললেন, 'কী ঝামেলা?'

আশিষ বলল, আগামীকাল দুপুরে আমাকে দিল্লি যেতে হবে। জরুরি একটা রিপোর্টিং অ্যাসাইনমেন্ট পড়ে গেছে। সম্পাদক নিজে আজ ডেকে বলেছেন। উনার ধারণা, এটা আমি ছাড়া আর কেউ পারবে না। আর এটার ওপর আমার একটা বড় প্রমোশনও নির্ভর করছে।' www.boighar.com

শুকরঞ্জন ডাক্তার যেন খানিক হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। আশিষদের এই মুহূর্তে গাঁয়ে যাওয়া হবে না ভেবে তার যে মন খারাপ হচ্ছে না, তা না। তবে তিনি কেন যেন ভয়ঙ্কর কোনো কিছুর আশঙ্কা করছিলেন। সেই আশঙ্কা থেকে যে তার মুক্তি মিলেছে, এতেই তিনি খুশি। তিনি মুখে হাসি টেনে বললেন, 'কোনো সমস্যা নাই। তুই যা, দিল্লি থেকে ঘুরে আয়। সবার আগে চাকরি। গ্রামে পরেও যাওন যাইব।'

আশিষ তবুও অপরাধীর গলায় বলল, 'বাড়ি যাওয়ার ইচ্ছাটা আর সবার চেয়ে আমার অনেক বেশিই বাবা। সে কবে গিয়েছি! মনেও করতে পারি না।

তবে শোন, আমি সম্পাদককে বলেছি, দিল্লির সাত দিনের ট্যুর শেষে ফিরে আসতেই যেন আমাকে লম্বা একটা ছুটি দেন। তিনি রাজি হয়েছেন।'

শুকরঞ্জন ডাক্তার বললেন, 'খুবই ভালো কথা। তুই ভালোয় ভালোয় কাজটা সেরে আয়।'

রাতে খাবার টেবিলে মিলির সঙ্গেও কথা হলো। মিলিও একমত হলো। আশিষ ফিরে আসার পর গেলেই ভালো। তারও ছুটি পরিবর্তন করতে খুব একটা সমস্যা হবে না। তবে শুকরঞ্জন ডাক্তারের যেন আর তর সইছিল না। তিনি বললেন, 'তোমরা সবাই তাহলে আশিষ ফিরা আসনের পরেই আসো। আমি একটু আগেভাগেই চইলা যাই। বাড়িঘরের কী অবস্থা কে জানে! লোকজন নিয়া একটু গোছগাছ করি!'

এতক্ষণে সুজাতা রানী কথা বললেন। কথা বললেন মানে হেসে দিলেন। তিনি বললেন, 'যাও, তুমি কালকেই যাও। গিয়া একটু বুক ভইরা শ্বাস-প্রশ্বাস নাও।'

শুকরঞ্জন ডাক্তার যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন। তিনি সকালকে কোলে তুলে নিয়ে বললেন, 'ভাবছিলাম তোমারে কই মাছের কানে হাঁটন দেখাব। এইজন্য সারাদিন ঢাকা শহর ঘুইরা জ্যাতা কই মাছ কিনা আনছিলাম। কিন্তু এখন ভাবতেছি একদম গ্রামে নিয়া সরাসরিই দেখাব। কী বল দাদাভাই?'

সকালের ঘুম পেয়েছে। সে কোনো কথা বলল না। মিলি তাকে কোলে করে নিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে এলো। পরদিন খুব ভোরে শুকরঞ্জন ডাক্তার মালোপাড়ার উদ্দেশে রওনা হয়ে গেলেন। তবে তার এক পুরনো বন্ধুর সঙ্গে জরুরি কাজ থাকায় তিনি প্রথমে যাবেন টরকি বন্দর। ওখান থেকে মোঘলগঞ্জ। মোঘলগঞ্জ থেকে ট্রলারে যযাতিপুর। তারপর বাড়ি। লম্বা যাত্রা। তবে তিনি প্রচণ্ড আনন্দ নিয়ে এই যাত্রা শুরু করেছেন। তার মনে হচ্ছে যযাতিপুর, মালোপাড়া, রামপাড়ার আলো-বাতাস, ঘাস, জল, মাটি তাকে আয় আয় বলে ডাকছে। তিনি সেই ডাক স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছেন। শুকরঞ্জন ডাক্তার প্রবল তৃষ্ণা নিয়ে বাড়ি পৌঁছানোর অপেক্ষা করছেন।

শুকরঞ্জন ডাক্তার রওনা হয়ে যাওয়ার পাঁচ ঘণ্টা পর বাসা থেকে বের হলো আশিষ। তার ফ্লাইট দুপুর দুইটায়। তার সঙ্গে মিলি আর সকাল। আশিষের অনুপস্থিতি নিয়ে সকালের তেমন কোনো বায়না নেই। কিন্তু গতকাল রাত থেকে সে বারবার বলছিল, 'বাবার কাছে শোব, বাবার কাছে শোব।'

রাতে আশিষ তাকে তার বুকের ওপর নিয়ে ঘুমিয়েছে। ভোরবেলা সকালের আরেক বায়না, সে বাবার সঙ্গে এয়ারপোর্ট যাবে। কান্নাকাটি, হুলস্থূল অবস্থা। মিলির অফিস বাদ দিতে হলো। এয়ারপোর্টে পৌঁছে সকাল আরেক বায়না

ধরল, সে বাবার সঙ্গে যাবে। প্লেনে চড়বে। আশিষ-মিলি নানান উপায়ে তাকে বোঝানোর চেষ্টা করল। কিন্তু সে কোনো কিছুই শুনবে না। তার এক কথা, 'বাবার সঙ্গে প্লেনে যাব।' আশিষ প্লেনে উঠল একদম শেষ মুহূর্তে। সকাল তখন চিৎকার করে কাঁদছিল। কোনোভাবেই তাকে থামানো যাচ্ছিল না। সে মিলির কোলেও থাকবে না। নেমে চলে যাবে। মিলির প্রচণ্ড অসহায় লাগতে লাগল। সে বাইরে এসে একটা স্কুটার ভাড়া করল। সকাল তখনও গলার রগ ফুলিয়ে তীব্র চিৎকারে কেঁদে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে শরীরের সব শক্তি দিয়ে হাত-পা ছুড়ছে সমানে। মিলি কী করবে ভেবে পেল না। সে নানানভাবে বোঝানোর চেষ্টা করল। কিন্তু সকাল যেন ক্রমশই আরও বেশি বেপরোয়া হয়ে উঠছে। কোনোভাবেই তাকে সামলানো যাচ্ছিল না। মিলির একই সঙ্গে ক্লান্ত এবং প্রচণ্ড বিরক্ত লাগতে লাগল। সে হঠাৎ সজোরে চড় বসাল সকালের গালে। সকাল খানিক অবিশ্বাসী চোখে মিলির দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর চুপ হয়ে গেল। একদম চুপ। তারপর টুপ করে কখন ঘুমিয়ে পড়ল মিলির কোলের ভেতর। তার চোখের কোলে, গালের এখান-সেখান জুড়ে জলের দাগ।

মিলি ঘুমন্ত সকালের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। ইশ! ঘুমন্ত এই মুখটা জুড়ে কী অদ্ভুত মায়া! মিলির বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠল। তার মনে হলো বুকের ভেতরটা ভীষণ ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। সকাল বেলার পাখিটাকে যদি বুকের ভেতর ভরে রাখা যেত! মিলি পৃথিবীর সব মমতা আর সব ভালোবাসা নিয়ে ঘুমন্ত সকালের কপালে চুমু খেল। তখন মহাখালী চৌরাস্তা ক্রস করছিল হলুদ স্কুটারটা। ডানপাশের রাস্তায় সিগন্যাল না পেয়ে একটা চলন্ত বাস তীব্র গতিতে সোজা ধেয়ে এলো। এক ধাক্কায় মিলিদের স্কুটারটা ছিটকে পড়ল গজ দশেক দূরে। ভয়াবহ দুর্ঘটনা! শুকরঞ্জন ডাক্তার তখন লঞ্চের ডেকে দাঁড়িয়ে থই থই অসীম জলরাশি দেখছেন। আশিষ বিমানের সিটে বসে তখন মেঘে ঢাকা সীমাহীন আকাশ দেখছে। সুজাতা রানী বারান্দায় কাপড় তুলতে গিয়ে দেখেন প্রবল বাতাসে যেন উড়ে যাচ্ছে বিশ্ব চরাচর। তারা কেউ বুকের ভেতর নড়ে ওঠা হৃৎপিণ্ডখানা টের পেলেন কিনা বোঝা গেল না।

সকাল মারা গেল হাসপাতালে নেওয়ার আগেই। অচেতন মিলিকে নিয়ে যাওয়া হলো আইসিইউতে। ডাক্তাররা জানালেন আটচল্লিশ ঘণ্টার আগে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। এমন ভয়ঙ্কর সময়ে মিলির কাছের মানুষেরা কেউ তার পাশে নেই। কেউ না।

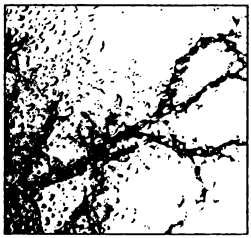

মজিবর মিয়া আজকাল আড়তে আসে অনেক দেরিতে।

আরশিকে স্কুল থেকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে তারপর। ততক্ষণে দুপুর গড়িয়ে যায়। দিনের বাকি সময় মনাই-ই ভরসা। তাছাড়া লাইলিরও বাচ্চা হবে। অনেকদিন থেকেই তার মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে উঠেছে। সে হুটহাট রেগে যাচ্ছে। যার-তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করছে। আম্বরি বেগমের সঙ্গেও কয়েকবার দুর্ব্যবহার করেছে। এত ভালোবাসত যে আরশিকে তাকেও আজকাল চোখের সামনে দেখতে পারে না লাইলি। বারকয়েক নাকি আরশির গায়ে হাতও তুলেছে। আরশি অবশ্য তাকে কিছু বলেনি। বলেছেন আম্বরি বেগম। তবে মজিবর মিয়া এই নিয়ে খুব একটা চিন্তিত না। সে জানে, পোয়াতি অবস্থায় মেয়েদের এমন একটু-আধটু হয়ই। মন-মেজাজের ঠিক থাকে না। সে চেষ্টা করছে লাইলিকেও আলাদা করে সময় দিতে। কিন্তু লাইলি যেন দিনদিন ক্রমশই বেয়াড়া হয়ে উঠছে। আগের সেই কোমলতাটা যেন আর নেই। কেমন রুক্ষ হয়ে উঠছে। আতাহার তালুকদারের ঘটনার পর গাঁয়ের মানুষ হঠাৎ করেই চুপচাপ হয়ে গেছে। সবার মধ্যে চাপা এক ধরনের ভয়! যযাতিপুর বাজারটাও হঠাৎ থমকে গেছে। থমকে যাওয়ার কারণও অবশ্য আছে, তালুকদারবিহীন এই বাজারের ভবিষ্যৎ নিয়ে সবাই সন্দিহান হয়ে পড়েছে। তবে মজিবর মিয়া ছিল সবচেয়ে বড় ভয়ে। তার ধারণা ছিল, লতু হাওলাদার পার্টির লোকজন দিয়ে তাকে শাসাবে। জমি ফেরত দিতে বলবে। কিংবা আরও বেশি কিছু। তবে চড় খাওয়ার ঘটনা যে সে কারো কাছেই বলবে না, সেটা মজিবর মিয়া আগে থেকেই আন্দাজ করেছিল এবং তার ভাবনাই ঠিক, লতু হাওলাদার বিষয়টা বেমালুম চেপে গেছে। আর এ কারণেই হয়তো মজিবর মিয়ার বিরুদ্ধে কঠিন কোনো ব্যবস্থা নেওয়ার পক্ষে যৌক্তিক কোনো কারণ দাঁড় করাতে পারেনি সে। পার্টির লোকেদের সঙ্গে তার যতই ভালো যোগাযোগ থাকুক, লতু হাওলাদার একটা বিষয় খুব পরিষ্কার করে বুঝেছে, তারা তাদের নিজেদের স্বার্থ ছাড়া কিছু করে না। আতাহার তালুকদারের বিষয়ে তাদের নিজেদেরও একটি বড় স্বার্থ

ছিল, কিন্তু মজিবর মিয়ার ক্ষেত্রে সেটা তাদের নেই। থাকলেও তা আরও অনেক কিছুর বিবেচনায় অতি ক্ষুদ্র।

মজিবর মিয়া গত কয়েক দিনের হিসাব নিয়ে বসেছে। মনাইকে ডেকে বলল পাশের দোকান থেকে এক কাপ চা এনে দিতে। আজকাল তার একটু চায়ের অভ্যাস হয়েছে। দুপুরে ভাত খেয়ে আড়তে এসে বসলে গলার ভেতরটা কেমন খুসখুস করে। এক কাপ চা খেলে আরাম লাগে। সে চায়ের কাপ হাতে নিয়ে বসেছে। আড়তের বেচা-কেনার হিসাবেই পরিষ্কার ফুটে উঠেছে আতাহার তালুকদারদের ঘটনার পর এই বাজারের অবস্থা কতটা খারাপ হয়েছে! সে চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে কাপের তলানিটুকু বাইরে ছুড়ে দিতে গিয়ে আর চোখ ফেরাতে পারল না। যে দৃশ্যটা দেখল, তাতে তার মেরুদণ্ড বেয়ে শীতল স্রোত বয়ে গেল। দুপুরের সময় বলে বাজার মোটামুটি ফাঁকা। ফলে পাঁচ-ছয়জনের একটা দলের সঙ্গে লতু হাওলাদারকে হেঁটে আসতে দেখে মজিবর মিয়ার চোখ আটকে গেছে। সেই ঘটনার পর থেকে আর কখনও লতু হাওলাদার যযাতিপুর বাজারে আসেনি। তালুকদাররা চলে যাওয়ার পরও না। মজিবর মিয়া ত্বরিত উঠে দাঁড়াল। তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলছে তার সামনে বিপদ। ভয়াবহ বিপদ। কিন্তু এই মুহূর্তে এই বিপদ থেকে উদ্ধারের পথ তার জানা নেই। লতু হাওলাদার ভয়ঙ্কর চেহারায় মজিবর মিয়ার সামনে এসে দাঁড়াল। মজিবর মিয়া কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু এত জোরে লতু হাওলাদার থাপ্পড় মারতে পারে, এটা তার ধারণায়ও ছিল না। সে থাপ্পড় খেয়ে হতভম্ব হয়ে লতু হাওলাদারের দিকে তাকিয়ে রইল। লতু হাওলাদার সাপের মতোন হিসহিস করে বলল, 'খানকি মাগির পুত, বেশ্যা মাগির পুত। নে তোরে গালি দিলাম, তোর মায়রেও দিলাম। কী করবি কর! কর।'

মজিবর মিয়ার সারা শরীরে মুহূর্তেই আগুন ধরে গেল। সে তখন কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে এক খ্যাপা ষাঁড়! লতু হাওলাদারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার ঠিক আগমুহূর্তে অনেকগুলো হাত তাকে সাঁড়াশির মতোন পেঁচিয়ে ধরল। মজিবর মিয়া তাকিয়ে অচেনা মুখগুলোকে দেখল। সে এদের কাউকে চেনে না। তবে আন্দাজ করতে পারছে, এরা পার্টির লোক। লোকমান গ্রুপের। নাকের নিচে মোটা গোঁফওয়ালা একটা মানুষ আড়তে ঢুকল। বেটে মানুষটার থুঁতনির নিচে বড় একটা আঁচিল। লতু হাওলাদার হঠাৎ সরে গিয়ে তাকে পথ করে দিল। তারপর বলল, 'লোকমান ভাই, এই সেই হারামজাদা। এই কুত্তার বাচ্চাই সেইদিন রাইতে আতাহার তালুকদাররে নিজের ট্রলারে কইরা মোঘলগঞ্জ দিয়াসছিল।'

মজিবর মিয়ার ভেতরটা হঠাৎ ভয়ে কুঁকড়ে গেল। এই লোকমানের নাম সে অনেক শুনেছে। ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা মাথার এক খুনি। নৃশংস এক মানুষ। তারচেয়েও ভয়ের কথা, তারা এখন জেনে গেছে যে আতাহার তালুকদারের পালানোর সঙ্গে

Boighar.com & ARS

সবচেয়ে বড় ভূমিকা ছিল তার। কিন্তু এরা কীভাবে জানল? মজিবর মিয়া আর ভাবার সময় পেল না। তার তলপেটে প্রচণ্ড লাথি পড়ল। মজিবর মিয়া পা ভাঁজ করে পড়ে গেল মাটিতে। লোকমান দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'তুই! তুই সেই কুত্তার বাচ্চা?'

মজিবর মিয়া কথা বলতে পারল না। তার ফুসফুস থেকে যেন সব বাতাস বের হয়ে গেছে। সে বার দুই কাশল। এবার হাঁটু বাঁকা করে ভাঁজ হয়ে বসে থাকা মজিবর মিয়ার মাথার বাঁ পাশে মারল লোকমান। তারপর বলল, 'আমি সবকিছু মাফ করি। কিন্তু আমার সঙ্গে কেউ বিনা কারণে শত্রুতা করলে সেইটা মাফ করি না। ওই, তোর সঙ্গে আমার কিসের শত্রুতা ছিল? তুই আমার এত বড় একটা সুযোগ কেন নষ্ট করলি!'

অতটুকুতেই মজিবর মিয়া কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। এবার ঘুষিটা পড়ল সরাসরি তার মুখে। গলগল করে রক্ত বেরোল মুখ দিয়ে। তারপরের কিছু আর মনে নেই মজিবর মিয়ার। চারজন মানুষ মিলে আড়তের সামনে টেনে বের করল তাকে। তারপর ইচ্ছেমতো পেটাল রড আর কাঠ দিয়ে। চারপাশে তখন ভিড় জমে গেছে। আম্বরি বেগম খবর পেয়ে যতক্ষণে এলেন, ততক্ষণে মজিবর মিয়া নিথর পড়ে আছে আড়তের সামনে। আম্বরি বেগম তখন উন্মাদপ্রায়। তবে তাকে মজিবর মিয়ার নিথর দেহের কাছে আসতে দেওয়া হলো না। আম্বরি বেগম জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়লেন সেখানেই। আবদুল মমিন লোকমানের কানে কানে বলল, 'মালটা তো শেষ লোকমান ভাই। লাশ কী করব?'

লোকমান টকটকে লাল চোখ মেলে তাকাল। সেই চোখের দৃষ্টি ভয়াবহ। সে ধীর পায়ে হেঁটে গিয়ে অকেকক্ষণ ধরে মজিবর মিয়ার শরীরটা নেড়েচেড়ে দেখল। তারপর বলল, 'এখনও মরে নাই। তবে মরতে দেরিও নাই। হারামজাদারে আমি সবার সামনে গুলি কইরা মারব। তারপর লাশ ভাসাই দিব নদীতে। সবাই দেখব। তার আগে এইটা সারারাইত এইখানেই থাকব। কেউ জানি না ধরে।'

সারারাত মজিবর মিয়া পড়ে রইল সেখানে। ভোরের দিকে তাকে নিয়ে যাওয়া হলো নদীর ঘাটে। লোকমান এলো তারও কিছুক্ষণ পর। অবাক করা ব্যাপার হলো মজিবর মিয়ার জ্ঞান ফিরেছে। তার এই জ্ঞান ফেরাতে সবচেয়ে বেশি যে খুশি হয়েছে তার নাম লোকমান। লোকমান তখন আর মানুষ নেই। যেন মানুষের চেহারায় ভয়ঙ্কর কোনো পশু। সে মজিবর মিয়ার কাছে এসে বলল, 'আমি তোর শরীলের প্রত্যেকটা অংশ আলাদা কইরা কাটব। তারপর তোরে খুন করব।'

সকাল ১০টার দিকে মজিবর মিয়ার ডানপায়ের গোড়ালি করাত দিয়ে কেটে ফেলা হলো। কাটা পায়ের টুকরা ফেলে দেওয়া হলো যযাতিপুর নদীতে। মৃতপ্রায় মজিবর মিয়া সংজ্ঞাহীন পড়ে রইল সেখানেই। তার মৃত্যু এখন সময়ের

ব্যাপার মাত্র। কিন্তু লোকমান মনেপ্রাণে চাইছে মজিবর মিয়া আরেকবার জেগে উঠুক। আর মাত্র একবার। সে আর একবার জেগে উঠলেই তার একটা হাত কাটবে সে। কিন্তু মজিবর মিয়া জেগে উঠল না। সে মরে গেছে না বেঁচে আছে সেটাও পরিষ্কার না। তবে এই সময় একটা অভাবনীয় ঘটনা ঘটল। কাকতালীয় ঘটনা! দূরে নদীতে একটা ট্রলার দেখা গেল। ট্রলার থেকে যেই মানুষটা নামল, তাকে দেখে লোকমান বসা থেকে উঠে দাঁড়াল। মানুষটার নাম শুকরঞ্জন ডাক্তার। ঢাকা থেকে টরকী বন্দর আর মোঘলগঞ্জ হয়ে তিনি এই পথে যযাতিপুর এসেছেন। যযাতিপুর থেকে পায়ে হেঁটে মালোপাড়া তার বাড়িতে যাবেন। কিন্তু তিনি কোথাও গেলেন না। অনড় দাঁড়িয়ে রইলেন মজিবর মিয়ার নিথর শরীরের পাশে। লোকমান তার কাছে এসে বলল, 'আদাব ডাক্তার সাব।'

শুকরঞ্জন ডাক্তার লোকমানের দিকে ফিরেও তাকালেন না। তবে থক করে একদলা থুথু ফেললেন। লোকমান আবার বলল, 'আমারে চিনছেন ডাক্তার সাব? ঢাকায় একবার আপনে আমার জীবন বাঁচাইছিলেন। মনে আছে?'

শুকরঞ্জন ডাক্তার প্রথম দৃষ্টিতেই লোকমানকে চিনেছেন। কিন্তু এমন একটা জঘন্য পশুর জীবন বাঁচিয়েছিলেন ভেবে তার এখন নিজেকে জগতের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর অপরাধী বলে মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে তিনি নিজে মজিবর মিয়ার এই অবস্থার জন্য দায়ী। সেদিন তিনি যদি এই জঘন্য মানুষটার জীবন না বাঁচাতেন, তাহলে আজ হয়তো মজিবর মিয়ার এই পরিণতি হতো না। শুকরঞ্জন ডাক্তার ধীর পায়ে মজিবর মিয়ার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর নাড়ি টিপে দেখলেন। চোখের পাতা উল্টে দেখলেন। তারপর লোকমানের কাছে এসে বললেন, 'আপনে আমারে বলছিলেন, আপনার উপকারের বিনিময়ে জীবনে সুযোগ হইলে আপনে আমার একটা উপকার করবেন। কিন্তু মানুষের উপকার করনের ক্ষমতা আপনের নাই। ভগবান সবাইরে সব ক্ষমতা দেয় নাই। তারপরও যদি পারেন, এরে আর মাইরেন না। আমার কাছে দিয়া দেন। জানি না বাঁচাইতে পারব কিনা! চেষ্টা করব। এর একটা মা মরা মাইয়া আছে। এ ছাড়া তার আর কেউ নাই। অবশ্য এই অবস্থায় এর জন্য না বাঁচনই ভালো।'

www.boighar.com

লোকমান মজিবর মিয়াকে ফেরত দিল। সেই ট্রলারে করেই মজিবর মিয়াকে নিয়ে আবার মোঘলগঞ্জ ফেরত গেলেন শুকরঞ্জন ডাক্তার। পথে তিনি তার ডাক্তারি বিদ্যা দিয়ে সাধ্যমতো চেষ্টা করলেন মজিবর মিয়াকে টিকিয়ে রাখতে। শেষপর্যন্ত মজিবর মিয়া টিকেও গেল। বেঁচে রইল পৃথিবীর আলো-বাতাস-জল- হাওয়ায়। কিন্তু কিছু বেঁচে থাকা মৃত্যুর চেয়েও ভয়ঙ্কর! মজিবর মিয়া বেঁচে রইল সেই মৃত্যুর চেয়েও ভয়ঙ্কর জীবনে।

লাইলির কন্যা সন্তান হয়েছে। নাম রাখা হয়েছে তহুরা। বাচ্চা হওয়ার সময় স্টিমারঘাটা থেকে লাইলির মা এসেছিল। কিছুদিন যযাতিপুর থেকে মেয়ে আর নাতনির সেবা-শুশ্রূষা করে আবার চলেও গেছে। অসুস্থ লাইলিকে মজিবর মিয়ার এমন ভয়াবহ অবস্থার কথা পুরোপুরি জানানো হয়নি। যা জানানো হয়েছে তা হলো মজিবর মিয়াকে পার্টির লোকজন মেরেছে, শুকরঞ্জন ডাক্তার তাকে চিকিৎসার জন্য মোঘলগঞ্জ নিয়ে গেছে। পুরোপুরি সুস্থ হতে বেশ কিছুদিন সময় লাগবে। চিন্তার কিছু নেই। অবাক করার মতো বিষয় হচ্ছে, লাইলির প্রতিক্রিয়া দেখে মনেও হলো না এই বিষয় নিয়ে সে খুব একটা চিন্তিত! তাকে খবরটা দিল পাশের বাড়ির শেফালি। লাইলি খবর শুনে নির্বিকার গলায় জিজ্ঞেস করল, 'মাইর বেশি মারছে?'

www.boighar.com

শেফালি মাথা নেড়ে বলল, 'না, বেশি না। ডাইন পায়ে আর হাতে একটু সমস্যা, সাইরা যাইব।'

লাইলি বলল, 'কবে ফিরব?'

শেফালি বলল, 'ফিরব।'

এরপর এই বিষয়ে লাইলি আর কিছু বলেনি। বলেনি আর কেউই। কেইবা বলবে! এ বাড়ির মানুষগুলো হঠাৎ যেন সমুদ্রের অতল জলে ভেসে থাকা এক একটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপ হয়ে গেছে। আরশিও আজকাল পারতপক্ষে লাইলির পাশে ঘেঁষে না। সেদিনের পর থেকে আম্বরি বেগম নামের সর্বংসহা মানুষটাও যেন সমূলে উপড়ে পড়া মৃত এক বুড়ো গাছ। নিঃস্ব, মৃত প্রাণ। কারও সঙ্গে কথা বলেন না। কিছু খান না, ঘুমান না। সারাটাক্ষণ পা বিছিয়ে শূন্য চোখে বসে থাকেন ঘরের দরজায়। তার ঘোলাটে চোখজুড়ে কী ভীষণ শূন্যতা! যেন জগতের কোনো কিছুতেই আর কিছু যায়-আসে না তার। কী এক বিভীষণ হাহাকার শুধু ঘুরে ঘুরে বেড়ায় এই বাড়ির আনাচে-কানাচে। আরশির স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। মজিবর মিয়ার কী হয়েছে তা তাকে দীর্ঘদিন বলা হয়নি। মজিবর মিয়া তখন মোঘলগঞ্জে হাসপাতালে ভর্তি। আরশি খুব একটা লাইলির কাছে যায় না। তবে সেদিন গেল। গিয়ে বলল, 'বু কিছু বলে না। আব্বায় আসে না কেন?'

লাইলির কী হলো কে জানে! সে হঠাৎ খেঁকিয়ে উঠল, 'মায়রে খাইছস, এখন বাপরে না খাইলে চলব কেমনে!'

আরশি কিছু বুঝল না। সে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইল। আজকাল এটা খুব হয়, লাইলি কথায় কথায় তাকে বকাঝকা করে। মাঝে মধ্যে চড়-থাপ্পড়ও দেয়। প্রথম প্রথম তার খুব খারাপ লাগত। এখন আর লাগে না। সে কাউকে কিছু বলেও না। বাবাকেও বলত না। তবে তার বু আম্বরি বেগম তাকে বুঝিয়েছেন, মায়েরা একটু-আধটু শাসন করেই। লাইলি তো তার মা-ই।

মায়েরা বকলে মন খারাপ করতে হয় না। তা এ নিয়ে সে মন খারাপ করেও না। চুপচাপ মেনে নেয়। কাঁদেও না। আসলে আরশি কি তার মা নিয়ে খুব একটা ভাবে? নাকি সে আলাদা করে জানেই না, মা জিনিসটা আসলে কী! মায়েরা কী করে? মায়েরা তার সন্তানকে বুকের ভেতর আগলে ধরে ঘুমায়, জ্বর হলে মাথায় জলপট্টি দিয়ে দেয়, সারক্ষণ ছটফট করে, মুখে তুলে খাইয়ে দেয়, কোলে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। এই তো! এই শেষটা ছাড়া বাদবাকি আর সবগুলোই সে পেয়েছে। আম্বরি বেগমের কাছ থেকে পেয়েছে। এখন সে খানিক বড় হওয়ায় আম্বরি বেগম তাকে কোলে নিতে পারেন না। আরশি অবশ্য এসব নিয়ে ভাবেও না।

তবে আরশি মাঝে মাঝে অবাক হয়। স্কুলের যশোদা স্যার খুব রাগী। সেদিন তাদের দুই-তিন ক্লাস ওপরের এক ছেলে, আরেক ছেলের শ্লেট ভেঙে ফেলল। যশোদা স্যার শুনে ছেলেটাকে স্কুলের বারান্দায় নিয়ে গেলেন। সবাই তখন ভয়ে থরথর করে কাঁপছে। যশোদা স্যার জোড়া বেত হাতে বাঘের মতোন হুঙ্কার দিয়ে বললেন, 'মায়ের পেট থেকে বের হওয়ার আগেই বদমায়েশ হয়েছিস! আজকে তোর বদমায়েশি হাড়ে হাড়ে বোঝাব!'

যশোদা স্যার চাবুক চালানোর মতোন করে বেত চালালেন ছেলেটার পিঠে। ছেলেটা কান্নাকাটি তেমন করল না। কিন্তু তীব্র আতঙ্কে প্যান্ট ভিজিয়ে দিল। তারপর ধপ করে পড়ে গেল মাটিতে। যশোদা স্যার ছেলেটার কান ধরে দাঁড়া করালেন। তারপর মেঘের মতো গর্জন করে বললেন, 'ওই বদমায়েশ! ওই...।'

তিনি কথা শেষ করতে পারলেন না। স্কুলের মাঠের উল্টোদিক থেকে কোনাকুনি দৌড়ে এলো এক মহিলা। সম্ভবত মাঠের সঙ্গেই বাড়ি। সে দৌড়ে মাঠ পেরোল। তারপর বাজপাখির মতোন ছোঁ মেরে যশোদা স্যারের হাত থেকে ছেলেটাকে কেড়ে নিল। তারপর হুঙ্কার ছেড়ে বলল, 'কী করছে আমার পোলায়? কী করছে? আপনে আমার পোলার গায়ে হাত দিছেন ক্যান? ওই শ্লেটের দাম কয় টাকা? কয় টাকা ওই শ্লেটের দাম? এই লন টাকা।'

সে তার পুরনো, জীর্ণ শাড়ির আঁচল থেকে নোংরা তেল চিটচিটে একটা পাঁচ টাকার নোট ছুড়ে দিল। যশোদা স্যার, স্কুলের দপ্তরি, শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী সবাই অবাক চোখে তাকিয়ে রইল। মহিলা ঝাঁঝের গলায় বলল, 'নিজের তো পোলা-মাইয়া নাই, বোঝবেন কেমনে? একেকটা বাড়ি দেন এই ছোট্ট ছোট্ট শরিলগুলানে, আর লাগে গিয়া মায়'র কইলজায়। পড়ামু না আমার পোলারে আমি স্কুলে। আমার পোলার পড়ালেখা কইরা জজ-বারিস্টার হওনের দরকার নাই। এক জোড়া গরু কিন্যা দিমু, হালচাষ করব। তাও আমার পোলার গায় কেউরে হাত দিতে দিমু না।'

Boighar.com & ARS

সে তার ছেলেকে কোলে তুলে নিল। অত বড় ছেলেকে কোলে নিয়ে সে হাঁটতে পারছিল না। এলোমেলো পা ফেলছিল। ছেলে বারকয়েক মার কোল থেকে নেমে হেঁটে যেতে চাচ্ছিল। কিন্তু সে নামতে দিল না। ও মাঠটুকু পার হতে গিয়ে তার হঠাৎ মনে হলো, তার ছেলের মাথায় রোদ লাগছে। সে তার খাটো শাড়ির আঁচলখানা বারবার টেনে বড় করে ছেলের মাথা ঢেকে দেওয়ার চেষ্টা করছিল। অতি সাধারণ এক দৃশ্য। কিন্তু আরশির বুকের ভেতর খাঁ খাঁ করা শূন্য এক অনুভূতি নিয়ে কে যেন হাজির হয়ে গেল। সেদিন সারাটা দিন তার বুকের ভেতরটা কেমন হয়ে থাকল। কিছু একটা যেন দলা পাকিয়ে গলার ভেতর আটকে থাকল। সে পুরোটা বিকেল একা একা বসে ছিল সেই চালতা গাছটার তলায়। সে কিছু দেখছিল না, কিছু ভাবছিল না। কিন্তু অবাক হয়ে হঠাৎ খেয়াল করল, তার কান্না পাচ্ছে, তীব্র কান্না। সেই প্রথম তার মায়ের জন্য কষ্ট হতে থাকল, তীব্র কষ্ট। অভিমান হতে থাকল, তীব্র অভিমান।

আরশি কাঁদল না। তার কাঁদতে ভালো লাগে না। সে কাঁদতেও চায় না। এমন মন খারাপের সময়গুলোতে তাই সে ভালো কিছু ভাবতে চায়। আনন্দের কিছু। এরপর থেকে এমন সময়গুলোতে সে চুপচাপ বাবার কথা ভাবে। সাইকেলের সামনে বসে বাবা তাকে রোজ স্কুলে দিয়ে আসত। টুংটাং করে বেল বাজাত। তার কী যে ভালো লাগত! কিন্তু সে কখনও বাবাকে তা বলত না। তার বলতে ইচ্ছে করত না। কিন্তু ভারি আনন্দ হতো। বাবার গায়ের গন্ধটাও কেমন! এত চেনা আর আপন! মনে হতো ইশ, এই সুবাসটা যদি সবসময় আশপাশ জুড়ে থাকত! কখনও দূরে না যেত। আচ্ছা বাবা কি বোঝে, সে বাবাকে কত ভালোবাসে! মনে হয় বোঝে না। বাবা এত ব্যস্ত থাকে! কত কাজ তার! এত ভাবার সময় কই! বাবা যখন অনেকদিন ধরে এলো না। প্রায় মাসেরও অধিক, কী যে অপেক্ষায় থাকত আরশি! তার মনে হতো, বাবা এলেই আবার সেই টুংটাং সাইকেল। আবার সেই মেঠোপথ। টুকটাক গল্প। বাবার গায়ের ঘামের গন্ধ। স্কুল। বাড়ি। কিন্তু বাবা যেদিন ফিরল, সেদিন একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল। সে দীর্ঘসময় তার বাবার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে রইল। তাকিয়ে রইল একদৃষ্টিতে। তাকিয়ে রইল মজিবর মিয়াও। কিন্তু কেউ কোনো কথা বলল না। আম্বরি বেগম বাটিতে করে বার্লি নিয়ে এসেছেন। তিনি মজিবর মিয়াকে বার্লি দিতে যাবেন, এই মুহূর্তে আরশি তার আঁচল ধরে টানতে টানতে বলল, 'আব্বা কই? আব্বা?'

আম্বরি বেগম আরশির কথার কোনো জবাব দিলেন না। তিনি চুপচাপ মজিবর মিয়াকে বার্লি খাওয়ালেন। তারপর মাথার নিচে একটা বালিশ দিয়ে শুইয়ে দিলেন বিছানায়। ওযু করলেন। নামাজ পড়লেন। রান্না করলেন। শুকাতে দেওয়া কাপড় ঘরে নিলেন। আরশি এই পুরোটা সময় একই কথা বলল, 'আব্বা? এইটা আব্বা? এইটা আব্বা?'

আরশি সত্যি সত্যি একটা দীর্ঘ সময় অবধি বাড়ি ফেরা এই মজিবর মিয়াকে তার বাবা ভাবতে পারল না। শুধু আরশি কেন, অনেকেই পারল না। দ্বিধান্বিত চোখ নিয়ে দ্বিতীয়বার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। মজিবর মিয়ার মুখের ওপরের পাটির দাঁতের অংশ থেকে নিচের পাটির দাঁতসহ চিবুকের অংশের পুরোটাই স্থায়ীভাবে বাঁ দিকে বেঁকে গেছে। তার মুখ দেখে হুট করে বোঝার উপায় নেই, এই মজিবর মিয়া আর সেই মজিবর মিয়া একই মানুষ। ডান হাতখানা পুরোপুরি অকার্যকর না হলেও অনেকটাই উল্টোদিকে ভাঁজ হয়ে আছে। হাতে খুব একটা সাড়ও নেই। শুধু হাতে না, শরীরের কোনো অংশেই তেমন একটা সাড় নেই। একা ঠিকঠাকমতো উঠতে পারে না, বসতে পারে না। সারাদিন শুয়ে থাকে বিছানায়। ডান পায়ের গোড়ালির নিচের অংশ করাত দিয়ে কাটা। সেখানে ভয়ঙ্করদর্শন এক ক্ষত। শুধু শরীরে না, মজিবর মিয়া আর আগের সেই মজিবর মিয়া নেই মানসিকভাবেও। তার আচার-আচরণও অসংলগ্ন। সে কারও সঙ্গে কথা বলে না। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলেও ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। যেন মানুষটাকে সে চিনতে পারছে না। আসলে ভয়ঙ্কর এক ধরনের মানসিক ট্রমার ভেতর ঢুকে গেছে মজিবর মিয়া।

লাইলি এখনও তার ঘর থেকে খুব একটা বের হয় না। মজিবর মিয়া থাকে আম্বরি বেগম আর আরশির ঘরে। সে চৌকিতে ঘুমায়। মেঝেতে বিছানা করে ঘুমায় আরশি আর আম্বরি বেগম। আম্বরি বেগমের এখন অনেক কাজ। লাইলির কাজ, তহুরার কাজ, ঘরের কাজ, বাইরের কাজ। সবচেয়ে বড় কাজ মজিবর মিয়ার। মজিবর মিয়ার জন্য তাকে সারারাত জেগে থাকতে হয়। আগে রোজ আরশিকে কোলের ভেতর নিয়ে রাজ্যের গল্প করতেন আম্বরি বেগম। রাজা-রানীর গল্প, রাখালের গল্প, ভূত-প্রেতের গল্প। মাঝে মাঝে কী সুন্দর করে যে পুঁথি পড়ে শোনাতেন। আম্বরি বেগমের অনেক পুঁথি মুখস্থ। তিনি গুনগুন করে সুর করে সেগুলো শোনাতেন আরশিকে। শেষ পর্যন্ত আরশিরও অভ্যাস হয়ে গেল, এই পুঁথি না শুনলে তার ঘুম হতো না। রোজ জ্বালাতন করত আম্বরি বেগমকে। আম্বরি বেগম তখন একই গল্প বারবার বলতেন। একই পুঁথি বারবার শোনাতেন। শুনতে শুনতে আরশির প্রতিটি গল্প মুখস্থ হয়ে গেল। পুঁথির সুরগুলো যেন মাথার ভেতর গেঁথে রইল। সে সারাদিন অবচেতন মনেই তা গুনগুন করে গাইত। কিন্তু আজকাল আম্বরি বেগম চুপচাপ শুয়ে পড়েন। আরশিও আর বিরক্ত করে না। আসলে জগতের সবকিছু পাল্টায়। পাল্টায় তার নিজস্ব নিয়মে।

সেদিন ক্লান্ত আম্বরি বেগম হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুমিয়ে পড়েছে আরশিও। কিন্তু মাঝরাতে আরশির ঘুম ভেঙে গেল কী এক শব্দে। তার ঘুম ভেঙে গেলেও সে জাগল না। চোখ বন্ধ করে শুয়ে রইল। শব্দটা আবার হলো। ভারী নিঃশ্বাসের শব্দ। আরশির চোখ বন্ধ থাকলেও কান উৎকর্ণ হয়ে উঠল।

Boighar.com & ARS

ভারী নিঃশ্বাসের শব্দ থেকে এবার একধরনের ঘড়ঘড় শব্দ শুরু হলো। আরশি চোখ মেলে তাকাল। অন্ধকারকে তার প্রবল ভয়। কিন্তু বেড়ার সঙ্গে হারিকেন ঝোলানো। মজিবর মিয়া অসুস্থ বলে সারারাত হারিকেন জ্বালিয়ে রাখেন আম্বরি বেগম। হারিকেনের সেই আলোতে আরশি দেখল রক্ত হিম হয়ে আসা এক দৃশ্য। মজিবর মিয়ার হাতে মাছকাটার বঁটি। সে চেষ্টা করছে বঁটিটা তার নিজের গলা অবধি তুলতে, কিন্তু পারছে না। তার বাঁ হাতখানা থরথর করে কাঁপছে। সারা শরীর কাঁপছে। ঘামে-নেয়ে উঠছে মজিবর মিয়া। কম্পমান বঁটির এলোমেলো আঁচড়ে শরীরের এখানে-সেখানে কেটে গিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে। ভয়ঙ্কর এক দৃশ্য। কিন্তু নিজের ভয়ঙ্কর অভিশপ্ত জীবনটাকে শেষ করে দিতে চাওয়া ওই মানুষটার গায়ের ঘামের গন্ধেই যেন আরশি ফিরে পেল তার বাবা মজিবর মিয়াকে। সাইকেলের সেই টুংটাং শব্দে বাবার বুকের কাছে লেপ্টে থাকা সেই সুবাস!

আরশি মুহূর্তের জন্য চোখ সরাতে পারল না। যেন এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এক মুহূর্তেই সাত-আট বছরের এক বালিকা মেয়ের বয়স বেড়ে গেল কয়েক বছর। সে যেন জানল, এই জগতে তাকে ছায়া দেওয়ার আর কেউ নেই। যেন সে বুঝে গেল, তাকেই হয়ে উঠতে হবে ছায়াময়ী বটবৃক্ষ। সে ধীরপায়ে উঠে গিয়ে মজিবর মিয়ার হাত থেকে বঁটিটা টেনে নিয়ে রেখে দিল চৌকির নিচে। তারপর গামছা দিয়ে মুছিয়ে দিল সারা শরীর। মজিবর মিয়া হঠাৎ চুপ হয়ে গেল। একদম চুপ। আরশিও একটা কথাও বলল না। কেবল বালিশটা তুলে নিয়ে গিয়ে মজিবর মিয়ার পাশে এক কোনায় গুটিসুঁটি মেরে শুয়ে রইল। একটা হাত তুলে দিল হাপড়ের মতোন উঠতে-নামতে থাকা বাবার বুকে। চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা মজিবর মিয়া তাকিয়ে আছে ঘরের চালার দিকে। সেখানে নিকষ গাঢ় অন্ধকার। কেরোসিনের হারিকেনের আলোর সাধ্য নেই সেখানে পৌঁছায়। সাধ্য নেই মজিবর মিয়ার দৃষ্টিরও। তার পাশে শুয়ে আছে তার সেই ছোট্ট মেয়েটা। বাবার বুকের ওপর তার ছোট্ট সেই হাত। সেই হাতভর্তি কী? মায়া, মমতা, নির্ভরতা, আশ্রয়? মজিবর মিয়া জানে না। সে আজকাল কিছুই জানে না। কিন্তু সে চুপ হয়েই রইল। আরশিরও আর কোনো সাড়া নেই। শব্দ নেই। সে কি ঘুমিয়ে পড়েছে? মজিবর মিয়া অত শত বোঝে না। সে আসলে আজকাল কিছুই বোঝে না। কিছুই না। কিন্তু আজ এই মুহূর্তে মজিবর মিয়া কী বুঝল কে জানে, তার চোখ উপচে উঠল জলে। বানের জলের মতো। সেই জলেরা স্রোতের মতোন গড়িয়ে পড়ল চোখের দু'কূল বেয়ে। বালিশের শরীরে ডুবে গেল সেই অব্যক্ত জলের স্রোতরা। মিশে গেল।

তবে তার দাগ পড়ে রইল কোনো এক অপাঠ্য অনুভূতির তীব্রতম ভাষা হয়ে।

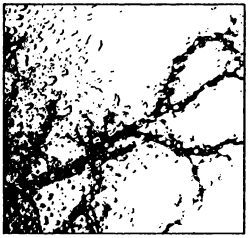

সময় কী?

আশিষের এতদিন মনে হতো, এর উত্তর একটাই। সময় আসলে ক্ষত সারানোর মহৌষধ। জগতের সব ক্ষত মুছে দেয় সময়। কিন্তু সময় আশিষের এই ক্ষত কী করে মুছবে? সকালের ক্ষত! সেই ঘটনার পর সময় তো পুরো একটা বছর ঘুরে এলো। কিন্তু ক্ষত মুছল কই? বরং ক্রমশই বাড়ল। মিলি মোটামুটি বদ্ধ উন্মাদ এক জীবন্ত লাশ। তাকে আজকাল পুরোটা সময় দরজা বন্ধ করে আটকে রাখতে হয় ঘরে। তার ঘরজুড়ে ছড়ানো-ছিটানো থাকে অজস্র ক্যালেন্ডারের পাতা। সেই ক্যালেন্ডারের পাতাগুলোতে প্রতিদিন দাগ দিয়ে রাখে সে। লাল কলমের দাগ। সেখানে রোজ লেখা থাকে নানান কথা। আজ সকালের বয়স কত হলো। সকাল কবে স্কুলে যাবে। কবে তার স্কুল ড্রেস বানাননো হবে। তার জন্মদিন কবে।

মিলি তার বন্ধ দরজার একলা ঘরে সারাটা দিন সকালের সঙ্গে কথা বলে। কত রকম কথা! প্রথম প্রথম মিলির এই অবস্থা নিয়ে আশিষের খুব খারাপ লাগত। কিন্তু আজকাল তার মনে হয়, মিলি ভালোই আছে। অন্তত সকালকে নিয়েই আছে। কিন্তু সে? সে কী নিয়ে আছে? এই প্রশ্নের উত্তর নেই। আশিষ নিজেও জানে না সে কী নিয়ে আছে! সে সেবার দিল্লি থেকে এক সপ্তাহ পরেই ফিরেছিল। কত কত কাজ করে বেড়াল। মিলি তখন হাসপাতালে জ্ঞানহীন। শুকরঞ্জন ডাক্তার কেমন কেমন করে খবর পেয়ে ঢাকায় ফিরেও এলেন। আশিষের অফিসেও যোগাযোগ করা হলো। জরুরি দেশে ফিরতে হবে এমন খবর পেল সে ষষ্ঠ দিনে। কিন্তু দেশে ফেরা হলো সেই সাত দিনের দিনই। তারপরের মুহূর্তগুলো আর ভাবতে চায় না আশিষ। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে মানুষ যে দুঃসহ স্মৃতিদের ভুলে যেতে চায়, তাই মনে পড়ে সবচেয়ে বেশি। তার আজকাল মিলির মতো হয়ে যেতে ইচ্ছে হয়। খুব ইচ্ছে হয়। আশিষ ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না। কিন্তু সে অবাক হয়ে লক্ষ্য করল, তার বুকের ভেতর অদ্ভুত সব অভিমান জমে আছে। অসংখ্য অভিযোগ জমে আছে! সে ভেবে পায় না, এসব অভিমান অভিযোগ কার বিরুদ্ধে জমে আছে? কোনো মানুষের বিরুদ্ধে

www.boighar.com

তো নয়। তাহলে? তাহলে কি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে? সে কি তবে নিজের ভেতরে অবচেতনে বিশ্বাস করে, কেউ একজন আছে? এই জগৎ-সংসারের সব কিছু তিনি দেখছেন? নিয়ন্ত্রণ করছেন? আশিষ আসলে জানে না, সে কী ভাবছে। কী করছে। তার ধারণা, আজকাল আর তার নিজের প্রতি নিজের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। সে ভাবছে, চলছে, বেঁচে থাকছে অন্য কারও ইচ্ছায়। এমনকি সে জানেও না সেই অন্য কেউ আসলে কে!

আজ ভোরে শুকরঞ্জন ডাক্তার আর সুজাতা রানী কলকাতা গেছেন। আশিষের বোন আনিতা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে আশিষের কী যে ভয়ঙ্কর একা লাগতে লাগল। সে দীর্ঘ সময় অন্ধকারে বসে রইল ড্রইং রুমে। তার হঠাৎ মনে হলো সে কোনো এক বিশাল মরুভূমিতে একা দাঁড়িয়ে আছে। সন্ধ্যার আলো-আঁধারিতে যতদূর চোখ যায়, সেই মরুভূমির কোথাও কিচ্ছু নেই। সে একদম একা। হুহু করে তুমুল হাওয়া বইছে। সেই হাওয়ায় তার শীত লাগছে। তীব্র শীত। কিন্তু তার কাছে কোনো শীতের কাপড় নেই। আশিষ অন্ধকারে অনেকক্ষণ ড্রইংরুমে বসে রইল। তার হঠাৎ মনে হলো পুরো রুমসহ পৃথিবীটা ঘুরছে। তার শরীর থরথর করে কাঁপতে লাগল। সে কখন ঘুমিয়ে গেল কিংবা অচেতন হয়ে গেল টেরই পেল না। তার ঘুম ভাঙল গভীর রাতে। শরীর জুড়ে ভয়াবহ জ্বর। অন্ধকারে ড্রইংরুমে হাতের কাছে কোথাও থার্মোমিটার খুঁজে পেল না। এখন মিলিকে ডেকেও লাভ নেই। বাকি রাত সে ঘুমাল ঘোরের মধ্যে। ভোর নাগাদ কয়েকবার বমি হলো তার। নিজে নিজেই দুটো প্যারাসিটামল গিলে ফিলল। জ্বর খানিক কমলেও অসুস্থতা কমল না। তবে বেলা করে নিজে নিজেই নাশতা বানাল। মিলিকে দিল। দুপুরের দিকে অফিসে যাওয়ার জন্য বেরও হলো। কিন্তু মোড় থেকে যে রিকশা নিল, তা বড় রাস্তায় গিয়েই থামতে বাধ্য হলো। আশিষের আবারও মাথা ঘোরাচ্ছে, চোখে অন্ধকার দেখছে সে। বমিও হলো কয়েকবার। রাস্তার পাশে একটা ফার্মেসিতে নামল আশিষ। ফার্মেসির অল্প বয়সী ছেলেটা বলল, 'আপনার লক্ষণ তো ভালো না ভাই। এক কাজ করেন, রাস্তার উল্টোদিকে মিনিট পাঁচেক গেলেই একটা ক্লিনিক পড়বে, সেফ হোম নাম। ওইখানে ভালো ডাক্তার আছে। একটু কষ্ট করে দেখিয়ে যান।'

আশিষ ক্লিনিকে গেল। সেফ হোম ক্লিনিকে তাকে যে মহিলা ডাক্তার দেখল তার নাম রুবিনা। আতাহার তালুকদারের পুত্রবধূ রুবিনা। কিন্তু আশিষ বা রুবিনা, এরা কেউ কাউকে চেনে না। কখনও দেখেওনি। আশিষের গায়ে একশ' চারের মতো জ্বর। তাকে অনেক সময় নিয়ে দেখল রুবিনা। তারপর চশমার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে বলল, 'দুপুরে কিছু খেয়েছেন?'

আশিষ ম্লান গলায় বলল, 'এক পিস রুটি আর খানিকটা জেলি।'

রুবিনা বলল, 'সকালে?'

আশিষ বলল, 'কিছু না, ঘুম থেকে উঠতে দেরি হয়েছিল।'

রুবিনা বলল, 'কাল রাতে?'

আশিষ বলল, 'কিছু না।'

রুবিনা বলল, 'কাল দুপুরে?'

এবার বিরক্ত হলো আশিষ, 'কী খেয়েছি, কখন খেয়েছি সেটা দিয়ে কী দরকার? সমস্যাটা কী সেটা বলেন। ওষুধ লাগলে প্রেসক্রিপশন দিন। আমি বাইরের দোকান থেকে কিনে নিচ্ছি।'

রুবিনার রাগ করার কথা ছিল। কিন্তু সে রাগল না। মিষ্টি করে হাসল। বলল, 'বাসায় কে কে আছে?'

আশিষ রুবিনার কথার জবাব দিল না। ঝট করে উঠে দাঁড়াল। রুবিনা শান্ত গলায় বলল, 'বসুন। আপনার সঙ্গে কথা আছে।'

আশিষ জানে না রুবিনার গলায় কী ছিল, কিন্তু সে বসল। রুবিনা বলল, 'আপনার ভয়াবহ নার্ভাস ব্রেকডাউন হচ্ছে। আপনার প্রেসার অনেক হাই। বিপজ্জনক রকম বেশি। আমার ধারণা আপনি কোনো কারণে খুবই স্ট্রেসের ভেতর দিয়ে যাচ্ছেন। ঘুম, খাওয়া-দাওয়া কিছুই হচ্ছে না। এ রকম চলতে থাকলে যেকোনো সময় আপনার পুরো সিস্টেমটাই কলাপস করতে পারে। রাস্তাঘাটেও আপনি সেন্সলেস হয়ে যেতে পারেন। আরও ভয়ঙ্কর সব সমস্যাও হতে পারে। এখুনি যদি সতর্ক না হন, বিষয়টা হয়তো নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে।'

রুবিনা থামল। সে সতর্ক চোখে তাকিয়ে রইল আশিষের চোখের দিকে। কিন্তু আশিষ এবার আর কোনো কথা বলল না। সে চুপচাপ তাকিয়ে রইল টেবিলের কাচের দিকে। স্বচ্ছ কাচের ভেতর থেকে অসংখ্য ভিজিটিং কার্ড দেখা যাচ্ছে। সে সেদিকে তাকিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ভিজিটিং কার্ডগুলো দেখতে লাগল। যদিও এই কার্ড নিয়ে তার কোনো আগ্রহ নেই। হয়তো রুবিনার চোখ থেকে নিজেকে লুকানোর চেষ্টা। রুবিনাই কথা বলল, 'আমি একজন ডাক্তার। বুদ্ধিমান মানুষ ডাক্তারের কাছে অসুখ লুকায় না।'

আশিষ এবারও কিছু বলল না। নিজের অসহায়ত্ব কিংবা দুর্ভাগ্যের কথা মানুষকে বলতে ইচ্ছা করে না তার। মানুষের সহানুভূতিপূর্ণ চোখ তার ভালো লাগে না। রুবিনা আবারও কথা বলল, 'জোর নেই কোনো, আপনি চাইলে আমাকে বলতে পারেন। নাও বলতে পারেন। তবে টেক কেয়ার অব ইওরসেলফ। যতই সমস্যা থাকুক, আগে নিজেকে সুস্থ রাখতে হবে। নিজে সুস্থ না থাকলে সমস্যার সমাধান কী করে হবে?'

আশিষ এবার মুখ খুলল। যতটা সম্ভব সংক্ষেপে সে মিলির সঙ্গে তার বিয়ের কথা বলল, সকালের কথা বলল, সকালের দুর্ঘটনার কথা বলল। মিলির বর্তমান অবস্থার কথা বলল। রুবিনা খুব স্বাভাবিক চেহারায় আশিষের কথা

Boighar.com & ARS

শুনল। আশিষের কথা শেষে এই নিয়ে তাকে আর কিছু জিজ্ঞেস করল না সে। কিছু বললও না। খসখস করে কিছু ওষুধ লিখে দিল। একটা খাবার তালিকা করে দিল। কিছু ঘুমের ওষুধও দিল। আশিষ চলে যাওয়ার আগে রুবিনা তার একটা ভিজিটিং কার্ড দিয়ে হাসিমুখে বলল, 'আপনাকে এমন আলাদা খাতির করার একটা কারণ কিন্তু আছে।'

আশিষ কপাল কুঁচকে তাকাল। রুবিনা বলল, 'আপনাকে আমি চিনতে পেরেছি। আপনার পত্রিকার লেখাগুলো আমি খুব আগ্রহ নিয়েই পড়ি। প্রথম দেখে সঙ্গে সঙ্গেই চিনতে পারিনি, তবে খুব চেনাচেনা লাগছিল। কিছুদিন আগে পত্রিকায় আপনার ছবিও ছাপা হয়েছিল। সম্ভবত সাংবাদিকতা নিয়ে কী একটা পুরস্কার পেয়েছিলেন।'

আশিষ জবাব দিল না। সে চলে এলো। সেদিন আর অফিসেও গেল না। সে বাইরে থেকে খাবার আর ওষুধ কিনে নিয়ে বাসায় ফিরল। সারারাত মরার মতো ঘুমাল। পরদিন ভোরে তার ঘুম ভাঙল বেলা করে। খানিক সুস্থ লাগলেও শরীর জুড়ে রাজ্যের ক্লান্তি। আশিষ সিদ্ধান্ত নিল সে কিছুদিন অফিসে যাবে না। তবে জরুরি কিছু কাজ সারতে সে বাইরে গেল। ফোন করে অফিসে জানাল আগামী কয়েকদিন সে অফিসে যেতে পারবে না। তারপর খাবার কিনে বাসায় ফিরল। মিলির সঙ্গে যে তার খুব একটা কথা হয়, তাও না। সে আজ বাসায় গিয়ে তার পুরনো দিনের স্মৃতির ঝাঁপি খুলে বসল। কিন্তু সে অবাক হয়ে দেখল তার আসলে পুরনো দিনের স্মৃতি বলতে তেমন কিছুই নেই। তার ছোটবেলার পুরোটাই কেটেছে একা। সে কারো সঙ্গে মিশত না, হৈ-হুল্লোড় করত না। ছেলেবেলা থেকেই সে গল্প যা করত তা এক অপলা আর জয়দ্বীপ কাকুর সঙ্গে। তা জয়দ্বীপ আসতও খুব ঘন ঘন। যেন কলকাতায় তার মনই বসত না। ফাঁক পেলেই চলে আসত মালোপাড়া, আর সঙ্গে থাকত রাজ্যের বই। সেসব বইপত্র পড়ে পড়েই বোধ করি আশিষ ঢুকে গিয়েছিল তার নিজের ভাবনার জগতে। সেই ভাবনার জগৎ থেকে কি সে বের হতে পেরেছিল? নাকি পেরেছে? এতদিন বিষয়টি নিয়ে আশিষ ভাবেনি। সে তার নিজের মতোই চলে, কাজ করে, ভাবে। কিন্তু আজ এই নিজেকে খুঁজে ফেরা মুহূর্তে আশিষের মনে হলো গত একটা বছর সে ভীষণভাবে ডুবে ছিল একটা মাত্র মানুষের ভাবনায়। সেই মানুষটা সকাল। মিলির আচরণটা হয়তো অনেক বেশি প্রতিক্রিয়াশীল, কিংবা অনিয়ন্ত্রিত। কিন্তু সে নিজে কি মিলির চেয়ে কম কিছু করছে? সে বাসে অফিসে যাওয়ার সময় পুরোটা পথ মনে মনে সকালের সঙ্গে কথা বলে। নানান কথা। এবং অবাক করা বিষয় হচ্ছে, সে শুনতে পায়, সকালও দিব্যি তার সব কথার উত্তর দিচ্ছে।

এই কথা যে শুধু বাসে হয় তা না। অফিসে কাজের ফাঁকেও হয়। হাঁটা কিংবা ঘুমের ভেতরও হয়। সে মনে মনে সকালের সঙ্গে কথা বলে। তার এই

কথা কেউ শুনতে পায় না বলে তাকে কেউ পাগল ভাবে না। মিলিকে ভাবে। তবে আজকাল মাঝে মাঝে তা শুধু মনে মনেই থাকছে না। সেদিন বাসে তার পাশের সিটের লোকটা তাকে হঠাৎ ধাক্কা দিয়ে বলল, 'ভাই, শরীল খারাপনি?'

আশিষ অবাক হয়ে বলল, 'কেন?'

লোকটা বলল, 'না, মানে অনেকক্ষণ থেকেই শুনতেছি আপনে নাটকের মতোন করে ডায়লগ দিতেছেন। একবার নিজের গলায়, আরেকবার বাচ্চাদের গলায়। ভাইজান কি নাটক-ফাটক করেন? টিভিতে? না থিয়েটার?'

আশিষ অনেকক্ষণ লোকটার দিকে তাকিয়ে রইল। তার হঠাৎ করে বিষয়টা বুঝতে খানিক সময় লাগল এবং বুঝতে পারার পর থেকেই তার কেমন অস্বস্তি হতে লাগল। সে নেমে গেল পরের স্টপেজেই। দিনের বাকিটা সময় সে খুব সতর্কভাবে নিজেকে খেয়াল করল। এই অতি সতর্কতার কারণেই কিনা কে জানে, সে দেখল খানিক পরপরই সে সকালের সঙ্গে কথা বলছে এবং সেটা সে বুঝতে পারছে কথা অনেকক্ষণ চালিয়ে যাওয়ার পর। যখন সে অবচেতনে ভাবা সকালের নানারকম প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে শব্দ করে তখন।

সে কি ধীরে ধীরে তার নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলছে? এটা একটা বিপজ্জনক লক্ষণ। আশিষ বিষয়টা নিয়ে একা একা অনেকক্ষণ ভেবেছে এবং সে স্পষ্টতই টের পাচ্ছে যে, তার নিজের প্রতি নিজের যে শক্ত নিয়ন্ত্রণটা এতদিন ধরে ছিল, তা ক্রমশই শিথিল হয়ে আসছে। গতকালের ঘটনাটা বিষয়টাকে আশিষের সামনে আরও খোলাখুলিভাবে ধরা দিয়েছে। বিশেষ করে সেফ হোম ক্লিনিকের ডাক্তারের কথা। আশিষ দীর্ঘ সময় পর মিলির ঘরে গেল। কিন্তু মিলিকে দেখে সে ছোটখাটো একটা ধাক্কা খেল। মিলি বসে আছে খাটের মাঝখানে। তার ঠোঁটে টকটকা লাল লিপস্টিক। চোখে টানা কাজল। মাথার চুল এলোমেলো হলেও তা যে অনেক ভেবেচিন্তে সাজিয়ে-গুছিয়ে করা হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সবচেয়ে বড় বিষয় যেটা, সেটা হলো মিলির শাড়ির আঁচল তার বুকের ওপর খুবই অগোছালো অবস্থায় রাখা। সে পরেছে লাল টাইট ব্লাউজ। ব্লাউজের সামনের দুটো বোতাম খোলা। তার লাল রঙের অন্তর্বাস স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। তার শাড়ি হাঁটু অবধি গোটানো। ধবধবে ফর্সা পুরুষ্ট পা জোড়া অশালীন ভঙ্গিতে ভাঁজ করে বসে আছে মিলি। আশিষকে দেখেই সে ফিসফিস করে বলল, 'আমাকে আর ভালো লাগে না তোমার, না?'

আশিষ এতটাই অবাক হয়ে গেছে যে সে সঙ্গে সঙ্গেই কোনো জবাব দিতে পারল না। মিলি বলল, 'আমার গা থেকে গন্ধ আসে? আমার শরীরটাও আর ভালো লাগে না, তাই না?'

আশিষ মিলির কাছে গেল। বলল, 'কী হয়েছে তোমার?'

মিলি বলল, 'আমার কী হয়েছে, না তোমার কী হয়েছে? অপলা, সব অপলা করছে আমি জানি। তুমি রোজ আমাকে একা রেখে রেখে অপলার কাছে

Boighar.com & ARS

যাও, আমি জানি। আমি সব জানি। আমার শরীরটা পুরনো হয়ে গেছে, এখন নতুন শরীর চাই তোমার?'

আশিষ এতদিনেও মিলির এই নতুন পাগলামির সঙ্গে পরিচিত ছিল না। সে কিছুটা হতচকিত গলায় বলল, 'এসব কী বলছ তুমি?'

মিলি বলল, 'এহ, ন্যাকা। কিচ্ছু জানে না। আমি সব জানি, কেন তুমি আমার কাছে আসো না। কেন অত রাত পর্যন্ত বাইরে থাক। আমি সব জানি। সব।'

আশিষ মিলির গা ঘেঁষে বসল। বলল, 'প্লিজ, এমন কর না।'

মিলি বলল, 'ও, তুমি যা করছ তাতে দোষ নাই, আর আমি বললেই দোষ। বাহ। দারুণ বুদ্ধি। কিন্তু শোন, এটা আমি হতে দিব না। আমার শরীরটা দেখ, আমি অন্য কারও চেয়ে অসুন্দর না। দেখবে কীভাবে? তুমি তো আর আমার কাছে আসোই না। তাহলে বুঝবে কেমন করে? কাছে এসে দেখ, কাছে আসলে অনেক কিছুই বুঝবে। অনেক কিছু। অনেক কিছু।'

মিলি খপ করে আশিষের শার্টের কলার টেনে ধরল। তারপর আশিষকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল বিছানায়। ক্ষুধার্ত বাঘিনীর মতোন তার শরীরের ওপর চেপে বসল। তারপর ঠোঁট নামিয়ে আনল আশিষের ঘাড়ে। আশিষ কী করবে বুঝতে পারছে না। তবে সে এটা টের পাচ্ছে মিলি আর মিলির মধ্যে নেই। সে এই মুহূর্তে অন্য কেউ। আশিষ দু'হাতে মিলিকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু মিলির শক্তির সঙ্গে যেন সে পেরে উঠল না। মিলি তার দাঁত বসিয়ে দিল আশিষের গলায়। আশিষ তীব্র ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল। মিলি মুখ তুলে তাকিয়ে বলল, 'এখন থেকে দিন-রাত আমরা এই ঘরে থাকব। অনেক কিছু করব। অনেক কিছু। তোমাকে আমি আর বাইরে যেতে দিব না। আর না।'

আশিষ এক ঝটকায় মিলিকে ছিটকে ফেলে উঠে দাঁড়াল। মিলির চোখভর্তি ভয়াবহ দৃষ্টি। সেই দৃষ্টিতে আশিষের সারা শরীর কেমন শিউরে উঠল। সে দুই পা পেছনে হেঁটে গিয়ে দরজার কাছে দাঁড়াল। মিলি ফোঁস ফোঁস শব্দে জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছে। তার বুক দ্রুত ওঠানামা করছে। সে অনেকক্ষণ একদৃষ্টিতে আশিষের দিকে তাকিয়ে রইল। অনেকক্ষণ। তার সেই দৃষ্টিভর্তি সর্বগ্রাসী আগুন। আশিষের কেমন দিশেহারা লাগতে লাগল। সে ভেবে পাচ্ছে না এই মুহূর্তে তার কী করা উচিত! আশিষ দেয়ালের কাছটাতে দাঁড়িয়ে রইল। জানালার বাইরে চড়া রোদ উঠেছে। কর্মব্যস্ত মানুষের কোলাহল। আশিষ ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। ঠিক এই মুহূর্তে মিলি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। আশিষ তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল, খানিক আগের সেই গনগনে আগুন চোখে মুহূর্তেই ছলছল জল জমে উঠেছে। মিলি তার দু'খানা হাত জড়ো করে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল, 'আমি আর কোনোদিন আমার সকাল বেলার পাখিকে মারব না। আর

কোনো দিন না। বিশ্বাস কর, কোনো দিন না। তুমি শুধু একবার আমার সকাল বেলার পাখিকে এনে দাও। একবার। মাত্র একবার। একবার শুধু এনে দাও।'

মিলির সারা শরীর প্রবল ঝড়ে কেঁপে ওঠা গাছের মতোন কাঁপছে। যেন ভেঙে পড়ছে। সে সেই কান্না জড়ানো গলায়ই আবার বলল, 'আমার পেটের মধ্যে আমার সকাল বেলার পাখিকে এনে দাও। একবার শুধু এনে দাও। আমি আর কোনোদিন ওকে নিয়ে বাইরে যাব না। কোনোদিন না। ও আমার পেটের ভেতরই থাকবে। সেই আগের মতোন একটু একটু করে পেটের ভেতর নড়বে। তুমি কান পেতে শব্দ শুনবে। আমি আর কোনোদিনে স্কুটারে উঠব না। দরজা খুলে বাইরে যাব না। সারাদিন বাসায় বসে থাকব। তুমি শুধু আমাকে একটু খেতে দিও। আমি আর কিচ্ছু চাইব না। কিচ্ছু না। আমাকে একবার শুধু আমার সকাল বেলার পাখিটাকে এনে দাও। একবার।'

মিলি যেন ভাঙা কাচের টুকরোর মতোন ঝরঝর করে ঝরে পড়ছিল তার প্রতিটি ফোঁটা চোখের জলের সঙ্গে মিশে। আশিষ এই মিলিকে চেনে না। সে হঠাৎ পাগলের মতোন ছুটে এসে মিলিকে শক্ত করে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরল। শক্ত করে। যেন মিলিকে সে তার বুকের ভেতর মিশিয়ে ফেলতে চায়। যেন এই জগতে মিলির আলাদা করে আর কোনো অস্তিত্ব না থাকে। যেন তার আলাদা করে কষ্টের আর কিছু না থাকে। কান্নার আর কিছু না থাকে। যেন সবটুকুই হয়ে যায় আশিষের। সব কষ্ট, সব কান্না, সব দুঃখ। কেবল আশিষের।

দিন তিনেক বাদে আশিষ কী মনে করে আবার সেফ হোম ক্লিনিকে গেল। কিন্তু রুবিনাকে পাওয়া গেল না। সে আসবে সন্ধ্যা ছয়টায়। তখন কেবল দুটো বাজে। কিন্তু আশিষ চার ঘণ্টা বসে রইল রুবিনার জন্য। মিলি গত দিন তিনেক ধরে আগের চেয়ে খানিক শান্ত। কিছুটা স্বাভাবিকও। কিন্তু আশিষ জানে মিলি আসলে স্বাভাবিক না। বরং আরও অসুস্থ। সে আজকাল প্রতি রাতে একটা স্বপ্নই দেখে। সেটি হলো, সকাল তাকে বলছে, 'মা তুমি কাঁদো কেন? আমি তো তোমার পেটের ভেতরই আছি মা।'

www.boighar.com

সেই থেকে মিলির ধারণা হয়েছে সে যদি আবার বাচ্চা নিতে পারে, তাহলে সকাল আবার ফিরে আসবে। কিন্তু সেই ভয়াবহ দুর্ঘটনায় মিলি ফিরে এসেছে স্রেফ ভাগ্যের জোরে। ডাক্তাররা স্পষ্ট করে বলেও দিয়েছিলেন, মিলির যা শারীরিক এবং মানসিক অবস্থা, তাতে আপাতত নির্দিষ্ট একটা সময় অবধি যেন আর বাচ্চা-কাচ্চা না নেওয়া হয়। আর নিলেও তা অবশ্যই ডাক্তারের সঙ্গে আলোচনা করেই। কিন্তু সেদিনের ঘটনার পর থেকে আশিষের নিজেরও কেমন অস্থির অস্থির লাগছে। সে কিছু না ভেবেই চলে এসেছে সেফ হোমে। রুবিনা এলো ছয়টারও কিছু পরে। সে ওয়েটিং রুমে আশিষকে বসে থাকতে দেখেই

Boighar.com & ARS

চিনল। আশিষ বলবে না বলবে না করেও পুরো ঘটনাই খুলে বলল। সেদিনের ঘটনাও। রুবিনা গম্ভীর মুখে সব শুনল। তারপর বলল, 'আসলে আপনার স্ত্রীর সঙ্গে কথা না বলে কিছু বলা মুশকিল। তবে একটা বিষয় তো নিশ্চিত, একজন সাইকিয়াট্রিস্ট দেখানো সবচেয়ে বেশি জরুরি।'

আশিষ বলল, 'অনেককেই দেখানো হয়েছে।'

রুবিনা বলল, 'কিন্তু সেটা ভিন্ন পরিস্থিতিতে। পরিস্থিতি বদলেছে।'

আশিষ বলল, 'তাহলে আমি কি কোনো সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে নিয়ে যাব?'

রুবিনা বলল, 'আপনার সমস্যা না থাকলে আমার পরিচিত একজন আছে, উনার কাছে নিয়ে যেতে পারেন। সেক্ষেত্রে আমি হয়তো বলে দিতে পারব।'

আশিষ আপত্তি করল না। কিন্তু প্রায় সপ্তাহখানেক ধরে মিলির নিবিড় পর্যবেক্ষণ শেষে সাইকিয়াট্রিস্ট যা বললেন, তাতে সমস্যা বরং আরও ঘনীভূতই হলো। সাইকিয়াট্রিস্ট স্পষ্ট করেই বললেন, মিলি তার মনোজগতে অদ্ভুত এক গল্প তৈরি করছে প্রতিমুহূর্তে। সেই গল্পের সবটা জুড়েই আছে তার মৃত সন্তান সকাল। তার সেই বিশেষ স্টেট অব মাইন্ডে যে ইমাজিনেশন সে তৈরি করছে, তাহলো সে যদি আবার মা হয়, তাহলে সকালই তার সন্তান হিসেবে জন্ম নেবে এবং এটি একটি বিপজ্জনক মানসিক অবস্থা। এক ধরনের ইওটোপিয়ায় ভুগছে সে। এই ইওটোপিয়া থেকে কিছুতেই বের হতে পারছে না। তার ভেতরে এই ইমাজিনেশনটা শক্তভাবে গেঁথে গেছে।

এখন এই অবস্থায় বাচ্চা নিলে দেখা গেল সন্তান জন্ম দেওয়ার পর মিলি দেখল যে বাচ্চাটা আসলে সকাল না। অন্য এক শিশু। তখন পরিস্থিতি সেই সন্তান আর মিলি দু'জনের জন্যই আরও খারাপ হতে পারে। বরং ভালো হয় আরও কিছু সময় নিয়ে মিলিকে খানিকটা সুস্থ এবং স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার মধ্যে নিয়ে আসতে পারলে। আবার সন্তান নেওয়ার বিষয়টা তারপর ভাবা যেতে পারে। সবচেয়ে ভালো হয় সকালের বয়সী কিংবা তার কাছাকাছি বয়সের কাউকে সার্বক্ষণিক মিলির কাছাকাছি রাখতে পারলে। এতে ধীরে ধীরে এই নতুন সম্পর্ক বা যোগাযোগ হয়তো মিলির আগের ভাবনার জগতের ওপর একটা প্রভাব ফেললেও ফেলতে পারে।

আশিষ আবার এলোমেলো হয়ে গেল। কী করবে কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না সে। সমাধানটা আসলে কী! সাইকিয়াট্রিস্টের কাছ থেকে ফেরার পথে আশিষ হঠাৎ সেফ হোম ক্লিনিকের সামনে রিকশা থামাল। মিলি বলল, 'এখানে কী?'

আশিষ বলল, 'ভেতরে চল। একজন ডাক্তার আপা আছে, তার সঙ্গে কথা বলে দেখি।'

রুবিনা সেদিন একা ছিল না। অনেক বায়নার পর অবশেষে রুপাইকে নিয়ে এসেছে চেম্বারে। আশিষ রুবিনার সঙ্গে মিলিকে পরিচয় করিয়ে দিল, কিন্তু

মিলির তাতে খুব একটা আগ্রহ আছে বলে মনে হলো না। পুরোটা সময় রুবিনার সঙ্গে তেমন কোনো কথাই বলল না মিলি। সে তাকিয়ে রইল রুপাইয়ের দিকে। রুপাই তখন মায়ের স্টেথেস্কোপ গলায় ঝুলিয়ে বিশাল ডাক্তার সেজে গেছে। রুমের একপাশে ধবধবে সাদা চাদরে ঢাকা রোগী দেখার বেড। সেই বেডের ওপর রাখা বালিশের সঙ্গে স্টেথেস্কোপ চেপে ধরে ভারি উৎকর্ণ হয়ে কল্পিত হার্টবিট শোনার চেষ্টা করছে রুপাই। সে কী শুনল কে জানে, তবে কিছুক্ষণ পর গম্ভীর গলায় বলল, 'হার্ট দুর্বল। বেশি করে পানি খেতে হবে। রেগুলার ঘুম হচ্ছে না।'

মিলি চুপচাপ তার চেয়ার থেকে উঠে গিয়ে রুপাইয়ের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল দীর্ঘসময়। তারপর হঠাৎ রুপাইয়ের কাছে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে নরম গলায় বলল, 'ডাক্তার ম্যাডাম, আমার খুব অসুখ করেছে, আমাকে একটু দেখে দেবেন?'

রূপাই খানিক বড় বড় চোখ করে মিলির দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর হঠাৎ দৌড়ে চলে গেল মায়ের কাছে। মিলি কিছু বলল না। তবে অদ্ভুত চোখ মেলে তাকিয়ে রইল রুবিনা আর রুবিনার কোলের ভেতর লেপ্টে থাকা রুপাইয়ের দিকে। দীর্ঘক্ষণ। একদৃষ্টিতে। আশিষ, রুবিনা কিংবা রুপাই, সবাই মিলির এই তাকিয়ে থাকা চোখের দৃষ্টি দেখল, কিন্তু সেই দৃষ্টির ভাষা তারা কেউই পড়তে পারল কিনা বোঝা গেল না।

আশিষ মিলিকে নিয়ে বাসায় ফিরল সন্ধ্যার পর। বাসায় ফিরে দেখে শুকরঞ্জন ডাক্তার ফিরে এসেছেন। তবে তিনি ফিরেছেন একা। সুজাতা রানী আপাতত ফিরবেন না। বাবাকে দেখে আশিষ প্রবল স্বস্তি বোধ করল। তার প্রায়ই মনে হয় এই মানুষটা পাশে থাকলে কোনো পরিস্থিতিতেই সে আর একা নয়। সে চাইলেই নিশ্চিন্ত হতে পারে। রাতে চোখ বন্ধ করে বেঘোরে ঘুমাতেও পারে। দরজার কাছে দাঁড়ানো শুকরঞ্জন ডাক্তারকে দেখে আশিষের আরেকটা কথা মনে হলো। সেদিন যে সে ভাবছিল, তার শৈশবের কোনো স্মৃতি নেই, এই কথাটা আসলে সত্যি না। এই মানুষটার সঙ্গে তার জগতের সুন্দরতম সব স্মৃতি রয়েছে। সেই স্মৃতিরা বুকের কোনো গহিন কোণে ঘাপটি মেরে বসে থাকে। সে প্রায়ই তাদের খুঁজে পায় না। তবে যখন তার আশ্রয়ের প্রয়োজন হয়, তখন তারা চুপিচুপি গুটি গুটি পায়ে উঠে আসে। তাকে পরম মমতায় আগলে ধরে রাখে। আশিষের হঠাৎ শুকরঞ্জন ডাক্তার হয়ে উঠতে ইচ্ছে করল। আসলে শুকরঞ্জন ডাক্তার না, তার হয়ে উঠতে ইচ্ছা করল শুকরঞ্জন ডাক্তারের মতোন ডালপালা ছড়ানো বিশাল বটবৃক্ষের মতোন এক বাবা!

Boighar.com & ARS

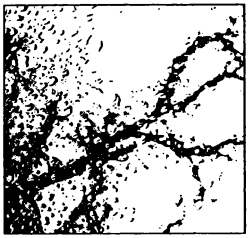

মজিবর মিয়ার আড়তের হাল ধরে রাখল মনাই।

লোকমানের গ্রুপ বা লতু হাওলাদার কেউই আর এই বিষয় নিয়ে কোনোরূপ উচ্চবাচ্য করল না। মনাই প্রথম থেকেই মজিবর মিয়ার সঙ্গে কাজ করছে। ফলে আড়তের সবকিছুই সে জানে। তার জন্য ব্যবসা চালিয়ে নেওয়া কোনো সমস্যা হলো না। সে রাতে ঘুমায়ও আড়তে। দুপুরে আর রাতে বাড়ি এসে খেয়ে যায়। সেদিন দুপুরে ভাত খেতে এসে দেখে আম্বরি বেগম নেই, তাকে ভাত বেড়ে দিতে এসেছে লাইলি। লাইলি ভাত দিতে দিতে বলল, 'কী রে মনাই, ব্যবসাপাতির কী খবর?'

মনাই বলল, 'এই তো বুজান, চলতেছে। ভালোও না, আবার একদম মন্দও না।'

লাইলি বলল, 'আড়তের কাগজপত্র কই?'

মনাই বলল, 'কিয়ের কাগজপত্র?'

লাইলি বলল, 'আমি শুনছি যযাতিপুর হাটের একটামাত্র দোকানের জমির মালিকানা আতাহার তালুকদারের নাই। সেইটা হইল আমাদের আড়ত। এই আড়তের জমি আরশির বাপ কিন্যা নিছে। কাগজপত্রও আছে।'

মনাই বলল, 'এইসব জিনিস তো আর সে আমার কাছে বলে নাই বুজান।'

লাইলি কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণ চোখে মনাইকে জরিপ করল। তারপর বলল, 'তোর সঙ্গে তার হিসাব-নিকাশ কী ছিল?'

মনাই বলল, 'কিয়ের হিসাব-নিকাশ?'

লাইলি বলল, 'তোর বেতন টেতন কেমন কী দিত?'

মনাই বলল, 'আমার তো কোনো বান্দা বেতন ছিল না। যখন যা লাগত, তাই দিত। মজিবর ভাই আমারে কখনও ঠকায় নাই। আর আমার তো কেউ নাই, এত টাকা-পয়সা দিয়া আমিইবা কী করুম? মজিবর ভাই বলছিল, বাকি জীবন আমি জানি তার সঙ্গেই থাকি।'

লাইলি কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল, 'ভালো কথা বলছে। এখন আমারে বল, দোকানের হিসাব-নিকাশের কী অবস্থা? এখন থেকে প্রতি সপ্তায় আমারে হিসাব

দিবি। আরেকটা কথা ওই লোকমান পার্টির কোনো লোক বা লতু হাওলাদার কোনো ঝামেলা করলে সঙ্গে সঙ্গে আমারে জানাবি।'

মনাই বলল, 'আইচ্ছা।'

মনাই ভাত খেয়ে উঠে গেল। ঘরের মেঝেতে ছড়ানো-ছিটানো এঁটো বাসন-কোসন। আরশি উঠানের একপাশে চালতা গাছতলায় বসে ছিল। লাইলি নরম গলায় তাকে ডাকল। আরশি খানিক অবাক হলেও ত্রস্ত পায়ে হেঁটে এলো। লাইলি বলল, 'দুপুরে কিছু খাইছস?'

আরশি ডান-বাঁয়ে মাথা নাড়ল। লাইলি ঘরের দাওয়া থেকে উঠানে নেমে আরশির মাথায় হাত বোলাল। তারপর আর্দ্র গলায় বলল, 'আমি মাঝে মাঝে রাইগা গেলে মন খারাপ কইর না মা। দেখো না, চাইরপাশে কত ঝামেলা। এত ঝামেলা সামলাইতে গেলে মাথা কি সব সময় ঠিক থাকে?'

এই এতটুকু কথা। কিন্তু আরশির যেন কী হলো। তার গলা ভারী হয়ে এলো মুহূর্তে। চোখের ভেতরটা কেমন জ্বালা করে উঠল! তার কি কান্না পাচ্ছে? লাইলির শাড়ির আঁচল তার নাকের কাছে এসে মৃদু বাতাসে উড়ছে। সেই শাড়ির আঁচলে সে কি কোনো সুবাস পাচ্ছে! মায়ের সুবাস? আরশি কাঁদল না। কিন্তু আরও কিছুটা ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়াল লাইলির শরীরের সঙ্গে।

লাইলি বলল, 'তারপর দেখছ না মা, তোমার বাপেরও এই অবস্থা। এখন আমাদের সবারই অনেক চিন্তা-ভাবনা কইরা চলতে হইব। চাইরদিকে বিপদ, চিন্তা-ভাবনা না কইরা চললে কেমনে হইব? তার ওপর তোমার তো একটা ছোট বইনও হইছে। তারে নিয়াও তো চিন্তা।'

আরশি কেবল মৃদু মাথা নাড়ল। লাইলি বলল, 'যাও, ঘরে ভাত বাড়া আছে তোমার জন্য। ভাত খাইয়া আমার ঘরে আসো।'

লাইলি আজকাল এমনিতে তাকে তুই করেই বলে। তবে মাঝে মাঝে তুমি করেও বলে। এই এখন যেমন বলছে। এর কারণ অবশ্য আরশি জানে না। আম্বরি বেগম সকাল থেকেই বাড়িতে নেই। কই গেছেন কাউকে বলেও যাননি। আরশি ঘরের মেঝেতে পাতা মাদুরের ওপর থেকে ঢেকে রাখা ভাতের প্লেটটা নিল। সকালে রান্না হয়নি বলে সেই গত রাতের পর থেকে এখন অবধি আর কিছু পেটেও পড়েনি। তবে এ নিয়ে তার কোনো অভিযোগও নেই। সে জানে বাড়িতে বু নেই। রান্না করবে কে? রোদ খানিকটা চড়ে এলে পাশের বাড়ির শেফালি এসে খানিকটা ভাত রেঁধে দিয়ে গেছে। আরশি ভাতের প্লেট হাতে নিতেই ঝিমিয়ে থাকা ক্ষিদেটা টের পেল। কিন্তু প্রথম নলা ভাত মুখে দিতেই তার পেট মুচড়ে বমি চলে এলো। সম্ভবত গত রাতের বেঁচে যাওয়া ভাত! পানি দিয়ে পান্তা করে রাখা হলেও সারারাত শেষে এই দুপুর অবধি এসে তা পচে নরম হয়ে গেছে। একটা উৎকট গন্ধও ছড়াচ্ছে। সঙ্গে খানিক বাসি ডাল। আরশি ঢকঢক করে এক গ্লাস পানি খেয়ে হাত ধুয়ে উঠে পড়ল। এই ঘরের

Boighar.com &ARS

মেঝের একপাশে ভাত-সালুনের হাঁড়ি সাজিয়ে রাখা হয়। কিন্তু সেখানে কোথাও শেফালির রান্না করা দুপুরের ভাত-সালুনের হাঁড়ি সে দেখতে পেল না। খানিক অবাক হলেও কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করল না আরশি।

সে প্লেটের পচা ভাতগুলো উঠানের একপাশে ঘুরে বেড়ানো হাঁস-মুরগির মাঝে ছড়িয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। খাবার পেয়ে এতক্ষণ ধরে অলস ঘুরে বেড়ানো হাঁস-মুরগিগুলোর ভেতর যেন রীতিমতো উৎসব লেগে গেল। আরশি পুরোটা সময় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল। একটা মা মুরগি অনেকগুলো ধবধবে সাদা তুলোর বলের মতোন ছানা নিয়ে ঠুকরে ঠুকরে খাবার খাচ্ছিল। মজার ব্যাপার হচ্ছে, তার ছানাদের কারও মধ্যেই মাটি থেকে ভাত কুড়িয়ে খেতে কোনো আগ্রহ নেই। তারা সবাই ঠোঁট উঁচু করে অপেক্ষায় থাকে তাদের মা কখন মাটি থেকে এক দানা, দুই দানা ভাত ঠুকরে নেবে ঠোঁটে। অমনি তারা একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়বে মায়ের ঠোঁটে। তারপর মায়ের ঠোঁট থেকে ঠুকরে নেবে সেই খাবারটুকু। মা মুরগিটাকে এতে খুব একটা বিরক্ত বলে মনে হলো না আরশির। তার বরং মনে হলো মাটি থেকে ঠোঁটে করে খাবার কুড়িয়ে নিয়ে প্রতিবারই মা মুরগি তার ছানাদের জন্য অপেক্ষায় থাকে।

দৃশ্যটা কী যে সুন্দর! কিন্তু আরশি আবিষ্কার করল, আজকাল অল্পতেই তার চোখ কেমন স্যাঁতসেঁতে হয়ে যায়। বুকের ভেতরটা ভারী ভারী লাগে। গলার ভেতর কী যেন কী দলা পাকিয়ে ওঠে। সে আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর অজস্র ভাবনার এলোমেলো জট মাথায় নিয়ে লাইলির ঘরে গেল। এই ভর দুপুরেও লাইলি শুয়ে ছিল মশারি টানিয়ে। মশারির ভেতরে তহুরা ঘুমাচ্ছে। আজকাল দিনেদুপুরেও প্রচুর মশা চারদিকে।

লাইলি তাকে দেখেই বলল, 'ভাত খাইছস?'

আরশি মাথা নাড়াল, 'হ্যাঁ'।

লাইলি বলল, 'যাও মা, ওইখানে এখন যেই থালা-বাসনগুলা আছে, ওইগুলা একটু পুস্কুনি থেইকা ধুইয়া নিয়া আসো।'

আরশি আবারও মাথা নেড়ে বলল, 'আচ্ছা।'

আরশি বের হতে যাচ্ছিল, এই মুহূর্তে লাইলি তাকে ডেকে বলল, 'পরিষ্কার হয় জানি। আমি কিন্তু অপরিষ্কার থালা-বাসন দেখতে পারি না। ঠিক আছে?'

আরশি আবারো মাথা নাড়ল। তবে এবার আর কোনো কথা বলল না। লাইলির ঘর থেকে বের হতে গিয়ে সে দেখল, দুপুরের জন্য রান্না হওয়া ভাত আর সালুনের হাঁড়িগুলো লাইলির ঘরের একপাশে সার দিয়ে রাখা!

আরশি এতদিন কোনো কাজ করেনি। আম্বরি বেগম তাকে বুকের ভেতর ছোট্ট পাখির মতোন আগলে রেখেছিলেন। আরশি বাসন-কোসন মাজতে গিয়ে একটা জিনিস আবিষ্কার করল, আম্বরি বেগমকে দেখে বাসন-কোসন মাজা যত সহজ মনে হয়েছিল। আসলে বাস্তবে তা অতটা সহজ না। বরং ভালোই কঠিন।

সে আম্বরি বেগমের মতোনই চুলা থেকে খানিক ছাই নিয়ে নিয়েছে, খানিক খড়কুটাও। কিন্তু তার অমন সরু বাঁশের কঞ্চির মতোন হাতের জোরইবা কতটুকু? খড়কুটোর চুলোয় রান্না হওয়া হাঁড়ি-পাতিল বাসন-কোসন জুড়ে রাজ্যের কালি-ঝুলি। সে তার সাধ্যমতো চেষ্টা করল, কিন্তু তার অপুষ্ট হাত আর অনভিজ্ঞ চেষ্টায় সেই চেষ্টা কতটা সফল হলো তা সে তখনই বুঝল না। বুঝল লাইলিকে দেখানোর পর। লাইলি দাঁড়িয়ে ছিল উঠানের মাঝখানে। সে আরশিকে ডাকল। ছোট্ট আরশি অতগুলো বাসন-কোসনের বোঝা নিয়ে এলোমেলো পা ফেলে লাইলির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। লাইলি অনেক সময় নিয়ে বাসন-কোসনগুলো উল্টে-পাল্টে দেখল। তারপর এক ঝটকায় আরশির হাতের বাসন-কোসনগুলো ছুড়ে ফেলে দিল মাটিতে। বাজখাই চিৎকারে বলল, 'এইগুলা তুই কী করছস? এইগুলা কী করছস? হাঁড়ি-পাতিল মাজছস না পুস্কুনির থেইকা আরও কেদাকুদা মাইখা আনছস? ক' তো আমারে, খুইলা ক'। কী চাস তুই ক'? একটা কথা শুইনা রাখ, এইরকম করলে আমার বাড়িতে থাকতে পারবি না। আমার বাড়িতে থাকতে হইলে কাম-কাইজ কইরা থাকতে হইব। না হইলে খাওন জুটব না। শাহজাদির মতোন, নবাবজাদির মতোন গায়ে-গতরে হাওয়া লাগাইয়া এই বাড়িতে ঘুরন যাইব না। কথা কানে গেছে? গেছে কানে?'

আরশি চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। তাকে আম্বরি বেগম খেলার জন্য খুব ছোট্ট এই এতটুকুন একটা বাটি আর একটা ভাতের হাঁড়ি দিয়েছিল। সে অবাক হয়ে দেখল মাটিতে ছড়িয়ে পড়া এই এত এত বাসন-কোসনের ভেতর থেকেও সেই খেলনা বাটি আর হাঁড়িখানা ছড়িয়ে পড়েছে খানিক দূরে। আকৃতিতে ছোট বলেই কিনা কে জানে, মাটিতে পড়েও তার সেই খেলনা বাসন দু'খানা কী সুন্দর চক্রাকারে লাটিমের মতোন ঘুরছে! আরশি বাসন-কোসনগুলো কুড়িয়ে নিয়ে আবার ধুতে যাওয়ার আগে দীর্ঘক্ষণ ঠাঁয় দাঁড়িয়ে রইল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল সেই খেলনা বাসন দুটোর ঘূর্ণনরত চক্র।

www.boighar.com

আম্বরি বেগম ফিরলেন বিকেলের দিকে। তার শাড়ির আঁচলে কী কী সব বাঁধা। তিনি আরশিকে ডেকে সেগুলো আরশির হাতে দিয়ে বললেন, 'এক কবিরাজ আইছে উত্তরকান্দি। সেই কবিরাজ অনেক লতা-পাতা, গাছ-গাছড়ার ঔষধপাতি দেয়। কইছে তিনবেলা এই লতাপাতা ছেইচ্যা তোর আব্বারে রস খাওয়াইতে।' আরশি লতাপাতাগুলো হাতে নিয়ে বলল, 'তাইলে কী হইব বু?'

আম্বরি বেগম বললেন, 'তাইলে তোর আব্বা যে কেউর সঙ্গে কথা কয় না। কেমন পাগল পাগল ভাব করে, এইগুলা দূর হইব।'

আরশি বলল, 'আমার আব্বা কি পাগল?'

Boighar.com & ARS

আম্বরি বেগম এই কথার উত্তর দিলেন না। তিনি বললেন, 'মাইনসের কত ধরনের বিপদ-আপদ হয়। হয় না? যুদ্ধের বছর দেখছি কত মাইনষের হাত-পাও নাই হইয়া গেছে। তারপরও তারা বাঁইচা থাকে নাই? তোর বাপের মতোন পাগল হইতে তো কাউরে দেখি নাই। এখন এই যে ব্যবসাপাতি, জমি-জিরাত আছে, এইগুলান কে সামলাইব?'

আরশি কিছু বলার আগেই পেছন থেকে জবাব দিল লাইলি। সে কখন পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে কেউ দেখেনি। সে বলল, 'অসুস্থ মানুষটারে লইয়া আর টানাহেঁচড়া কইরেন না। তারে তার মতোন থাকতে দেন।'

আম্বরি বেগম বললেন, 'অসুস্থ মানুষটারে ওইরকম ফালাইয়া রাখলে, সে আর জীবনেও সুস্থ হইব না। আর সে এইরকম থাকলে এই সংসার কেমনে চলব?'

লাইলি বলল, 'সেইটা আপনার চিন্তা করন লাগব না। ওই চিন্তা আমারে করতে দেন।'

আম্বরি বেগম বললেন, 'তুই কী চিন্তা করবি?'

লাইলি বলল, 'যা যা চিন্তা করন লাগব, সবই করব।'

আম্বরি বেগমের কাছে কেন যেন লাইলির কথার এই ধরন পছন্দ হলো না। তিনি বললেন, 'তোরে দেইখা তো বোঝনের উপায় নাই যে তোর স্বামী ঘরে পইড়া রইছে। তার এই অবস্থা! একবার তো দুই-চাইরটা ভালো-মন্দ কথাও তার সঙ্গে বলস না।'

লাইলি বলল, 'তার কাছে এখন ভালোও যা, মন্দও তা। সে কি আর আলাদা কইরা কিছু বোঝে? যখন সুস্থ সবল আছিল, তখনই নিজের ভালো-মন্দ বোঝে নাই। আর এখন তো অসুস্থ!'

আম্বরি বেগম বলল, 'সুস্থ থাকতেই নিজের ভালো-মন্দ বোঝে নাই মানে কী? আমার মজিবরের মতোন সোনার টুকরা পোলা এই দশগ্রামে আর একটাও আছিল? আছিল না।'

লাইলি বলল, 'ভালো-মন্দ বুঝতে হইলে মাথায় বুদ্ধি লাগে। সেইটাই তার ছিল না। সেইটা থাকলে লতু হাওলাদারের সঙ্গে লাগতে যাইত না। তার মায়ের সঙ্গে লতু হাওলাদারের কবে কী ছিল না ছিল, সেইটা শুইনা তার তো অত উত্তেজিত হওনের কিছু নাই। জুয়ান বয়সে ওইরকম সব মাইয়া মানুষেরই একটু না একটু থাকেই। তার মায়ের থাকলে কী সমস্যা! তাছাড়া জুয়ান বয়সে স্বামী মইরা গেলে এইটা তো স্বাভাবিক, তাই না? এই নিয়া অত উত্তেজিত হইলে চলে?'

আম্বরি বেগম লাইলির কথা শুনে প্রথমে কিছুক্ষণ বুঝলেন না। যখন বুঝলেন তখন তার বিশ্বাস হলো না, লাইলি এসব তাকে নিয়ে বলছে! তাকে ইঙ্গিত করে এমন কথা বলার সাহস লাইলি কই পেল! তিনি চকিতে বসা থেকে

উঠে দাঁড়ালেন। তার সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে। আম্বরি বেগম দুই পা সামনে এগিয়ে লাইলির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললেন, 'তুই কী কইলি লাইলি? তুই কী কইলি?'

লাইলি নির্বিকার গলায় বলল, 'কিছু বলি নাই আম্মা। আমি খারাপ মাইয়া মানুষ তো, মুখে খালি খারাপ কথা আসে। খারাপ চিন্তা আসে। এইসব নিয়া আপনেও আবার আপনার ছেলের মতোন উত্তেজিত হইয়েন না।'

আম্বরি বেগম কী বলবেন ভেবে পেলেন না। তিনি মুহূর্তেই তার বুকের ভেতর টের পেলেন এক অমোঘ সত্য। তার মনে হলো এই জীবনের হিসাব-নিকাশের পুরোটাই যেন তার জন্য এক বিশাল বিভ্রম। এই বিভ্রম আসলে এক উল্টোজগতের বিভ্রম। জীবনের পুরোটা সময় জুড়ে কী নিখাদ শ্রমে আর সংগ্রামেই না জীবনটাকে টেনে এনেছেন তিনি। সবসময়ই মনে হয়েছে এই দীর্ঘ সংগ্রামের পথ শেষে তার জন্য লেখা আছে স্বস্তি আর ভালোবাসার খানিকটা অবসর। কিন্তু গত ক'দিনেও যা মনে হয়নি, এমনকি মজিবর মিয়ার অমন ঘটনায়ও না, আজ এই মুহূর্তে তার মনে হলো, এই জীবন তার জন্য প্রার্থিত কোনো কিছু নিয়ে আর অপেক্ষায় নেই। অপেক্ষায় আছে সীমাহীন ক্লেদ নিয়ে। এই জগৎ আসলে উল্টোজগৎ। এখানে মানুষের ভাবনাগুলো আয়নার প্রতিবিম্বের মতোন। মানুষ যা ভাবে তার সবটুকুই যেখানে উল্টো। পুরোপুরি উল্টো।

রাতে মজিবর মিয়াকে খাওয়াতে গিয়ে আম্বরি বেগম আবিষ্কার করলেন আরশি মজিবর মিয়ার পাশেই ঘুমিয়ে পড়েছে। তিনি মজিবর মিয়াকে খাইয়ে আরশিকে ডেকে তুললেন। আরশি উঠে মুখে খানিক পানি দিয়ে চুপচাপ আম্বরি বেগমের পাশে বসে গেল। আম্বরি বেগম বললেন, 'বড় হইতে হইলে মাইয়া মানুষের অনেক কিছু সহ্য করতে হয়।'

আরশি কোনো কথা বলল না। সে চুপচাপ বু'র হাত থেকে ভাতের নলা মুখে নিয়ে গিলছিল। সারাদিন কিছু খায়নি সে। আম্বরি বেগমকে কিছু বলেওনি। এমনকি তার সেই বাসন মাজার ঘটনাও না। আম্বরি বেগম বললেন, 'মানুষ তার ভবিষ্যৎ জানে না। কাইল কী হইব, সেইটা যদি মানুষ আইজ জানত, তাইলে মানুষ বাঁচতে পারত না। এইটা একটা সুবিধা। এই কথাটা মনে রাখবি।'

আরশির চোখভর্তি ঘুম। সে মাথা নেড়ে আম্বরি বেগমের কথায় সায় দিল। আম্বরি বেগম বললেন, 'মানুষের জীবনে এই জন্যই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হইল সময়। আর এই সময়ের খারাপ-ভালো বইলা কিছু নাই। হয় সবই খারাপ, না

Boighar.com & ARS

হয় সবই ভালো। এখন যেই সময়টারে মনে হইতেছে খারাপ, পরে কোনো সময় গিয়া দেখা গেল সেই সময়ের তুলনায় এখনকার এই সময়টাই ভালো ছিল। আবার এখন যেই সময়টা ভালো মনে হইতেছে, পরে কোনো খারাপ সময়ে গিয়া আবার মনে হইব, ওই ভালো সময়টার কারণেই পরের খারাপ সময়গুলা আসছে।'

আরশি বলল, 'তাইলে সবই খারাপ?'

আম্বরি বেগম বলল, 'সময়ের খারাপ-ভালো কিছু নাই। সময়টাই আসল। যেই সময়টা চইলা যায়, সেই সময়টা আর ফিরা আসে না। কোনো চেষ্টায়ই না। সেইটা ভালো হোউক আর মন্দ হোউক।'

আরশি বুঝল না, এই রাতে আম্বরি বেগম তার সঙ্গে এত এত কথা কেন বলছে! সে বুঝল ভাত খেয়ে ঘুমাতে যাওয়ার আগে। আম্বরি বেগম তাকে বিছানায় বুকের মধ্যে চেপে ধরে নিয়ে বলল, 'আইজ সারাদিনে পেটে কোনো দানা-পানি পড়ে নাই না?'

আরশি কোনো কথা বলল না। সে তো এই কথা কাউকে বলেনি। বু'কেও না। তাহলে বু জানল কী করে!

আম্বরি বেগম গলা নিচু করে বলল, 'বু গো, এই দুনিয়ায় নিজের দাবি নিজে আদায় করতে না জানলে কেউ আদায় কইরা দিব না। নিজের দাবি নিজেরই আদায় করতে হইব। কথা বলতে হইব। নিজের জিনিস নিজের চাইতে হইব। সারা জীবন তো আর বু সঙ্গে থাকব না। শুকনা মুখ দেইখাই কেউ বুইঝা নিব না, এই মাইয়াটার কী কষ্ট! মুখটা শুকনা কেন! কেউ বুঝব না। আর বুরও তো বয়স হইছে, টুক কইরা একদিন মইরা যাইব।'

আরশির কী হলো সে জানে না। সে হঠাৎ আম্বরি বেগমকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল। ঢুকে গেল বুকের ভেতর গুটিশুটি মেরে। যেন এই কঠিন কঠিন সব কথা, এই এত এত সব হিসাব-নিকাশ, এইসব কিছুর কিছুই সে আর শুনতে চায় না। সে কেবল শুনতে চায় এই মানুষটার বুকের ভেতর এই যে ঢিব ঢিব করে বয়ে যাচ্ছে শব্দ, এই যে প্রাণস্পন্দন। এই প্রাণস্পন্দন সে সারাটা জীবন জুড়ে শুনতে চায়। সারাটা জীবন জুড়ে। এই শব্দটা ছাড়া সে তার এই জীবনে আর কিচ্ছু শুনতে চায় না। কিচ্ছু না।

হারিকেনের আলো-আঁধারিতে আরশি আর আম্বরি বেগম যখন ঘুমিয়ে পড়লেন তখন মজিবর মিয়া নামের প্রায় জড়পিণ্ড হতে যাওয়া মানুষটা চৌকির ওপর থেকে নির্নিমেষ তাকিয়ে আছে তাদের দিকে। এই সীমাহীন অপার্থিব মমতার দিকে। তার চোখের জলেরা হুড়মুড় করে বাঁধ ভাঙল। সেই চোখের জলের কথা সে ছাড়া আর কেউ জানল না। কেউ না।

আম্বরি বেগম মারা গেলেন সেই রাতেই।

আরশি সদ্য ঘুম ভাঙা চোখে দেখল সে তখনও আম্বরি বেগমকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে আছে। বাইরে ততক্ষণে ভোরের আলো ফুটেছে। আম্বরি বেগম সাধারণত এতবেলা অবধি ঘুমান না। ফজরের আগেই উঠে যান। নামাজ পড়ে ঘরদোর ঝাঁট দেন। নানান কাজকর্ম সারেন। অথচ আজ তিনি এখনও ঘুমাচ্ছেন। আরশি বারকয়েক আম্বরি বেগমকে ডাকল। কিন্তু তিনি সাড়া দিলেন না। আরশি তার হাত ধরে ঝাঁকুনি দিল, 'ও বু, বু। বু।'

আম্বরি বেগম সাড়া দিলেন না। আরশি নানাভাবে তার ঘুম ভাঙানোর চেষ্টা করল। কিন্তু আম্বরি বেগম উঠলেন না। আরশির হঠাৎ কী মনে হলো কে জানে, সে দৌড়ে গিয়ে পাশের বাড়ির শেফালিকে ডেকে আনল। শেফালি অনেকক্ষণ ধরে আম্বরি বেগমকে নেড়ে-চেড়ে দেখল। তারপর আরশির দিকে তাকিয়ে কাঁপা গলায় বলল, 'বুর পাশে একটু বয়। আর কোনোদিন বুর পাশে বইতে পারবি নারে আরশি। আর কোনোদিন বইতে পারবি না।'

আরশি অবাক চোখে শেফালির মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। শেফালি কাঁদছে। হাউমাউ করে কাঁদছে। মজিবর মিয়া চৌকির ওপর থেকে খানিক কাত হয়ে দেখল। তারপর তাকিয়ে রইল মেঝের মাদুরে শুয়ে থাকা মানুষটার দিকে। তার মা! সেই মা! সেই মা! মজিবর মিয়া তাকিয়েই রইল। এক মুহূর্তের জন্যও নড়ল না সে। কোনো শব্দ পর্যন্ত করল না। কাঁদল না। কাঁদল না আরশিও। সে চুপচাপ গিয়ে আম্বরি বেগমের পাশে বসল। আম্বরি বেগমকে দেখে মনে হচ্ছে তিনি ঘুমাচ্ছেন। যেন কতদিন একটু আরাম করে ঘুমান না। আজ ঘুমাচ্ছেন। আজ আর তার কোনো চিন্তা নেই, ভাবনা নেই, তাড়া নেই। যেন অফুরন্ত অবসর। অফুরন্ত ঘুমের অবসর। আরশি তার ছোট্ট হাতখানা আম্বরি বেগমের মুখে রাখল। কী ঠাণ্ডা! সে খুব ধীরে, খুব ধীরে ছুঁয়ে দিল আম্বরি বেগমের কপাল, চোখ, নাক, গাল। আরশি কাঁদল না এক মুহূর্তের জন্যও না।

আম্বরি বেগমকে মাটি দেওয়া হলো উঠানের খোলা রান্নাঘরের পেছনে যে চালতা গাছটা আছে তার তলায়। সেখানে ধবধবে সাদা চালতা ফুলে ছেয়ে থাকে। আরশি রোজ ভোরে, অন্ধকার থাকতে থাকতে গিয়ে চালতা ফুল কুড়ায়। কেউ তাকে কিছু শিখিয়ে দেয়নি কিন্তু সে ফুলগুলোকে আম্বরি বেগমের কবরের ওপর ছড়িয়ে দিয়ে খানিক দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর তার ছোট্ট হাত দু'খানা মোনাজাতের মতোন ভঙ্গিতে তুলে ধরে বলে, 'আল্লাহ গো, ।'

এরপর সে আর কিছু বলতে পারে না। তার আল্লাহর কাছে কত কিছু বলার আছে, অথচ সে আর কিচ্ছু বলতে পারে না। সে প্রতিদিন ভাবে, রাতে শুয়ে শুয়ে মনে মনে কত কত কথা গোছায়। কিন্তু পরদিন ভোরে আম্বরি

Boighar.com & ARS

বেগমের কবরের কাছে গেলেই সে আর কিছুই বলতে পারে না। সবকিছু কেমন এলোমেলো হয়ে যায়। তার চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। সে তার হাতের উল্টোপিঠে ঝাপসা হয়ে যাওয়া চোখ মোছে। কিন্তু এক চোখ মুছতেই তার আরেক চোখ ভিজে ওঠে। আবার সেই চোখ মুছতে আগের চোখ। সে কী করবে? সে তো কাঁদতে চায় না। একটুও কাঁদতে চায় না। এত চেষ্টা করেও সে কান্না থামাতে পারে না। সে তখন চোখ মোছা বন্ধ করে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। তার চোখের জলেরা প্রবল জলধারার মতোন বাঁধ ভেঙে ঝরে। ঝরতেই থাকে। আরশি ঝাপসা চোখে তাকিয়ে থাকে ধবধবে সাদা ফুলগুলোর দিকে। তাকিয়ে থাকে ভোরের আলোর দিকে, আকাশের দিকে। তার কাছে তখন জগতের সবকিছুই ঝাপসা মনে হয়। সবকিছু। এ যেন পুরনো ফেলে রাখা কোনো আয়নার দিকে তাকিয়ে থাকা। প্রবল ধুলো-ময়লায় সেই আয়নায় যা দেখা যায় তার সবকিছুই অস্পষ্ট, ঝাপসা।

আম্বরি বেগম মারা গেছেন বছর ঘুরে এলো। এই সময়ে অনেক কিছু বদলেছে। আরশি ঠিক জানে না, তার বয়স এখন কত! তবে নয়-দশ তো হবেই। বয়স যা-ই হোক, তার বয়সের অন্য আট-দশজনের চেয়ে শরীরে অনেক ছোট হলেও, সে যে ভেতরে ভেতরে তাদের চেয়ে অনেক বড়, তা আরশি টের পায়। তার ধারণা অন্যরা যেখানে রোজ একদিন একদিন করে বড় হয়, সে সেখানে রোজ কয়েক বছর করে বড় হয়। জীবন এবং অভিজ্ঞতা এমন এক জিনিস, যা মানুষকে বয়সের অনেক আগেই বড় করে ফেলে। আবার এই অভিজ্ঞতাই শরীরে যথেষ্ট বেড়ে ওঠার পরও মানুষকে বয়সের চেয়ে অনেক ছোট করে রাখে। আরশির জীবন তাকে তার শরীরের বয়সের চেয়ে মনের বয়সে অনেক অনেক বড় করে তুলেছে। এই ক'মাসেই সে এখন রান্না করতে জানে, বাসন মাজতে জানে, কাপড় ধুতে জানে। যেদিন একসঙ্গে অনেক কাজ পড়ে যায়, সেদিন যে কী কষ্ট হয়! তার টিনটিনে হাত-পাগুলো এত পরিশ্রম নিতে পারে না। কিন্তু ঘুম থেকে উঠেই তাকে আগের রাতের এঁটো বাসন ধুতে হয়। হাঁস-মুরগিকে খাবার দিতে হয়। রান্না বসাতে হয়। তার ওপর এটা-সেটা আরও কত কী! তার অবশ্য কোনো কিছু নিয়েই কোনো অভিযোগ নেই। তা সে অভিযোগ করেও না। আজও করল না। লাইলি সকালের দিকে তাকে ডেকে অনেকগুলো ছোট ছোট কাঁথা-কাপড় দিয়ে বলল, 'যা, এইগুলা এখনই ধুইয়া আন।'

আরশি আস্তে করে বলল, 'চুলায় ভাত আছে।'

লাইলি বলল, 'চুলায় ভাত থাকলে, ভাত নামাইয়া রাইখা যা। আকাশে মেঘ দেখছস? কখন এইগুলা ধুবি, তারপর বিষ্টি-বাদলা নামব, তখন শুকাইবও না। তহুরা রাইতে কী গায় দিব? কেমনে ঘুমাইব?'

আরশি আর কথা বলল না। সে গামলাভর্তি কাঁথা-কাপড়গুলো ধুতে নিয়ে যাচ্ছিল। লাইলি পেছন থেকে ডেকে বলল, 'এই কাঁথাগুলান বাড়ির পুষ্কুনিতে ধুইস না। রাস্তার পাশে যে ডোবাটা আছে, ওইটাতে ধুইস। এইগুলান তহুরার হাগা-মুতের কাঁথা। বাড়ির পুষ্কুনিতে ধুইয়া পানি নষ্ট করনের দরকার নাই।'

আরশি রাস্তার পাশের ডোবা থেকে তহুরার নোংরা কাঁথাগুলো ধুয়ে আনল। তহুরা একটু একটু করে বড় হচ্ছে। এক-পা দুপা করে হাঁটেও। ফোকলা দাঁতে ফিক করে হেসে দেয়। আরশির তখন কী যে ভালো লাগে! মনে হয় দুই হাতে তহুরার গাটুস-গুটুস গালগুলো টিপে ধরে নাকটা মুখের ভেতর নিয়ে নেয়। কিন্তু লাইলি দেখলে কপালে দুর্ভোগ আছে। লাইলি চায় না তহুরা কোনোভাবেই আরশির সঙ্গে মিশুক। তহুরা হয়েছে ধবধবে ফর্সা। লাইলির ধারণা, আরশির সঙ্গে থাকতে থাকতে ধীরে ধীরে তহুরার গায়ের রঙও আরশির মতোই হয়ে যাবে। আরশি এতদিন গায়ের রঙ নিয়ে কখনও ভাবেনি। কিন্তু বাড়িতে কেউ এলেই লাইলি যখন তার আর তহুরার গায়ের রঙ নিয়ে কথা বলে, তখন আড়ালে-আবডালে গিয়ে নিজেকে দেখে আরশি। সে কি কালো? অনেক বেশি কালো? আরশি আগে এসব নিয়ে ভাবত না। কিন্তু আজকাল মাঝে মাঝে একটু-আধটু ভাবনা মাথায় চলে আসে। মন খারাপ হয়। তবে সে যে তাকে খুব একটা পাত্তা দেয়, এমন না। www.boighar.com

সে তহুরার কাঁথা-কাপড় ধুয়ে এসে দেখে চুলা থেকে নামিয়ে রাখা ভাত ঠাণ্ডা হয়ে আছে। এই ভাত আবার চুলায় দিলে কী হবে কে জানে! যা হলো তা টের পাওয়া গেল খেতে বসে। দুপুরে মনাই খেতে বসেছে। ভাত বেড়ে দিচ্ছে লাইলি। মনাই ভাত মুখে দিয়ে হঠাৎ বলল, 'চুলায় কি জ্বাল দেওনের সময় অনেক ধুঁয়া হইছিল নাকি? ভাতের থেইকা কেমন বোটকা বোটকা গন্ধ আইতেছে।'

লাইলি কোনো কথা না বললেও একটা প্লেট টেনে সেখানে কিছু ভাত নিল। খানিক নুন আর তরকারি ছিটিয়ে ভাতের নলা মুখে দিয়েই আঁতকে উঠল। আরশি বসে ছিল পাশেই, সে আরশির ঘাড় চেপে ধরে তার মাথা টেনে নুইয়ে ভাতের প্লেটের সঙ্গে মুখ চেপে ধরে বলল, 'এইটা কী রানছস? কী রানছস এইটা? আমার ওপর রাগ ঝাড়স না নবাবজাদি? তহুরার কাঁথা ধুইতে দিছি, মুখে তো সেই রাগ ঝাড়তে পারস নাই। এই জন্য সেইটা এখন ঝাড়তেছস খাওন নষ্ট কইরা! খাড়া, তোর তেজ আমি কমাইতেছি। দেখি কত তেজ তোর হইছে।'

আরশিকে ছাড়াল মনাই। আরশির চুলে, মুখে, নাকে, কপালে তখন ভাত লেগে আছে। মনাই বলল, 'থাউক বুজান, ও ছোট্ট মানুষ, ভুল হইছে।'

লাইলি যেন খেঁকিয়ে উঠল, 'ছোট্ট মানুষ! কিয়ের ছোট্ট মানুষ। পেটে পেটে সেয়ানা বুদ্ধিতে ভরা। তুই চিনবি না, এইটা একটা আস্তা ইবলিশ।'

Boighar.com &. ARS

মনাই ভাত খেয়ে আড়তে চলে গেল। আরশি সেদিন আর কিছুই খেল না। লাইলিও তাকে আর কিছু বলল না। আরশি দিনের বাকিটা সময় বসে রইল ঘরের সঙ্গের খোলা বারান্দায়। এই বারান্দাটা নতুন বানানো হয়েছে। চৌকি পেতে দেওয়া হয়েছে। চৌকিতে রাতে শুয়ে থাকে মজিবর মিয়া। তবে আজকাল দিন-রাত সে শুয়ে-বসেই কাটায় না। আগের চেয়ে খানিক ভালো বোধ করছে। লাঠিতে ভর দিয়ে একপায়েই খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতেও পারে। তবে বাড়ি থেকে খুব একটা বের হয় না সে। হলেও বড়জোর পেছনের জমিতে কিছুদূর হেঁটে যায়। প্রায় অকেজো ডান হাতখানা নাড়ানোর চেষ্টা করে। তবে একদমই যা বদলায়নি, তাহলো কথা। মজিবর মিয়ার কথা যেন বন্ধই হয়ে গেছে। কিছু লাগলে সে হাতের ঈশারায় দেখায়। কাউকে ডাকতে হলে হাতের লাঠি ঠুকে শব্দ করে জানান দেয়। লাইলির সঙ্গে বলতে গেলে কোনো যোগাযোগই নাই মজিবর মিয়ার। একই চালের নিচে স্বামী এবং স্ত্রী, অথচ কেউ যেন কাউকে চেনে না। কী অদ্ভুত এক সম্পর্ক!

তবে মাঝখানে বারদুয়েক মজিবর মিয়ার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছিল লাইলি। সেই চেষ্টা অবশ্য ছিল তার সেই পুরনো উদ্দেশ্যে! আরশির নামে থাকা আড়ত আর লতু হাওলাদারের সেই চার বিঘা জমি নিয়ে মজিবর মিয়ার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছিল সে। কিন্তু তাতে কোনো ফল আসেনি। অনেক চেষ্টার পরও মজিবর মিয়ার কাছ থেকে কোনো ধরনের সাড়াশব্দই বের করতে পারেনি সে। মজিবর মিয়া আজকাল নিজে নিজেই খাবার খেতে পারে। অনেক কষ্টে ভাতসহ হাতখানা খানিক তুলতে পারে সে। বাদবাকিটা করতে হয় তার শরীরের। মেরুদণ্ড ভাঁজ করে মুখ নিয়ে যেতে হয়ে কিছুটা উত্তোলিত ভাতসহ হাতের কাছে। তারপর মুখ হাঁ করে হাত থেকে ভাত মুখে নিতে হয়। খুবই কষ্টকর প্রক্রিয়া। কিন্তু মজিবর মিয়া আস্তে আস্তে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে। সুতরাং পরনির্ভরশীলতাও তার অনেকটাই কমেছে।

আরশির সঙ্গেও মজিবর মিয়ার যোগাযোগের ধরনটা খুব অস্বাভাবিক। তাদের মধ্যেও যে খুব একটা যোগাযোগ হয়, তাও না। আসলে এ বাড়ির বাতাসে বাতাসে মিশে যেন ঘুরে বেড়ায় লাইলি। মজিবর মিয়া আর আরশি কখন কী করে তার প্রতিমুহূর্তের খবর যেন নখদর্পণে রাখা চাই তার। ফলে বাবা-মেয়ের মধ্যকার যোগাযোগটাও তেমন হয়ে ওঠে না। আর উঠবেইবা কী করে! দিন-রাত বিরাম নেই আরশির। সারাদিনের তুমুল পরিশ্রম শেষে অই অতটুকু শরীর যেন সন্ধ্যে হতেই ভেঙে পড়ে। তারপর শুয়ে পড়তেই গভীর ঘুম। সেই ঘুম ভাঙে আজানের সঙ্গে সঙ্গে। তারপর আবার আরেকটা দিন। আরেকটা ক্লান্ত সময়। আরশি অবশ্য ক্লান্ত দিন আর সময় নিয়ে ভাবে না। সে যতটুকু ভাবে, তার পুরোটা জুড়েই আম্বরি বেগম। আম্বরি বেগমের প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি কথা, প্রতিটি ভঙ্গি যেন তার চেনা। চোখ বন্ধ করলেই সে যেন আম্বরি

বেগমকে ছুঁতে পারবে। সারাদিনের এই ক্লান্ত সময়ের ভেতরও মাঝে মাঝে গভীর রাতে আরশির ঘুম ভেঙে যায়। চারপাশ জুড়ে তখন কী ভীষণ নৈশব্দ! সেই নৈশব্দে কান পাতলে আরশি যেন কিছু একটা শুনতে পায়। সে নিজেও জানে না, কী! তবে সেই কিছু একটা জুড়ে কোনো এক অচিনপুরের প্রবল বিষাদ যেন গলে গলে পড়ে। আর থাকে টিনের চালে টুপটাপ ঝরে পড়া শিশিরের শব্দ।

আজও গভীর রাতে তার ঘুম ভেঙে গেল। রাতে কিছু খায়নি বলেই কিনা কে জানে, শরীরজুড়ে কেমন অস্বস্তি হতে লাগল। কিন্তু সেই অস্বস্তি হঠাৎ শরীর থেকে কানে চলে এলো। এই গভীর রাতেও কাছাকাছি কোথাও দুটি মানবকণ্ঠের ফিসফিস শব্দ কানে এলো তার। সে অনেকক্ষণ ধরে সেই শব্দের উৎস বোঝার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। পারল না শব্দের কথাগুলোর কোনো অর্থ বুঝতেও। তবে এটা সে স্পষ্টই বুঝল যে ফিসফিস করে কথা বলছিল একটি নারী ও একটি পুরুষ কণ্ঠ।

সারারাত আর ঘুম হলো না আরশির। খানিকটা তন্দ্রার মতো লেগে এসেছিল শেষ রাতের দিকে। কিন্তু ভোরের আলো ফুটতেই উঠে পড়ল সে। তবে রাতের সেই কণ্ঠ দুটি কানে বেজে রইল সারাদিন। সেদিন রাতেও অনেকক্ষণ জেগে রইল আরশি। তার কেমন ভয় ভয় হতে লাগল। অন্ধকারকে তার ভয়। কিন্তু আজকাল যেন কোনো কিছুকেই আর ভয় হয় না আরশির। সে জেগে রইল অনেক রাত অবধি। কিন্তু সেই শব্দ আর কানে এলো না। সে জেগে রইল পরের রাতেও, তার পরের রাতেও। কিন্তু সেই কণ্ঠ আর শুনতে পেল না সে। তবে শরীর খারাপ হয়ে গেল তার। ভোর রাতের দিকে প্রবল জ্বর। লাইলি তার খোঁজ নিতে এলো সকাল ১০টার দিকে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বলল, 'কী ব্যাপার নবাবজাদির ঘুম কি এখনও ভাঙে নাই নাকি?'

আরশি কোনো মতে উঠে বসল। তারপর মৃদু কণ্ঠে বলল, 'জ্বর আইছে। শরীলটা খারাপ লাগতেছে।'

লাইলি বলল, 'নবাবজাদির শরীল তো, ননীর পুতলা। পান থেইকা চুন খসলেই শরীল খারাপ হয়।'

আরশি কোনো জবাব দিল না। লাইলি বলল, 'শরীল খারাপ বইলা লাভ নাই। বহুত কাজকাম বাকি পইড়া আছে! আপনের লুলা বাপ তো আর জমিদারি কইরা রাখে নাই যে দাসী-বান্দি রাইখা খাওয়ামু।'

আরশি মিনমিন করে বলল, 'কী কাম করা লাগব বলেন।'

লাইলি বলল, 'আমি ভাত চড়াইতেছি, আপনে আল্লাহরস্তে ওই পেছনের ভিটাবাড়ি থেইকা এক বস্তা শুকনা পাতা আইনা দেন।'

আজকাল রেগে গেলে এই রকমের নানান সম্বোধনেই কথা বলে লাইলি। আরশি আরও অনেকক্ষণ সেভাবেই বসে রইল। ঠিক যেভাবে বসে ছিল। কত

Boighar.com & ARS

আকাশ-পাতাল চিন্তা যে তার মাথার ভেতর গিজগিজ করছিল! কিছুক্ষণ পর অনেক কষ্টে উঠে দাঁড়াল সে। মাথাটা যেন মুহূর্তেই চক্কর দিয়ে উঠল। এলোমেলো পা ফেলে ঘর থেকে বের হলো আরশি। পুরো বাড়িটা কেমন ঝিম লাগা নিস্তব্ধতায় থেমে আছে। পুরো উঠান, পুরো বাড়িতে কোথাও যেন কেউ নেই। কিছু নেই। মজিবর মিয়াকেও কোথাও দেখতে পেল না সে। তবে খানিক আগে লাইলি যখন তাকে ঘুম থেকে ডেকে উঠাল তখন পলকের জন্য হলেও বাবাকে বারান্দায় দেখতে পেয়েছিল। বাবা অবশ্য থাকলেও কিছু হতো না। লাইলিকে কিছু বলার ক্ষমতা আর তার নেই।

ঝাড়ু আর বস্তা নিয়ে বাড়ির পেছনের নিচু জমিতে নামল আরশি। কিন্তু কয়েক পা হেঁটে যেতেই মনে হলো, কোনোভাবেই এই এতটা পথ সে হেঁটে যেতে পারবে না। আর যেতে পারলেও শুকনো পাতা কুড়িয়ে আনা তার জন্য এই মুহূর্তে অসম্ভব। সে খোলা মাঠের মাঝখানের খেজুরগাছটার সঙ্গে হেলান দিয়ে বসে পড়ল। চোখ বন্ধ করতেই মনে হলো তার চারপাশের পুরোটা পৃথিবী চক্রাকারে ঘুরছে। মনে হলো যেকোনো সময় জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাবে সে। নিথর হয়ে বসে রইল বন্ধ চোখের ভেতর ঘূর্ণায়মান পৃথিবী নিয়ে। এই সময় গা গুলিয়ে প্রচণ্ড বমি হলো তার। পরপর দু'বার। বমি শেষে মাথা তুলতে গিয়ে আরশি দেখল অবাক করা এক দৃশ্য! মজিবর মিয়া আসছে। সেই পরিত্যক্ত ভিটেবাড়ির দিক থেকে হাতের লাঠিতে ভর দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে আসা মানুষটার পিঠের ওপরে মস্ত বড় এক বস্তা! পিঠের ওপর শুকনো পাতাভর্তি বস্তার মুখের সঙ্গে দড়ি বেঁধে সেই দড়ি কাঁধের ওপর দিয়ে সামনে টেনে এনে বেঁধে রেখেছে নিজের কোমরের সঙ্গে। তারপর সামনের দিকে কুঁজো হয়ে মানুষটা এক পা এক পা করে হেঁটে আসছে। আরশির ঘুরতে থাকা পৃথিবীটা যেন মুহূর্তেই থেমে গেল। থেমে স্থির হয়ে রইল ওই মানুষটার ওপর। মানুষটা এক পা এক পা করে হেঁটে আসছে।

যেন মানুষটা না, যেন হেঁটে আসছে এই নশ্বর জগতের তাবৎ অবিনশ্বর ভালোবাসারা।

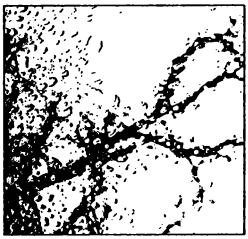

লতু হাওলাদার একদম চুপচাপ হয়ে গেছে।

চুপচাপ হয়ে যাওয়ার কারণ দুটো। এক. মজিবর মিয়া যে শাস্তি পেয়েছে তা তার কল্পনারও বেশি ছিল। মজিবর মিয়ার সঙ্গে প্রতিশোধের খেলায় সে পুরোপুরি জিতে গেছে। সুতরাং এই নিয়ে আর উচ্চবাচ্য করার কোনো কারণ নেই।

দুই. একটা খেলায় জিতলেও আরেকটা খেলায় সে এখনও হেরেই আছে। জমিটা সে এখনও ফেরত পায়নি। কিন্তু আপাতত জেতার উপায়ও নাই। মজিবর মিয়ার যা অবস্থা তাতে জমিজমা নিয়ে তাকে এখন আর চাপ দিয়ে লাভ নেই। মেরে ফেলার ভয় দেখালেও লাভ হবে বলে মনে হয় না। লতু হাওলাদার এখন বিকল্প উপায় খুঁজছে। অনেকগুলো বিকল্প বুদ্ধিই তার মাথায় আছে, কিন্তু তার কোনোটাই সে পুরোপুরি গুছিয়ে আনতে পারছে না। তার ওপর মজিবর মিয়ার বউটাকে সে বুঝে উঠতে পারছে না। এই এক তো, আবার অন্য। মাঝে মধ্যে লাইলির সঙ্গে তার কথাবার্তা যে হয় না তা না। আগেও হয়েছে। তবে প্রথম প্রথম এই মেয়ে যতটা আলাভোলা টাইপের ভাবভঙ্গি করেছিল, এখন তার পুরোপুরি উল্টো। এর কারণও অবশ্য আছে। লোকমান গ্রুপের প্রধান লোকমানের সঙ্গে কী করে কী করে যেন খুব খাতির হয়ে গেছে লাইলির। নিজের আপন ভাই নেই বলে লোকমানকে সে ভাই ডেকেছে।

লতু হাওলাদারের ধারণা ছিল মজিবর মিয়ার এই অবস্থার পর তার আড়ত আর জমির একটা বন্দোবস্ত সে করে ফেলতে পারবে। প্রথম থেকেই নানা উপায়ে লাইলিকে ফুঁসমন্তর দিয়ে সে-ই জাগিয়ে তুলেছিল। মজিবর মিয়ার জমিজমার খবরাখবর দিয়ে লাইলিকে বুঝিয়েছিল, তার অনাগত সন্তানের ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই। লতু হাওলাদার ধুরন্ধর মানুষ। সে লাইলি সম্পর্কে নানান কথাবার্তা আগেই শুনেছিল। আর প্রথমবার কথা বলতে গিয়েই সে বুঝে ফেলেছিল, লাইলি যেই-সেই মেয়েছেলে না। এ ফণা গুটিয়ে থাকা এক বিষাক্ত সাপ। একবার জাগিয়ে তুলতে পারলেই যে কাউকে ছোবল দিতে দেরি করবে না।

তার ভাগ্য ভালো সে তাকে জাগিয়ে তুলতে পেরেছিল মজিবর মিয়ার বিরুদ্ধে। নাহলে আতাহার তালুকদারকে পালিয়ে যেতে যে মজিবর মিয়া সাহায্য করেছিল, ট্রলার নিয়ে মোঘলগঞ্জ অবধি গিয়েছিল, এই তথ্য সে পেত না। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, চালে খানিক ভুল হয়ে গেছে, লোকমানের সঙ্গে তার যে সম্পর্ক, এই সম্পর্ক তার বাকিটা পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তবে লতু হাওলাদার হাল ছাড়ার পাত্র না। সে প্রয়োজনে নতুন চাল চালবে। অবাক করা ব্যাপার হচ্ছে, আতাহার তালুকদারদের কেউ আর গাঁয়ে না থাকলেও এলাকায় অবশেষে ইলেক্ট্রিসিটি আসছে। আতাহার তালুকদারের ছেলে আফজাল তালুকদার সম্ভবত কাজ অনেকটাই এগিয়ে রেখেছিল। মাসখানেক হলো ইলেক্ট্রিসিটির খাম্বা, তারও বসে গেছে। কোনো বাড়িতে এখনও লাইন না গেলেও পরীক্ষামূলকভাবে যযাতিপুর বাজারের মাঝখানে একটা বড় লাইট জ্বলে রাতে। লতু হাওলাদারের সেই জমির দাম এখন আকাশছোঁয়া। আর ক'দিন পর যে এই দাম কই পৌঁছাবে, তা ধারণার বাইরে। এই জমি কিছুতেই হাতছাড়া করা যাবে না। তাছাড়া এটা তার বংশগৌরবের বিষয়। ওই জমি তার চাই-ই চাই।

www.boighar.com

আরেকটা বিষয় নিয়ে লতু হাওলাদার অনেক ভেবেছে। সেদিন তার বাড়ি থেকে খবরটা কীভাবে আতাহার তালুকদারের কাছে বা মজিবরের কাছে পৌঁছেছিল। এই বিষয়ে লাইলি কিছু না বললেও তার ধারণা মসজিদের ইমাম আকরাম হোসেন ছাড়া এই কাজ আর কারও পক্ষে করা সম্ভব না। কিন্তু এই মুহূর্তে সে আকরাম হোসেনকে কিছু বলতে চায় না। আকরাম হোসেনের সঙ্গে তার স্বার্থের কিছু নাই। তাছাড়া এত এত ঝামেলার মধ্যে ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করারও কোনো মানে হয় না।

লতু হাওলাদার এক সন্ধ্যায় দীর্ঘপথ পায়ে হেঁটে মালোপাড়া গেল। মালোপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বাবু যশোদা জীবন দে তখন ঘুমানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। লতু হাওলাদার তার দরজায় কড়া নাড়তে তিনি প্রবল বিরক্তি নিয়ে দরজা খুললেন। লতু হাওলাদার বলল, 'আদাব মাস্টার সাব।'

যশোদা স্যার লতু হাওলাদারকে দেখে খানিক অবাক হয়ে গেলেন, বললেন, 'এত রাতে আপনি?'

লতু হাওলাদার বলল, 'একটা কাজে আসছিলাম মাস্টার সাব। জরুরি কাজ।'

যশোদা স্যার বললেন, 'আসেন, আসেন, ভেতরে আসেন।'

লতু হাওলাদার ভেতরে গিয়ে বসল। যশোদা স্যার জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন তার দিকে। লতু হাওলাদার কোনো ভূমিকা না করেই বলল, 'মাস্টার সাব আমারে একখান চিঠি লেইখা দিতে হইব। আমার ছেলের কাছে

চিঠি লিখব। কিছু গোপন কথা লিখতে হইব। জানেনই তো আমি লিখতে-পড়তে জানি না। আর যযাতিপুরে আমার নানান শত্রু। কার কাছে না কার কাছে যাব। সব জাইনা-শুইনা কী না কী ক্ষতি করব। এই জন্য আপনার কাছে আসা।'

যশোদা স্যার সঙ্গে সঙ্গে কথা বললেন না। খানিক চুপ করে থেকে বললেন, 'এত রাতে যযাতিপুর থেকে আপনি মালোপাড়া আসছেন চিঠি লেখানোর জন্য? এটাও আমাকে বিশ্বাস করতে হবে?'

লতু হাওলাদার হাসল, 'আগে তো চিঠিটা লেইখা দেন। এইটাও একটা কাজ।'

যশোদা স্যার কোনো কথা বললেন না। তিনি চুপচাপ লতু হাওলাদারের চিঠি লিখে দিলেন। চিঠিতে গোপন কোনো কথা নেই। তিনি তার ছেলে মোস্ত ফাকে লিখেছেন, সে যেন সম্ভব হলে মাস তিনেকের ছুটির ব্যবস্থা করে বাড়ি আসে। জরুরি দরকার আছে। ছুটি আরেকটু বাড়াতে পারলে ভালো।'

চিঠি লেখা শেষ করে যশোদা স্যার বললেন, 'আমি বেশি রাত জাগি না। বেশি রাত জাগা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।'

লতু হাওলাদার বলল, 'আমাকে আপনার একটা সাহায্য করতে হইব।'

যশোদা স্যার জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

লতু হাওলাদার ফিসফিস করে বলল, 'আপনের আসল পরিচয় আর সবাই ভুললেও আমি কিন্তু ভুলি নাই।'

যশোদা স্যার গম্ভীর গলায় বললেন, 'আমার আসল পরিচয় কী?'

লতু হাওলাদার বলল, 'আপনে বিশাল রাজনীতির মানুষ। একসময় দ্যাশের বড় বড় মানুষ আপনেরে চিনত। যুদ্ধের সময়ও দ্যাশের জন্য অনেক বড় বড় কাম করছেন! কিন্তু আফসুস, এই গণ্ডগ্রামের মূর্খ লোকজন সেইসব কিছুই জানে না।'

যশোদা স্যার বললেন, 'তখন আমি শহরে থাকতাম। এই এলাকার লোকের তো বিষয়টা অত জানার কথাও না। তারপরও মানুষ অল্পবিস্তর জানে।'

লতু হাওলাদার তার গলা আরও খানিক নিচে নামিয়ে বলল, 'আপনার আরও একটা পরিচয় আছে, সেইটা কেউই জানে না।'

যশোদা স্যার এবার আর প্রশ্ন করলেন না। তাকিয়ে রইলেন লতু হাওলাদারের চোখের দিকে। লতু হাওলাদার বলল, 'আপনি যে এককালে কমিউনিস্ট পার্টির বিশাল লিডার ছিলেন, এই কথা কিন্তু এই গাঁয়ের কেউ জানে না।'

যশোদা স্যার নিরুত্তাপ গলায় বললেন, 'সেটা অনেক আগের কথা হাওলাদার সাব। তখন বয়স কম ছিল, নানান স্বপ্ন-টপ্ন ছিল। সমাজ, রাষ্ট্র, সিস্টেম সব বদলে দিব এইসব। কিন্তু নানা কারণে স্বপ্নগুলা একে একে ভাঙতে

Boighar.com & ARS

লাগল। দলের ভেতর নানান মতবিরোধ। দলও ভাঙা শুরু করল। এক-দুই ভাগে না। শত শত ভাগে। সেই টুকরা টুকরা ভাগগুলার মধ্যে দলের মূল আদর্শ বলতে আর কিছু থাকল না। সব হয়ে গেল ব্যক্তিকেন্দ্রিক। নানান গ্রুপও ভেঙেচুরে টুকরা টুকরা হতে থাকল। একসময় হতাশ হয়ে সব ছেড়ে-ছুড়ে গ্রামে চলে এলাম। এখন বাচ্চা-কাচ্চা পড়াই। সমাজ বদলাতে চাইলে নানানভাবেই বদলানো যায়। এই বাচ্চা-কাচ্চাদের যে পড়াই, এদের দিয়েও তো সমাজ বদলানো যায়। যায় না?'

লতু হাওলাদার বলল, 'এইসব আমি কী বুঝব মাস্টার সাব? এইসব হইল আপনাদের মতোন শিক্ষিত মাইনষের কাম। আমার কাম জমি-জিরাত নিয়া।'

লতু হাওলাদার একটু থামল। তারপর বলল, 'গালকাটা বশির গ্রুপের যে বশির, সে তো আপনার ছাত্র ছিল, তাই না? আপনার কাছে সে নানান বিষয়ে পড়তে আসত।'

এবার ভালোরকম অবাক হলেন যশোদা স্যার। বললেন, 'এই কথা আপনারে কে বলছে?'

লতু হাওলাদার যশোদা স্যারের কথার জবাব না দিয়েই বলল, 'শুধু যে ছাত্র ছিল তাও না। সে পার্টিতে আপনার বিশাল শিষ্য ছিল। এখনও সে আপনারে গুরু ভাবে। শুধু গুরু কেন, নিজের বাপের মতোন মানে। কথা কি মিথ্যা বললাম?'

যশোদা স্যার অবাক দৃষ্টিতে লতু হাওলাদারের দিকে তাকিয়ে রইলেন। অনেকক্ষণ পর শীতল গলায় বলল, 'আপনার উদ্দেশ্যটা কী?'

লতু হাওলাদার বলল, 'লোকমান গ্রুপই তো গালকাটা বশিরের শ্বশুররে খুন করছিল। এরা তো একজন আরেকজনের বিরাট শত্রু। আপনে তো জানেনই এখন তারা ঘাঁটি গাড়ছে যযাতিপুর হাটে। গ্রামটারে একদম ছারখার কইরা ফালাইতেছে। কী যে অত্যাচার করতেছে মাইনষেরে! আপনে একটা ব্যবস্থা করেন মাস্টার সাব। যেমনেই পারেন, একটা ব্যবস্থা করেন।'

যশোদা স্যার যে লোকমানদের কথা জানেন না, এমন না। কিন্তু তিনি এসব নিয়ে কারও সঙ্গে কোনো কথা বলেন না। শোনেনও না। তার দিন কাটে স্কুলে আর বাড়িতে। তিনি কারও সঙ্গে মেশেনও না। গালকাটা বশির তাকে বাবার চেয়েও বেশি মানে, শ্রদ্ধা করে এই কথা সত্য। কিন্তু তিনি তার সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ডে মোটেও সন্তুষ্ট না। তাছাড়া বশিরও নিজ থেকেই তার সঙ্গে খুব একটা যোগাযোগ করে না। কারণ, পরে না আবার বশিরের সঙ্গে যোগাযোগের কারণে তিনি কোনো বিপদে পড়ে যান।

যশোদা স্যার ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'মজিবর মিয়া নামে একজনরে আমি চিনতাম। আমার স্কুলে তার মেয়ে পড়ত। মা নেই। সেই ছেলেটারে নাকি ভয়াবহরকম মারছে!'

লতু হাওলাদার সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠে দরদ ঢেলে বলল, 'নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারবেন না মাস্টার সাব। ডান পায়ের গোড়ালি থেইকা বাকি অংশ কাঠ কাটার করাত দিয়া কাইটা ফালাইছে। ডাইন হাতও ভাইঙ্গা উল্টা দিকে বেঁকা হইয়া আছে। মুখের কোনো অবস্থাই নাই। সবচেয়ে বড় কথা সে বাঁইচা আছে আধপাগল হইয়া। কোনো কথা বলতে পারে না। কাউরে চেনে না।'

যশোদা স্যার শেষের কথাটা শুনে খানিক চমকালেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'তার একটা মেয়ে ছিল। কী যেন নাম? আরশি, আরশি। মেয়েটার কী খবর? ভারি চমৎকার মেয়ে।'

লতু হাওলাদার তার গলায় আরও দরদ মিশিয়ে প্রায় কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, 'আর বইলেন না মাস্টার সাব। মা মরা মাইয়া। জন্মের সময় মা মারা গেছে। এরপর ছিল বাপ। সেই বাপের এখন এই অবস্থা। থাকার মধ্যে ছিল দাদী, সেও কয়দিন আগে মারা গেছে। এখন ঘরে সৎ মা। ওহ আল্লাহ মাবুদ! সেই মা যে কী অত্যাচার করতেছে ওইটুক দুধের বাচ্চা মাইয়ার ওপর। আল্লাহর আরশ কাঁইপা যাওনের কথা। এতদিনে যাইতও। কিন্তু ওই যে লোকমান। সে এখন ওই সৎ মায়রে সব সাপোর্ট দিতেছে। মজিবর মিয়া আগেই মাইয়াটার নামে কিছু জমিজমা কিন্যা রাখছিল, সেইগুলাও পরের ঘরের মাইয়ার নামে লেইখ্যা দেওনের চাপ দিতেছে। মাইয়াটারে বানাইছে কামের মানুষ! মাইয়াটার দুঃখ দেখলে মাস্টার সাব...'

লতু হাওলাদারের চোখে সত্যি সত্যি পানি চলে এলো। যশোদা স্যার কিছু বললেন না। থম মেরে বসে রইলেন। তিনি একটা অদ্ভুত ব্যাপার খেয়াল করলেন, সেই প্রথম যেদিন মজিবর মিয়া মেয়েটাকে ভর্তি করাতে নিয়ে এলো, সেই প্রথম দিন দেখা মেয়েটার মুখটা তার চোখের সামনে যেন স্পষ্ট ছবির মতোন জ্বলজ্বল করে ভেসে উঠল। ভেসে উঠল অদ্ভুত একজোড়া চোখ। তিনি সেই চোখের দিকে চেয়ে যেন চমকে গিয়েছিলেন। এত মায়া সেই চোখজুড়ে!

কিন্তু কী করবেন তিনি? তিনি যতদূর জানেন, গালকাটা বশির পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে। তার সঙ্গে যোগাযোগ করার কোনো উপায়ও নেই। যশোদা স্যার দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'হাওলাদার সাব, যদ্দূর জানি, বশির এখন জেলে। তাছাড়া আমার সঙ্গে তার বহুদিন যোগাযোগও নাই।' যশোদা স্যার একটু থামলেন, তারপর আবার বললেন, 'আসলে কী জানেন, ঈশ্বর মানুষকে সব কিছু করার ক্ষমতা দেন নাই। কিছু ক্ষমতা নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন। যাতে মানুষ তার ওপর নির্ভরশীল থাকে। এই ঘটনায় আমি ঠিক ততটাই অসহায়, যতটা অসহায় হওয়ার কারণে ঈশ্বরের ওপর নির্ভর করা ছাড়া আমার আর কোনো উপায় নাই।'

লতু হাওলাদারের সব উৎসাহ-উদ্দীপনা যেন দপ করে নিভে গেল। সে সেই রাতে আবার অতটা পথ পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরল। এই দীর্ঘ পথের পুরোটা জুড়েই সে মনের ঝাল মিটিয়ে জঘন্য সব গালাগাল দিল বাবু যশোদা জীবন দে'কে। বাড়ি ফিরতে ফিরতে ফজরের আজান হয়ে গেল। লতু হাওলাদার মসজিদে নামাজ শেষ করে গেলেন ইমাম আকরাম হোসেনের কাছে। তার সঙ্গে ইমাম আকরাম হোসেনের কী কথা হলো, তা জানা গেল না। তবে এই কথাবার্তার পরপরই ইমাম আকরাম হোসেন সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন, সুযোগ পেলেই তিনি যযাতিপুর ছেড়ে পালাবেন। যযাতিপুর ছেড়ে না পালাতে পারলে, তার বিপদ। ভয়ঙ্কর বিপদ।

তিনি অপেক্ষায় থাকলেন সেই পালিয়ে যাওয়ার সুযোগের।

লাইলি তার ঘরের চৌকিতে বসে ভাত খাচ্ছে, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে আরশি। এটা লাইলির নতুন নিয়ম। সে ভাত খাওয়ার পুরোটা সময় আরশিকে তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। এই প্রতিটি মুহূর্ত তীব্র আতঙ্ক নিয়ে কাটাতে হয় আরশিকে। তরকারিতে নুন বেশি বা কম হয়েছে, ভাত নরম বা শক্ত হয়েছে, এমন নানান রকম ভয়। আজও দাঁড়িয়েছিল আরশি। প্রতিটি মুহূর্ত তার কাছে মনে হচ্ছিল দীর্ঘ সময়। কী না কী হয়! ভাত খাওয়া শেষ হওয়ার ঠিক আগমুহূর্ত ঘটল ঘটনাটা। লাইলি হঠাৎ ভাতের প্লেট ছুড়ে মারল আরশির দিকে। আরশি ত্বরিত মাথা না নোয়ালে আঘাতটা লাগত। সামান্যর জন্য মাথা এড়াল প্লেটখানা। লাইলি লাফ দিয়ে নামল বিছানা থেকে, তারপর ক্রুদ্ধ গলায় বলল, 'নবাবজাদি, তুই আমারে মারতে চাস? আমার ওপর শোধ তুলস! দেখাইতেছি তোর শোধ!'

আরশি প্রথমে কিছুই বুঝল না। বুঝল তখন যখন দেখল লাইলির হাতে লম্বা একটা চুল। লাইলি খপ করে আরশির চুল ধরে বলল, 'মাথায় চুল বেশি হইছে, না? এইজন্যই ভাত-তরকারির সঙ্গে আমারে চুল রাইন্ধা খাওয়াস?'

আরশি কিছুই বলল না, চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তবে লাইলি বলল। বলতেই থাকল। মুখে যত অশ্রাব্য ভাষা আছে, তার সবটাই সে বলল। শুধু বলেই ক্ষান্ত রইল না। বিকেলের দিকে যযাতিপুর বাজার থেকে ভোলানাথ নাপিতকে খবর দিয়ে আনাল। আরশিকে উঠানের এক কোণে বসিয়ে সেদিনই আরশির মাথা ন্যাড়া দেওয়া হলো। এবং সে স্পষ্ট করে ঘোষণা দিল এখন থেকে আরশির মাথা এমন ন্যাড়াই থাকবে!

সেই রাতে আরশি একফোঁটা ঘুমাতে পারল না। সারারাত জেগে রইল। চোখ বন্ধ করলেই কী এক প্রবল আতঙ্কে তার দম বন্ধ হয়ে আসে। পরের রাতেও জেগে রইল আরশি। এবং বহুদিন বাদে, মাঝরাতে আবার সেই

ফিসফিস শব্দ শুনল। সঙ্গে আরও কিছু উদ্ভট শব্দ। বহু বছর পর এবার আবার বন্যার পানি বেড়েছে। বাড়ির চারপাশের নিচু জমি জুড়ে পানি। রাতভর সেই পানিতে নানান শব্দ। আরশির মাঝে মাঝেই ঘুম ভেঙে যায়। গত দু'দিন ঘুম ভাঙার পর আরশি আবারও সেই ফিসফিস শব্দ শুনল। সঙ্গে কোনো এক নারী কণ্ঠের গোঙানির চিৎকার। আরশির প্রচণ্ড ভয় হতে লাগল। সে কি বাবাকে ডাকবে! কিন্তু বাবা কী করবে? বাকি রাতটা ভয়াবহ উৎকণ্ঠা আর দুঃস্বপ্ন নিয়ে কাটল তার। পরদিন ভোরে ঘুম ভাঙতেই আবার রাতের ভয়টা কেটে গেল। এরপর কয়েক রাত আর কোনো সাড়াশব্দ নেই। কেটে গেল আরও মাসখানেক। সেদিন ভয়াবহ গরম। সারাদিন মেঘে ছেয়ে আছে আকাশ। বাতাসের লেশমাত্র নেই কোথাও। গত দিন কয় ধরেই এই অবস্থা। বৃষ্টি হবে হবে করেও হচ্ছে না। আরশি উঠানে মাছ কুটছিল। www.boighar.com

ভয়াবহ গরমের দুপুরবেলা হারাধন আর তালেব মাঝি উঠে এলো বাড়ির উঠানে। তারা বিলের পানিতে নৌকা বেয়ে এসেছে। এই ক'বছরেই তালেব মাঝি যেন খুনখুনে বুড়ো হয়ে গেছে। সে আরশিকে বলল, 'কী রে চুল কামাই ফেলছস? ভালো কাম করছস। যা গরম পড়ছে এইবার, চুল কামাইয়া ফেইলাই ভালো করছস। তোর বাপ কই?'

আরশি বলল, 'আব্বা ঘরে। শরীলডা খারাপ। জ্বর আইছে মনে হয়।'

তালেব মাঝি ঘরে ঢুকল। মজিবর মিয়া শুয়ে ছিল বিছানায়। তালেব মাঝির কথা শুনে উঠে বসেছে। তালেব মাঝি এদিক-সেদিক তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'তোরে মালোপাড়ার যশোদা মাস্টার দেখা করতে বলছে।'

মজিবর মিয়া কোনো শব্দ বা ঈশারাও করল না। কেবল কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে রইল। তালেব মাঝি আবার বলল, 'আমি নাও লইয়াইছি, আমার লগেই যাইতে বলছে। সঙ্গে তোর মাইয়ারেও নিতে বলছে। তোর মাইয়াডারে সে একটু দেখতে চায়।'

মজিবর মিয়া উঠে দাঁড়াল। তালেব মাঝি বলল, 'দাঁড়া, তোর বউর সঙ্গে আগে কথা বইলা নেই।'

সে লাইলির সঙ্গে কথা বলল। অবাক করা ব্যাপার হলো লাইলি কোনো আপত্তিই করল না। কেবল জিজ্ঞেস করল, 'এখন গেলে আইজ ফিরতে পারব?'

তালেব মাঝি বলল, 'না, কাইল সকাল সকাল ফিরব, সঙ্গে তো নৌকা আছেই!'

লাইলি খানিক চুপ করে কিছু একটা ভাবল। তারপর বলল, 'আচ্ছা, নিয়া যান।'

আরশির বুকের ভেতর কেমন ছটফট করছিল। কতদিন ধরে সে এই বাড়ি থেকে বের হতে পারে না। যশোদা স্যারের সঙ্গে দেখা হবে ভেবেই তার বুকের ভেতরটা কেমন ছটফট করছিল। সে ঘরে গিয়ে তার একমাত্র তুলে রাখা ফ্রকটা

বের করে পরল। পুকুরের জলে নিচু হয়ে মুখ দেখল, ইশ! চুলগুলো কেটে ফেলায় কী অদ্ভুতই না লাগছে তাকে। মেয়েদের মতো না, তাকে যেন দেখতে লাগছে ছেলেদের মতোন। সে নৌকায় মজিবর মিয়ার পাশে জবুথবু হয়ে বসে রইল। বাবার পাশে বসে থাকতে তার কী যে ভালো লাগছে!

কিন্তু ঘণ্টাখানেক পর নৌকা ভিড়ল হারাধনের বাড়ির সামনে। মজিবর মিয়ার বাড়ি থেকে হারাধনের বাড়ি ঘণ্টাখানেকের পথ। মজিবর মিয়া কৌতূহলী চোখে তাকাল। হারাধন এতক্ষণে কথা বলল, 'মজিবর ভাই, চিন্তার কিছু নাই। যশোদা স্যার আমার বাড়িতেই। সে আগেই চইলা আসছে। আমারে খবর পাঠাইয়া বলল আপনারে আমার বাড়িতে আইনা রাখতে।'

মজিবর মিয়া কিছুই বুঝল না। আরশিও না। তবে হারাধনের বাড়িতে গিয়ে যশোদা স্যারকে পাওয়া গেল না। হারাধন বলল, 'স্যার তো জানাইছিল সে বিকালের মধ্যেই আইসা পড়ব। এখনও এলো না কেন বুঝলাম না।'

তালেব মাঝি বলল, 'মাস্টার সাব যখন বলছে, অবশ্যই আসব। একটু দেখি আমরা।'

তারা হারাধনের বাড়িতে অপেক্ষা করল অনেক রাত অবধি। কিন্তু যশোদা স্যার এলেন না। মজিবর মিয়ার হঠাৎ কেমন অস্থির লাগতে লাগল। সে আকারে-ইঙ্গিতে বাড়ি ফেরার কথা বলতে লাগল। হারাধন আর তালেব মাঝি বারবার বোঝানোর পরও সে শুনল না। তার ভেতরের পাগলামিটা যেন ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছিল। ততক্ষণে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি শুরু হয়েছে। এতদিনের মেঘলা আকাশ যেন এখুনি ভেঙে পড়বে। হারাধন আর তালেব মাঝি নানাভাবে মজিবর মিয়াকে বোঝানোর চেষ্টা করল। বলল, যশোদা স্যার তার সঙ্গে জরুরি কথা বলতে চায়। কিন্তু মজিবর মিয়াকে কিছুতেই কিছু বোঝানো গেল না। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হলো, মজিবর মিয়া নিজে সঙ্গে গিয়ে আরশিকে বাড়িতে নামিয়ে রেখে আবার ফেরত আসবে। কথা বললে যশোদা স্যার তার সঙ্গে বলবেন। আরশির কী দরকার?

হারাধন আবার নৌকা ছাড়ল। গভীর রাতে তারা পৌঁছাল মজিবর মিয়ার বাড়িতে। উঠানে আরশিকে নামিয়ে দিয়ে আবার ফিরতি পথ ধরল তারা। ততক্ষণে প্রচণ্ড বৃষ্টি শুরু হয়েছে। বিকট শব্দে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। কেমন গা ছমছমে ভুতুড়ে অন্ধকার। আরশির একা একা তার ঘরে ঢুকতে ভয় হচ্ছে। শুধু যে অন্ধকার বলেই ভয় হচ্ছে, তা না। আজকের এই ঘটনার কারণেই ভয় হচ্ছে। ওরা তাদের কেনইবা নিয়ে গেল। আর যশোদা স্যারইবা কেন এলেন না? আবার কোনো বিপদ নয়তো? এমন নানা প্রশ্ন আরশির মনে ঘুরপাক খেতে লাগল। এই পুরো ঘটনাটা নিয়ে তার ভেতরে এক ধরনের চাপা ভয় কাজ করছে। আজকের দিনটাই যেন কেমন। এখন এই অন্ধকার ঝড়-জলের রাতে সে একা একা কী করে থাকবে! নাকি লাইলির ঘরে যাবে? কিন্তু এখন লাইলির

ঘরে গেলে লাইলি নির্ঘাত বকবে! কী করবে তাহলে? খোলা বারান্দায় দাঁড়িয়ে আরশি অনেকক্ষণ ভাবল। শেষে সিদ্ধান্ত নিল, বকলে বকুক, সে লাইলির ঘরেই যাবে। এই ভয়ঙ্কর দুর্যোগের রাতে সে কোনোভাবেই একা একা ওই অন্ধকারে থাকতে পারবে না। প্রয়োজনে সে লাইলির ঘরের মেঝেতে মাটিতেই শুয়ে থাকবে। তাও লাইলির কাছেই যাবে।

আরশি লাইলির ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। ভেতরে হারিকেনের মৃদু আলো কাঁপছে। সে খানিক দাঁড়িয়ে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিল। যেন সাহস সঞ্চয় করল। তারপর মৃদুকণ্ঠে লাইলিকে ডাকল। কিন্তু ভেতর থেকে কোনো সাড়া এলো না। সে গলার স্বর খানিকটা উঁচু করে আবার ডাকল, কিন্তু এবারও কেউ সাড়া দিল না। আরশির হঠাৎ মনে হলো, ভেতরে কেউ একজন কাঁদছে। কিংবা সেই গভীর রাতের নারী কণ্ঠের মতোন কেউ একজন গোঙাচ্ছে। ফিসফিস শব্দ হচ্ছে। হাসিও হচ্ছে। চুড়ির টুংটাং শব্দও শোনা যাচ্ছে। কে ভেতরে? সে এবার দরজা ধাক্কা দিল। একবার, দুইবার, তিনবার। কিন্তু কেউ দরজা খুলল না। লাইলি কি ঘুমিয়ে পড়েছে? কিন্তু তাহলে এই অদ্ভুত শব্দগুলো কোথা থেকে আসছে? আরশি হেঁটে বাঁ-পাশে সরে গিয়ে ঘরের বেড়ার ফাঁক দিয়ে ভেতরে চোখ রাখল। ভেতরের দৃশ্যটা দেখে আরশি প্রথমে কিছুই বুঝল না। তবে সে আবিষ্কার করল তার সারা শরীর মুহূর্তেই কেঁপে উঠেছে। সে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ দম নিল। তারপর আবার তাকালো। দশ-এগারো বছরের আরশির জীবনে এই প্রথম এমন দৃশ্য। সে যেন বরফের মতোন জমে গেল। হারিকেনের আবছা আলোয় সে দেখল বিছানায় সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে শুয়ে আছে লাইলি। আর লাইলির নগ্ন শরীরের ওপর শুয়ে আছে আরেকটা নগ্ন মানুষ। প্রবল ঝড়ো হাওয়ায় ঘরের পেছনের আমগাছটার শুকনো ডাল ভেঙে পড়ল টিনের চালের ওপর। সেই শব্দেই কিনা কে জানে, লাইলির ওপর শুয়ে হাঁপাতে থাকা পুরুষ মানুষটা হঠাৎ মুখ তুলে তাকাল এবং সঙ্গে সঙ্গেই মানুষটাকে চিনল আরশি। খাটো, মোটা গোঁফের এই মানুষটাকে সে চেনে। আম্বরি বেগম দূর থেকে একাধিকবার এই মানুষটাকে তাকে দেখিয়েছে। ভয়ঙ্কর খুনি নৃশংস এই মানুষটার নাম লোকমান!

ঘটনার আকস্মিকতায় আরশি হতভম্ব হয়ে গেছে। দু'পা সরে এসে বারান্দার উঁচু মাটির ঢিবির প্রান্তে সে দাঁড়াল। বাইরের প্রবল বৃষ্টির ঝাপটা এসে লাগল তার মুখে। সে আধভেজা হয়ে সেই গাঢ় অন্ধকারে স্থির দাঁড়িয়ে রইল। মাথার ভেতরটাতে অজস্র ঝিঁঝিঁ পোকারা যেন একনাগাড়ে ডেকে যাচ্ছে। কী করবে এখন সে! তাকে অবশ্য কিছু করতে হলো না। ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এসেছে লাইলি। খোলা দরজা দিয়ে হারিকেনের আলো এসে পড়েছে লাইলির মুখে। আরশির হঠাৎ মনে হলো, তার সামনে লাইলি না, দাঁড়িয়ে আছে ফণা তোলা কোনো এক ভয়ঙ্কর বিষধর সাপ। লাইলি ঠিক সাপের মতোই হিসহিস শব্দ করে বলল, 'তোর বাপ কই?'

Boighar.com & ARS

আরশি ভীত, বিভ্রান্ত, কম্পমান গলায় বলল, 'আব্বা আসে নাই। আমারে নামাই দিয়াই চইলা গেছে।'

লাইলি তীক্ষ্ণ চোখে এক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর হঠাৎ খপ করে আরশির বাহু খামচে ধরে বলল, 'কী দেখছস তুই? কী দেখছস?'

আরশি এই কথার জবাব দিল না, সে মাথা নিচু করে ফেলল। লাইলি ভয়ঙ্কর রকমের কর্কশ গলায় বলল, 'যা, ঘরে যা, আমি আসতেছি।'

আরশি চুপচাপ তার ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। ঘরের ভেতরে নিকষ অন্ধকার। সেই অন্ধকারে পা বাড়াতে গিয়েও আরশি থমকে দাঁড়াল। বিকট শব্দে বাজ পড়ল কাছাকাছি কোথাও। পরপর কয়েকবার বিদ্যুৎ চমকালো। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকা আরশির হঠাৎ মনে হলো, তার সামনে-পেছনে ভয়ঙ্কর বিপদ। এই ভয়ঙ্কর বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার কোনো উপায় তার জানা নেই। তবে সে একটা কথা জানে, তাকে পালাতে হবে। যে করেই হোক এই বাড়ি থেকে তাকে পালাতে হবে। এই মুহূর্তেই। না হলে আজ রাতই হবে তার জীবনের শেষ রাত।

ইমাম আকরাম হোসেন বসে আছেন লতু হাওলাদারের দহলিজ ঘরে। তার সামনে লতু হাওলাদার। কিন্তু ঘুটঘুটে অন্ধকারের কারণে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। লতু হাওলাদার বলল, 'ইমাম সাব, সেইদিন ফজরের নামাজের পর যা বলছিলাম, আজকে তার ফাইনাল। বুঝছেন তো?'

ইমাম আকরাম হোসেন জবাব দিলেন না। লতু হাওলাদার বলল, 'লোকমানের দলের কেউই গত দিন-পনেরো ধইরা যযাতিপুরে নাই। লোকমানও ছিল না। তারা সবাই গেছে খাসের হাট। অনেক দূরের পথ। কিন্তু গত দুই দিন ধইরা লোকমান একা আসছে, লুকাইয়া। দলের কাউরে কিছু না জানাইয়া আসছে। সে এই বন্যার কাদা-পানি পাড়াইয়া একা একা এতদূর পথ কেন আসছে, জানেন?'

ইমাম সাহেব এবারও কোনো কথা বললেন না। লতু হাওলাদার বলল, 'সে আসছে মাংসের লোভে। এই জগতে পুরুষ মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় লোভ হইল এই মাংসের লোভ। নারী মাংস। এই মাংসের লোভ এড়ানো বড় কঠিন ইমাম সাব।'

ইমাম আকরাম হোসেন চুপ করে অন্ধকারে বসে রইলেন। তার মাথায় তখন কাজ করছিল সেদিন ফজরের নামাজ শেষে লতু হাওলাদারের সেই কথা। লতু হাওলাদার নামাজ শেষে তাকে ডেকে নিয়ে ভয়ঙ্কর কথাটা বলল। ইমাম সাহেব নিজে যে আতাহার তালুকদারকে গিয়ে সেদিনের খবরটা দিয়েছিল, এবং মজিবর মিয়াকে নিয়ে পালাতে সাহায্য করেছিল, এই কথা লতু হাওলাদার

আগে থেকেই আঁচ করতে পেরেছিল। কিন্তু ইমাম সাহেবের সঙ্গে তার কোনো শত্রুতা নেই বলেই বিষয়টা লতু হাওলাদার কাউকেই বলেনি। এই কথা যদি একবার লোকমান গ্রুপের কারও কানে যায়, তাহলে ইমাম সাহেবের পরিণতি কী হবে, তা সহজেই অনুমেয়। তার শাস্তি হবে মজিবর মিয়ার চেয়েও ভয়াবহ। লোকমান গ্রুপ তাকে বাঁচিয়ে রাখবে না, এটা নিশ্চিত। তবে মেরে ফেলার আগে কী করবে, সেটা ভেবে প্রচণ্ড আতঙ্কে ইমাম আকরাম হোসেন শিউরে উঠেছিলেন। লতু হাওলাদার সেদিন ফজরের নামাজের পর তাকে ডেকে নিয়ে শেষ যেই কথাগুলো বলেছিল, তা ছিল আরও ভয়ঙ্কর। সে বলেছিল, 'আমি এই যে আপনার এত বড় একটা উপকার করতেছি, এই গোপন কথা লোকমান গ্রুপরে বলতেছি না, আপনার জীবন কিন্তু বাঁচাই রাখতেছি, এইটার বিনিময়ে আপনি আমারে কী দিবেন?'

ইমাম সাহেব ভয়ে কুঁকড়ে যাওয়া গলায় বলেছিলেন, 'হাওলাদার সাব, আমার ক্ষমতা অতি সামান্য। তবে কেউ যদি জীবনে আমার এতটুকু উপকারও কখনও করছে, আমি আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি, তার সেই উপকারের ঋণ শোধ করার। আমারে বলেন, আমি আপনার জন্য কী করতে পারি?'

লতু হাওলাদার ফট করে বলে বসেছিল, 'যদি মানুষ খুন করতে বলি?'

ইমাম আকরাম হোসেন দপ করে নিভে গিয়েছিলেন। তিনি লতু হাওলাদারকে চেনেন। লতু হাওলাদার ফালতু কথা বলার মানুষ না। সে তার জীবনে কখনও স্বার্থ ছাড়া কোনো কাজ করেনি। ইমাম সাহেব সঙ্গে সঙ্গেই বুঝলেন, লতু হাওলাদার যেহেতু আতাহার তালুকদারের পালানোর ঘটনায় তার যুক্ত থাকার ঘটনা জেনেও এতদিন কাউকে কিছুই বলেনি। তার মানে তাকে নিয়ে লতু হাওলাদারের বড় কোনো পরিকল্পনা আছে। কিন্তু সেই পরিকল্পনা যে মানুষ খুন, সেটা তিনি বোঝেননি। তারপরও সেইদিন সেই ভোররাতে লতু হাওলাদারের সঙ্গে কথা বলেই বুঝতে পেরেছিলেন, ভয়ঙ্কর কিছু করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, এই গ্রাম তাকে ছাড়তে হবে, নাহলে বিপদ। ভয়াবহ বিপদ। কিন্তু তিনি এটাও জানতেন, লতু হাওলাদারের চোখ থেকে হুট করে পালিয়ে যাওয়া তার পক্ষে আর সম্ভব হবে না। সে এখন থেকে তাকে চোখে চোখে রাখবে। ইমাম সাহেবকেও থাকতে হবে সুযোগের অপেক্ষায়। কিন্তু আজ এই ভয়ঙ্কর দুর্যোগের রাতে এসে এভাবে লতু হাওলাদার তাকে ডেকে পাঠাবে, এটা ইমাম সাহেব ভাবেননি। ভাবেননি আজ রাতেই এমন একটি অসম্ভব এবং ভয়ঙ্কর কাজ লতু হাওলাদার তাকে করতে বলবে সেটাও।

লতু হাওলাদার অন্ধকারেই দা-খানা বের করল। লম্বা ছিপছিপে রামদা। ব্লেডের মতোন ধারাল দা-খানা সে ইমাম সাহেবের হাতে তুলে দিয়ে বলল, 'গত কুরবানিতে যযাতিপুর গাঁয়ে কয়খানা গরু জবাই করছিলেন ইমাম সাব?'

Boighar.com & ARS

ইমাম সাহেব বললেন, 'মনে নাই হাওলাদার সাব।'

লতু হাওলাদার বলল, 'সবাই আপনার মতোন গরু জবাই করতে পারে না ইমাম সাব। আপনে গরু জবাইর কাজে বড়ই ওস্তাদ লোক। এই দাওখান দিলাম। রাম দাও। স্পেশাল অর্ডার দিয়া বানাইছি। আজকেই খালি এইটা দিয়া মাইনষের গলা কাটবেন, বাদবাকি জীবনে কাটবেন গরুর গলা। আল্লাহর নাম নিয়া কোরবানির গরুর গলা কাটবেন। বড়ই সওয়াবের কাজ।'

ইমাম সাহেব কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, 'হাওলাদার সাব, আমি আপনার...' www.boighar.com

লতু হাওলাদার তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'এখন কথা বলনের সময় না ইমাম সাব। এখন কাম করনের সময়। যা বলি মন দিয়া শোনেন। সোজা মজিবর মিয়ার বাড়িতে চইলা যাইবেন। এই ঝড়-বিষ্টির রাইতে কেউ জাইগা নাই। জাইগা আছে খালি মজিবর মিয়ার বউ লাইলি আর তার নাগর লোকমান। ঘরের পাশে গিয়া ঘাপটি মাইরা বইসা থাকবেন। বেড়ার ফাঁক দিয়া তাকাইলে অবশ্য বিনা পয়সায় সিনেমাও দেখতে পাইবেন। তারপর তাদের সিনেমা শেষ হইলে দেখবেন লোকমান কখন বাইর হয়। রাইতে সে প্রস্রাব-পায়খানার জন্য বাইরে আসবই। অপেক্ষায় থাকবেন। অনেকক্ষণ আন্ধারে ঘাপটি মাইরা থাকনের কারণে আপনি তারে দেখবেন একদম পষ্ট। খুব কাছে গেলেও সে আপনারে খেয়াল করব না। একটা মাত্র কোপ দেবেন। এক কোপেই কাম সারা। আপনে চোখের পলকে গরু জবাই করনের লোক। মানুষ জবাই করন তো আপনের কাছে দুধভাত। কী ভুল বললাম?'

ইমাম আকরাম হোসেন অনুভব করলেন তার শরীরের লোমগুলো দাঁড়িয়ে গেছে। তিনি এ কার সামনে বসে আছেন! কিন্তু তার সামনে আর কোনো উপায় নেই। ইমাম আকরাম হোসেন সেই তুমুল ঝড়-জলের রাতে বিশাল রামদা হাতে বেরিয়ে এলেন অন্ধকার রাস্তায়। তার গন্তব্য মজিবর মিয়ার বাড়ি। তার উদ্দেশ্য লোকমানকে খুন করা। ভয়ঙ্কর দুর্ধর্ষ লোকমানকে!

আরশি তার ঘরের দরজার চৌকাঠ পেরুল না। সে লাফ দিয়ে পড়ল উঠানের গাঢ় অন্ধকারে। জমে থাকা বৃষ্টির পানিতে ছপ করে শব্দ হলো। ভেতরের ঘর থেকে লাইলির চেঁচানো কণ্ঠস্বর শুনতে পেল সে, 'লোকমান, তাড়াতাড়ি আসো। খুব তাড়াতাড়ি। নাইলে কিন্তু সর্বনাশ হইয়া যাইব। ওই মাইয়ারে তুমি চেনো না। দেখতে অতটুক হইলে কী হইব! সাক্ষাৎ ইবলিশ...।'

আরও কী কী কথা বলছিল লাইলি কে জানে! আরশি আর এক মুহূর্তও দাঁড়াল না। সে দৌড়ে বাড়ির সামনের মূল রাস্তায় উঠল। কিন্তু এখন কই যাবে সে! সে জানে না সে কই যাবে! সে শুধু জানে তাকে ছুটতে হবে। ধরাছোঁয়ার

বাইরে যেতে হবে! এখন থামলেই বিপদ। তার পেছন ধাওয়া করে আসছে মূর্তিমান মৃত্যু! সে সেই গাঢ় অন্ধকারে বাতাসের মতো ছুটল। হোঁচট খেয়ে পড়ল। আবার উঠল। আবার ছুটল। আবার হোঁচট খেয়ে পড়ল। উঠল। দৌড়াল। বৃষ্টির গতি আরও বেড়েছে। শো শো করে পাগলাটে হাওয়া বইছে। আরশি কতক্ষণ ছুটেছে সে জানে না। তবে সে আবিষ্কার করল, সে চলে এসেছে যযাতিপুর বাজারে। কিন্তু এরপর সে কোথায় যাবে! একটা টিনের বেড়ার ঘরের আড়ালে দাঁড়িয়ে খানিক দম নিল সে। এই মুহূর্তে কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করে ডেকে উঠল।

আরশি ঝট করে মুখ ঘুরিয়ে তাকাল।

গলির মুখে কুকুরটা বসে আছে। প্রবল বৃষ্টিতে জবুথবু অবস্থা। কিন্তু কোনো এক অদ্ভুত কারণে কুকুরটা নড়ছে না। ঠায় বসে আছে। গাঁয়ে নতুন ইলেক্ট্রিসিটি এসেছে। ইলেক্ট্রিকের লাইন এখনও বাড়ি বাড়ি যায়নি। তবে বাজারের মাঝখানে বিশাল ইলেক্ট্রিকের পিলার, সেই পিলারের মাথায় রাতের বেলা বাতি জ্বলে। লাল আলো। আরশি সেই লাল আলোর নিচে ভোলানাথের সেলুনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এই ভয়াবহ দুর্যোগের রাতে সে কোথায় যাবে? তার ফ্রক চুইয়ে পানি পড়ছে। সে মাথা নিচু করে সেই পানির দিকে তাকিয়ে রইল। কুকুরটা বার দুই ঘেউ ঘেউ করে ডাকল। বিকট শব্দে বিদ্যুৎ চমকালো। দমকা হাওয়া বইল। কিন্তু আরশি মুখ তুলল না। সে তাকিয়ে আছে তার পায়ের দিকে। টুপটুপ করে পানি ঝরে পড়ছে তার ফ্রকের প্রান্ত চুইয়ে। সে হঠাৎ আবিষ্কার করল, তার পায়ের ওপর টুপটাপ ঝরে পড়া পানির কিছু ফোঁটা উষ্ণ! সে হাতের উল্টোপিঠে চোখের কোনা মুছতে গিয়েও থমকে গেল। না, আজ সে কাঁদবে। শুধু আজই সে কাঁদবে। এই জীবনে আর কখনও সে কাঁদবে না। কখনও না। আরশি হঠাৎ চিৎকার করে কেঁদে উঠল! তীব্র চিৎকার। সে কাঁদতেই থাকল। তার জীবনের শেষ কান্না। এরপর বাকি জীবন সে আর কাঁদবে না। আরশি কাঁদল। এই চরাচর ভাসিয়ে নেওয়া বৃষ্টির মতোই সে কাঁদল। তার বুকের ভেতর জমে থাকা সব কান্না! তার এই কান্নার শব্দ কেউ শুনল না। কেউ না। শুধু গলির মোড়ে ঠায় বসে থাকা জবুথবু কুকুরটা তার দিকে তাকিয়ে থাকল।

আরশি মাথা তুলে তাকাল। ভোলানাথের বন্ধ সেলুনের সামনে কাঠের খুঁটি। সেই খুঁটির গায়ে হাতের তালুর সমান ছোট্ট এক চিলতে আয়না। ঝাপসা হয়ে যাওয়া সেই আয়নার দিকে তাকিয়ে খানিক স্থির দাঁড়িয়ে রইল আরশি। তারপর ধীর পায়ে আয়নাটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। আয়নার ভেতরে আবছা একটা মানুষ। গতকাল অবধি দেখে আসা সেই একই চোখ, সেই একই নাক, সেই একই মুখ, একই চেহারা। কিন্তু গতকালের সেই আরশি আর এই মানুষটি কি এক? এই মানুষটাকে কি সে চেনে? আরশির হঠাৎ মনে হলো, এই জগতে

www.boighar.com

কেউ কাউকে চেনে না। এই জগৎ আয়নার মতোন। উল্টোজগৎ। এখানে সবকিছু উল্টো।

এই উল্টোজগতের নাম আসলে আরশিনগর।

ইমাম আকরাম হোসেন যখন মজিবর মিয়ার বাড়ির সামনে এলেন, ঠিক তখনই বাড়ির ভেতর থেকে রাস্তায় উঠে এলো আরশি। এই অন্ধকারেও আরশিকে চিনতে ভুল হলো না ইমাম সাহেবের। তিনি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেও বুঝলেন না কী করবেন। তবে এটা তিনি স্পষ্টই বুঝতে পারছেন যে, আরশির বিপদ! ভয়ঙ্কর কোনো বিপদ। এর খানিক বাদেই আরও একজন কেউ মজিবর মিয়ার বাড়ি থেকে বের হলো। তার সামনে দিয়ে পানিতে ছপছপ শব্দ তুলে চলে গেল। ইমাম সাহেবের বুঝতে অসুবিধা হলো না যে এই মানুষটা লোকমান। লোকমানের ডান পায়ে গুলি লেগেছিল। সেই থেকে ডান পায়ে খুব একটা জোর পায় না সে। ফলে এই ঘুটঘুটে অন্ধকার আর কাদা-বৃষ্টির রাতে ঠিকমতো ছুটতে পারছিল না সে। ইমাম সাহেবের হাতে রামদা খানা নেই। তার সঙ্গে আছে ছোটখাটো একটা ব্যাগ। ব্যাগভর্তি তার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র। তিনি আসার পথে মসজিদ থেকে এই ব্যাগখানা নিয়ে এসেছেন। আর রামদা খানা ফেলে দিয়ে এসেছেন মসজিদের সামনের পুকুরে। তিনি সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছেন, আজ রাতেই এই গ্রাম ছেড়ে চলে যাবেন। যে করেই হোক আজ রাতেই তাকে পালাতে হবে। তবে তার আগে কিছু কথা বলে যেতে চাইছিলেন মজিবর মিয়াকে। বিশেষ করে আজকের এই কথাগুলো। লোকমান আর লাইলির সম্পর্কের কথাটা অন্তত মজিবর মিয়াকে জানিয়ে দিয়ে যেতে চাইছিলেন তিনি। কিন্তু এখন কী করবেন! মজিবর মিয়া কি তাহলে বাড়িতে নেই? সেটা নিয়ে অবশ্য পরেও ভাবা যাবে। তবে সবার আগে যেটা করতে হবে, তা হলো আরশিকে বাঁচাতে হবে। যেকোনো ভাবেই হোক, আরশিকে বাঁচাতেই হবে। তিনি জানেন না লোকমানের মতোন মানুষের হাত থেকে তিনি আরশিকে কীভাবে বাঁচাবেন! তার মনে হলো দা-খানা পুকুরে ফেলে দেওয়া ভুল হয়েছে। বিরাট ভুল।

তবে ইমাম আকরাম হোসেন তারপরও ছুটলেন যযাতিপুর বাজারের দিকে।

পুরো বাজার চষেও আরশিকে কোথাও খুঁজে পেল না লোকমান। আরশি যেন ভোজবাজির মতোন হাওয়ায় মিশে গেল। পুরো বাজার জুড়ে কয়েকবার চক্কর দিল সে। তারপর ছুটল বাজারের উত্তরে আতাহার তালুকদারের বাড়ির দিকে।

বর্ষায় চারদিকে থই থই পানিতে ডুবে গেছে। ওই একটা দিকে ছাড়া আর কোথা যাওয়ার সুযোগ নেই এত রাতে। লোকমান যতটা সম্ভব দ্রুত উত্তরে ছুটল। আরশি লুকিয়ে ছিল ভোলানাথের সেলুনের পাটাতনের নিচে অন্ধকার জায়গাটায়। সে যখন বের হলো, তার সারা শরীর তখন কাদা-পানিতে মাখামাখি। ইমাম আকরাম হোসেন দাঁড়িয়ে ছিলেন ইলেক্ট্রিসিটির পিলারটার নিচে। আরশিই তাকে প্রথম দেখল। তার আর তখন অত কিছু ভাবার অবস্থা নেই। সে তখন ঘোরগ্রস্ত এক মানুষ। তীব্র আতঙ্কে দিশেহারা। সে ইমাম সাহেবের দিকে অর্ধেকটা পথ দৌড়ে এসে হঠাৎ লুটিয়ে পড়ল কাদায়। ইমাম সাহেব যখন তাকে তুললেন, তখন আরশির শরীর থরথর করে কাঁপছে। সে বিড়বিড় করে একটা কথাই বলছে, 'আমি কিছু দেখি নাই। আমি কিছু দেখি নাই। আমি কিছু দেখি নাই।'

ইমাম আকরাম হোসেন বুদ্ধিমান মানুষ। তিনি যা বোঝার বুঝে নিলেন। আরশিকে কাঁধে করে নিয়ে তিনি নেমে এলেন যযাতিপুর বাজার পেরিয়ে নদীর ঘাটে। সেখানে সারি সারি নৌকা বাঁধা। তিনি দেখে-শুনে একখানা ছইঅলা নৌকায় উঠে পড়লেন। বিপত্তি বাঁধাল তালা। গাছের সঙ্গে লোহার শেকল দিয়ে তালা মেরে বেঁধে রাখা হয়েছে নৌকাগুলো। অবশ্য তালা ভাঙতে খুব একটা বেগ পেতে হলো না তার। আরশিকে ছইয়ের ভেতর শুইয়ে রেখে নৌকা ছাড়লেন ইমাম সাহেব। কিন্তু কোথায় যাবেন তিনি? আরশি বা তার, কারও জন্য আর যযাতিপুরে থাকা সম্ভব না। কোনোভাবেই সম্ভব না। যযাতিপুর মানেই এখন তাদের জন্য অবধারিত মৃত্যু। সুতরাং যতটা দূরে সরা যায় ততই ভালো। ইমাম সাহেব হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিলেন, তিনি নৌকা বেয়ে নদীর ওপারে আড়াআড়ি চলে যাবেন। গন্তব্য রাঙ্গারোড। রাঙ্গারোড থেকে কোনো একটা ব্যবস্থা করে নেবেন। আরশি রাঙ্গারোড যেতে পারে, লোকমান এটা ধারণাও করতে পারবে না। ইমাম সাহেব রাঙ্গারোড থেকে সোজা চলে যাবেন শরীয়তপুরে। তার গ্রামের বাড়ি। তারপর বাকিটা ভাবা যাবে। ইমাম আকরাম হোসেন আল্লাহর নাম নিয়ে বৈঠা ডুবালেন পানিতে। তখন শো শো করে বয়ে যাচ্ছে ঝড়ো বাতাস। উত্তাল হয়ে উঠছে নদী। তুমুল বৃষ্টিতে ভেসে যাচ্ছে চরাচর। নিকষ অন্ধকারে ঢেকে আছে রাতের পৃথিবী। সেই ভয়াবহ দুর্যোগের রাতে, ওই অন্ধকার অসীম মহাশূন্যের ওপারে বসে কেউ একজন হয়তো লিখে চলেছেন অন্য এক গল্প।

সেই গল্পে হয়তো লিখে চলেছেন আরশির জীবনের আরেক অধ্যায়।

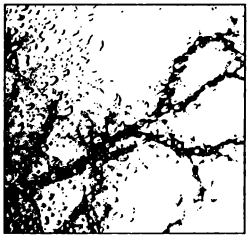

রাঙ্গারোড নামকরণের পেছনের ইতিহাস মজার।

পাকা সড়ক হওয়ার আগে দীর্ঘদিন সেখানকার রাস্তায় লাল ইট-সুরকি বিছিয়ে রাখা হয়েছিল। তখন সবার মুখে মুখে ওই রাস্তার নাম হয়ে গিয়েছিল রাঙ্গারোড। লাল ইট-সুরকি সরে গিয়ে পাকা সড়ক হলেও কালে কালে নাম রয়ে গেছে সেই রাঙ্গারোডই। ইমাম সাহেব আরশিকে নিয়ে যতক্ষণে রাঙ্গারোডে পৌঁছালেন, ততক্ষণে এই পৃথিবীতে অনেক কিছুই ঘটে গেছে। ঘটে গেছে যযাতিপুরেও। তিনি যখন রাঙ্গারোড থেকে তার গ্রামের বাড়ির পথ ধরেছেন তখন যযাতিপুরে ঘটছে ভয়াবহ এক ঘটনা।

যযাতিপুরের সব মানুষ দাঁড়িয়ে আছে নদীর পারে। দাঁড়িয়ে আছে গালকাটা বশির গ্রুপের প্রধান গালকাটা বশিরও। তার চারপাশে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার দলের লোকজন। তাদের সবার হাতেই নানান রকম অস্ত্রপাতি। কেবল গালকাটা বশিরের হাতে একটা কাঠ কাটার করাত। করাতের গা বেয়ে দরদর করে রক্ত ঝরছে। তাজা রক্ত। তাদের গোল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা বৃত্তের মাঝখানে চিৎ হয়ে পড়ে আছে একটা মানুষ। মানুষটার ডান পায়ের গোড়ালিটা পড়ে আছে তার পা থেকে হাতখানেক দূরে। সে ডাঙায় তোলা মাছের মতোন ছটফট করছে। মানুষটার নাম লোকমান। এই ঝড়-বৃষ্টির ভোরেও যযাতিপুর গাঁয়ের মানুষ দূরে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। তবে তারা কেউ কাছে ভিড়ছে না। পরের একঘণ্টায় লোকমানের বাঁ পায়ের গোড়ালিও কাটা হলো। কাটা হলো তার ডান হাত আর বাঁ হাতও। হাত-পা বিহীন লোকমান পড়ে রইল সেই নদীর পারে। দুপুর নাগাদ গালকাটা বশির দলবল নিয়ে চলে গেল। কিন্তু তখনও ভিড় করে দাঁড়িয়ে রইল যযাতিপুর গ্রামবাসী। লোকমান মারা গেল সন্ধ্যায়। গ্রামবাসী ভাবল গালকাটা বশির লোকমানের সঙ্গে তার পুরনো দ্বন্দ্বের হিসাব মিটিয়েছে। কিন্তু তারা কেউ জানল না, যযাতিপুর গাঁয়ে সেই তুমুল ঝড়-বৃষ্টির রাতে আরও একজন মানুষ এসেছিলেন। সেই মানুষটির নাম বাবু যশোদা জীবন দে। মালোপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক।

www.boighar.com

কিন্তু মানুষ একটা জিনিস বুঝল না। আরশি কই? যযাতিপুর থেকে আরশি যেন হাওয়ায় মিশে গেল।

মজিবর মিয়া সেই রাতে হারাধনের বাড়িতেই ছিল। ভোররাতের দিকে হারাধনের বাড়ির সামনে একখানা ছইঅলা ট্রলার এসে থেমেছিল। ট্রলার থেকে নেমেছিলেন যশোদা স্যার। তার পেছনে ছিল গালকাটা বশির। দলের বাকি সদস্যরা বসে রইল ট্রলারেই। মজিবর মিয়া যশোদা স্যারকে দেখেও চুপচাপ বসে রইল। যশোদা স্যার দীর্ঘ সময় নিয়ে মজিবর মিয়াকে দেখলেন। তার মতো কঠিন, নির্বিকার এবং বহু অভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ একজন মানুষও মজিবর মিয়ার অবস্থা দেখে থমকে গেলেন। মুখে কিছু না বললেও যশোদা স্যারের কপালের দুই ধারের শিরাগুলো যেন দপদপ করে নড়ে উঠল। তবে তিনি এ নিয়ে কিছুই জিজ্ঞেস করলেন না। কেবল বললেন, 'তোমার মেয়ে কই? আরশি?'

হারাধন বলল, 'আপনি আসতেছেন না দেইখা মজিবর ভাই খুব পেরেশান হইয়া গেছিল। সেইজন্য রাইতে গিয়া আরশিরে আবার নামাইয়া দিয়া আসছি।'

হারাধন কথা শেষ করার আগেই যশোদা স্যার হঠাৎ বসা থেকে দাঁড়িয়ে গেলেন। তারপর উৎকণ্ঠিত গলায় বললেন, 'সর্বনাশ!'

হারাধন, তালেব মাঝি কিংবা মজিবর মিয়া কেউই যশোদা স্যারের এমন উৎকণ্ঠার কোনো কারণ খুঁজে পেল না। যশোদা স্যার অবশ্য তাদেরকে কিছু বললেনও না। বললেন গালকাটা বশিরকে, 'জানি না কী ঘটেছে। তবে আমি সব খবর নিয়েই পরিকল্পনা সাজাইছিলাম। কিন্তু এরা সব উল্টাপাল্টা করে দিল। মেয়েটা ওই বাড়িতে বিপদে পড়তে পারে। হাতে সময় নেই, এখুনি বের হ। এখুনি।'

মজিবর মিয়া বা তালেব মাঝি কাউকেই গালকাটা বশিরদের সঙ্গে যেতে দিলেন না যশোদা স্যার। নিজেও গেলেন না। তখন ফজরের আজান হচ্ছে। তবে আকাশে ঘন মেঘ থাকায় তখনও ভোরের আলো ফোটেনি। গালকাটা বশির এই এলাকায় নতুন। পথ-ঘাট তেমন চেনে না বলেই তাদের সঙ্গে গেল শুধু হারাধন। তারা যতক্ষণে মজিবর মিয়ার বাড়ি পৌঁছাল ততক্ষণে ভোর হয়ে গেছে। ঘণ্টাখানেকের জন্য বৃষ্টি খানিক থামলেও তখন আবার বেড়েছে। লাইলি বারান্দায় পায়চারি করছিল। হারাধন ট্রলারের ছইয়ের ভেতর থেকে বের হলো না। গালকাটা বশির তার দুইজন লোক নিয়ে অস্ত্র বাগিয়ে সরাসরি ঘরে ঢুকে পড়ল। লাইলি মোটামুটি ভালো রকম ভড়কে গেছে। সে সন্ত্রস্ত গলায় কী কী সব যেন জিজ্ঞেস করল। কিন্তু গালকাটা বশির বা তার সঙ্গের কেউই তার জবাব দিল না। লোকমানকে মজিবর মিয়ার বাড়িতে পাওয়া গেল না। পাওয়া গেল না আরশিকেও। গালকাটা বশির দলবল নিয়ে ছুটল যযাতিপুর হাটের দিকে। সেখানেও পাওয়া গেল না লোকমান বা আরশি কাউকেই। গালকাটা

Boighar.com & ARS

বশির কী করবে বুঝে উঠতে পারছিল না। সে ছুটল উত্তর দিকে। এবং তখনই আতাহার তালুকদারের বাড়ির পথে পাওয়া গেল লোকমানকে। লোকমান তখন আরশির চিন্তায় পাগলপ্রায়। মেয়েটা গেল কই! সে মোটামুটি ভয় পেয়ে গেছে। ওইটুকু মেয়ে, এই ঝড় জলের রাতে চোখের সামনে দিয়ে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। বিষয়টা তার বিশ্বাস হচ্ছে না। নিজের মধ্যেই নানান ধরনের উল্টাপাল্টা চিন্তা উঁকি দিচ্ছে! কই গেল মেয়েটা? ঠিক সেই মুহূর্তে গালকাটা বশিরকে সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে লোকমান মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে গেল যে তার মাথায় কোনো একটা গণ্ডগোল হয়েছে। না হলে এই সময়ে এইখানে গালকাটা বশির কোথা থেকে আসবে! কিন্তু তলপেটে যখন সে প্রথম লাথিটা খেল, তখন মুহূর্তেই সতর্ক হয়ে উঠল। কিন্তু কোমরে গুঁজে রাখা যন্ত্রটা বের করার সুযোগ পেল না। হাত পিছমোড়া করে তাকে ততক্ষণে চেপে ধরা হয়েছে কাদার মধ্যে।

আরশি সম্পর্কে সে যতটুকু তথ্য দিল তাতে কিছু অংশ পরিষ্কার হলেও বাদবাকিটুকু থাকল অন্ধকারেই। মজিবর মিয়ার বাড়ি থেকে সেই অন্ধকারে আরশির বের হওয়া থেকে তার পিছু নিয়ে নিজের ছুটে যাওয়া পর্যন্তই কেবল বলতে পারল লোকমান। কিন্তু এরপর আরশি কোথায় মিলিয়ে গেল? লোকমান নিজেই জানে না, সে বলবে কী! এর চেয়ে বেশি আর কোনো তথ্য সে দিতে পারল না। গালকাটা বশিরও বিভ্রান্ত হয়ে গেল। লোকমান পর্ব শেষে গালকাটা বশির ফিরে গেল। কেউ জানলও না সে কোথায় এসেছিল, কীভাবে এসেছিল, কোথায় চলে গেল। কিন্তু আরশি! আরশিকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। খবর শুনে মজিবর মিয়া তার বাঁ হাতে যশোদা স্যারের হাত খামচে ধরে বিকৃত গলা আর উদ্ভট উচ্চারণে বলল, 'স্যার, আমার মা, আমার মা, আমার আরশি!'

যশোদা স্যার কোনো জবাব দিলেন না। তার মাথায় তখন রাজ্যের চিন্তা। এই চিন্তার কারণেই কিনা কে জানে, কেউই মজিবর মিয়ার এই হঠাৎ কথা বলে ওঠার বিষয়টা খেয়াল করল না। সে কথা বলেছে দীর্ঘ সময় পর। যশোদা স্যার অনেক ভেবেও কোনো উত্তর পেলেন না। শুধু একটা সম্ভাবনা ছাড়া, 'জলে ডুবে যায় নাই তো মেয়েটা!'

আরও দুটো দিন তিনি গা-ঢাকা দিয়ে রইলেন হারাধনের বাড়ি। কাকপক্ষীও যেন টের পেল না তার কথা। এর মধ্যে খবর এলো, যযাতিপুর বাজারের নদীর ঘাটে একটা নৌকাও পাওয়া যাচ্ছে না সেই রাত থেকেই। অনেক আশঙ্কার মাঝে এটা একটা আশার খবর। এই খবরে অন্তত পক্ষে এইটুকু আশাবাদী হওয়া যাচ্ছে যে আরশি হয়তো বেঁচে আছে। হয়তো নদীতে ডুবে মারা যায়নি সে। এই আশাটুকু তাহলে করাই যায়। সেই আশার পালে হাওয়া লাগল পরদিন বিকেল নাগাদ। উধাও হয়ে যাওয়া নৌকাখানার খবর মিলল রাঙ্গারোডের দিকে। সঙ্গে মিলল আরও একটা খবর, যযাতিপুর গাঁ থেকে উধাও হয়ে গেছেন ইমাম আকরাম হোসেনও। নিস্তরঙ্গ যযাতিপুরে রাত-দিন নানান

গল্প হতে লাগল। আরশিকে নিয়ে মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়তে লাগল নানান গল্প। সেইসব গল্পে আরশির বেঁচে থাকার সম্ভাবনা যেমন থাকল, থাকল তাকে নিয়ে তৈরি হওয়া নানান অতিপ্রাকৃত কল্পকাহিনীও। কিন্তু মজিবর মিয়ার কেন যেন মনে হলো, আরশি ভালো আছে এবং সে আছে ইমাম আকরাম হোসেনের সঙ্গে। ইমাম আকরাম হোসেন তাকে ভয়াবহ কোনো বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন। ইমাম আকরাম হোসেনের কাছে আরশি ভালো থাকবে। তার বাড়ির চেয়ে ভালো থাকবে। যযাতিপুরের চেয়ে ভালো থাকবে। এই সম্ভাবনা নিয়ে যশোদা স্যারও যযাতিপুর ছাড়লেন।

মজিবর মিয়া লাইলির সঙ্গে কোনো বিষয় নিয়েই কোনো কথা বলল না। শুধু কথা কেন, মজিবর মিয়া কিছুই করল না। তবে লাইলি যেন হঠাৎ পাল্টে গেল। কিংবা যাওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু লাইলি তখন মজিবর মিয়ার জীবনে অর্থহীন। এক গভীর রাতে মজিবর মিয়ার হঠাৎ মনে হলো, এই জীবন থেকে তার আর পাওয়ার কিছু নেই। অক্ষম, অসহায়, ক্লান্ত মজিবর মিয়া সেই রাতে তার জীবনে দ্বিতীয়বারের মতো আত্মহত্যার চেষ্টা করল। কিন্তু একটা তীব্র তেষ্টা তাকে বাঁচিয়ে রাখল। সেই তেষ্টা পৃথিবীর আর সব তেষ্টার চেয়ে গভীর, আর সব তেষ্টার চেয়ে তীব্র।

সেই তেষ্টার সবটা জুড়ে এই জীবনে আর একটাবারের জন্য হলেও আরশিকে দেখার তেষ্টা।

এই পুরো ঘটনায় একজন মানুষ পুরোপুরি হতবুদ্ধি হয়ে গেল। সেই মানুষটির নাম লতু হাওলাদার। আর কেউ না বুঝলেও লতু হাওলাদার ঠিকই আঁচ করতে পারল লোকমানের ঘটনার পেছনের ঘটনা। কিন্তু যশোদা স্যার যে আরশি আর মজিবর মিয়ার জন্য এতটা করবে এটা সে ভাবেনি। তার উদ্দেশ্য এক দিক দিয়ে সফল হয়েছে। লোকমান মারা গেছে। কিন্তু তাতে অবশ্য তার লাভ কিছু হয়নি। বরং বুমেরাং হয়েছে। কারণ এটা এখন স্পষ্ট যে প্রকাশ্যে না হলেও মজিবর মিয়ার মাথার ওপর ছায়া হয়ে আছেন যশোদা স্যার। আর তিনি কতটা কী পারেন, সেটাও পরিষ্কার হয়ে গেছে। গালকাটা বশির থানা হাজত থেকে পর্যন্ত বের হয়ে এসেছে। পুরো বিষয়টিই লতু হাওলাদারের জন্য বরং আরও বিপদের কথা। তবে লতু হাওলাদার খানিকটা অবাক হয়েছে লাইলির প্রতি মজিবর মিয়ার আচরণ দেখে, লাইলিকে মজিবর মিয়া কিছুই বলেনি। না বলার কারণও অবশ্য আছে। ছোট মেয়ে তহুরা এখনও খুবই ছোট। লাইলির কোলে। এই অবস্থায় লাইলিকে সে কিইবা বলবে!

লতু হাওলাদার এই প্রথম হাল ছেড়ে দেওয়ার মতো অবস্থায় পড়ল। তবে একটা বিষয়ে সে নিশ্চিত, আজ হোক, কাল হোক, আবদুল মমিন তার দলবল

Boighar.com & ARS

নিয়ে যযাতিপুরে ফিরে আসবেই। তারা লোকমানের এই ভয়াবহ পরিণতির উসুল না উঠিয়ে এত সহজে ছেড়ে দেবে না। কিন্তু লতু হাওলাদার এটাও জানে যে তার সাজিয়ে রাখা দাবার ছকটা হঠাৎ করেই পাল্টে গেছে। আবদুল মমিন যদি আসেও সেটা বহু সময়ের ব্যাপার। সে আটঘাট না বেঁধে, প্রস্তুতি না নিয়ে আসবে না। সেক্ষেত্রে তার আগেই লতু হাওলাদারকে নতুন কোনো খেলা খেলতে হবে। কিন্তু সেই খেলা কী হবে? লতু হাওলাদার নানান ধরনের ছক কাঁটলেন, বুদ্ধি বের করলেন, কিন্তু কোনো কিছুতেই যেন কিছু হচ্ছিল না। সবটাতেই যেন কোনো না কোন ফাঁক থেকে যাচ্ছিল। একটা আশা ছিল মোস্ত ফা বাড়ি আসবে মাস ছয়েকের ছুটি নিয়ে। কিন্তু সেও এলো না। এলো না মানে কী এক জটিলতায় আসতে পারল না। সময় কেটে যাচ্ছিল তরতর করে। কিন্তু আবদুল মমিন বা তার দলবলেরও আর কোনো খবর মিলল না। লতু হাওলাদার বুকের ভেতর প্রবল জিঘাংসা পুষে অতৃপ্ত অপেক্ষায় কাটাতে লাগল অসহনীয় অজস্র সময়।

সেই ঘটনার পর থেকে লাইলি চুপচাপ হয়ে গেছে। তাকে দেখে বোঝার উপায় নেই, তার ভেতরে কী ঘটছে। লোকমানের অমন ভয়ঙ্কর পরিণতির পর, লাইলির ধারণা ছিল মজিবর মিয়া তাকে ছেড়ে দেবে না। কিন্তু অদ্ভুত ব্যপার হলো মজিবর মিয়া তাকে কিছু বলল না। আরশির বিষয়েও কিছু জানতে চাইল না। এটা বরং লাইলির ভেতরে আরও বেশি অস্বস্তি তৈরি করছে। মানুষকে বুঝতে না পারার মতোন বড় অস্বস্তি আর কিছুতেই নেই। মজিবর মিয়ার মনে কী আছে, কী ভাবছে এটা বুঝতে না পেরে লাইলি যে অস্বস্তিতে আছে, তা ধীরে ধীরে বেড়ে যাচ্ছে। ক্রমশই অস্বস্তিরা পরিণত হচ্ছে প্রবল আশঙ্কাতে। লাইলি নানাভাবে চেষ্টা করছে নিজেকে নতুন মোড়কে উপস্থাপন করতে। কিন্তু সেই মোড়কটা মজিবর মিয়ার চোখে পড়ছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। সে এই বাড়িতে বেঁচে আছে জড় বৃক্ষের মতোন। যেই বৃক্ষ একা একা রোদে পুড়ে যায়, চুপি চুপি বৃষ্টিতে ভিজে যায়, তুমুল হাওয়ায় থরথর করে কাঁপে। কিন্তু সেই জড় বৃক্ষকে ছোঁয়ার সাধ্য বোধকরি লাইলির মতোন মেকি কোনো মানব প্রাণের নেই।

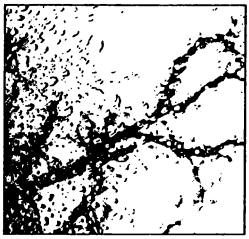

ইমাম আকরাম হোসেন তার স্ত্রী কামরুন্নাহারের হাতে আরশিকে তুলে দিয়ে বললেন, 'তোমার হাতে যারে দিলাম, সে এক মহা যন্ত্রণার নাম। দুনিয়ায় আসনের পর থেইকা এ যন্ত্রণা শুরু করছে। সে যে শুধু নিজেই নিজের যন্ত্রণা তা না, সে তার আশপাশের মানুষের জন্যও বিশাল যন্ত্রণা। এই প্রমাণ সে ইতিমধ্যেই দিছে। এখন এর দায়িত্ব তোমার। হয় যন্ত্রণা সামাল দিবা, নাইলে যন্ত্রণা পোহাবা। এখন কোনটা করবা, সেই সিদ্ধান্ত তোমার।'

কামরুন্নাহার যন্ত্রণা পোহানোর দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিল। না নিয়ে উপায়ও অবশ্য ছিল না। কারণ এর কিছুদিন পর ইমাম আকরাম হোসেন মাদ্রাসার ছোটখাটো এক চাকরি পেয়ে চলে গেলেন বাগেরহাট। সেই চাকরিতে বেতন অতি অল্প, ছুটিছাঁটাও তেমন নেই। দু-চারদিনের জন্য বাড়ি আসার সুযোগ হয় দীর্ঘ সময় পরপর। ইমাম সাহেবের টানাটানির সংসার। সেই সংসারে হুট করে উটকো এক ভরণ-পোষণের ভার হয়ে এলো আরশি। কিন্তু এই নিয়ে কারও যেন কোনো অভিযোগ রইল না। তবে ইমাম সাহেব কিছুটা বিব্রত ছিলেন। কিন্তু তার স্ত্রী কামরুন্নাহার বলল, 'মুখ যে দেয়, আহারও সেই দেয়। রিজিকের মালিক আল্লাহ।'

কামরুন্নাহার এই উটকো ঝামেলা কতটা কী সহ্য করবে, সেটি অবশ্যই একটি বড় উদ্বেগের ব্যাপার। তবে যে পরিস্থিতি থেকে আরশি উঠে এসেছে, তাতে কোথাও তার অসুবিধা হওয়ার কথা না। ইমাম সাহেব আর কামরুন্নাহারের এক সন্তান মারা গেছে। এখন এক সন্তান রয়েছে। পুত্র সন্তান। সে আরশির চেয়ে বছর ছয়েকের ছোট। তার নাম জায়েদ। জায়েদ আর আরশির সম্পর্ক ভালো। অল্পদিনেই তারা দু'জন ভাই-বোন হয়ে গেল। কামরুন্নাহার ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে বলে, 'ও আরশি, পাতিলে পানি দেওয়া ভাত আছে, তোর ভাইরে লইয়া পান্তা খাইয়া পাতিলগুলা আমারে খালি কইরা দে। আমি ধুইতে যাই।'

আরশি প্রথম প্রথম বুঝত না এ বাড়িতে তার ভূমিকাটা আসলে কী হবে! সে কতদিন থাকবে? এরপর কই যাবে, কিছুই না। সে ভাত খেতে বসে খুব

ভাবত, এদের এমন টানাটানির সংসারে এমনিতেই সে ভাগ বসাচ্ছে, তার ওপরে যদি পেট পুরে খায়, তাহলে না তাদের আরও অসুবিধা হয়। আরশি দেখত, এক মুঠো চাল বা একটা টাকা বাঁচানোর জন্য কামরুন্নাহার কী অদ্ভুত অদ্ভুত সব কৌশল আবিষ্কার করে! হাঁস-মুরগির খাবারের জন্য যে খুদ-কুঁড়া জমিয়ে রাখা হতো, মাসের শেষের দিকে কামরুন্নাহার সেই খুদ-কুঁড়া থেকে কুলায় ঝেড়ে ঝেড়ে ভাঙা চালের খুদগুলো আলাদা করে রাখত। তারপর রান্নার চালের সঙ্গে সে রোজ খানিকটা করে খুদ মিশিয়ে দিত। এতে ভাতের পরিমাণ যেমন বাড়ে, তেমনি চালের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হতো বলে খুদের ভাতকে আলাদা করে খুব একটা বোঝাও যেত না। ডিম ভাজতে গেলে বাটিতে একটা ডিম গুলে তার সঙ্গে মিশিয়ে দিত হলুদ-কুমড়ো ফুল। জায়েদের আস্ত একটা ডিম খাওয়ার খুব ইচ্ছে। কিন্তু একটা ডিমের পুরোটা তাকে দিলে বাকিদের জন্য কিছুই থাকে না। এই কুমড়ো ফুল পদ্ধতির কারণেই জায়েদের ভাতের প্লেট জুড়ে তাই গোটা একটা ভাজা ডিম দেওয়ার পরও সেই একটামাত্র ডিমের কিছু অংশ বাকিদের জন্যও থেকে যায়!

আরশি যে এ বাড়িতে ঝাড়া হাত-পা হয়ে অন্ন ধ্বংস করে যাচ্ছে বিষয়টা মোটেও এমন না। কামরুন্নাহার যে তাকে গালমন্দ করে না, তাও না। এমনকি তার গায়ে দুয়েকদিন হাতও তুলেছে কামরুন্নাহার। কিন্তু এসব ঘটনা আগে থেকেই আরশির গা-সওয়া হওয়া সত্ত্বেও লাইলির সেই বকাঝকা, গালমন্দ কিংবা মারধরের সঙ্গে এর যেন কোথায় এক বিশাল পার্থক্য রয়েছে। পার্থক্যটা আরশি টের পায়। খুব করে টের পায়। এই অনুভূতিটা তার কাছে নতুন। সেদিন ঠাণ্ডা পড়েছে বেশ। কামরুন্নাহারের হাতে বাতের ব্যথা। সে ঘুম থেকে উঠে চলে গেল চুলার কাছে। চুলায় আগুন ধরিয়ে তাতে ডান হাত-বাঁ হাত সেঁক দিতে থাকল। শীতের সকাল খানিক দেরি করে হলেও আরশি তখনও ঘুমাচ্ছিল। কামরুন্নাহার চুলার পাশ থেকে চেঁচিয়ে ডাকল, 'আরশি, ও আরশি। শাহাজাদি হইছস না? উঠ, ঘুম থেকে উঠ। উইঠা হাঁড়ি-পাতিলগুলা পুষ্কুনিরতন মাইজা আন। যা।'

আরশি উঠল না। সে তখন গভীর ঘুমে। জায়েদ দু'হাত ছড়িয়ে দুই পা আরশির মুখের ওপর দিয়ে উল্টো হয়ে শুয়ে আছে। কামরুন্নাহার বারকয়েক ডাকাডাকি করেও কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে আবার ঘরে এলো। ঘরে এসেই শুরু হলো তার গজগজ, 'এই দ্যাহো ঘুমানোর সুরত। মাইনষের পোলাপান নাকি এইরম কইরা ঘুমায়!' সে জায়েদের পা দু'খানা সরিয়ে দিল আরশির মুখের ওপর থেকে। তারপর আরশির চুলের মুঠি ধরে টানল, 'ওই নবাবের বেটি। এত বেলা কইরা ঘুমাইলে ঘরে ফেরেশতা ঢোকে না। উঠ, উঠ।'

আরশি চোখ কচলাতে কচলাতে উঠে বসল। কামরুন্নাহার ঝাঁঝিয়ে উঠল, 'তোর এখন বয়স হইছে না? নামাজ-রোজা তো শুরু করন লাগব। আল্লাহ-

খোদার নাম তো কিছু মুখেও নেস না! আর কবে নিবি! যা যা উঠ। হাঁড়ি-পাতিলগুলান পুষ্কুনিরতন মাইজা আন।'

আরশি ঢুলু ঢুলু চোখে হাঁড়ি-পাতিল নিয়ে পুকুরে যায়। মাটির চুলা থেকে ছাই নেয়। সেই ছাই দিয়ে হাঁড়ি-পাতিল মেজে ঘষে চকচকে করে। তারপর খানিকটা ছাই আঙুলের ডগায় নিয়ে দাঁত মাজতে থাকে। বাড়ি ফিরে হাঁড়ি-পাতিলগুলো উঠানের এক কোনায় স্তূপ করে রাখা খড়ের গাদায় শুকাতে দেয়। জায়েদকে ঘুম থেকে তুলে পুকুরে নিয়ে মুখ ধোয়ায়। তারপর আবারও আঙুলের ডগায় ছাই নেয়। এবার জায়েদের দাঁত মাজার পালা। কিন্তু এই শীতের ভোরে দাঁত মাজতে জায়েদের বড় অনীহা, সে ঠোঁট চেপে মুখ বন্ধ করে রাখে। আরশি জোর করে তার ঠোঁট ফাঁক করে সেখানে ছাইসুদ্ধ আঙুল পুরে দেয়। জায়েদ মুখ সরিয়ে নিতেই তার সারা নাক-মুখ জুড়ে আরশির আঙুলের ছাই লেগে যায়। জায়েদ হাত বাড়িয়ে পুকুরের ঠাণ্ডা পানি ছিটিয়ে দেয় আরশির গায়ে। আরশি খপ করে জায়েদের মাথার পেছনটা চেপে ধরে কাছে টেনে আনে। তারপর শক্ত করে নিজের বুকের সঙ্গে চেপে ধরে দাঁত মেজে দিতে থাকে। জায়েদ নানান উপায়ে চেষ্টা করেও ছুটতে না পেরে শেষে ভ্যা করে কেঁদে দেয়। আরশি অবশ্য তাতে তোয়াক্কা করে না। এসব রোজকার ঘটনা। জায়েদের চোখের জল নাকের জল এক হতে থাকে। আরশি নির্দয়ের মতোন তার দাঁত মেজে মুখ ধুইয়ে ঘরে এনে গামছায় হাত-মুখ মুছে ভাত খেতে দেয়। জায়েদ তখন শীতে ঠকঠক কাঁপতে কাঁপতে বলে, 'তুই ঘুমাইলে আমি তোর কাঁথার মইধ্যে পানি দিয়া দিব।'

আরশি অবশ্য জায়েদকে খুব একটা পাত্তা দেয় না। সে তার পাতের মাছের টুকরা থেকে ভেঙে খানিকটা জায়েদের পাতে তুলে দিতে দিতে বলে, 'দিস। তারপর দেখুম রাইতে আমার কাছে কে ঘুমাইতে আসে?'

জায়েদ জিভে ভেংচি কেটে বলে, 'তোর কাছে কে ঘুমাইতে যায়? আমি মার কাছে ঘুমাই।'

আরশি বলে, 'হ, তোর মা তোরে সারা রাইত ধইরা কেচ্ছা শুনাইব? যা, মার কাছে যা।'

জায়েদ বলে, 'তুই যা।'

জায়েদের যদিও রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে কিসসা শোনার প্রবল আগ্রহ। এবং এক্ষেত্রে আরশি ছাড়া তার আর কোনো উপায়ও নেই। তবুও এই মুহূর্তে এ নিয়ে তাকে খুব একটা চিন্তিত বলে মনে হলো না। কামরুন্নাহার রাতে শুয়ে পড়ার দুই মিনিটের মাথায় নাক ডাকতে শুরু করে। সুতরাং জায়েদের একমাত্র ভরসা আরশি। আরশি তখন তাকে গল্প শোনায়। যযাতিপুরে আম্বরি বেগম বেঁচে থাকতে রোজ ঘুমানোর আগে আরশিকে কত কিছু শোনাতেন। গুনগুন করে পুঁথি পাঠ করে শোনাতেন, গল্প শোনাতেন। আরশির সেইসব গল্প

www.boighar.com

দিব্যি মনে আছে। সে আগ্রহ নিয়ে সেসব গল্প জায়েদেক শোনায়। বানিয়ে বানিয়েও শোনায়! গল্প শুনতে শুনতে জায়েদ ঘুমিয়ে পড়ে। আর আরশি! আরশি ঘুমায় না। সে গভীর রাত অবধি জেগে থাকে। তার তখন যযাতিপুরের কথা মনে পড়ে। বাবার কথা মনে পড়ে। বাবা কেমন আছে? বাবাকে কি ওরা মেরেছে? বাবা কি বেঁচে আছে! তার খুব জানতে ইচ্ছে করে। খুব। বাবাকে দেখতে ইচ্ছে করে! বাবার গায়ের গন্ধ পেতে ইচ্ছে করে। উঠানের পেছনের চালতা গাছটার তলায় বসে থাকতে ইচ্ছে করে। বু'র কবরটার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছা করে। তার ঘুম আসে না। সে কত কিছু ভাবে। কত কিছু! কিন্তু তার কাউকে কিছু বলতে ইচ্ছে করে না। কাউকে কিছু না। তার নিজের কষ্টের কথা, ভাবনার কথা, জীবনের কথা, কাউকে বলতে ইচ্ছে করে না। কাউকে না। একা একা গভীর রাতে কেবল বুকের ভেতরটা কেমন হুহু করে ওঠে। সে তখন ছোট্ট জায়েদকে বুকের সঙ্গে চেপে ধরে রাখে।

জায়েদ কটকট করে কথা বলা বেপরোয়া এক শিশু। সে আরশিকে তুই-তোকারি করেই বলে। অনেক কষ্টে তাকে শেখানো হয়েছে আরশিকে বুবু বলতে। তা সে বলেও। তবে ক্ষেপে গেলে বুবু হয়ে যায় গু গু। সে এখন ক্ষেপে আছে। সে আরশিকে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বলল, 'তুই একটা গু গু।' তারপর নিজের নাক চেপে ধরে বলে, 'ইশ! গন্ধ।'

আরশির যে কী মায়া লাগল। সে ছুটে এসে জায়েদের নাকের সঙ্গে তার গাল চেপে ধরে বলল, 'নে নে নে, গন্ধ নে।'

জায়েদ দুই হাতে আরশিকে দূরে ঠেলে দিতে চাইল। কিন্তু পারল না। শেষে তার শেষ অস্ত্র কান্না। সে দুই হাতে আরশির চুল খামচে ধরে চেঁচাল। কামরুন্নাহার বিরক্ত গলায় বলে, 'ও আরশি! আবার কী শুরু করলি? দুইটা মিনিট যদি একটু শান্তিতে থাকতে দেস আমারে! সারাটা দিন দুইটায় খামচা-খামচি! আমার হাড়টা জ্বালাইয়া খাইলি তোরা। যা যা, ভাত খাইয়া রোদে গিয়া বয়।'

আরশি অবশ্য কোনোকিছুতেই জবাব দেয় না। সে চুপচাপ জায়েদের কাছ থেকে সরে গিয়ে বসল। কিন্তু কোন ফাঁকে জায়েদ এক গাদা ভাত এনে আরশির চুলের ভেতর ছড়িয়ে দিয়ে দৌড়ে পালায়। আরশির চুল তখন অনেকটাই বড় হয়ে গেছে। কিন্তু তেল-সাবান না পড়ায় সেই চুল হয়ে আছে আঠা আঠা। কামরুন্নাহার আরশিকে ধরে নিয়ে পুকুর পারে বসায়। সাবানের অনেক দাম। সে কী এক অদ্ভুত উপায়ে পুকুরের কাদামাটি মেখে আরশির চুল ধুয়ে দেয়। আর গালমন্দ চলতেই থাকে, 'ওইটুক একটা পোলা। সেইটাই সামলাই রাখতে পারস না। নিজেরে কেমনে সামলাবি! আর এত গিদর হইছস ক্যা? মাথারতন ইঁদুর মরা গন্ধ আসে। এহ!'

কামরুন্নাহার ক্রমাগত মুখ চালাতে চালাতেই আরশির মাথায় সজোরে চাটি মারে। কিন্তু খারাপ লাগার বদলে কামরুন্নাহারের এই শাসন, এই গালমন্দ আরশির এত ভালো লাগে! তার মনে হয় সারাক্ষণ চেঁচানো কিংবা রুদ্রমূর্তির কামরুন্নাহারের ভেতর কী জানি কী আছে! সেই 'কী জানি কী' অব্যাখ্যেয় এক স্নেহ-মমতার অব্যক্ত গভীর আধার। তবে ব্যাপারটা আরশি খুব করে টের পায়। এবং সে তার অনুভূতির সবটা দিয়ে সেটুকু অনুভব করে। উপভোগ করে। বরং কামরুন্নাহার যখন তার সঙ্গে চেঁচায় না, চুপচাপ থাকে, বকাঝকা করে না, তখন তার কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে।

কামরুন্নাহারের এমন চোঁচানো রোজকার রুটিন। ক্ষেপে গেলে মারধরও করে। সবচেয়ে বেশি তেতে থাকে মাসের শেষ দিনগুলোতে। সে সময়টায় দু'বেলা খাবার জোটানোই মুশকিল হয়ে ওঠে। রাতে ঘরে বাতি জ্বালানোর কেরোসিন অবধি থাকে না। আজ ক'মাস হলো অবশ্য হঠাৎ করেই বাজারে নুন, তেল, চালের দাম বেড়ে গেছে। সবচেয়ে বেশি বেড়েছে কেরোসিনের দাম। তার ওপর এই মাসে আকরাম হোসেনেরও কোনো খবর নেই। মাস শেষ হয়ে পরের মাসেরও দশ দিন কেটে গেল। প্রথম দু'চার দিন ধার-কর্জ করে চলল কামরুন্নাহার। শেষ পর্যন্ত আর ধারেও কুলাল না। এর মধ্যেই আরশির হঠাৎ জ্বর হলো। টানা দু'দিন বিছানা থেকে উঠতে পারল না। কামরুন্নাহারের মেজাজ হয়ে গেল আরও খারাপ। সে ঘরে আসতে-যেতে চেঁচাতে লাগল, 'যেই শরীলে খাওন জোটে না, সেই শরীলে অসুখ জোটে কেমনে! নবাবজাদির শরীল হইছে একখান। দুইডা দিন ঠাণ্ডার মইধ্যে হাঁড়ি-পাতিল ধুইছে, সঙ্গে সঙ্গে জ্বর! এই শরীল লইয়া রাজা-বাদশাহর ঘরে জন্ম নেওনের কাম আছিল।'

এইসব গালমন্দ আরশির গা-সওয়া। সে চুপচাপ কাঁথার মধ্যে শুয়ে থাকল। উঠানে রাজ্যের শুকনো খড়-কুটো রোদে শুকাতে দেওয়া ছিল। অবাক ব্যাপার সন্ধ্যার আগে আগে এই শীতেও হঠাৎ বৃষ্টি চলে এলো। শুকনো খড়-পাতা রান্না ঘরে নিতে হবে। আরও কত কাজ বাকি! বাতের ব্যথায় মোটামুটি কাবু হয়ে থাকা কামরুন্নাহার যেন পড়ল অথৈ সাগরে। কোনটা ছেড়ে কোনটা সামলাবে বুঝে উঠতে পারছিল না সে। কিন্তু তার মুখ চলতেই থাকল, 'আল্লাহয় আমারে মরণ দেয় না কেন! মরণ। আমার মরণ দিলে সবারই হাড় জুড়াইত।' সে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে কাজ করতে থাকল। ঘরে সামান্যই কেরোসিন আছে। খুব প্রয়োজন না হলে তাই বাতি দেওয়া হয় না ঘরে। কিন্তু আজ এক ফাঁকে ঘরে এসে আরশির পাশে কেরোসিনের কুপি জ্বালিয়ে দিল কামরুন্নাহার। কিন্তু তার মুখ ততক্ষণে আরেক দফা চলল, 'ওই নবাবের বেটি! মাগরিবের আজান হইতেছে, এই সময় বিছানায় চিৎ হইয়া থাকলে রোগ-বালাই সারে না। আরও বাড়ে। আল্লাহরস্তে একটু উইঠা বসেন। আজানডা শেষ হইলে আবার চিৎ হইয়েন।'

Boighar.com & ARS

আরশি অনেক কষ্টে উঠে বসতে বসতে বলল, 'আমি আইসা কাপড়-চোপড় ঘরে নিতেছি। হাঁস-মুরগিগুলান খোপে দিতাছি!'

কামরুন্নাহার যেন খেঁকিয়ে উঠল, 'আর ঢং করন লাগব না। আমারে দরদ দেখান লাগব না। অত দরদ থাকলে নিজেরে দেখা। জ্বরজারি ভালো কর।'

কামরুন্নাহার ঘর থেকে বের হয়ে যেতেই আরশি আবার শুয়ে পড়ল। তার পক্ষে আর বসে থাকা সম্ভব না। কিন্তু অঘটনটা ঘটল তার পরেই। আরশি শুয়ে পড়তে কোন ফাঁকে পায়ে লেগে চৌকির কোনা থেকে কেরোসিনের কুপিটা পড়ে গেল মেঝেতে। আরশি খেয়াল করল না, সে কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়েই রইল। শেষ যেটুকু কেরোসিন ছিল, সেটুকু ছড়িয়ে পড়ল মেঝেতে বিছিয়ে রাখা পাটিতে। মুহূর্তে দাউ দাউ করে আগুন ধরে গেল। কামরুন্নাহার যতক্ষণে দেখল ততক্ষণে পাটির আগুন প্রায় টিনের চাল ছুঁই ছুঁই। কামরুন্নাহার পুকুর থেকে বালতিতে পানি নিয়ে উঠানে ঢুকেছিল। ঘরের সামনে এসে হতভম্ব হয়ে গেল। তারপর 'ওরে আল্লাহরে' বলে চিৎকার দিয়ে বালতির পানি ঢেলে দিল আগুনে। ঢেলে দিল চুলার পাশে থাকা আরও দু'কলস পানি। আগুন নিভলেও তার মেজাজ নিভল না। নানা কারণে বিপর্যস্ত কামরুন্নাহার কেরোসিন বিহীন পিতলের কুপিটাকে মেঝেতে পড়ে থাকতে দেখে আর নিজেকে সামলাতে পারল না। এতকিছুর পরও আরশি কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে ছিল চৌকির কোনায়। কামরুন্নাহার হঠাৎ আরশির শরীর থেকে কাঁথাটা টেনে সরিয়ে নিল। তারপর আরশির হাত ধরে টেনে বসাল। প্রবল জ্বরে কাঁপতে থাকা আরশি অবাক চোখে তাকিয়ে রইল। কামরুন্নাহার সবসময়ই হৈচৈ করে, কিন্তু তার এমন উন্মত্ত চেহারা সে এর আগে কখনও দেখেনি। কামরুন্নাহার প্রথম চড়টা বসাল যথেষ্ট জোরে। আরশি ছিটকে বাঁ দিকে পড়ে গেল। সে আরশিকে টেনে আবার ওঠাল। এবার চড় বসাল বাঁ গালে। আরশির মাথাটা ডান দিকে ঘুরে গেলেও সে আর পড়ে গেল না। কামরুন্নাহার এবার আরশির চুলের মুঠি ধরে বলল, 'আমার সর্বনাশ কইরা ছাড়বি তুই? আমার সর্বনাশ কইরা ছাড়বি? আর কত সর্বনাশ করবি! আইজ তো আমারেও শেষ কইরা দিছিলি।'

আরশির শরীর খুবই খারাপ লাগছিল। মাথাটা ব্যথায় ফেটে যাচ্ছিল। সে একপলক তাকিয়েই যা বোঝার বুঝে নিল। কিন্তু এতদিন যা হয়নি, আজ হঠাৎ করেই তা হলো। কামরুন্নাহার এতদিনে যতই গালমন্দ করেছে তাকে, সেসব সে পাত্তাই দেয়নি। কিন্তু আজ যেন কেমন করে উঠল বুকের ভেতরটা। নতুন করে অসহায় অনুভব করার কিছু নেই। কিন্তু আজ তার নিজের অসহায়ত্ব ছাপিয়ে কেমন এক ধরনের অশুচি অনুভূতি হতে লাগল। মনে হতে লাগল এই জগৎ-সংসারে তার সৃষ্টি হয়েছে সব অনাসৃষ্টির জন্য। সব অকল্যাণ আর অশুভর জন্য। তার জন্য এই জগতে ভালো বলে কিছু নেই। শুভ, কল্যাণকর কিছু নেই। সে যেখানে যাবে, যা স্পর্শ করবে, তাই যেন মুহূর্তেই হয়ে উঠবে ধ্বংসস্ত

প। সে যেন এক অভিশপ্ত সৃষ্টি। তার এই এইটুকু জীবনের প্রতিটি পদে পদে সে যেন তার প্রমাণ দিয়ে চলেছে। আরশি খানিক কামরুন্নাহারের চোখের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর হঠাৎ কাঁপা গলায় বলল, 'আমি মনে হয় ভালো মানুষ
www.boighar.com
না। আমি খারাপ মানুষ। আমার মনে হয় কোনো দোষ আছে। আমারে রাখলে আপনাগোও ক্ষতি হইব। আমারে ধইরা একটু রাস্তায় দিয়াসবেন? আমি চইলা যাই।'

কামরুন্নাহার আরশির চুলের মুঠি ছেড়ে দিয়ে বলল, 'সব গেলেও এই ঢং আর গেল না? কই যাবি তুই? রাস্তায় মাইনষে তোর জন্য খাওন-দাওন নিয়া খাড়াই আছে না? গেলেই কোলে কইরা নিয়া খাওন-দাওন দিয়া ঘুম পাড়াইব? ঢ্যামনি জানি কোনহানকার!'

আরশির আজ কী যে কষ্ট হলো! সে নিজে নিজেই সব মেনে নিতে শিখেছে। সে জানে তাকে সর্বংসহা হতে হবে। কিন্তু আজ তার তীব্র কষ্ট হলো। তীব্র কষ্ট। এই জগতে তার আসলে কোথাও যাওয়ার নেই। কোথাও না। এই এত বড় জগৎ, অথচ তার যাওয়ার এতটুকু জায়গা নেই কোথাও। কামরুন্নাহার চলে গেল বাদবাকি কাজ সারতে। ক্লান্ত, অসুস্থ আরশি কখন ঘুমিয়ে গেছে সে নিজেই টের পায়নি। তার ঘুম ভাঙল গভীর রাতে। একটা শক্ত হাত কাঁথার ভেতর দিয়ে তাকে টেনে নিল কাছে। তারপর তার মাথাটা দু'হাতে তুলে নিয়ে রাখল নরম কোলে। অনেকক্ষণ সময় নিয়ে সেই শক্ত হাতখানা তার মাথায় জলপট্টি দিল। ঘুমভাঙা আরশি চোখ খুলল না। সে চোখ বন্ধ করে জেগে রইল। মানুষটা তার শাড়ির আঁচল দিয়ে আরশির কপালে জমে থাকা পানি মুছল। মুখ মুছল। তারপর খানিকটা মাথা ব্যথার মলম লাগিয়ে দিল। তারপর একটা অদ্ভুত কাণ্ড করল। ঠোঁট নামিয়ে আরশির কপালে ছোট্ট একটা চুমু খেল। আরশি প্রথমে বুঝল না। যখন বুঝল আপনাআপনি তার চোখ খুঁলে গেল। ঘরের এক কোনায় পুরনো চটের বস্তা দিয়ে অদ্ভুত উপায়ে ছোট এক মশালের মতোন বাতি বানিয়ে জ্বালিয়ে রেখেছে কামরুন্নাহার। তার আলোতে অন্ধকার সব না কাটলেও সেই আধো আলো অন্ধকারে আরশি মানুষটার মুখ দেখল, কামরুন্নাহার তার নামাজ পড়ার সাদা কাপড়টা পরে আরশির মাথা কোলে নিয়ে বসে আছে। তার পাশে জায়নামাজ বিছানো। সে আরশির মাথাটা কোল থেকে নামিয়ে আবার বালিশে রেখে দিয়ে জায়নামাজে গিয়ে বসল। রাত তখন কত হবে আরশি জানে না। কামরুন্নাহার দীর্ঘ সময় নিয়ে নামাজ পড়ল। তারপর মোনাজাতে বসল। কামরুন্নাহার যে মোনাজাতের ভেতর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে, এই নিঃশব্দ রাতে তা আরশির অজানা রইল না। সে গভীর ঘুমের ভান ধরে নিঃসাড় পড়ে রইল। কামরুন্নাহার তার কান্না চেপে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না। আরশি সেই মোনাজাতের কথা শুনতে পেল না। কিন্তু মোনাজাত শেষে কামরুন্নাহার তার মাথাটা ছুঁয়ে বিড়বিড় করে বলতে থাকল,

Boighar.com & ARS

'আল্লাহগো, এই দুঃখী মাইয়াটারে তুমি আর কষ্ট দিও না আল্লাহ। আমারও সামর্থ্য নাই আমি কিছু করি। অভাব-অনটনের সংসারে মাথা ঠিক রাখতে পারি না, মাইয়াটারে কত কিছু যে বলি আল্লাহ। তুমি আমারে মাফ করো আল্লাহ।'

কামরুন্নাহার আরশির চুলের ভেতর হাত দিয়ে বিলি কাটতে থাকল। আরশি চোখ বন্ধ করে পড়ে রইল। তার হঠাৎ মনে হতে লাগল এই জগৎ-সংসারে তার মতোন এমন সৌভাগ্যবতী আর কেউ নেই। তার মতোন এমন অসাধারণ ভাগ্য নিয়ে আর কেউ জন্মায়নি। আর কেউ না। কামরুন্নাহার সেই রাতে তাকে ঘুম থেকে উঠিয়ে ভাত খাওয়াল। তারপর বুকের ভেতর চেপে ধরে ঘুমিয়ে রইল। আরশি সেই বুকের ওমে ডুবে রইল সারারাত। ডুবে রইল জগতের অদ্ভুত ব্যাখ্যাহীন মমতার ভাষায়।

আরশি সুস্থ হয়ে উঠল তিন দিনের মাথায়। ঘরে একটাও চাল নেই। নুন নেই, তেল নেই, কেরোসিন নেই। সকাল থেকে কামরুন্নাহার চুপচাপ বসে আছে। জায়েদ সেই কখন থেকে ভাতের জন্য কাঁদছে। কিন্তু কামরুন্নাহার কোনো কথা বলছে না। ইমাম আকরাম হোসেন এলেন বিকেল নাগাদ। তিনি চাল-ডাল-তরিতরকারি নিয়েই এসেছেন। সে রাতে অনেক দিন পর ভালো খাওয়া-দাওয়া হলো। খাওয়া-দাওয়া শেষে ইমাম সাহেব দুঃসংবাদটা দিলেন, 'কামরুন্নাহার, আমার দেরি হওয়ার কারণে তুমি অনেক রাগ করছ, এইটা আমি জানি। কিন্তু কী করব বল। মাদ্রাসার আয়-রোজগার খুবই খারাপ। তারা বেতন-টেতন ঠিকঠাক মতো দেয় না। এজন্যই দেরি হয়। আমার কী চিন্তা থাকে না, বল? চিন্তা তো আমারই থাকে। তোমরা এতগুলা মানুষ আমার মুখের দিকে তাকাইয়া অপেক্ষায় থাকো। এই চিন্তার চাইতে বড় চিন্তা আর কী আছে!'

কামরুন্নাহার সবই বোঝে। তারপরও কেন যেন অভিমান হয়। এই অভিমান কার ওপর হয় সে জানে না। কিন্তু হয়। ইমাম সাহেব বললেন, 'এতদিন তাও দেরি হইলেও বেতন দিছে। এখন মাদ্রাসা প্রায় বন্ধ হওনের উপক্রম। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হইছে, আপাতত মাদ্রাসার কর্মচারী ছাঁটাই কইরা খরচ কমাইব।'

ইমাম সাহেব একটু থেমে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'আমার রিজিক ওইখানে নাই। ছাঁটাইয়ের মধ্যে আমিও পড়ছি।'

এই নিয়ে বাড়িতে আর কোনো কথা হলো না। ইমাম সাহেব পরের কয়েকদিন এখানে-সেখানে কাজ খুঁজলেন। কিন্তু পেলেন না। ভারি বিপদে পড়ে গেলেন তিনি। কী করবেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না। শেষ দিকে এসে আরশির চিন্তাটাই প্রধান হয়ে উঠল ইমাম সাহেবের। আরশির কোনো একটা ব্যবস্থা করা জরুরি। আরশিকে দেখতে যদিও এখনও আট-নয় বছরের শিশুর মতোই মনে হয়, কিন্তু বছর কয়েকের মধ্যে আরশি বড় হয়ে উঠবে। তখন মেয়েদের নানান জটিলতা শুরু হয়। নিজেদের তিনটি মাত্র মুখেই দু'বেলা

খাবার জোটাতে হিমশিম খেতে হয় তাকে। সামনে আরশি বেড়ে উঠবে, তখন কীভাবে কী করবেন এই ভেবে খানিকটা শঙ্কিত হলেন তিনি। কিন্তু আরশিকে নিয়ে যযাতিপুরে যাওয়ার ভরসাও পেলেন না। সেখানে কী অবস্থা কে জানে! তাহলে উপায় কী? ভয়াবহ দুশ্চিন্তায় দিন কাটতে লাগল ইমাম সাহেবের। কোথাও কোনো কাজও জোটাতে পারছেন না। কী থেকে কী করবেন কিছুই ভেবে পেলেন না ইমাম আকরাম হোসেন।

ইমাম আকরাম হোসেনের ছোট একখানা পকেট ডায়রি রয়েছে। সেই ডায়রির ভেতর পরিচিত-অপরিচিত অনেক মানুষের ঠিকানা লেখা থাকে। সেদিন সেই ডায়রি খুলে উঠানের কোনায় বসলেন তিনি। যদি কাউকে খুঁজে পান, যে একটা কাজ জোগাড় করে দিতে পারবে। বা কোনো একটা উপায় বের করে দিতে পারবে! কিন্তু ডায়রি তন্নতন্ন করে খুঁজেও তেমন কাউকে খুঁজে পেলেন না ইমাম সাহেব। তবে ডায়রির ভেতর থেকে টুপ করে একটা কার্ড পড়ল। ভিজিটিং কার্ড। কার্ডখানা উল্টেপাল্টে দেখলেন ইমাম সাহেব। চকিতে রুবিনার কথা মনে পড়ল। আতাহার তালুকদারের পুত্রবধূ রুবিনা। সেই রাতে পালিয়ে যাওয়ার সময় কার্ডখানা দিয়েছিল। ইমাম সাহেবের হঠাৎ মনে হলো, তার জন্য না, অন্তত এই মুহূর্তে আরশির জন্য যদি কেউ কিছু করে, তাহলে সে হবে রুবিনাই। তাছাড়া এইখানে এই প্রবল অভাব-অনটনে তার কাছে রেখে আরশির ভবিষ্যৎ নষ্ট করার কোনো অর্থ নেই। তার চেয়ে অন্তত রুবিনা পর্যন্ত কোনোভাবে আরশিকে পৌঁছে দিতে পারলে সে কোনো না কোনো একটা ব্যবস্থা করবেই।

পরের শুক্রবার তিনি আরশিকে নিয়ে ঢাকার উদ্দেশে রওনা হলেন। ঢাকায় যাবেন লঞ্চে। লঞ্চঘাটে কামরুন্নাহার আরশির হাত ধরে দাঁড়িয়ে রইল। জায়েদ বলল, 'বুবু তুই কই যাস?'

আরশি কোনো জবাব দিতে পারল না। জায়েদ বলল, 'মা, বুবু কই যায়?'

কামরুন্নাহার জায়েদের কথার উত্তরে কিছু বলল না।

আরশি দু'হাতে জায়েদের হাত চেপে ধরে বলল, 'বুবু চইলা যায়।'

জায়েদ আঙুল উঁচিয়ে লঞ্চ দেখিয়ে বলে, 'কই? লঞ্চে?'

আরশি মাথা নেড়ে বলে, 'হু।'

জায়েদ বলে, 'আমি যাব। মা, বুবুর সঙ্গে যাব।'

কামরুন্নাহার বা আরশি কেউ কোনো জবাব দেয় না। জায়েদ আবার বলে, 'বুবুর সঙ্গে যাব। ও মা, মা, বুবু একলা যাইব কেন। বুবুর সঙ্গে যাব।'

আরশি হঠাৎ জায়েদের নাকের সঙ্গে তার গাল চেপে ধরে বলল, 'বুবুর গালে গন্ধ না? এইজন্য বুবু চইলা যায়।'

জায়েদ হঠাৎ তার ছোট ছোট হাতে আরশিকে জড়িয়ে ধরে বলে, 'বু বু। বু বু। আর গন্ধ বলব না। আর গু গু বলব না। বুবু যাব। ও মা, বুবু যাব।'

Boighar.com & ARS

কামরুন্নাহার কথা বলে না। আরশি জায়েদটাকে গালের সঙ্গে চেপে ধরে রাখে। লঞ্চ ছাড়ার ভেঁপু দিচ্ছে। এতক্ষণ কামরুন্নাহার কোনো কথা বলেনি। কিন্তু ভেঁপু বাজার সঙ্গে সঙ্গেই তার কী যে হলো! সে হঠাৎ আরশিকে বুকের সঙ্গে চেপে ধরে কেঁদে ফেলল। কান্না জড়ানো গলায় সে বার বার শুধু একটা কথাই বলতে লাগল, 'মা, মা রে।'

আরশির হঠাৎ মনে হলো এই মানুষগুলোকে ছেড়ে সে কোথাও যেতে পারবে না। কোথাও না। এই মানুষগুলোকে ছাড়া এই জগতে তার আর কেউ নেই। কেউ না। এই মানুষগুলোর বুকের ভেতর যে শব্দ, গায়ের যে ঘ্রাণ, এই মানুষটার আঁচল জুড়ে যে সুবাস, তা এতদিন তার কাছে অচেনা ছিল, অজানা ছিল। এখন এই সুবাসের মানে সে জানে, এই শব্দের অর্থ সে জানে। সে কামরুন্নাহারকে কখনও কিছু বলে ডাকেনি। কিন্তু আজ ডাকল। আজ এই এতদিনের নামহীন, সম্বোধনহীন, অসংজ্ঞায়িত বন্ধন ছেড়ে চলে যাওয়ার আগে সে ফিসফিস করে ডাকল, 'মা, মাগো। ও মা। মাগো।'

কামরুন্নাহার সেই ডাক শুনল কিনা কে জানে। কারণ বিকট শব্দে তখন লঞ্চ ছেড়ে দেওয়ার শেষ ভেঁপুটা বাঁজল।

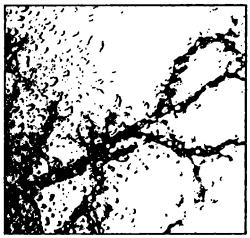

শুকরঞ্জন ডাক্তার সুজাতা রানীকে আনতে কলকাতায় গিয়ে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। অসুস্থ মানে ভালো রকম অসুস্থ। ডাক্তার স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন আপাতত কোনো শারীরিক পরিশ্রম নয়। পুরোপুরি বিশ্রাম। নিয়ম মেনে খাওয়া। আশিষ আবার সেই একা। মাঝখানে মাস ছয়েক মিলি খানিক শান্তশিষ্ট ছিল। কিন্তু আবার অশান্ত হয়ে উঠেছে সে। নানান নৈরাজ্য করে বেড়াচ্ছে। আশিষকে হাতের কাছে পেলেই যা কিছু পাচ্ছে ছুড়ে মারছে। আশিষ আজকাল অল্পতেই ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছে। তার সহ্যশক্তি যেন দিন দিন লোপ পাচ্ছে। সেদিন সে একটা ভয়াবহ অন্যায় করে ফেলেছে। সারারাত অফিস করে বাসায় ফিরেছে ভোরে। মূল দরজা বাইরে থেকে তালা মেরে রেখে যায় সে। আজ দরজা খুলে ঘরে ঢুকে দেখে ড্রইংরুম জুড়ে জিনিসপত্রের ছড়াছড়ি। ফুলদানি, শোপিস, পেনবক্সসহ নানা জিনিসপত্র। সে বছরখানেক আগে সাংবাদিকতার জন্য যে গুরুত্বপূর্ণ একটা পুরস্কার জিতেছিল, সেটিও মেঝেতে দু'ভাগ হয়ে গড়াগড়ি খাচ্ছিল। আশিষের হঠাৎ কী হলো। সে মিলির ঘরের দরজায় সজোরে নক করল। কিন্তু মিলি দরজা খুলল না। সে ভেতর থেকে বলল, 'সকাল এখন স্কুলে যাবে। ওকে রেডি করছি, দেখছ না?'

www.boighar.com

আশিষ কর্কশ গলায় বলল, 'মিলি দরজা খোল।'

মিলি বলল, 'কী বলছি শুনতে পাচ্ছ না? আমি এখন ব্যস্ত। আগে সকাল স্কুলে যাক। তারপর দরজা খুলব।'

আশিষ আবারও দরজায় নক করল। বিরক্ত মিলি দরজা খুলে বলল, 'কী ব্যাপার? ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মতো করছ কেন? রাতে মৌজমাস্তি ঠিকমতো হয়নি? না হলে এত সকালে ফেরার কী দরকার ছিল। মৌজমাস্তি শেষ করেই ফিরতে!'

আশিষ হঠাৎ মিলিকে ধাক্কা দিল। মিলি খানিকটা পিছিয়ে গেল। সে আশিষের আচরণে খানিকটা অবাক হলেও ভড়কাল না। বলল, 'কী হয়েছে? তোমার ডাক্তার ম্যাডাম সারারাতে তোমার খায়েশ মেটাতে পারেনি? এখন আবার আমাকেও লাগবে? আমার শরীরটা তো পুরনো হয়ে গেছে। এটা কি আর ভালো লাগবে?'

আজকাল রুবিনাকে নিয়েও অশ্লীল সব কথা বলে মিলি। আশিষ দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'চুপ। একদম চুপ। একদম চুপ।'

মিলি বাঁকা ঠোঁটে হেসে বলল, 'কেন? এখনই শুরু করবে? কাপড় খুলব? কিন্তু আমাকে তো আর ভালো লাগবে না। ডাক্তার ম্যাডামের কত বড় বড় বুক। কত সরু কোমর। আহা! আমার কি আর সেসব আছে!'

আশিষ মিলির গালে প্রথম চড়টা বসাল জোরে। পরেরটা আরও জোরে। তারপর ধাক্কা মেরে মিলিকে ফেলে দিল বিছানার ওপর। মিলি উঠল না। সে বড় বড় চোখ করে আশিষের দিকে তাকিয়ে রইল। আশিষ ক্রুদ্ধ গলায় বলল, 'অনেক হয়েছে। অনেক। যথেষ্ট পাগলামি হয়েছে। আর না।'

মিলি চুপচাপ শুয়ে রইল। উঠল না। আশিষ গোসল সেরে বাইরে থেকে নিয়ে আসা খাবার খেল। তারপর ড্রইংরুমেই শুয়ে পড়ল। ঘুম থেকে উঠল বিকেলে। লম্বা আর গভীর ঘুমের কারণেই কিনা কে জানে, হুট করে তার মাথায় আর সকালবেলার ঘটনাটা মনে রইল না। ড্রইংরুমে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা জিনিসপত্র গোছাতে গিয়ে তার হঠাৎ মিলির কথা মনে পড়ল। সে মিলির ঘরে গিয়ে দেখল মিলি সেই সেখানেই শুয়ে আছে। তার একটা হাত ঝুলে আছে খাট থেকে বাইরে। একটা ছোট্ট শিশুর মতোন পা দু'খানাকে বুকের কাছে ভাঁজ করে শুয়ে আছে মিলি। ঘুমের ভেতরও তার শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠছে। আশিষের নিজেকে এত অপরাধী লাগতে লাগল। এত ছোট লাগতে লাগল। সে মিলির ঝুলে থাকা হাতটা বিছানায় তুলে দিতে গিয়ে টের পেল, মিলির শরীর পুড়ে যাচ্ছে জ্বরে। প্রবল জ্বরে। সে রাতে বারকয়েক বমি করল মিলি। আশিষ তার বমি পরিষ্কার করে হাতে তুলে খাইয়ে দিল। ঘোরগ্রস্ত মিলি কিছু খেল, কিছু ফেলে দিল। তারপর আবার শুয়ে পড়ল। আশিষ মিলির মাথাটা বুকের ওপর টেনে নিয়ে তার চুলের ভেতর হাত বোলাতে থাকল। ঘুমের ঘোরেই কিনা মিলি সারারাত দু'হাতে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে রাখল আশিষকে। সারারাত।

মিলি তার পরদিন থেকে একদম চুপ হয়ে গেল। সারাদিন বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকে। মাঠে ছেলে-মেয়েদের ছোটাছুটি দেখে। তার মাঝে মাঝে মনে হয়, সকাল কোথাও না কোথাও এখনও বেঁচে আছে। বড় হচ্ছে। আজ ক'দিন থেকে তাই মনে হচ্ছে মিলির। মনে হচ্ছে, সকাল একদিন ঠিক ঠিক ফিরে আসবে। তবে সে মনে মনে হিসাব করে, সকাল ফিরে এলেও সে এখন কত বছরে পড়ল। সে এতদিনে নিশ্চয়ই অনেক বড় হয়ে গেছে। সকালও কি তাহলে এখন ওই বাচ্চাদের মতোন সামনের মাঠে খেলাধুলা করত! মিলি পুরোটা সময়ই যে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, বিষয়টা এমন না। বরং মাঝেমাঝে সে নিজে নিজেই নিজেকে, নিজের আচরণকে বোঝার নানান রকম চেষ্টা করে। কখনও কখনও পারেও। নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণটা ফিরেও আসে। কিন্তু সেটা খুব অল্প সময়ের জন্য। তারপর হঠাৎ হঠাৎ কী হয়ে যায়! ঝড়ো

বাতাসের ঝাপ্টার মতোন কিছু একটা এসে সবকিছু এলোমেলো করে দেয়। ঝাপসা করে দেয়। এত চেষ্টা, এত কষ্টে খানিকটা হলেও গুছিয়ে তোলা ভেতরটা মুহূর্তেই আবার এলোমেলো হয়ে যায়। সে টের পায়, নিজের প্রতি তখন তার আর কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। একটুও না। কিন্তু তখন কিছুই করতে পারে না সে।

যেমন বেশ কিছুদিন বাদে সেদিন রাতে আবার ঘুম ভেঙে গেল তার। সে আশিষকে ডেকে উঠাল। আশিষ ঘুমজড়ানো গলায় বলল, 'কী হয়েছে?'

মিলি বলল, 'সকাল এসেছে। ও সামনের মাঠে ফুটবল খেলতে গিয়ে পায়ে ব্যথা পেয়েছে। পা খানিকটা কেটেও গেছে। স্যাভলন লাগবে। ব্যান্ডেজ লাগবে। ছেলেটা সেই কখন থেকে দরজা ধাক্কাচ্ছে। কেউ খুলছে না।'

আশিষ বলল, 'তুমি স্বপ্ন দেখেছ মিলি।'

মিলি বলল, 'আরে আজব! আমি স্বপ্ন দেখব কেন? আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলাম। দেখলাম ও হঠাৎ খেলতে খেলতে কিছুতে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। নখ উল্টে রক্ত বেরোচ্ছে। সেই তখন থেকে দরজা ধাক্কাচ্ছে। কিন্তু কেউ খুলছে না।'

আশিষ চুপ করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, 'সকাল তো অনেক ছোট। ও সামনে মাঠে কী করে খেলবে?'

মিলি বলল, 'তোমার কোনোদিনও আক্কেলজ্ঞান হলো না। সকালের এখন ক'বছর হলো সে খেয়াল আছে তোমার? এ বয়সের বাচ্চারা কত দ্রুত বাড়ে, তা তুমি জানো না? ও কি এখনও সেই আগের ওইটুক বাচ্চা সকাল আছে? মোটেও না। ও এখন অনেক বড় হয়েছে। মাঠে ছেলেপুলেদের সঙ্গে খেলতেও পারে।'

আশিষ এবার আর কোনো কথা বলল না। মিলির দিকে অনেকক্ষণ এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। সেই ঘটনার পর থেকে মিলি আজকাল আশিষকে খুব ভয় পায়। আশিষের এমন তাকিয়ে থাকা দেখে সে নরম গলায় বলল, 'তুমি ভাবছ, আমি আবার পাগল হয়ে গেছি? তাই আমাকে আবার মারবে?'

আশিষ কী বলবে? সে তাকিয়েই রইল। মিলি ভেঙে পড়া গলায় বলল, 'ইচ্ছে হলে মেরো। তাও একটু দরজাটা খুলে সকালকে নিয়ে এসো। আমাকে আগে মেরে তারপর যাবে? নাকি, আগে সকালকে দরজাটা খুলে দিয়ে তারপর এসে মারবে?'

মিলি থামলেও আশিষ কোনো কথা বলল না। মিলিই আবার বলল, 'কিন্তু শোন, সকালের সামনে বসে কিন্তু আমাকে মেরো না। ও কিন্তু তাহলে অনেক কষ্ট পাবে। আমি তো ওর মা, তাই না? মাকে মারলে সব বাচ্চারই খারাপ লাগে। লাগে না?'

Boighar.com & ARS

আশিষ চুপচাপ উঠে মিলিকে নিয়ে ড্রইংরুমে গেল। বাতি জ্বালিয়ে দরজা খুলল। বাইরে ধবধবে জোছনা। আজ পূর্ণিমা নাকি! কে জানে। আজকাল পূর্ণিমার খবর তারা কেউ রাখে না। সেইরাতে আশিষ মিলির কোমর জড়িয়ে ধরে সারারাত ঘুরে বেড়াল মাঠে। সারারাত। মিলি আশিষের কাঁধে মাথা রেখে হাঁটল। কেমন নীলচে আলোর সেই ঘোর লাগা রাত্রিতে একজোড়া মানব-মানবী তাদের দুঃখদের, অপ্রাপ্তিদের, দূরত্বদের কিছুটা সময়ের জন্য ভুলে রইল। ভুলে রইল কঠিন হিসাব-নিকাশের জগৎ-সংসারের কথা। তারা ডুবে রইল অন্য কোনো জগতে। সেই জগতে দুঃখ নেই, কষ্ট নেই, অপ্রাপ্তি নেই। সেই জগৎ বিভা ও বিভ্রমের জগৎ।

রুবিনা ফোনটা পেল সকাল এগারটার দিকে। সে তখন কেবল রুপাইকে নিয়ে স্কুল থেকে ফিরেছে। রুপাইর পা থেকে মোজা খুলে দিচ্ছে, এই মুহূর্তে ফোনটা বাজল। সে ফোন ধরে বলল, 'হ্যালো।'

ওপার থেকে সেফ হোম ক্লিনিকের রিসিপশনিস্ট মেয়েটা বলল, 'হ্যালো, ম্যাডাম, আমি ঝুমা।'

রুবিনা একটু বিরক্ত হলো। মাঝেমাঝেই ক্লিনিক থেকে অসময়ে ফোন আসবে। এইসব ফোনে নানান বিরক্তিকর আবদার থাকে। নানান উটকো সমস্যা থাকে। দেখা গেল জরুরি কোনো কাজের অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়ে বসে আছে, কিন্তু ক্লিনিক থেকে ফোন দিয়ে এমন এক সমস্যার কথা জানাল যে সব কাজ বাদ দিয়ে তাকে ছুটে যেতে হয় ক্লিনিকে। অবশ্য অন্য ডাক্তাররা কিছু না শুনেই মুখের ওপর না বলে দেয়। বা বাসায় থাকার সময়টায় ফোনের রিসিভার উঠিয়ে রাখে। কিন্তু রুবিনা পারে না। সে বকাঝকা করেও শেষ অবধি যায়। রুবিনা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'হ্যাঁ ঝুমা বল।'

ঝুমা বলল, 'আপনার কাছে একজন লোক আসছে।'

রুবিনা আরও বিরক্ত গলায় বলল, 'আমার কাছে তো রোজই কত লোক আসে। একজনটা আবার কে?'

ঝুমা বলল, 'আপনার পরিচিত। গ্রাম থেকে আসছে।'

রুবিনা হঠাৎ থমকে গেল। গ্রাম থেকে! তার মানে যযাতিপুর থেকে! যযাতিপুরের কথা সে প্রায় ভুলতেই বসেছিল। আসলে সে চায়নি যযাতিপুরের কথা আর মনে রাখতে। অনেক কষ্টে সে তার স্বামী আফজাল তালুকদারকে নিবৃত্ত করতে পেরেছিল। আফজাল সেই ঘটনার একটা এসপার-ওসপার না করে থামতে চায়নি। কিন্তু রুবিনা তাকে নানাভাবে বুঝিয়েছিল যে আতাহার তালুকদার নেই। এই অবস্থায় আফজাল চাইলেও আর গাঁয়ে গিয়ে থাকতে পারবে না। পরিস্থিতি আসলেই খারাপ। আর গাঁয়ে গিয়ে তারা করবেইবাটা কী!

আফজাল যে পুরোপুরি বিষয়টা বুঝেছে তাও না। কিন্তু আপাতত হলেও চুপ করে গেছে। কিন্তু বাবার মতোন বংশ মর্যাদা, প্রভাব-প্রতিপত্তি সংক্রান্ত আসক্তি তার নাই। রুবিনা তাই চেষ্টা করেছে যতটা সম্ভব যযাতিপুরের ভাবনা তার মাথা থেকে দূরে রাখতে এবং অনেকটা পেরেছেও। সেই ঘটনার পর যযাতিপুরের সঙ্গে তাদের আর কোনো সম্পর্ক ছিল না। যোগাযোগ ছিল না। কিন্তু আজ কে এলো গ্রাম থেকে? তার ঠিকানা তো কারও জানার কথা না!

রুবিনা খুব সতর্ক গলায় বলল, 'এত কথা না বলে, নামটা বল, কে এসেছে?'

ঝুমা নাম জিজ্ঞেস করে বলল, 'ভদ্রলোকের নাম আকরাম হোসেন।'

রুবিনা হুট করে আকরাম হোসেন নামে কারও কথা মনে করতে পারল না। সে খানিক ভেবে বলল, 'দেখতে কেমন?'

ঝুমা বলল, 'দাড়িওয়ালা এক হুজুর। লম্বা। পরনে সাদা পাজামা, পাঞ্জাবি আর টুপি।'

রুবিনা তারপরও চিনতে পারল না। সে বলল, 'আর কিছু?'

এবার ঝুমা খানিকটা বিরক্ত হলো। সে বলল, 'উনার সঙ্গে ছোট একটা মেয়ে আছে। তবে মেয়েটা সম্ভবত উনার নিজের মেয়ে না। সেই সকাল থেকে বসে আছে, কিন্তু মেয়েটা একবারও তাকে বাবা বা চাচা কিছুই ডাকেনি। তবে...'

রুবিনা বলল, 'তবে কী?'

ঝুমা বলল, 'না ম্যাডাম কিছু না। এমনি অপ্রাসঙ্গিক একটা কথা।'

রুবিনা বলল, 'অপ্রাসঙ্গিক কথাটাই কী? বল, শুনি।'

ঝুমা বলল, 'মেয়েটার চোখগুলো যে কী অদ্ভুত সুন্দর ম্যাডাম! মনে হয় সারাক্ষণ তাকিয়ে থাকি।'

রুবিনার দুশ্চিন্তা হচ্ছিল, খানিকটা বিরক্তিও। কিন্তু ঝুমার এই কথা শুনে সে মনে মনে হাসল। এই মেয়েটা মাঝে মাঝে এমন খাপছাড়া আচরণ করে। অদ্ভুত অদ্ভুত সব কথা বলে! রুবিনা বলল, 'আচ্ছা, মেয়েটাকে তার নাম জিজ্ঞেস কর। তারপর আমাকে জানাও।'

রুবিনা ফোনের রিসিভার ধরে দাঁড়িয়ে রইল। ঝুমা খানিক বাদে জানাল, 'ম্যাডাম, আরশি। মেয়েটার নাম আরশি!'

রুবিনা হঠাৎ চমকে উঠল। ভীষণভাবে চমকে উঠল! আরশি ঢাকায়! তার চেম্বারে! সঙ্গে এক হুজুর! নিশ্চয়ই ইমাম সাহেব। সে নিজেকে খানিকটা তিরস্কার করল, ইমাম সাহেবের নামটা তার জানা উচিত ছিল। কিংবা হয়তো জানত, কিন্তু ভুলে গিয়েছিল। তবে উনাকে যযাতিপুরের সবাই এক ডাকে ইমাম সাহেব বলেই চেনে। ইমাম সাহেবের আড়ালে তার আসল নাম আকরাম

হোসেন হারিয়েই গিয়েছিল। রুবিনা বলল, 'উনাদের নাশতা-টাশতা কিছু এনে এখনি খেতে দাও। খবরদার কোথাও যেতে দেবে না। আমি আসছি।'

রুবিনা যখন চেম্বারে পৌঁছাল। তখন খাওয়া-দাওয়া শেষ করে বসেছিলেন ইমাম সাহেব আর আরশি। রুবিনাকে দেখে আরশির তেমন কোনো ভাবান্তর হলো না। সে যেমন বসে ছিল, তেমন বসেই রইল। ইমাম সাহেব উঠে দাঁড়িয়ে সালাম দিলেন। রুবিনা বলল, 'কথা যা বলার পরে শুনব। আগে বাসায় চলুন।'

গাড়ির জানালা দিয়ে আরশি বড় বড় চোখে তাকিয়ে রইল। এ কোথায় এসেছে সে! যা দেখে, তাতেই তার বড় চোখগুলো আরও বড় হয়। বিমুগ্ধ হয়। বিভ্রান্ত হয়। সে যেন সত্য আর স্বপ্নকে আলাদা করতে পারে না। একই অবস্থা হয় রুবিনার বাড়ি পৌঁছেও। সবকিছুই যেন নতুন এক জগৎ। সেই জগৎ আরশির কল্পনায়ও ছিল বহু বহুদূর। কিংবা ছিলই না। তবে সবচেয়ে মজার ব্যাপার ঘটে যখন রুপাইর সঙ্গে দেখা হয় আরশির। মাঝখানে অনেকগুলো বছর কেটে গেছে। এই বয়সটা মেয়ে শিশুদের কিশোরী হয়ে ওঠার বয়স। শরীর এবং মনের নানান জড়তায় আগলে থাকার বয়স। যদিও রুপাই বয়সে আরশির চেয়ে বছরখানেকের ছোট, তারপরও সে যেখানে তরতর করে বেড়ে উঠেছে লাউডগার মতোন, আরশি যেন সেখানে থেমে আছে সেই শিশু বয়সেই। রুপাইকে দেখলে মনে হয় সে যেন আরশির চেয়ে কয়েক বছরের বড়। রুবিনা সেই বছর কয়েক আগের ঘটনা মনে করিয়ে দিল আরশি আর রুপাইকে। নতুন করে পরিচয়ও করিয়ে দিল। কিন্তু ওইসব কারণেই দু'জন প্রায় সমবয়সী শিশুর তাই হুট করে আর কাছাকাছি আসা হয় না। যেন কোথাও কোনো বাধা রয়ে যায়। কোনো সঙ্কোচ রয়ে যায়। রয়ে যায় অদৃশ্য কোনো দেয়াল।

সারারাত লঞ্চে জেগে থেকে ঢাকায় আসার অভিজ্ঞতা আরশির এই প্রথম। সে রাজ্যের ক্লান্তি নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। রুবিনার সঙ্গে দীর্ঘ আলাপ হয় ইমাম আকরাম হোসেনের। পুরো ঘটনা শুনে ভয়ঙ্কর আতঙ্কে শিউরে ওঠে রুবিনার শরীর। অপরাধবোধও হয়। মজিবর মিয়া কিংবা আরশির এই ভয়াবহ পরিণতির পেছনে সে কিংবা তার পরিবার সরাসরি যুক্ত। কিন্তু কী করতে পারবে সে! ইমাম আকরাম হোসেন দু'দিন থেকে চলে যান। চলে যাওয়ার আগে হঠাৎ রুবিনা তাকে জিজ্ঞেস করে, 'ইমাম সাহেব, আপনি সেদিন আরশির সেই ভয়ঙ্কর অসুস্থতার রাতে আমাকে মা জননী বলে কেন ডেকেছিলেন?'

ইমাম আকরাম হোসেন সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন না। খানিক চুপ করে থেকে বললেন, 'দুনিয়াতে কত ধরনের আজব আজব ঘটনা যে ঘটে। এইসব ঘটনার ব্যাখ্যা জ্ঞানী মানুষেরা দিতে পারব। আমি জ্ঞানী মানুষ না। তাই দিতে পারব না। তবে সেই দিন এমন একটা আজব ঘটনা ঘটছিল।'

রুবিনা আগ্রহ ভরা গলায় বলল, 'কী ঘটনা?'

ইমাম সাহেব বললেন, 'আমার মা'র নাম ছিল রুবিনা বানু। তারে সবাই রুবি বইলা ডাকত। এইরকম হইতেই পারে। জগতে একই নামের অনেক মানুষ আছে। আমার মা যখন মারা যায়, তখন আমি অনেক ছোট। তবে মায় যে আমারে কী আদর করত সেইটা আমার মনে আছে। মা মারা যাওনের পর, আমার একটা অসুখ হইল। রাইত-বিরাইতে যেইখানে-সেইখানে মায়রে দাঁড়াই থাকতে দেখতাম। মনে হইতো মায় ঘরের কোণে দাঁড়াই আছে। আমি গিয়া তার শরীলে হেলান দিয়া দাঁড়াই থাকতাম। সবাই আমারে বলত, কী বিষয়, এইরকম ব্যাঁকা হইয়া দাঁড়াইয়া রইছস কেন? আমি জবাব দিতাম না। আমি দাঁড়াইয়াই থাকতাম। তখন মায়ের আঁচলের ঘ্রাণ পাইতাম নাকে। আমি সারারাইত জাইগা থাকতাম, ঘুম আসত না। কখন মায় আসব, আমি তার শরীলের সঙ্গে হেলান দিয়া বসব বা দাঁড়াই থাকব। একদিন আমি একটা আজব ঘটনা আবিষ্কার করলাম। সেইটা হইল, আমি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ঘুমাইতে পারি! খুবই আচানক ব্যাপার। দুনিয়াতে একমাত্র প্রাণী ঘোড়া, যে দাঁড়াই দাঁড়াই ঘুমায়। আমি গভীর রাতে দেখি মায় উঠানে আইসা দাঁড়াইছে, আমি রাতে দরজা খুইলা উঠানে গিয়া দাঁড়াইলাম। তারপর মায়ের শরীলে হেলান দিয়া দাঁড়াইলাম, মায় আমার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে থাকল। আমি ঘুমাই গেলাম। সকালবেলা দেখি বাড়িভর্তি হাজার হাজার মানুষ। কী ঘটনা! ঘটনা হইল, আমার বাপজান সকালে নামাজ পড়তে উইঠা দেখে আমি উঠানের মাঝখানে ব্যাকা হইয়া দাঁড়াই আছি। বাপজান আমারে অনেক ডাকাডাকি করল, আমার সাড়া-শব্দ নাই। তারপর সে যখন আমারে ধাক্কা দিছে, আমি তখন মাটিতে পইড়া গেলাম। তখনও আমার ঘুম ভাঙে নাই। তখন ফকির-কবিরাজ আনা হইল। তাদের ধারণা আমারে জিন-পরীতে ধরছে। তারা নানান ফন্দিফিকির করল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না।'

ইমাম সাহেব একটু থামলেন। রুবিনা প্রবল আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছে। সে বলল, 'তারপর?'

ইমাম সাহেব বললেন, 'মজার বিষয় হচ্ছে আমি ইচ্ছা কইরা অনেকবারই চেষ্টা কইরা দেখছি, ওইভাবে দাঁড়াই বা কিছুতে হেলান না দিয়া বইসা ঘুমাইতে পারি কিনা! কিন্তু পারি নাই। অনেক চেষ্টা করছি। পারি নাই। শুধু যখন মারে দেখতাম, তখন পারতাম। পারতাম মানে কী! আমি তো তখন বিশ্বাসই করতাম, মায় আমারে দুই হাত দিয়া ধইরা রাখছে, আমি নিশ্চিন্ত। নিশ্চিন্তে আমার ঘুম আইসা যাইত! আসলে মায় এত আদর করত আর বাপজান তার কিছুদিন পরেই আবার বিয়া করছিল। সেই সৎ মায় খুব অত্যাচার করত। আর সেইজন্যই মনে হয় খালি মায়ের কথা মনে পড়ত। মায়ের কাছে যাইতে মন চাইত। সেই থেইকা একটা অভ্যাস হইয়া গেছিল। যখনই কোনো বিপদে পড়তাম, মন খারাপ থাকত, দেখতাম কী মায় দাঁড়াই আছে! সঙ্গে সঙ্গে মনে

Boighar.com & ARS

হইত আর কোনো ডর নাই। আর কোনো চিন্তা নাই। কোনো বিপদ-আপদেই কোনো কিছু হইব না। মায় আছে!'

ইমাম সাহেবের গলা ধরে এলো। তিনি পাঞ্জাবির খুঁটে চোখ মুছলেন। তারপর বললেন, 'যত বড় হইছি, মায়রে দেখা তত কইমা গেল। তারপর একটা সময় আর দেখলামই না। কত যে মায়রে মনে মনে ডাকছি! রাইতের পর রাইত না ঘুমাইয়া কাটাইছি। আল্লাহর কাছে মোনাজাত ধইরা কানছি। কিন্তু আর দেখি নাই। সেইদিন রাইতে, যখন আরশির ওই অবস্থা, আমি কী করব! আমার তো করার কিছু নাই। আপনে আসলেন। যখন সেই ইনজেকশনের কথা বললেন, আমি ভয় পাইয়া গেলাম। অত রাইতে ওই অঞ্চলে, ওই ইনজেকশন আমি কই পামু! তখনই ঘটনাটা ঘটল, আপনার দিকে তাকানোর সঙ্গে সঙ্গে আমার শরীল কাটা দিয়া উঠল। আমি দেখলাম কি আপনে না, আমার মায় দাঁড়াইয়া আছে। কিন্তু আমার এইটুক চেতনা তখনও আছে, যে ওইটা আপনে। ওইটা আমার মা না। কিন্তু আমার তখন বিশ্বাস হইয়া গেল যে যেমনেই হউক, আমি এই ইনজেকশন জোগাড় কইরা আনতেই পারব। সেইরাতে আমি কেমনে কেমনে, কী কারণে যে মালোপাড়া গেছি, আমি জানি না। আমার এতটুক ভয়-ডর করে নাই। তখন শুকরঞ্জন ডাক্তারও নাই গাঁয়ে। নতুন এক লোক আসছে। তার বাড়ি গেলাম। সেই রাইতে তারে ঘুম থেইকা ডাইকা উঠাইলাম। সে বড় বড় চোখ কইরা তাকাই রইল। এবং তার কাছে ওই একটা ইনজেকশনই ছিল। আমার কাছে পয়সাপাতি কিছু ছিল না। কিন্তু সে আমারে ইনজেকশনটা দিল। আমি আইসা যখন আপনারে তখনও মজিবর মিয়ার বাড়িতে দেখলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমার আবার মনে হইল, আপনে না, আমার মায় এতক্ষণ আপনার মতোন কইরা এইখানে দাঁড়াইয়া ছিল। আমার তখন মুহূর্তের জন্য মনে হইল, হয় আপনেই আমার মা, না হইলে আমার মা-ই আপনে। মুখ থেইকা আপনা আপনি বাইর হইয়া গেল শব্দটা!'

রুবিনা অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। বিষয়টা এমন না যে সে ইমাম সাহেবের এই ঘটনাটাকে অতিপ্রাকৃত কোনো ঘটনা ভাবছে। এই ঘটনার পরিষ্কার ব্যাখ্যা তার কাছে আছে। ইমাম সাহেব ছোটবেলায় মা হারিয়ে পরবর্তী সময়ে নানান কষ্টকর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গিয়েছেন, ফলে কোনো বাজে সময় এলেই তিনি মনে মনে তার মার কথা ভাবতেন। মার কাছে যেতে চাইতেন। এই চাওয়া এত তীব্র ছিল যে, একটা সময় তিনি বিশ্বাস করা শুরু করলেন যে তার মা সত্যি সত্যিই আসে। ছোট সময় ভাবনাগুলো অনেক বেশি কল্পনাপ্রবণ থাকার ফলে বিষয়টা তখন বেশি ঘটত। অনুভূতির তীব্রতাটাও বেশি ছিল। কিন্তু বড় হতে হতে সেটা কমেছে। একটা সময় নিজের রোজগার, স্ত্রী, সন্তান, কাজ নিয়ে এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন যে, সেই ভানাটা আর কাছে ঘেঁষতে পারেনি। ফলে পুরোপুরিই বিষয়টি থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন। ব্যাপারটা সে রাতে

আবার ফিরে আসার কারণ আরশি। এই মেয়েটার প্রতি কোনো এক অজ্ঞাত কারণে অসম্ভব মমতা অনুভর করেন ইমাম সাহেব! সেই রাতে তিনি কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছিলেন না যে আরশি মারা যাচ্ছে। তাই তার অবচেতন মন তার সবচেয়ে বড় সম্বল সেই ছোটবেলার অদৃশ্য মাকে ফিরিয়ে এনেছিল। তাকে ভরসা এবং সাহস দিয়েছিল। রুবিনা স্তব্ধ হয়ে আছে ইমাম সাহেবের বলার ভঙ্গি দেখে। সে ব্যাখ্যাগুলো জানা সত্ত্বেও তার মনে হচ্ছিল ইমাম সাহেব তাকে অন্য কোনো জগতের গল্প বলছেন। যেই জগতের সবটা জুড়ে আছে অনাবিষ্কৃত অপার রহস্য। যেই রহস্যের কোনো ব্যাখ্যা নেই। কিন্তু সে জানে, এই রহস্যেরও ব্যাখ্যা আছে। একটা মাত্র ব্যাখ্যা। সেই ব্যাখ্যার নাম ভালোবাসা।

ইমাম সাহেব যাওয়ার আগে আরশিকে কিছুক্ষণ বুকের সঙ্গে চেপে ধরে রইলেন। এরচেয়ে বেশি কিছু না। আরশি কিছুই বলল না।

রুবিনা ইমাম সাহেবের জন্যও একটা ব্যবস্থা করে দিল। রুবিনার বাবার বাড়ি কুষ্টিয়ার মেহেরপুরে। সেখানে তার বাবার নিজের একটা উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলও আছে। সে সেই স্কুলের আরবি শিক্ষক হিসেবে ইমাম আকরাম হোসেনের ব্যবস্থা করে দিল। সেখানে শুধু যে ইমাম আকরাম হোসেনের চাকরির ব্যবস্থা হলো তা না। স্ত্রী-পুত্র নিয়ে থাকার ব্যবস্থাও হয়ে গেল। ইমাম সাহেব তার স্ত্রী-পুত্র নিয়ে চলে গেলেন কুষ্টিয়ার মেহেরপুর।

তারপর কেটে যাচ্ছিল আরশির নিস্তরঙ্গ জীবন। রুপাইর সঙ্গে তার খানিকটা ভাব হয়েছে। রুবিনা কী একটা কাজ নিয়ে ভয়াবহ ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আফজাল তার ব্যবসার কাজে দীর্ঘদিন ধরেই চট্টগ্রামে। মাঝে মাঝে খুব অল্প সময়ের জন্য ঢাকা আসে। এখানে আরশির কোনো কাজ নেই। কাজের লোক আছে। তারা রান্নাবান্না করে। ঘরদোর গোছায়। রুবিনার ব্যস্ততার কারণে বাড়ির বয়স্ক দারোয়ান নুরু মিয়া রুপাইকে স্কুলে আনা-নেওয়া করে। এ বাড়িতে আরশির করার আর কিছু নেই। তবে ঘরের মধ্যে থেকে থেকেও তার নানান কৌতূহল মেটে। টেলিফোনের কৌতূহল, টেলিভিশনের কৌতূহল, বাথরুমের কৌতূহল। নানান কৌতূহল। তার কাছে সবই অদ্ভুত মনে হয়। এ এক অদ্ভুত জগৎ।

সেদিন রাতে বাসায় আসতেই রুবিনা খানিক চমকে গেল। এই মাসখানেকেই আরশি যেন অন্যরকম হয়ে উঠেছে। বয়সের তুলনায় অনেক ছোট দেখতে মেয়েটা যেন বেড়ে উঠেছে। সারাদিন ঘরে বসে থাকার কারণেই কিনা, গায়ের রঙ খুলেছে। এমনিতে আরশি ফর্সা না। শ্যামলা। তবে এখন খানিকটা বেশি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে গায়ের রঙ। আরশিকে কতগুলো ফ্রক বানিয়ে দেওয়া হয়েছে, সে গোলাপি রঙের ফ্রকটা পরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছে বাইরে। রুবিনা ঘরে ঢুকতেই ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। কী যে সুন্দর

Boighar.com & ARS

লাগছে দেখতে! এই মেয়েটার ভেতর এমন অদ্ভুত সৌন্দর্য লুকিয়ে ছিল, সে আগে কেন খেয়াল করেনি! কিন্তু মেয়েটা ভীষণ চুপচাপ। তার হঠাৎ মনে হলো, আরশিকে নিয়ে কিছু একটা ভাবা উচিত। মেয়েটাকে এভাবে ঘরে বন্দি করে রাখার কোনো অর্থ নেই। স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু আরশি কতদূর কী পড়েছে, সেটা সে জানে না। কোন ক্লাসে ভর্তি করানো যেতে পারে। কোন স্কুলে। স্কুল থেকে আনা-নেওয়া করবে কে? এসব নানান কিছু। পরদিন শুক্রবার। খানিকটা অবসর থাকায় রুপাই আর আরশিকে নিয়ে বাইরে ঘুরতে বের হলো রুবিনা। বিকেলের দিকে ওদের নিয়েই গেল চেম্বারে। সন্ধ্যার পরপর তার রুমে ফোন এলো। আশিষ আর মিলি এসেছে। অনেক দিন থেকেই আশিষের কোনো খবর নেই। বহুদিন পর এসেছে।

মিলিকে দেখে রুবিনা একটু দমে গেল। কী মিষ্টি চেহারা মেয়েটার! কিন্তু কেমন যেন পোকায় কাটা ফুলের মতো শুকিয়ে চুপসে যাচ্ছে। চোখের নিচে কালি পড়ে যাচ্ছে। শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছে। দেখে এত মায়া লাগল রুবিনার! তবে মিলি কোনো কথা বলল না। চুপচাপ বসে রইল। আশিষ বলল, 'ওর আজকাল একদম ঘুম হচ্ছে না। সারারাত জেগে থাকছে। আর যদি পাঁচ-দশ মিনিটের জন্য একটু ঘুমায়ও, দুঃস্বপ্ন দেখে সঙ্গে সঙ্গে জেগে ওঠে।'

রুবিনা মনোযোগ দিয়ে সব শুনল। কিছু কড়া ঘুমের ওষুধ দিল। এটা-সেটা অনেক কিছু নিয়ে কথা বলতে গিয়ে হঠাৎ খেয়াল করল মিলি নেই। সে রুবিনার রুমের সঙ্গের বারান্দার দরজায় দাঁড়িয়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে কিছু একটা দেখছে। রুবিনা চুপিচুপি উঠে গিয়ে দেখল আরশি আর রুপাই বারান্দায় কিছু একটা করছে। মিলি এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তাদের দিকে। আশিষ কয়েকবার ডাকতেও মিলি যেন কোথায় হারিয়েই রইল। তারপর যখন খেয়াল করল, খুব স্বাভাবিক গলায় বলল, 'দেখেছ? মেয়েটা দেখতে আমার সকালের মতো না?'

আশিষ জবাব দিল না। মিলিই আবার বলল, 'আচ্ছা ওর চোখ অত সুন্দর কেন? আমার সকালের চোখও কি অমন সুন্দর ছিল?'

মুহূর্তের জন্য থেমে সে নিজে নিজেই আবার জবাব দিল, 'নিশ্চয়ই সুন্দর। কতদিন দেখি না। অনেক কিছুই ভুলে গেছি।'

রুবিনা কী যেন ভাবল। তারপর হঠাৎ আরশিকে ডাকল। বলল, 'তুমি কি একটু ওর সঙ্গে কথা বলবে?'

আরশি কিছুক্ষণ মিলির দিকে তাকিয়ে রইল। মিলি যেন রোজ খানিকটা করে শিশু হয়ে যাচ্ছিল। কথায়, আচরণে এমনকি চলাফেরায় অবধি। সে শিশুদের মতো করে বলল, 'আমার সঙ্গে কেউ কথা বলতে চায় না। তুমি বলবে?'

আরশি মাথা নাড়িয়ে বলল, 'হ্যাঁ'।

ঘরের একপাশটায় সাদা পর্দা ঘেরা যে বেডটা রয়েছে, সেখানে দীর্ঘ সময় কথা হলো মিলি আর আরশির। যেন দু'জন একই বয়সের মানুষ। তবে এই কথাবার্তায় অস্বাভাবিকভাবে এতদিন যা আবিষ্কৃত হয়নি তাই আবিষ্কার হয়ে গেল। আরশির কথার উচ্চারণেই বোধ করি আশিষ জানতে চাইল আরশির পরিচয়। রুবিনা তাকে সংক্ষেপে মোটামুটি পুরো গল্পটাই বলল। আশিষ খুব একটা চমকে যায় না। কিন্তু আজ চমকে গেল। সে শুকরঞ্জন ডাক্তারের কাছে মজিবর মিয়ার কথা শুনেছে। কিন্তু সেই আরশি! সে প্রবল বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে রইল সাদা পর্দার ওপারে ছোট্ট অনাবৃত ওই অংশটুকুর দিকে। তার হঠাৎ মনে হলো, এই জগৎটা অদ্ভুত এক চিত্রনাট্যের জগৎ। এখানে কেউ একজন গল্পগুলোকে নিরন্তর নিরবচ্ছিন্নতায় লিখে চলেছে। মানুষ কখনও তা ধরতে পারে, কখনও পারে না।

এরপরের ঘটনাগুলো যেন অনিবার্য ছিল। রুবিনা, আশিষ আর মিলি তার পরের কয়েকদিনেই টের পেয়ে গেল মিলির জন্য সবচেয়ে বড় ওষুধ হয়ে উঠতে পারে আরশি। আরশিরও এই সময়টায় খানিকটা আলাদা করে যত্ন দরকার। সুতরাং সবচেয়ে ভালো হয় আশিষ আর মিলির নির্জীব নিস্পন্দ সংসারে আরশি উঠে এলে। একটা ঢেউ যদি তাতে ওঠে। যদি খানিকটা হলেও সেই ঢেউয়ে ডুবে থাকতে পারে মিলি। খানিকটা হলেও প্রবল তীক্ষ্ণ স্মৃতির ক্ষতরা শুকায়। এরপরের সময়গুলোতে যা ঘটল তা মিলির ফিনিক্স পাখির মতোন ধ্বংসস্তূপ থেকে জেগে ওঠার গল্প। আরশির জীবনের গল্পগুলোও লেখা হতে লাগল একের পর এক বিচিত্রতায়। যেন এই জীবনের সব অভিজ্ঞতা নানান পসরার ডালা খুলে সাজিয়ে বসেছে তার জন্য। সেখানে আরশি যেন হয়ে উঠল অন্য এক আরশি। কিন্তু এই নতুন অন্য আরশির বুকের ভেতরও কোথায় যেন ঠিক ঠিক ঘাপটি মেরে জেগে রইল সেই ছোট্ট আরশি, সেই পুরনো আরশি।

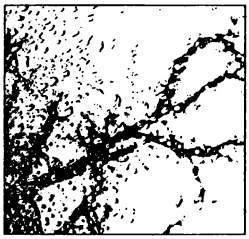

মজিবর মিয়া অনেকটাই সুস্থ হয়ে উঠেছে। সে আজকাল কখনও কখনও প্রয়োজনে কথাবার্তাও বলে। কিন্তু মুখ বেঁকে যাওয়ায় উচ্চারণ এবং শব্দগুলো হয় বীভৎস। ফলে পারতপক্ষে কথা বলতে চায় না। বললেও খুব কম। লাঠিতে ভর দিয়ে হাঁটাচলাও করতে পারে। আরশির জন্য বুকের ভেতর একটা আস্ত পাহাড় বয়ে চলে যেন সে। খেতে বসলে সেই পাহাড়ে খাবার আটকে থাকে, ঘুমাতে গেলে ঘুম আটকে থাকে। ভাবতে গেলে ভাবনা আটকে থাকে। কাঁদতে গেলে কান্নাও আটকে থাকে। কিন্তু এমন অথর্ব একজন মানুষ কিইবা করতে পারে! তারপরও সে যে চেষ্টা করেনি, তা না। সে চেষ্টা করেছিল আরশির খোঁজ নেওয়ার। কিন্তু আরশির উধাও হয়ে যাওয়ার বছরখানেক বাদে সবকিছু যখন শান্ত হলো, যখন মজিবর মিয়াও নিজেকে কিছুটা গুছিয়ে নিল, তখন একদিন সে হারাধনকে দিয়ে ইমাম সাহেবের বাড়িঘরের খোঁজ লাগাল। কিন্তু সবাই ইমাম সাহেবের জেলা আর থানার নামটাই শুধু জানত, তার গ্রাম, বা বিস্তারিত ঠিকানা কারও কাছেই ছিল না। তারপরও বহুকষ্টে হারাধন যখন তার বাড়িঘরের খোঁজ বের করল, তখন জানা গেল ইমাম সাহেব চাকরি নিয়ে সপরিবারে চলে গেছেন কুষ্টিয়াতে। কিন্তু সেই ঠিকানা কেউ দিতে পারল না। মজিবর মিয়া যদিও জানত, যযাতিপুর ফিরে আসার চেয়ে আরশি ইমাম সাহেবের কাছে যেখানেই আছে, সেটা ঢের ভালো। কারণ যযাতিপুর আর আরশির জন্য মোটেই নিরাপদ না। আর তার সেই ক্ষমতাও নেই যে সে বিশাল বটবৃক্ষ হয়ে আরশিকে ছায়া দিয়ে আগলে রাখবে। কিন্তু এতকিছুও মজিবর মিয়ার বুকের ভেতর পুড়তে থাকা জিনিসটাকে এতটুকুও নেভাতে পারল না। এতটুকুও না। এতকিছু ভেবেও বুকের ভেতর আটকে থাকা অবর্ণনীয় কষ্টের পাহাড়টাকে সে সরাতে পারে না। এ যে কী কষ্ট! একটা আস্ত কষ্টের পাহাড় বয়ে বেড়ানোর কষ্ট।

লাইলির আচরণ বেশ কিছুদিন পুরোপুরি বদলে গিয়েছিল। অত বড় একটা ঘটনার পরও মজিবর মিয়ার অমন নির্বিকার আচরণে সে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। তাছাড়া ঘটনাটা চারপাশের লোকজনও জেনে গিয়েছিল। ফলে পরিবর্তিত

পরিস্থিতির সঙ্গে সে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে চেয়েছিল। সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। কিন্তু সেই সুযোগ সঙ্গে সঙ্গেই এলো না। আবদুল মমিন তার দলবল নিয়ে এরপরও বারকয়েক যযাতিপুরে এসেছিল। তবে সেটা কয়েক ঘণ্টার জন্য। কয়েক ঘণ্টা থেকে চলে গিয়েছিল। কাউকে কিছু বলেনি। কিন্তু লাইলি সবসময়ই জানত, লোকমান গ্রুপের প্রধান লোকমান হলেও সেই দল আসলে চালাত ধুরন্ধর আবদুল মমিন। সেই সবচেয়ে বেশি ভয়ঙ্কর। তার পরিকল্পনা আর বুদ্ধিতেই দলটা টিকে ছিল। লোকমান ছিল অল্প বুদ্ধির মাথা গরম মানুষ। যখন যা মনে আসত তাই করত। কিন্তু আবদুল মমিন ঠাণ্ডা মাথার মানুষ। সে বিচার-বিবেচনা না করে কিছু করে না। ফলে লোকমান মারা যাওয়ার পর যারা ভেবেছিল এবার গালকাটা বশির আর আবদুল মমিনের মধ্যে প্রকাশ্যে যুদ্ধ শুরু হবে, তারা তার কিছুই দেখতে পেল না। বরং তারা অবাক হয়ে দেখল আবদুল মমিন আর তার দলবল লাপাত্তা। তাদের আর কোনো সাড়া-শব্দ নাই। তবে লাইলি জানত, আবদুল মমিন গালকাটা বশিরকে ছাড়বে না। শুধু তা-ই না, গাঁয়ের সবাই ধরে নিয়েছিল, এর পেছনে মজিবর মিয়ারও হাত আছে। আবদুল মমিন মজিবর মিয়াকেও ছাড়বে না। তবে কোনো এক অজানা কারণে লোকমান মজিবর মিয়াকে কিছু বলেনি। কিন্তু লাইলি সময়ের অপেক্ষায় আছে, সে টের পায়, মজিবর মিয়া লোকটার প্রতি তার নিজের ভেতরে কী তীব্র জিঘাংসা। সেটা এখন আর শুধু সেই জমি বা আড়তের মালিকানাতেই আটকে নেই। সেটা এখন মজিবর মিয়ার মতোন ল্যাংড়া, অথর্ব এক মানুষের কাছে তার চূড়ান্ত অপদস্থ, পরাজিত হওয়া পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। তার জীবনে এই অথর্ব, পঙ্গু মজিবর মিয়ার আর কানাকড়ি মূল্যও নেই। এর চেয়ে যোগ্য, সুস্থ সাবলীল হাজার পুরুষ মানুষ বশ করা তার জন্য হাতের তুড়ি বাজানোর মতো সহজ। কিন্তু সে অপেক্ষায় আছে। সঠিক সময়ের অপেক্ষায়। গত ক'টা বছর সে মজিবর মিয়ার মতোন একজন পঙ্গু, পাগল মানুষের চূড়ান্ত অপমান, উপেক্ষা আর অবহেলা মুখ বুজে সহ্য করেছে। এর শোধ সে নির্মমভাবেই নেবে।

ঘাপটি মেরে চুপচাপ আছে আরও একজন মানুষ। সে হলো লতু হাওলাদার। সে দীর্ঘদিন নতুন পরিকল্পনার অপেক্ষায় ছিল। পুরোপুরি না হলেও মোটামুটি একটা সিদ্ধান্তে সে এসেছে। সেটি হলো মজিবর মিয়ার যে শুধু তার সেই চার বিঘা সোনা ফলা জমি আর যযাতিপুর বাজারে আড়তটাই আছে তা না। সঙ্গে তার আগে কেনা আরও পাঁচবিঘা জমিও আছে। আর তার বাড়িটাও রাস্তার সঙ্গে, যযাতিপুর বাজারের কাছাকাছি। সবকিছু মিলিয়ে বিশাল লাভজনক ব্যাপার-স্যাপার। এই গাঁয়ে তার আর কেউ নাই। মেয়ে আরশির খোঁজখবর নাই। মা নাই, বাপ নাই। বউ লাইলি আসলেই কতটা তার সেটা লতু হাওলাদার ভালো করেই জানে। সবচেয়ে বড় কথা মজিবর মিয়া নিজেই তো নেই। সে যেভাবে আছে সেটাকে থাকা বলে না।

Boighar.com & ARS

শান্ত নিস্তরঙ্গ পুকুর হয়ে ওঠা যযাতিপুরে ঢেউ হয়ে এলো মোস্তফা। লতু হাওলাদারের ছেলে মোস্তফা। সে এসে একটা জিনিস খেয়াল করল, গাঁয়ে এতদিন আতাহার তালুকদার ছাড়া আর কারও তেমন কোনো প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল না। দুলাল মেম্বার, সোবহান কাজী, জালাল কাজীরা পর্যন্ত চুপচাপ ছিল। কথা যা বলার বলত এক তার বাবা লতু হাওলাদার। আসলে কাজীরা বা দুলাল মেম্বারদের চুপচাপ থাকার কারণ ছিল আতাহার তালুকদারের ভয়। তারা আতাহার তালুকদারের বুদ্ধি আর ক্ষমতাকে ভয় পেত। সেই ভয় উপড়ানোর সাহস দেখিয়েছে তার বাবা লতু হাওলাদার। সুতরাং এই গাঁয়ে এখন যদি কারও প্রভাব চলে তবে সেটা তারই হওয়া উচিত। কিন্তু মোস্তফা আবিষ্কার করল এই ক'বছরে উল্টা হাওয়াও বইতে শুরু করেছে। সোবহান, জালাল কাজী, দুলাল মেম্বাররা সরাসরি কিছু না বললেও আড়ালে-আবডালে লতু হাওলাদারকে ফোড়ন কাটার চেষ্টা করে। সে বাড়ি আসার দিন পনেরোর মধ্যে আবিষ্কার করল, গাঁয়ে ক্ষমতার হিসাব-নিকাশ এবং কেন্দ্র এসব পাল্টেছে একটা অদ্ভুত হিসাবে। সেই হিসাব হলো যযাতিপুর বাজার। যযাতিপুর বাজারে ইলেক্ট্রিসিটি এসেছে। এর আশপাশের বাড়িতেও এসেছে। কিন্তু তাদের বাড়ি ইলেক্ট্রিসিটির পিলারের আওতার বাইরে। সুতরাং তারা এখনও পড়ে আছে কুপির আবছা আলোতেই। আরেকটা বিষয় হচ্ছে গাঁয়ের মোটামুটি অবস্থাপন্ন সবারই যেখানে যযাতিপুর বাজারে ছোট-বড় হলেও একটা না একটা দোকান বা প্লট আছে, সেখানে তাদের কিছুই নেই। এই না থাকার কারণ যযাতিপুর প্রতিষ্ঠাকালীন আতাহার তালুকদারের সঙ্গে তার বাবা লতু হাওলাদারের শীতল যুদ্ধ।

www.boighar.com

মোস্তফা এক বিকেলে মজিবর মিয়ার বাড়ি এলো। সে রাস্তা থেকেই ডাকা শুরু করল, 'মজিবর বাড়ি আছসনি? ও মজিবর!'

মজিবর মিয়া তখন বাড়ি ছিল না। লাইলি দৌড়ে ঘর থেকে বের হলো। মোস্তফা লাইলিকে দেখে থমকে গেল। সে বিদেশ যাওয়ার আগেও লাইলিকে দেখেছে, কিন্তু এই মুহূর্তে লাইলিকে দেখে তার বুকের ভেতরটা কেমন ধক করে উঠল। কমলা রঙের শাড়ি পরা ফর্সা লাইলিকে শেষ বিকেলের কনে দেখা আলোয় অপূর্ব সুন্দরী লাগছে। মোস্তফা মুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিল। বলল, 'কেমন আছেন ভাবী?'

লাইলি তার প্রশ্নের জবাবে যে উত্তরটা দিল, তা ছিল চটকদার। সে বলল, 'জুয়ান দেওরারা (দেবর) আশপাশে না থাকলে জুয়ান ভাবীরা ভালো থাকে?'

মোস্তফা লাইলির এই উত্তরে এক ধরনের উত্তেজক আনন্দ পেল। সে বলল, 'এইটা অবশ্য খাসা কথা বলছেন ভাবী। তা ভাবী আমি কিন্তু আপনার দেওর হই না। মজিবররে আমি তুই কইরা ডাকি।'

লাইলি বলল, 'জানি, জানি। এইসব খবর আমার জানা। আপনে যেইটা জানেন না সেইটাও জানা।'

মোস্তফা অবাক গলায় বলল, 'আমি জানি না আর আপনে জানেন! ঘটনা কী, বলেন তো ভাবী!'

লাইলি বলল, 'চমকানোর কিছু নাই। কোনো গোপন কথা জাইনা ফালাই নাই। আপনে যে আপনার মজিবর ভাইর থেইকা বয়সে ছোট, এইটা আমি জানি।'

মোস্তফা হাসল। বলল, 'ও এই কথা! গ্রামে সমবয়সী সবাই সবাইরে তুই-তোকারিই করে। বড়-ছোট আর তখন থাকে না।'

লাইলি ভ্রুকুটি করে বলল, 'তা না থাকুক। আমার কাছে থাকলেই হইব। সারা জীবন শুনছি দেবররা থাকলে ভাবীদের কত মজা হয়। দেবর মানে নাকি দ্বিতীয় বর। এতদিন তো দেবর-টেবর ছিল না। বড়ই আফসোস ছিল। এখন তো সেই দুঃখ গেল।'

মোস্তফার সঙ্গে লাইলির আরও নানান কথাবার্তা হলো। তবে সেসব কিছুই তেমন কাজের কথাবার্তা না। হালকা কথাবার্তা। কিন্তু এই কথাবার্তায় মোস্তফা সম্ভবত নিষিদ্ধ কোনো বার্তা পেল। দীর্ঘদিন নারী সান্নিধ্য বিবর্জিত ওই বয়সের একজন পুরুষের জন্য এমন কাঙ্ক্ষিত কিছু আর হতে পারে না। তাছাড়া লাইলির আচার-ব্যবহার চরিত্র সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা তো তার আছেই। লাইলির সঙ্গে আড়ালে-আবডালে একটা নিয়মিত যোগাযোগ গড়ে উঠল মোস্তফার। সেটি চূড়ান্ত কোনো পরিণতিতে না গড়ালেও যেন সুযোগ এবং সময়ের অভাবেই কেবল বিলম্বিত হচ্ছিল। কিংবা আগের ঘটনার যে ভয়াবহ পরিণতি হয়েছিল তা ভেবেই লাইলির ভেতরও হয়তো কাজ করছিল বাড়তি সতর্কতা।

খবরটা প্রথম পেল লতু হাওলাদার। লোকমানের মৃত্যুর দু'বছরেরও বেশি সময় পরের ঘটনা। খাসের হাট নামের এক জায়গায় নদী থেকে দুটো লাশ ভেসে উঠেছে। ধারণা করা হচ্ছে লাশ দুটো গালকাটা বশিরের দলের কারও। সবচেয়ে আতঙ্কের ব্যাপার, এদের মৃত্যু হয়েছে নির্মমভাবে। সম্ভবত প্রথমে হাত-পা কেটে তারপর এদের শরীরে ইট বেঁধে নদীতে ফেলে দেওয়া হয়েছিল জীবন্ত। মৃত্যুর কয়েকদিন পর লাশগুলো পচে ভেসে উঠেছে। লতু হাওলাদার ছুটলেন খাসের হাট। লাশ দেখে তার আর কোনো সন্দেহ রইল না এই কাজ আবদুল মমিনের। নবসম্ভাবনায় লতু হাওলাদারের চোখ চকচক করে উঠল। কারণ সে

Boighar.com & ARS

জানে, যতদিন বাবু যশোদা জীবন দে আছেন, এবং তার সঙ্গে আছে গালকাটা বশির ততদিন এই পঙ্গু, লুলা মজিবর মিয়াও সুরক্ষিত। সুতরাং সবার আগে আবদুল মমিনকে জানাতে হবে লোকমানের মৃত্যুর পেছনের আসল পরিকল্পনাকারীর কথা। বাবু যশোদা জীবন দে'র কথা। এই কথা সে ছাড়া আর কেউ জানে না। নাকি আবদুল মমিন জানে! লতু হাওলাদার নিশ্চিত না। তবে সে ছটফট করতে লাগল আবদুল মমিনের খোঁজ পাওয়ার জন্য। কিন্তু এর মাসখানেকের মধ্যে আবার খুন হলো। এবার খুন হল খোদ যযাতিপুরে। এবার খুন হলো সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত একজন মানুষ। মানুষটার নাম তালেব মাঝি। বৃদ্ধ তালেব মাঝি খুন হলো নিজের ট্রলারের ভেতর। তার সপ্তাহখানেকের মধ্যে খুন হলো আরও একজন অপ্রত্যাশিত মানুষ। এবং এবারও যযাতিপুরে। এবার খুন হলো হারাধন। লতু হাওলাদার হঠাৎ অথৈ জলে পড়ে গেল। সে ভেবে পেল না হারাধন আর তালেব মাঝির দোষটা কী? তারা কেন খুন হচ্ছে! কিন্তু সে এটা নিশ্চিত এই খুনগুলো করছে আবদুল মমিনের লোকেরা। এক রাতে মোস্তফা তাকে ফিসফিস করে বলল, 'আব্বা, তালেব মাঝি আর হারাধনও পার্টির লোক ছিল। তবে তারা ছিল লোকমানের অ্যান্টি। গালকাটা বশিরের দলের লোক।'

ধুরন্ধর লতু হাওলাদার এই কথা শুনে খুশি হলো না। তার খুশি না হওয়ার কারণ তার নিজের নির্বুদ্ধিতা হঠাৎ করেই নিজের চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠা। এই এতটা বছর একই গাঁয়ে থেকেও এই সাধারণ জিনিসটা সে এতদিনেও আবিষ্কার করতে পারে নাই! লতু হাওলাদারের ঘাড়ের কাছটা হঠাৎ শিরশির করে উঠল প্রবল আতঙ্কে। আবদুল মমিন যদি তালেব মাঝি আর হারাধনের এমন গোপন খবরও বের করে ফেলতে পারে। তাহলে সে নিজে যে লোকমান আর তার দলবলকে মারার জন্য যশোদা স্যারের কাছে গিয়েছিল, এই কথা কি আবদুল মমিনের অজানা! ভয়ে লতু হাওলাদারের হাত-পা কাঁপতে লাগল। তবে তার সূক্ষ্ম আশা, এই কথা আবদুল মমিনের জানার কথা না। কারণ এই কথা সে নিজে আর যশোদা স্যার ছাড়া এই জগতে আর কেউ জানে না। যশোদা স্যারের কাছ থেকে এই কথা আবদুল মমিনের কানে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। কারণ এরা যখন মুখোমুখি হবে, তখন দুইজনের মধ্যে একজন মাত্র বেঁচে থাকবে। যেকোনো একজন। সুতরাং দুশ্চিন্তার কিছু নেই। আরও আশার কথা, গত দুই বছর ধরে আবদুল মমিন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম খোঁজ-খবর নিয়েছে, কারা লোকমানের খুনের সঙ্গে জড়িত ছিল। প্রস্তুতি নিয়েছে, পরিকল্পনা করেছে। আবদুল মমিন নিশ্চয়ই জানে, এতে কোনোভাবেই লতু হাওলাদার জড়িত ছিল না। এবং এটা সত্য। কিন্তু ইমাম আকরাম হোসেনকে দিয়ে যে সে লোকমানকে খুন করার পরিকল্পনা করেছিল? মাসছয়েক পর মসজিদের পুকুরের পানি সেঁচে মাছ ধরতে গিয়ে সেই দা-খানাও খুঁজে পেয়েছিল

সে। তবে একটা বিষয়ে সে নিশ্চিত ইমাম আকরাম হোসেনের এই ঘটনা জগতে সে আর ইমাম সাহেব ছাড়া কাকপক্ষীও জানে না। সুতরাং সে নিশ্চিন্ত।

কিন্তু মজিবর মিয়ার তাহলে কী হবে!

আবদুল মমিন নিশ্চয়ই জানে, মজিবর মিয়া সেদিন যশোদা স্যারের সঙ্গেই ছিল। নিশ্চয়ই জানে! সেই রাতে লতু হাওলাদার ঘুমাতে পারল না। সে সারারাত কইয়ের তেলে কই ভাজা স্বপ্নে দেখল। সেই ভাজা কইমাছ খেতে খুব সুস্বাদু। দুই দল নিজেরা নিজেরা খেলে শেষ হয়ে যাবে। মাঠ পড়ে থাকবে ফাঁকা। সে যেমনটা চেয়েছিল। আর সেই ফাঁকা মাঠে গোল দেবে সে। লতু হাওলাদার সেই ফাঁকা মাঠে গোল দেওয়ার স্বপ্নে বিভোর হয়ে রইল।

Boighar.com & ARS

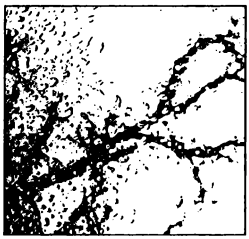

বছরখানেকের মধ্যেই আরশি যেন হুট করেই গা-ঝাড়া দিয়ে উঠল।

যে আরশিকে দেখলে মোটেই বার-তের বছরের কিশোরী মেয়ে মনে হতো না। সেই আরশি যেন এই বছরখানেকেই তরতর করে বেড়ে উঠল। আরশি আসার পরপরই আশিষ আর মিলির সংসার যেন আবার ঘর হয়ে উঠল। দীর্ঘদিন এই বাসায় রান্নাবান্না হতো না। আরশি আসায় আবার রান্নাবান্না শুরু হলো। রাতে ডাইনিং টেবিলে নিয়ম করে খাওয়া-দাওয়া শুরু হলো। একজন ছুটা কাজের বুয়াও পাওয়া গেল। সে সকালে নাশতা আর দুপুরের খাবার রান্না করে দিয়ে যায়। রাতে শুধু ভাতটুকু রেঁধে নেয় মিলি। এ বাসায় আরশির কাজ সারাদিন মিলির সঙ্গে সঙ্গে থাকা। মিলি তাকে ইচ্ছেমতো সাজায়। জামা পরায়। সঙ্গে নিয়ে হাঁটতে বের হয়। রাজ্যের গল্প করে। আরশির এতে যতটা না আনন্দ লাগে, তারচেয়ে বেশি লাগে মায়া! এই এত বড় মানুষটাকে তার নিজের চেয়েও ছোট মনে হয়। মিলি তার সঙ্গে যা করে, তাকে স্বাভাবিক স্নেহ, মমতা কিংবা ভালোবাসার নিক্তিতে মাপা সম্ভব না। এ তারচেয়েও বেশি কিছু। তীব্র কিছু। কখনও কখনও তা রীতিমতো অত্যাচার। আরশির মতোন একজন যে কিনা তার শৈশবের বেশিরভাগ অংশজুড়েই দেখেছে ভয়াবহ অনাদর, অবহেলা আর অত্যাচার, তার জন্য এই সম্পূর্ণ উল্টো এক জগৎ ভীষণ অস্বস্তি র। সে তাই অনেক কিছুই উপভোগ করতে পারে না। তবে হাসিমুখে মেনে নেয়। এই ক'দিনেই মিলির জন্য তার অদ্ভুত এক মায়া হতে থাকে। যে জটিল জগৎ দেখে বেড়ে উঠেছে আরশি তাতে মিলিকে তার কাছে মনে হয় সহজ-সরল এক শিশু!

মিলি আরশিকে স্কুলে দিল না। তার খুব ভয়। সবসময় কী এক আতঙ্ক, আরশির যদি কিছু হয়! পারতপক্ষে সে আরশিকে নিয়ে বের হয় না। হলেও নানান সাবধানতা। প্রথম বছরখানেক সে নিজে নিজেই পড়াল আরশিকে। মিলির কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল আরশির কথা। শব্দ চয়ন, বাচনভঙ্গি। সে আরশিকে বলল সে চায় না আরশি আগের মতো করে গ্রামের ভাষায় কথা বলুক। সে চায় আরশি সুন্দর শহুরে উচ্চারণে, সুন্দর বাচনভঙ্গিতে

কথা বলুক। তাকে মা বলে ডাকুক। এই নিয়ে রাত-দিন তার সে কী প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা। তবে অল্পদিনেই আরশি তার কথা গুছিয়ে উঠল। কিন্তু কেন যেন সে মিলিকে ঠিক মা বলে ডাকতে পারে না। নিজের ভেতর থেকেই যেন টের পায় না। তারপরও মিলির ভালো লাগে বলে এমন অনেক কিছুই সে করে। মাঝে মাঝে ডাকেও। তবে বেশিরভাগ সময় কিছু না বলেই কাটিয়ে দেয়। আর আশিষকে কী ডাকবে? মিলি একদিন বলল আরশি যেন আশিষকে বুবাই বলে ডাকে। কারণ সে তার বাবাকে বুবাই বলত। আরশি মিলির কোনো কিছুতেই আপত্তি করে না। ভালো না লাগলেও মেনে নিত। সে আশিষকেও পারতপক্ষে কিছু ডাকত না। তবে খুব প্রয়োজন হলে বুবাই বলেই ডাকত।

আজকাল আরশির উচ্চারণ, শব্দ, কথা শুনে মিলির এত অবাক লাগে। আরশি যখন শুদ্ধ উচ্চারণে কথা বলে, মিলি তখন মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে। আরশি নিজেও কি থাকে না! থাকে। তার নিজের জীবন, নিজের বদলে যাওয়া নিয়ে মাঝেমাঝেই তার এত অবাক লাগে। তার তখন আম্বরি বেগমের কথা মনে হয়। আম্বরি বেগম সেই যে, সেই রাতে তাকে বলেছিলেন মানুষের জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সময়। আর সময়ের ভালো-মন্দ বলতে কিছু নেই। আজ যা মন্দ মনে হয়, কালই মনে হতে পারে তা আসলে মন্দ ছিল না। কথাগুলোকে এত সত্য মনে হয় আরশির। তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকেই তার কী অসম্ভব জীবন্ত মনে হয়। মনে হয় এই প্রতিটি মুহূর্তেই কোথাও না কোথাও সে শিখেছে। সেখানে আসলেই ভালো-মন্দ বলতে কিছু নেই। সেখানে যা আছে তা হলো সময়। সময়ের আঁচড়, যা থেকে যায়। সময়ের সাপেক্ষেই থেকে যায়। তবে মিলি যখন তাকে পড়ায়, এই মুহূর্তগুলো আরশির আলাদা করেই চমৎকার কাটে। মিলির পড়ানোর ধরনটা মজার। সে যেন আরশির মতো করেই আরশির বুঝতে পারার এবং না বুঝতে পারার জায়গাগুলো বোঝে। আরশির অঙ্ক বুঝতে খুব সমস্যা হয়। সামান্য জিনিসও সে বুঝে উঠতে পারে না। কিন্তু মিলি যেন ঠিক বুঝে ফেলে কীভাবে বোঝাতে হবে। সে তখন মজার মজার সব উপায় আবিষ্কার করে। যেমন অঙ্ক বোঝাতে গিয়ে সে কিছুতেই আরশিকে বোঝাতে পারছিল না, ভগ্নাংশের হর আর লব কোনটা? নানাভাবে বোঝানোর পরও আরশি ঠিক ঠিক ভুলে যায় ভগ্নাংশের নিচের অংশটা হর, না ওপরের অংশটা? মিলি হঠাৎ সেদিন অঙ্ক করাতে গিয়ে বলল, 'তুই কি দুধ খেতে পছন্দ করিস?'

আরশি চমৎকার উচ্চারণে বলল, 'হ্যাঁ, করি।'

মিলি বলল, 'দুধের সর চিনিস?'

আরশি এবার খানিকটা হেসে দিয়ে বলে, 'হ্যাঁ, চিনি। আমাদের গাঁয়ে দুধের সরকে কী বলে জানো?'

মিলি বলল, 'কী?'

আরশি বলল, 'হর। আমাদের গাঁয়ে দুধের সরকে বলে হর।'

Boighar.com & ARS

মিলি বলল, 'দারুণ! আমি এটাই জানতে চেয়েছিলাম। আমি আশিষের কাছে এটা শুনেছি। এবার শোন, দুধের হর, মানে যেটা সর আর কি, সেটা দুধের কই থাকে? নিচে না ওপরে?'

আরশি খানিকটা অবাক গলায় বলে, 'কেন? ওপরে!'

মিলি বলে, 'ওকে, গ্রেট। দুধের হর থাকে ওপরে আর ভগ্নাংশের হর থাকে নিচে। কী মনে থাকবে?'

আরশি কিছুক্ষণ মিলির দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর হেসে ফেলল, 'তুমি না! এটা আমি আর কোনোদিন ভুলব না।'

তা আরশি ভোলেও না। এমন নানান মজার মজার বিষয়ে আরশির পড়ার সময়টা এত উপভোগ্য হয়ে ওঠে! প্রথম বছরেই আরশি অনেকটা এগিয়ে গেল। এই পুরো সময়টা আরশি মিলির ছায়াসঙ্গী হয়ে ওঠে। কিন্তু তার বুকের ভেতর টিপটিপ করে বাবার কথা! বাবার জন্য ভয়াবহ যন্ত্রণা হয়, তেষ্টা হয়। কিন্তু আরশি কিছু বলে না। কাউকে কিছু না। পরের বছরটা আরশির নিজের জন্য অদ্ভুত এক অভিজ্ঞতার। হুট করেই একদিন সে মেয়ে থেকে নারী হয়ে উঠল। আশিষের তখন নিয়মিত রাতভর কাজ থাকে। সে অফিস থেকে ফেরে ভোরে। আরশি ঘুমায় মিলির সঙ্গেই। সেদিন হঠাৎ মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেল আরশির। তার সারা শরীর জুড়ে কেমন অদ্ভুত এক অস্বস্তি! তার মনে হলো তার শরীর জুড়ে কিছু একটা হচ্ছে। সে উঠে বাথরুমে গেল। দেখল তার কাপড় ভিজে আছে রক্তে। সে প্রবল ভয় এবং আতঙ্ক নিয়ে বিছানায় ফিরল। কিন্তু শুতে গিয়ে দেখল বিছানায়ও এখানে-সেখানে রক্ত লেগে আছে! কী ভয়ঙ্কর ব্যাপার। সেই রাতের বাকি সময়টুকু আরশি আর ঘুমাল না। জেগে রইল সারারাত। মিলি ঘুম থেকে উঠে দেখে আরশি বসে আছে। তার চেহারা কেমন উদ্ভ্রান্ত। মিলি জিজ্ঞেস করল কী হয়েছে। আরশি জবাব দিল না। বারকয়েক জিজ্ঞেস করতেই আরশি তার কোমর অবধি ঢেকে রাখা কাঁথাটা সরিয়ে নিল। সেখানে বিছানায় তখনও রক্তের দাগ। মিলি হঠাৎ হেসে ফেলল। তারপর জড়িয়ে ধরল আরশিকে।

সবকিছু মেনে নিতে শেখা এই আরশি যেন তার এই পরিবর্তন সহজে মেনে নিতে পারল না। কিন্তু পরিবর্তনগুলো হলো আরও বিস্তৃত, আরও দ্রুত, সর্বপ্লাবী। তার মাস ছয়েকের মধ্যে সে বড় হয়ে উঠল। মেয়ে থেকে হয়ে উঠতে থাকল পুরোপুরি নারী। তার বুক, নিতম্ব, কোমর, উরু, তার পুরো শরীর তাকে সদম্ভে জানিয়ে দিল, তুমি নারী। একদিন মিলি তাকে দোকানে নিয়ে ফ্রকের বদলে একগাদা সালোয়ার-কামিজ বানিয়ে দিল। প্রথম যেদিন সালোয়ার-কামিজ পরল আরশি, মিলি খানিক অবাক চোখে তাকিয়ে রইল। আশিষও ঘরে ঢুকে থমকে তাকাল। একদিনেই কত বড় হয়ে গেছে মেয়েটা! কিন্তু মিলির আচরণ তাতে কিছু বদলাল না। তার কাছে আরশি হয়ে রইল সেই ছোট্ট

শিশুটি। সে তাকে হাতে তুলে খাইয়ে দেয়। বুকের ভেতর নিয়ে ঘুম পাড়ায়। মাথা আঁচড়ে দেয়। কোলের ভেতর নিয়ে পড়তে বসায়।

মিলির জীবনে যে ব্যস্ততার দরকার ছিল তা সে পেয়ে গেছে। তার বুকের ভেতর রোজ রোজ যে মমতা, যে মাতৃস্নেহরা জমে জমে কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উপচে উঠেছিল, তা রাখার একটা পাত্র যেন সে পেয়ে গেল। আরশি তার সেই স্নেহ-মমতা রাখার অতল পাত্র হয়ে উঠল। আরশি ছাড়া জগতের আর সবকিছুতেই মিলি তখন সুস্থ-স্বাভাবিক একজন মানুষ। শুধু আরশি তার এই জীবনের একমাত্র এবং সবচেয়ে অপরিহার্য খেলনা। এখানে সে ডুবে থাকে, ডুবিয়ে রাখে মানবজীবনের সবটা অনুভূতি অপার ভালোবাসা ঢেলে। আরশির দিন চলে যায়। মাঝে মাঝে মিলির এমন সর্বগ্রাসী আগলে রাখায় কেমন এক ধরনের শ্বাসরুদ্ধ অনুভূতি হয়। হাঁসফাঁস লাগে। আর মাঝে মাঝেই বুকের কোথায় যেন রয়ে যায় গহিন রাতের নিস্তব্ধতা। তীব্র তৃষ্ণা আর অস্পৃশ্য হাহাকার।

সেদিন বিকেলে খুব স্বাভাবিক একটা ঘটনা ঘটল। কিন্তু ঘটনাটা শেষ অবধি আর স্বাভাবিক রইল না। মিলি অবেলায় ঘুমিয়ে ছিল। আরশির বাইরে যাওয়ার খুব একটা সুযোগ হয় না। আজ মিলি ঘুমিয়ে ছিল বলেই সে চুপিচুপি বারান্দায় গেল। গ্রিলের বাইরে খোলা মাঠ। সেখানে নানান বয়সের ছেলেরা খেলাধুলা করে। সে গ্রিলের বাইরে তাকিয়ে ছিল। কিছু দেখছিল কিনা আরশি তা জানে না। তবে তাকিয়ে ছিল। দীর্ঘসময়। লাল স্কচটেপ লাগানো টেনিস বলটা সোজা উড়ে এসে গ্রিলের ফাঁক দিয়ে পড়ল তার পাশে। আরশি চমকে উঠল। সে তাকিয়ে দেখল একটা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে গ্রিলের বাইরে। কোঁকড়া চুলের ফর্সা ছেলেটার চোখে মোটাফ্রেমের চশমা। ছেলেটা খানিক ইতস্তত করে বলল, 'সরি, বলটা একটু দেবেন?'

আরশি কেন যেন খানিক থতমত খেয়ে গেল। সে একবার ছেলেটার দিকে তাকাল, একবার বারান্দায় পড়ে থাকা লাল বলটার দিকে। খুব স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু পুরো বিষয়টিতেই কিছু একটা ছিল। আরশি জানে না কী! সে সঙ্গে সঙ্গেই যেন বুঝতে পারল না ছেলেটা কী বলছে, কিংবা তার কী করা উচিত। ছেলেটা আবার বলল, 'বলটা একটু দেবেন প্লিজ?'

আরশি যেন সম্বিৎ ফিরে পেল। সে বলটা কুড়িয়ে গ্রিলের বাইরে ছুড়ে দিল। ছেলেটা বলটা কুড়িয়ে নিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে বলল, 'থ্যাংকস'।

আরশি জবাবে কিছু বলল না। সে ঘরে ফিরে এলো। খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু আরশির ভেতর কী যেন একটা কাঁটা হয়ে বিঁধে রইল। কেমন একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি। সে বহুক্ষণ ধরতে পারল না। ধরতে পারল মিলি যখন তাকে ঘুম থেকে উঠে বলল, 'দুধ খেয়েছিস?'

আরশি মাথা নেড়ে বলল, 'না।'

Boighar.com & ARS

মিলি বলল, 'না খেয়ে না খেয়েই তো রোজ কাঠি হচ্ছিস। চুপচাপ বসে থাক, আমি দুধ গরম করে আনছি।'

মিলি যখন দুধ গরম করতে গেল, সেই মুহূর্তে আরশি তার অস্বস্তি কিংবা অব্যাখ্যেয় এই অনুভূতির কারণটা খুঁজে পেল। তার এইটুকু জীবনে কেউ কখনও তাকে 'আপনি' বলে সম্বোধন করেনি। মিলি যখন বলল দুধ খেয়েছিস, সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টা ধরতে পারল সে। আর ছেলেটা তার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে কেমন যেন খানিকটা দ্বিধা, খানিকটা সঙ্কোচ মিলিয়ে আড়ষ্ট হয়ে ছিল। আরশি জানে না কেন, সে টের পেল এই অস্বস্তিকর অনুভূতির ভেতরও কোথায় যেন চিনচিন করে একটু ভালোলাগা মিশে আছে। কিন্তু এর কারণটা সে ধরতে পারল না।

আরও দিন দুই কেটে গেল। আরশি অবাক হয়ে লক্ষ্য করল বিকেল হলেই অবচেতন মনেই তার বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াতে খুব ইচ্ছে হয়। কিন্তু সে যায় না। মিলির সঙ্গে নানান গল্প করে। লুডু খেলে। আশিষ চৌদ্দ ইঞ্চি সাদাকালো টিভি কিনে এনেছে, তারা সন্ধ্যায় বসে টিভি দেখে। আরশির পড়াশোনা চলে। সে পড়াশোনায় খুব মেধাবী না হলেও ভালো। মাঝে মাঝেই মিলি তার পরীক্ষা নেয়। সেসব পরীক্ষায় আরশি খারাপ করলে মিলির দুশ্চিন্তার অন্ত থাকে না। সে নানান নতুন নতুন উপায় বের করার চেষ্টা করে, যাতে আরশি আরও সহজে শিখতে পারে। আর আরশি যদি কোনো পরীক্ষায় ভালো করে, তার আর আনন্দের সীমা থাকে না। সেদিন বাসায় ভালো রান্না হয়। মিলি গান গেয়ে শোনায়। সে এককালে ভালো গান গাইত। বহুকাল রেওয়াজ নেই বলে সুর-তাল-লয় সব গুলিয়ে গেলেও সে গায়। আরশিকেও গাইতে হয়। আরশি গান জানে না, তবে সে মুখস্থ পুঁথি বলতে পারে। আম্বরি বেগম রাতে ঘুমানোর সময় তাকে কোলের ভেতর নিয়ে রোজ কোনো না কোনো পুঁথি সুর করে শোনাত। তার অনেকগুলোই আরশির মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। এমনই একদিন আশিষ বাসায় দাওয়াত দিল তার পত্রিকার সহসম্পাদক শরিফুল আলমকে। শরিফুল আলম আশিষের চেয়ে বয়সে বছর পাঁচেকের বড়। কিন্তু তাদের সম্পর্ক বন্ধুর। তারা পরস্পরকে তুমি করে বলে। সে রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর ড্রইংরুমে আড্ডা বসল। মিলি গান গাইল, শরিফুল আলম নিজের লেখা কবিতা শোনাল। আশিষ বলল ভয়ঙ্কর গা ছমছমে ভূতের গল্প। শেষে এলো আরশির পালা। আরশি বলল, 'আমি তো কিছু জানি না।'

www.boighar.com

আশিষ বলল, 'তুই একটা পুঁথি শোনা।'

কিন্তু আরশি কিছুতেই বলতে চাইল না। শেষে মিলি মুখ ভার করে বলল, 'তুই যদি না শোনাস তো আমি আর কখনও গানই গাইব না।'

আরশির ভালো লাগছিল না। তাছাড়া তার খুব একটা মনেও নেই। ছাড়া ছাড়া দু'চার লাইন যা মনে আছে সেটা এ রকম আড্ডায় বলা যায় না। কিন্তু

বাধ্য হয়েই তাকে বলতে হলো। আম্বরি বেগম এই পুঁথিটা তাকে খুব শোনাত। তার জীবনের সঙ্গে মিলে গিয়েছিল বলেই কিনা কে জানে! কী এক অদ্ভুত বুক কেমন করা সুরে আম্বরি বেগম বলত। সুরটা আরশির মাথায় গেঁথে আছে। সে একসময় সারাদিন গুনগুন করে গাইত। আজ হঠাৎ কী হলো, সে সেই আবছা অন্ধকারের ঘরেও চোখ বন্ধ করে এক অপার্থিব বুক কেমন করা সুরে বলল–

'ছোট্ট মাইয়া, উঠল নাইয়া নদীরও জলে
মায়ে তাহার মুখ মোছাইল ভেজা আঁচলে।
তাহার পরে মেয়ের মুখে চুম্বনও দিল
ছোট্ট মেয়ে চক্ষুর জলে কী কান্দন কান্দিল।
উড়িয়া আসিল দস্যুর উড়াল পঙ্খী নাও,
সেই নাও বান্ধা নদীর ঘাটে, কারে লইয়া যাও।
লইয়া যাও, লইয়া যাও মাঝি কাহার মায়েরে!
মা হারা ছোট্ট মেয়ে... ভাসিল চোখেরও সায়রে...'।

অন্ধকার ঘরের নিস্তব্দ আঁধারে সেই সুরে যেন কী একটা ভেসে বেড়াল। গলে গলে ছুঁয়ে গেল মুহূর্তেই স্তব্ধ হয়ে যাওয়া মানুষগুলোর বুকের ভেতর। আরশি উঠল না। চুপ করে বসে রইল। উঠল না কেউই। কখনও কখনও অন্ধকার খুব দরকার হয়। খুব। নিজেকে আড়াল খোঁজার জন্য।

বারান্দার গ্রিলের বাইরের সেই ছেলেটার সঙ্গে আরশির আবার দেখা হলো। এবার কথাও হলো। মিলি কী একটা কাজে বাইরে গেছে। আরশি সন্ধ্যার আগে আগে বারান্দায় গেল। গোধূলির আকাশটা কেমন লাল হয়ে আছে। এসব দেখলেই তার বুকের ভেতরটা কেমন হাহাকার করে ওঠে। যযাতিপুরের জন্য ছটফট লাগে। আরশি ছেলেটাকে খেয়াল করেনি। সে কখন এসে গ্রিলের ওপারে আবছা অন্ধকারে দাঁড়িয়েছে! এতদিনে সে ছেলেটার কথা ভুলেই গিয়েছিল। ছেলেটা বলল, 'আপনি রোজ আসেন না কেন?'

আরশি চমকে গিয়ে তাকাল। প্রথমে সে ছেলেটাকে চিনতে পারল না। যখন চিনল, তখন কথা খুঁজে পেল না। ছেলেটা বলল, 'এ কদিনে তো আরও কটা বল যেতে পারত আপনাদের বারান্দায়, তাই না? সেগুলো কে ছুড়ে দিত?'

আরশি জবাব দিল না। ছেলেটা আবার বলল, 'আমার নাম আসিফ। আপনাদের পাশের তিনটা বিল্ডিং পরেই আমাদের বাসা। আপনাকে তো কখনও বাইরে দেখি না। আপনি কি সবসময় ঘরেই থাকেন?'

আরশি এবারও জবাব দিল না। আসিফ বলল, 'আপনি কথা বলতে পারেন তো? অনেক সিনেমা বা গল্পে এমন হয়। এমন করে ছেলেটা মেয়েটার প্রেমে

পড়ে যায়, তারপর দেখা যায় মেয়েটা কথা বলতে পারে না। কিংবা চোখে দেখে না। বলুন তো, আপনি কোনটা?'

আরশি এবার কথা বলল, 'দুটোই।'

আসিফ বলল, 'বাহ। তাহলে তো ভালোই। কিসে পড়েন আপনি?'

আরশি বলল, 'কোনো কিছুতে পড়ি না।'

আসিফ বলল, 'মানে কী?'

আরশির হঠাৎ কেমন বিরক্তি লাগতে লাগল। সে বুঝল না, চেনে না, জানে না, এমন একটা মানুষের সঙ্গে সে কেন কথা বলছে! ছেলেটাইবা তাকে এতকিছু কেন জিজ্ঞেস করছে! সে বলল, 'কোনো মানে নেই।'

আসিফ আরও কিছু বলতে চাইছিল। কিন্তু আরশি চট করে বারান্দা থেকে চলে এলো। এরপর থেকে সে আর বারান্দায় গেল না।

কলকাতা থেকে খবর এসেছে, সুজাতা রানী স্ট্রোক করেছেন। বড় ধরনের স্ট্রোক। আশিষ একা একাই দেখতে গেল। সে ফিরল সপ্তাহখানেক বাদে। সুজাতা রানীর ডান দিকটা অসাড় হয়ে গেছে। নিয়মিত ফিজিওথেরাপি দিতে হবে। বাসার আবহাওয়া খানিকটা থম মেরে গেল। থম মারা ভাবটা কাটল তার কিছুদিন বাদে। আশিষের অফিসে প্রমোশন হলো। আরও কী সব ছোটখাটো ঘটনা ঘটল। খুব ফুরফুরে মন নিয়ে আশিষ বাসায় ফিরল। রাতে আরশি আর মিলিকে নিয়ে বাইরে খেতে গেল।

সে রাতে বহুদিন পর আশিষ মিলিকে ফিসফিস করে বলল, 'আমি আজ রাতে তোমার কাছে থাকি?'

মিলি দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বলল, 'একদম না। আরশি এখন বড় হয়েছে। তিনজন একসঙ্গে কীভাবে থাকব?'

আশিষ মুখ করুণ করে বলল, 'আরশি না হয় আজ ও ঘরে থাকুক।'

মিলি বলল, 'একদম না। ও কী ভাববে?'

আশিষ আর কথা বাড়াল না। সে চুপচাপ গিয়ে ড্রইংরুমে শুয়ে পড়ল। মাঝরাতে মিলি আরশিকে ডেকে তুলল। বলল তার বুকে প্রচণ্ড ব্যথা। দম নিতে কষ্ট হচ্ছে। আরশি নিজ থেকে গিয়েই আশিষকে ডেকে আনল। আশিষ মিলির পাশে বসে রইল। আরশিও জেগে রইল। তারপর মিলি হঠাৎ বলল, 'তুমি আজ এখানেই থেকে যাও। আরশি ও ঘরে ঘুমাক।'

সে রাতে বহুদিন পর মিলির সঙ্গে আশিষের গভীর ভালোবাসায় ডুবে যাওয়া হলো। পরস্পরের শরীরে উদ্দাম মিশে যাওয়া হলো। পরদিন থেকে আরশির জন্য শুকরঞ্জন ডাক্তার আর সুজাতা রানীর ঘরটা ফাঁকা করে দেওয়া হলো। মিলি গর্ভবতী হলো পরের মাসেই। সেফ হোম ক্লিনিকে পরীক্ষা করানো

হলো, রুবিনা রিপোর্ট দেখে হাসল। বলল, 'এটাই সঠিক সময় ছিল। মিলি ওর মানসিক সমস্যাটা কাটিয়ে উঠেছে এবং আশা করি আর কোনো সমস্যা হবে না।'

কিন্তু সমস্যা হলো। গর্ভবতী হওয়ার দুই মাসের মাথায় আরশিকে পড়াতে বসিয়ে হঠাৎ খেপে গেল মিলি। কী একটা কঠিন বিষয় পড়াচ্ছিল, বার দুই বোঝানোর পরও যখন আরশি বুঝছিল না। মিলি তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'রাস্তা থেকে কাউকে তুলে এনে মানুষ করা সম্ভব না বুঝলি?'

সে বইপত্র ছুড়ে ফেলল মেঝেতে। আরশি অবাক চোখে তাকিয়ে রইল। মিলি ঝড়ের বেগে উঠে চলে গেল। সে কিছুই বুঝল না। পরের ক'দিনে মিলি ঠিকঠাকভাবে আরশির সঙ্গে কথা বলল না। এক দুপুরে বলল তাকে চা বানিয়ে দিতে। প্রথমবারের মতো। তারপর একদিন বুয়া না আসাতে বলল ভাত রাঁধতে। দীর্ঘদিন অভ্যাস না থাকা আরশির একটু সমস্যা হলো। কিন্তু সে পারল। কিন্তু মিলির আচরণ ক্রমশই বদলাতে থাকল।

আরশি সেদিন বহুদিন বাদে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল। আসিফ ঠিকঠিক কোথা থেকে চলে এলো। সে বলল, 'আপনি কতদিন পরপর বারান্দায় আসেন বলেন তো? সেটা জানলে আমার জন্য সুবিধা হতো। শুধু ওই সময়টায় এসে দাঁড়িয়ে থাকতে পারতাম। রোজ রোজ এই এতটুকু দেখার জন্য দাঁড়িয়ে থাকতে ভালো লাগে না।'

আরশি সেদিনও কোনো কথা বলল না। চুপচাপ চলে এলো। তার মন বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। সেদিন বুয়াও এলো না। সে তরকারি রাঁধতে গিয়ে ভুল করে দুইবার লবণ দিয়ে দিল। খেতে বসে মিলি যেন আগুন হয়ে গেল। ভাতের প্লেট ছুড়ে ফেলে দিল। সে রাতে মিলি আর কিছুই খেল না। দিনে দিনে আরশির সঙ্গে মিলির কথাবার্তা কমে গেল। আরশির বুকের ভেতর একটা কালো মেঘ ছায়া ফেলল। গভীর কালো মেঘ। কারণ সে জানে, জগতে ভালো সময়, খারাপ সময় বলে কিছু নেই।

আসলে যা আছে, তাহলো সময়ের আঁচড়। সে সময়ের আরও একটা আঁচড়ের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে লাগল।

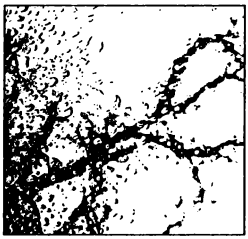

রুবিনা চেম্বার থেকে বের হতে যাবে, এই মুহূর্তে আশিষ ঢুকল। আশিষের চেহারায় কেমন উদ্ভ্রান্ত ভাব। রুবিনা সরাসরি বলল, ' কোনো সমস্যা?'

আশিষ বলল, 'হ্যাঁ'।

রুবিনা বলল 'কী সমস্যা? কোনো কমপ্লিকেশন? প্রেগন্যান্সি নিয়ে কোনো জটিলতা হচ্ছে?'

আশিষ বলল, 'না। অন্য সমস্যা। মিলি কনসিভ করার পর থেকেই আবার কেমন হয়ে যাচ্ছে। সে আজকাল আরশিকে সহ্যই করতে পারছে না। তার ধারণা সকাল আবার ফিরে আসছে তার পেটে এবং আরশি তার পেটের বাচ্চার জন্য ক্ষতিকর। বিষয়টা এখনও ম্যাসিভ হয়ে ওঠেনি। কিন্তু আমি টের পাচ্ছি। দিন যত যাবে, বিষয়টা তত খারাপ হবে।'

আশিষের কথা শেষ হলেও রুবিনা কোনো কথা বলল না। সে চুপ করে রইল। অনেকক্ষণ। তারপর চিন্তিত গলায় বলল, 'যা আশঙ্কা করেছিলাম শেষ অবধি তাই হলো কিন্তু একটু অন্যভাবে।'

আশিষ বলল, 'কিন্তু এখন কী করব?'

রুবিনা এবারও সঙ্গে সঙ্গে কথা বলল না। খানিক সময় নিয়ে বলল, 'সমস্যাটা গুরুতর। মিলি একধরনের সিজোফ্রেনিয়ায় ভুগছে। সে এটা থেকে বের হতে পারছে না। সকাল সংক্রান্ত ভাবনাগুলো বিষয়টাকে প্রকট করে তুলছে। আমার ধারণা ছিল আরশির কারণে ওটা কেটে যাবে। একদমই যে কাটেনি, তা না। একটা বড় জটিলতা কেটে গেছে। কিন্তু তৈরি হয়েছে নতুন জটিলতা।'

আশিষ বলল, 'এর সমাধান কী? কী করব এখন?'

রুবিনা বলল, 'আপাতত যতটা সম্ভব আরশিকে ওর কাছ থেকে দূরে রাখুন। তবে হুট করে একদম সরিয়ে দেবেন না।'

www.boighar.com

আশিষ বলল, 'কিন্তু এমনটা কেন হচ্ছে? আরশিকে ও এতটা পছন্দ করত!'

রুবিনা বলল, 'মিলি কনসিভ করার সঙ্গে সঙ্গে ওর ভেতরে আবার সকালকে হারানোর সেই আতঙ্কটা শুরু হয়েছে। ওর ধারণা ওর চারপাশে যারাই আছে তারা সবাই-ই ওর পেটের বাচ্চাটার শত্রু। ও সবসময়ই একটা আতঙ্কে ভুগছে যে কেউ হয়তো ওর বাচ্চাটার ক্ষতি করবে। মেডিক্যাল সায়েন্সের ভাষায় এটাকে বলে প্যারানয়েড সিজোফ্রেনিয়া। এই মুহূর্তে প্রথমেই ওর মাথায় যেটা ঢুকেছে, সেটা হলো আরশি। সে আরশিকে যতই ভালোবাসুক, কনসিভ করার সঙ্গে সঙ্গেই ওর মধ্যে এটা ঢুকে গেছে যে আরশি এ বাড়ির কেউ না। কাছের কেউ না। সুতরাং ওর পেটের বাচ্চার যদি কেউ ক্ষতি করতে পারে, তাহলে সেটা আরশি। এটা ওর মাথায় ঢুকে গেছে। তবে দুশ্চিন্তার বিষয় হচ্ছে, দিন যত যাবে, বিষয়টা তত বেশি এক্সট্রিম হবে। এমনকি আপনাকেও সহ্য করতে পারবে না। কাছে ঘেঁষতে দেবে না। তখন আপনাকে দিয়েও ক্ষতির আশঙ্কা করবে। আপাতত আরশিকে একটু দূরে দূরে রাখুন। আর মিলিকে ওর মতোই থাকতে দিন।'

আশিষ বাসায় ফিরল প্রবল দুশ্চিন্তা নিয়ে। আরশিকে বিষয়গুলো কীভাবে খুলে বলবে, সেটা বুঝে উঠতে পারছে না। তবে আরশিকে সে যতটা দেখেছে, খুবই বুদ্ধিমতী মেয়ে। কোনো না কোনোভাবে হয়তো তাকে বোঝানো যাবেই। কিন্তু মিলিকে নিয়ে কী করবে সে? আরেকটা বিষয় হচ্ছে আরশির পড়াশোনা। পড়াশোনা একদম বন্ধ হয়ে গেল। তবে দিন দুই বাদে একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটল। মিলি নিজেই ডাকল আশিষকে। স্বাভাবিক গলায় বলল, 'দেখছই তো যে আমি দিন দিন অসুস্থ হয়ে পড়ছি। আরশিকে আর পড়াতেও পারছি না। ওর জন্য একটা প্রাইভেট টিউটর রেখে দাও।'

আশিষ অবাক হলেও মিলির এইটুকু কথাতেই খুশি হলো। সে আরশির জন্য একজন টিউটর রেখে দিল। পঁয়তাল্লিশ-পঞ্চাশ বছরের মধ্যবয়স্ক মানুষ। বিধানচন্দ্র নাম। মূল পেশাই টিউশন। সারাদিন ঘুরে ঘুরে টিউশন করান। সবধরনের সাবজেক্টেই দখল আছে। বিধানচন্দ্র সপ্তাহে পাঁচ দিন আসেন। সন্ধ্যাবেলা ঘণ্টা দুই পড়িয়ে যান। ভালো শিক্ষক। আশিষের ইচ্ছে পরের বছর কোনো স্কুলে ক্লাস নাইনে ভর্তি করিয়ে দেবে আরশিকে। তারপর ম্যাট্রিক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেবে সে।

বিধানচন্দ্র খানিকটা শান্তিনিকেতনি ভাষায় কথা বলেন। আচার-ব্যবহার ভাবভঙ্গিও তেমন। কবিতা লেখেন। এই মানুষটাই আবার অঙ্ক-ইংরেজিতে তুমুল দক্ষ। মাস দুয়েকের মধ্যেই আরশির পড়াশোনাকে তিনি একটা প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে নিয়ে এলেন। আরশি এমনিতেই নানা বিষয়ের বেসিক জানাশোনার সঙ্গে ভালোভাবেই পরিচিত ছিল। মিলি তাকে চমৎকার ভিত্তি দিয়েছে। ফলে বিধানচন্দ্রের খুব একটা সমস্যা হলো না। তাছাড়া সপ্তাহে পাঁচ দিন পড়ানোর কথা থাকলেও তৃতীয় সপ্তাহ থেকেই তিনি সপ্তাহে সাত দিনই

Boighar.com & ARS

পড়াতে শুরু করলেন। তবে সেদিন একটা ঘটনা ঘটল, বিধানচন্দ্র বাংলা দ্বিতীয় পত্র পড়াতে গিয়ে আরশির খাতায় রবীন্দ্রনাথের দুটো লাইন লিখলেন, 'প্রহর শেষের আলোয় রাঙা সেদিন চৈত্রমাস, তোমার চোখে দেখেছিলেম আমার সর্বনাশ'। লাইন দুটো লিখে তিনি বললেন, 'বল তো আরশি, কবিগুরু, কোন বইতে এই লাইন দুটো লিখেছিলেন? এবং কেন লিখেছিলেন?'

আরশি ভাবল এটা তার পড়ারই কোনো অংশ। কারণ বিধানচন্দ্রের জানাশোনার ভাবনা এত বিস্তৃত যে সে অনেক সময়ই অবাক হয়ে যায়, একটা মানুষ এতকিছু জানে কী করে! এবং এ কারণেই মানুষটার প্রতি তার শ্রদ্ধাও সীমাহীন। সে বলল, 'স্যার, আমি তো জানি না। আমার বাইরের বই পড়ার তেমন সুযোগ হয় না।'

বিধানচন্দ্র বলল, 'কেন? তোমাদের ড্রইংরুম ভর্তি কত বই! তুমি তো পড়তে পার।'

আরশি বলল, 'কিছু কিছু পড়েছি। কিন্তু আমাদের বাসার বেশিরভাগ বইই কেমন খটমট। প্রবন্ধ, গবেষণা এসব। গল্প, কবিতা, উপন্যাস খুব কম।'

বিধানচন্দ্র বললেন, 'আচ্ছা'। তারপর দিন থেকে বিধানচন্দ্র রোজ দু'খানা করে বই নিয়ে আসেন। রবীন্দ্রনাথই বেশি। মাঝে মাঝে মানিক, শরৎচন্দ্র আর শরৎও থাকে। আরশি রোজই একখানা-দু'খানা বই শেষ করে ফেলে। প্রথম প্রথম অনেক কিছুই বুঝতে পারত না। তবে বিধানচন্দ্র চমৎকার করে বুঝিয়ে দিতেন। মানিকের পুতুলনাচের ইতিকথা পড়ে আরশি যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। বিধানচন্দ্র পুরো উপন্যাসটা তাকে আরও বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেন। সেই রাতে আরশির আর ঘুম হলো না। তার মনে হলো, আসলেই তো, মানুষের জীবন একটা পুতুলনাচের গল্প। সবার সঙ্গেই অদৃশ্য সুতো বাঁধা আছে। কেউ একজন আড়ালে বসে সেই সুতো নাড়ে, আর মানুষগুলো সেই অদৃশ্য সুতোর টানে অভিনয় করে যায়। কিন্তু এই এত দুঃখ, এত কষ্ট, এত মায়া এ সবকিছুই কি তাহলে মিথ্যে? সবকিছুই কি তাহলে অভিনয়?

বিধানচন্দ্র মানুষটার প্রতি তার কী অসম্ভব এক শ্রদ্ধা আর নির্ভরতা যে গেড়ে বসে। তার মনে হয়, এই জগতে সে যা জানে না, যা বোঝে না তার সবকিছুর উত্তরই বিধানচন্দ্রের কাছে আছে। এ যেন এক অতল নির্ভরতার উৎস। মিলির তখন সাত মাস চলছে। সে আরও অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে। তাকে সেদিন ডাক্তার দেখাতে নিয়ে গেল আশিষ। আগের দিনই বিধানচন্দ্রকে বলে দেওয়া হয়েছিল আজ না আসতে। কারণ বাসায় আশিষ-মিলি কেউ থাকবে না। কিন্তু সন্ধ্যাবেলা বিধানচন্দ্র এলেন। আরশিকে বললেন জরুরি একটা বিষয় আরশিকে দেখানোর জন্য তিনি এসেছেন। তার মাথায় কিছু ঢুকলে সেটা বের না হওয়া অবধি তিনি স্বস্তি পান না। তিনি পড়াতে বসাতে গিয়ে বললেন, 'আচ্ছা আরশি, আমি তোমার চোখ নিয়ে অনেক ভেবেছি, ধরো, বিভিন্ন গল্প,

উপন্যাস, কবিতায় আমি সুন্দর চোখের অজস্র বর্ণনা পড়েছি, কিন্তু কখনও আমার মনে হয়নি পৃথিবীতে কোনো চোখ এতটা সুন্দর হতে পারে! তুমি কি রোজ কাজল পর?'

আরশি খানিকটা অবাক হলেও বলল, 'আমি কখনই কাজল পরি না।'

বিধানচন্দ্র বললেন, 'অসম্ভব! সে কী করে সম্ভব? এই চোখে কাজল নেই?'

আরশি মাথা নেড়ে বলল, 'না।'

বিধানচন্দ্র খানিক চুপ থেকে বললেন, 'তোমার চোখ নিয়ে আমি কিছু কবিতা লিখেছি। তুমি কিন্তু আবার কিছু মনে কর না যেন। একটা কথা মনে রাখবে, শিল্পীর কাজ হচ্ছে শিল্প। আর শিল্পের নিয়ামক হচ্ছে সৌন্দর্য। এর বাইরে কিছু নেই। এই যে তুমি, তুমি কিন্তু আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ না, আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ তোমার চোখ। তুমি আমার কাছে শ্রেফ বাচ্চা একটা মেয়ে। কিন্তু তোমার চোখ আমার কাছে জগতের সেরা রহস্য, সেরা আকর্ষণ, সেরা সৌন্দর্য। তুমি কি দেখতে চাও আমার লেখাগুলো?'

আরশি কী বলবে ভেবে পেল না। সে বিধানচন্দ্রের এই এত ভারী ভারী কথা পুরোপুরি না বুঝলেও তার কেমন যেন অস্বস্তি লাগছিল এবং অবাক করা ব্যাপার হচ্ছে সেই অস্বস্তির ভেতর কোথায় যেন একটা তীব্র ভালোলাগাও আছে। সে দুটোই টের পাচ্ছিল এবং দুটি দ্বান্দ্বিক সত্তার কোনোটাই অপ্রধান না। এরা পরস্পরকে ক্রমাগত আঘাত করে চলেছে। সে বলল, 'স্যার, আমি আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না। আর আপনি আমার চোখ নিয়েই কবিতা কেন লিখবেন?'

www.boighar.com

বিধানচন্দ্র বললেন, 'সেটা আমি জানি আর তোমার চোখ জানে। জগতে তোমার চোখের চেয়ে সুন্দর কিছু আর কখনই সৃষ্টি হয়নি।'

আরশিকে কেউ মেয়েলি আচরণ, অনুশীলন শেখায়নি। সে তার বয়সী আর আট-দশটা মেয়ের সঙ্গে মেশার কোনো সুযোগও পায়নি। এবং সে জানেও না এই বয়সী মেয়েদের এই ধরনের পরিস্থিতিতে কী করতে হয়! কিন্তু সে আবিষ্কার করল বিধানচন্দ্রের মতোন একজন বয়স্ক লোক, যে কিনা তার বাবার চেয়েও বয়সে বড় হতে পারে, তার শেষ বাক্যটা আরশির বুকের ভেতর কেমন অজানা একটা শিহরণ বইয়ে দিল।

বিধানচন্দ্র আবার বললেন, 'তুমি কি আমার কবিতাগুলো দেখতে চাও?'

আরশি বলল, 'না। আমার কবিতা ভালো লাগে না। আমি কবিতা দেখতে চাই না।'

বিধানচন্দ্র খানিক চুপচাপ বসে থেকে বললেন, 'আমার ধারণা তুমি কবিতাগুলো দেখতে চাও। কিন্তু চট করে ধরতে পারছ না। আমি কবিতাগুলো রেখে যাচ্ছি।' তিনি তার ঝোলার ভেতর থেকে একটা লাল মলাটের খাতা বের করলেন। খাতাটা আরশির সামনে টেবিলের ওপরে রাখলেন। তারপর বললেন,

'আমার মনে হয় তুমি কবিতাগুলো পড়বে। আগ্রহ নিয়েই পড়বে এবং পড়া শেষে একটা অদ্ভুতরকমের আফসোস করবে।'

আরশি বিধানচন্দ্রের আচরণে প্রচণ্ড অবাক হয়েছে এবং মজার ব্যাপার হলো, সে তার নিজের আচরণেও অবাক হচ্ছে। তার ধারণা সে নিজে যে আচরণটা করছে সেটা তার না। সেটা অন্য কারও আচরণ। সেই অন্য কেউ তার ভেতরে ঢুকে তাকে নিয়ন্ত্রণ করছে। আরশি বলল, 'কী আফসোস?'

বিধানচন্দ্র বললেন, 'সেটাও খাতায় লেখা আছে। তুমি কবিতাগুলো পড়া শেষ হলে খাতার শেষ পাতায় লাল কালির লেখাটুকু পড়লেই বুঝবে।'

আরশি চুপ করে রইল। বিধানচন্দ্র বললেন, 'তুমি বোধহয় জানো না, আমি অকৃতদার। অকৃতদার মানে আমি বিয়ে-টিয়ে করিনি।'

আরশির এবার খুব বিরক্ত লাগছে এবং কেমন যেন ভয় লাগা শুরু হয়েছে। বিধানচন্দ্র বললেন, 'আমার সবসময় মনে হতো জগতে এমন কোনো নারী নেই, যার সঙ্গ আমার বেশিদিন ভালো লাগতে পারে। আমার কাছে নারী মানেই একঘেয়ে। চাল, তেল, নুন, ডাল আর অলঙ্কারের হিসাব। আরেকটা হিসাব হচ্ছে শরীরের। যেটা দু'চার-দশবারেই পুরোপুরি উন্মোচিত হয়ে যায়। রহস্যহীন হয়ে যায়। আমার জীবনে বহু নারী এসেছে, কিন্তু সেই আসা সামান্য সময়ের জন্য। সেই সামান্য সময়ে সেই নারীদের সব রহস্য আমার কাছে খোলা মাঠের মতোন উন্মোচিত হয়ে গেছে। সে শরীরের রহস্য হোক বা মনের। আমি জানি না, সংস্কৃতে কেন বলা হয় স্ত্রিয়াশচরিত্রম দেবা না জানন্তি, নারীর মন তো ঈশ্বরের না জানার কিছু নেই। এদের রহস্য খুবই অগভীর এবং একটা নির্দিষ্ট ছাঁচের। কোনো মেয়েকে মুগ্ধ গলায় তুমি কি সুন্দর বললেই তার অর্ধেক রহস্যই কর্পূরের মতো উবে যায়। সে হয়ে যায় জলের মতোন। এটা সত্য এবং বাস্তব। তবে আমার ধারণা বেশিরভাগ পুরুষই নারীকে বুঝতে চায় না।'

বিধানচন্দ্র খানিক থামলেন। আরশি কিছুই বুঝতে পারছে না, এই মানুষটা এসব কথা কেন বলছে। এই এতটা দিন, কখনও এতটুকু সময়ের জন্যও সে দেখেনি মানুষটা অন্য কোনোরকম। কী গোছানো, শান্ত, গভীর একজন মানুষ। অথচ আজ কী হলো! বিধানচন্দ্র আবার বললেন, 'আমার সারাজীবন এই-ই মনে হয়েছে, জীবনে একজন মাত্র নারীর সঙ্গে কাটানো অসম্ভব। আমার ভাবনাটা ভাঙতে পারে এমন কেউই হয়তো আমার চেনা জগতে ছিল না। হয়তো অন্য কোথাও ছিল বা আছে, যার সঙ্গে আমার দেখাই হয়নি। কিন্তু খুবই অদ্ভুত ব্যাপার হলো...।'www.boighar.com

বিধানচন্দ্র তার অদ্ভুত কথাটা শেষ করলেন না। চুপ করে গেলেন। আরশিও চুপ করে রইল। বিধানচন্দ্র হঠাৎ বলল, 'তোমাকে আমার ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে করছে। এই ছোঁয়া মানে হাত ছুঁয়ে দেওয়া না। এই ছোঁয়া তারচেয়েও বেশি কিছু। তীব্র কিছু। সর্বগ্রাসী কিছু। আমার দেখতে ইচ্ছে করছে যে অসীম

রহস্য তোমার চোখ জুড়ে তার কতটা তোমার শরীরে! তুমি প্রশ্ন করতে পার, এতক্ষণ আমি তোমার চোখের কথা বললাম কিন্তু এখন কেন আবার এই কথা বলছি। এর কারণও তোমার চোখই। ওটা আমার কাছে আসলে শুধুই চোখ না, একজোড়া উচ্চমাত্রার মাদক। এই মাদক মানুষকে মুহূর্তেই মাতাল করে দেয়।'

বিধানচন্দ্র উঠে দাঁড়ালেন। আরশি হয়তো বিধানচন্দ্রের সব কথার প্রতিটি শব্দ আলাদা করে বুঝল না। কিন্তু বিধানচন্দ্রের কথার মূল অর্থ সে বুঝেছে। তার ভেতরে হঠাৎ প্রবল এক আতঙ্ক ভর করল। বিধানচন্দ্র তার দিকে এগিয়ে আসছেন। এক পা দু পা করে সে আরশির খুব কাছাকাছি চলে এলেন। খুব কাছাকাছি। আরশি এখন কী করবে? সে কি চিৎকার দেবে? ছুটে দৌড় পালাবে? কিন্তু আরশি কিছুই করল না। বিধানচন্দ্র তার মুখ নামিয়ে আনলেন আরশির মুখের দিকে। আরশি প্রবল আতঙ্কে চোখ বন্ধ করল। সে বিধানচন্দ্রের গায়ের গন্ধ পাচ্ছে। গাঢ় নিঃশ্বাসের শব্দ পাচ্ছে। বিধানচন্দ্রের একটা কাঁপা হাত আরশির গাল ছুঁয়ে বন্ধ চোখের পাতার ওপর স্থির হয়ে রইল। আরশির পুরো শরীর তখন থরথর করে কাঁপছে। কিন্তু সে যেমন বসে ছিল, তেমনই বসে রইল। বিধানচন্দ্রের হাতটা হঠাৎ আরশির চোখের ওপর থেকে সরে গেল। আর স্পর্শ করল না তাকে। কিন্তু আরশি চোখ খুলল না। সে চোখ বন্ধ করেই বসে রইল, যেমন ছিল ঠিক তেমনই। অনেকক্ষণ পর আরশি চোখ খুলল। কিন্তু বিধানচন্দ্রকে সে কোথাও দেখতে পেল না। কোথাও না। কেবল টেবিলের ওপর তার লাল মলাটের খাতাটা পড়ে আছে।

বিধানচন্দ্রের সঙ্গে এই জনমে সেই তার শেষ দেখা।

পরদিন থেকে বিধানচন্দ্র আর এলেন না। আশিষ অপেক্ষা করল কয়েকদিন। খোঁজ-খবর লাগাল। কিন্তু বিধানচন্দ্রের কোনো খোঁজ পাওয়া গেল না। তিনি যেন দিব্যি হাওয়ায় মিলিয়ে গেছেন। আরশি কাউকে কিছু বলল না। সে যেমন ছিল, তেমনই চুপচাপ রয়ে গেল। মিলি দিনদিন আরও বেপরোয়া হয়ে উঠছে। আজকাল সে তার কাছাকাছি কাউকে যেতে দেয় না। সেদিন মিলিকে নিয়ে আশিষ আবার ডাক্তার দেখাতে গেল। আরশি আবারও একা বাসায়। বিকেলটা কেমন থম মেরে আছে যেন। আজকাল এই চার দেয়ালের ভেতর খুব অস্থির লাগে আরশির। আকাশ দেখতে ইচ্ছে করে। খোলা মাঠে হেঁটে যেতে ইচ্ছে করে। মানুষের সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করে, মিশতে ইচ্ছে করে। নিজেকে কেমন খাঁচার পাখি মনে হয়। মাঝে মাঝে দমবন্ধ লাগে। এই বাসায় একটামাত্র বারান্দা। বারান্দাটা মিলি আর আশিষের ঘর লাগোয়া। ফলে আজকাল আর বারান্দায় যাওয়ার সুযোগও হয় না আরশির। আজ বাসায় কেউ নেই বলে সুযোগটা হলো। সে গিয়ে বারান্দায় দাঁড়াল। কিন্তু বাইরের পৃথিবীটাও যেন

কেমন! সবকিছুই যেন আজ কোনো কারণে থমকে আছে। কোথাও যেন কোনো প্রাণ নেই। মন ভালো হওয়ার বদলে আরও যেন খারাপ হয়ে গেল। এই মুহূর্তে আসিফ এলো। সে বারান্দার গ্রিলের উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে আরশিকে সরাসরি বলল, 'কী পেয়েছেন আপনি? পেয়েছেনটা কী?'

আরশির নিজের ভেতরটা এমনিতেই কেমন শূন্য লাগছিল। আসিফের এমন উপস্থিতিতে সবকিছু যেন আরও বেশি বিরক্ত এবং এলোমেলো লাগল। সে ঝাঁঝাল গলায় বলল, 'কী সমস্যা?'

আসিফ কোনোভাবেই আরশির এমন উত্তর এবং ভঙ্গি আশা করেনি। সে থতমত খেয়ে গেল এবং খানিকটা দমে গেল। সে বলল, 'না কিছু না। সরি।'

আরশি বলল, 'কিছু না হলে দাঁড়িয়ে আছেন কেন?'

আসিফ বলল, 'চলে যাব?'

আরশি বলল, 'কাজ না থাকলে অবশ্যই চলে যাবেন।'

আসিফ বলল, 'কাজ তো আছেই।'

আরশি বলল, 'কী কাজ?'

আসিফ বলল, 'আপনার সঙ্গে কথা বলা। এটা ছাড়া আরও একটা আছে, কিন্তু সেটা বলতে ভয় হচ্ছে।'

আরশি এবার আর কোনো কথা বলল না। তার এবার খানিকটা কৌতূহল হচ্ছে। আসিফ বলল, 'আপনি বাসা থেকে বের হন না?'

আরশি বলল, 'সেটা জেনে কী লাভ?'

আসিফ বলল, 'লাভ আছে। কিন্তু এখন বলা যাবে না।'

আরশি কোনো কথা বলল না। আসিফ বলল, 'ওকে, না বললে নাই। আপনি কিসে পড়েন?'

আরশি আবারও বলল, ' সেটা জেনে কী লাভ?'

আসিফ বলল, 'না মানে তাহলে বুঝতে পারতাম আপনি আমার চেয়ে কতটা ছোট।'

আরশি বলল, 'আমি আপনার চেয়ে ছোট কে বলল?'

আসিফ বলল, 'আমি জানি। আমি ইউনিভার্সিটিতে সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি। কিন্তু আমাকে দেখে সবাই ভাবে আমি ইন্টারমিডিয়েট ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র। আশপাশের যারা আমাকে ছোট ভেবে তুই-তোকারি করে, আসল ঘটনা শোনার পর তাদের চেহারার অবস্থা হয় দেখার মতো। সুতরাং বুঝতেই পারছেন, আমাকে দেখতে যতটা ছোট মনে হয়, ঘটনা আসলে উল্টো।'

আরশি বলল, 'আমি ছোট না বড় সেটা জেনে কী লাভ?'

আসিফ বলল, 'না মানে, ছোট হলে তুমি করে বলতে পারতাম।'

আরশি বলল, 'আপনাকে সম্ভবত কেউ শেখায়নি, অপরিচিতরা ছোট হোক বড় হোক, তাদের আপনি করেই বলতে হয়।'

আসিফ বলল, 'তাহলে চলুন পরিচিত হয়ে যাই। ঝটপট।'

আরশি বলল, 'আপনি এখন যান। আমি চলে যাচ্ছি।'

আসিফ বলল, 'আমি রোজ দাঁড়িয়ে থাকি। কিন্তু আপনি আসেন না। আমি ক'মাস ধরে দাঁড়িয়ে থাকছি জানেন?'

আরশি বলল, 'কেন দাঁড়িয়ে থাকেন? আমি তো আপনাকে দাঁড়িয়ে থাকতে বলিনি।'

আসিফ এবার চুপ করে গেল। তারপর হঠাৎ নরম গলায় বলল, 'তা অবশ্য ঠিক। আপনি তো বলেননি।'

আরশি বলল, 'আর দাঁড়িয়ে থাকবেন না। যাই।'

আরশি ঘুরে চলে যাচ্ছিল। এই মুহূর্তে আসিফ পেছন থেকে বলল, 'আচ্ছা, আর দাঁড়িয়ে থাকব না। কিন্তু ওই যে তখন বললাম আপনার সঙ্গে কথা বলা ছাড়া আরও একটা কাজ আছে। সেটা বলি?'

আরশি বলল, 'কিন্তু তখন তো বললেন সেটা বলতে ভয় পাচ্ছেন। এতক্ষণে ভয় চলে গেছে?'

আসিফ বলল, 'ভয় চলে যাওয়ার মতো কিছু করেছেন? এতক্ষণে যা করেছেন, তাতে বরং ভয় আরও বেড়ে গেছে।'

আরশি বলল, 'তাহলে?'

আসিফ বলল, 'আর তো দাঁড়িয়ে থাকতে না করেছেন। তার মানে আপনাকে আর দেখতেও পাব না। তাছাড়া আপনি তো বাইরেও আসেন না। তার মানে আপনার সঙ্গে আর কখনও দেখাই হচ্ছে না। দেখাই যদি আর না হলো, তাহলে ভয় পেয়ে আর কী হবে!'

আরশি কোনো কথা বলল না। তাকিয়ে রইল। আসিফ মৃদু গলায় বলল, 'সেদিন আপনাকে যখন বলটা দিতে বললাম। আর আপনি কেমন চোখ তুলে তাকালেন। সঙ্গে সঙ্গে আমার গলা শুকিয়ে গেল। তারপর থেকে গলা শুকিয়ে আছে। জগের পর জগ পানি খেয়ে যাচ্ছি, লাভ হচ্ছে না। এই যে দেখেন, এখনও।' আসিফ সময় নিয়ে ঢোক গিলল। তারপর আবার বলল, 'সেই থেকে মনে হচ্ছে আপনার চোখের দিকে যদি অনেকটা সময় ধরে না তাকিয়ে থাকি, তাহলে এই তেষ্টা মিটবে না।'

সেদিন রাতে আরশি অনেকটা সময় ধরে আয়না দেখল। সে আসলে আয়না না, দেখল তার চোখ। আচ্ছা মানুষের চোখে কী এমন থাকে? যা অন্য মানুষকে এমন মুগ্ধ করে! অনেক ভেবেও আরশি যেন কিছু পেল না। তবে রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে আরশি হঠাৎ একটা অদ্ভুত জিনিস আবিষ্কার করল। সেটি হলো আয়না আর চোখের ভেতর একটা চমৎকার সম্পর্ক রয়েছে। সম্পর্কটা খানিক অদ্ভুত কিন্তু খুবই গভীর। জগতের দৃশ্যমান প্রায় সবকিছুকেই দেখার ক্ষমতা রয়েছে চোখের, অথচ সে নিজেই নিজেকে দেখতে পায় না।

নিজেকে দেখার ক্ষমতা নেই তার। নিজেকে দেখতে হলে তাকে যেতে হয় আয়নার কাছে!

কী অদ্ভুত সমীকরণ।

পরদিন বিকেলেও বাড়ি ছিল না মিলি আর আশিষ। যাবে না যাবে না করেও আরশি সন্ধ্যার আগে আগে বারান্দায় গেল। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। সে কী কারও জন্য অপেক্ষা করছে? আরশি নিজেকে বোঝাল, না, সে কারও জন্য অপেক্ষা করছে না। কার জন্য অপেক্ষা করবে সে! সে এমনি এমনি বারান্দায় এসেছে। বাসায় কেউ নেই। তার করারও কিছু নেই। তাই সে বারান্দায় এসেছে। এখানে অন্য কোনো কারণ নেই। আর কারও জন্য বারান্দায় আসার কোনো যুক্তিও নেই। কিন্তু আরশি মাঠের এদিক-সেদিক তাকাল। ছেলেপুলেরা খেলছে। সে একজন একজন করে দেখল। সে কি কাউকে খুঁজছে! নাহ, কাকে খুঁজবে সে? আরশি তার ঘরে ফিরে এলো। তার কি একটু অস্থির লাগছে? মন খারাপ লাগছে? আরশি পাত্তা না দেওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু সে আবার বারান্দায় এলো। বাইরে তখন অন্ধকার নেমে গেছে। সে খানিক দাঁড়িয়ে রইল। তারপর যেই ফিরে যাওয়ার জন্য ঘুরেছে, মিলি ঘরে ঢুকল এই সময়ে। মিলির হঠাৎ কী হলো কে জানে! সে প্রচণ্ড ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে উঠল। চেঁচিয়ে উঠে বলল, 'তুই এখানে কী করিস হ্যাঁ? এখানে কী করিস? আমার সকালকে মেরে ফেলার ফন্দি করিস? কী? কিছু লুকিয়ে রেখেছিস এখানে? কই লুকিয়ে রেখেছিস দেখি? কই? খাটের নিচে? বারান্দায়?'

আশিষ মিলির পেছনে পেছনে ঘরে ঢুকেছে। সে শার্ট খুলতে খুলতে আরশিকে চোখের ঈশারায় আশ্বস্ত করল। তারপর মুখে বলল, 'যা তোর ঘরে যা।'

আরশি মিলিকে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিল। মিলি হঠাৎ উন্মাদিনীর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল আরশির ওপর। দু'হাতে তার চুল খামচে ধরে চিৎকার করে বলতে থাকল, 'তুই কী করেছিস এই ঘরে? কী করেছিস। বল, বল!'

হতভম্ব আশিষ অনেক কষ্টে আরশিকে ছাড়াল। আরশি চুপচাপ তার ঘরে চলে এলো। কিছুই বলল না। কিন্তু আশিষ এবার ভালোরকম দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল মিলিকে নিয়ে। আরশি তার চোখের সামনে থাকলে বিপদ। কিন্তু আরশিকে কী করবে সে? দু'দিন বাদে আরশির ঘরে এলো আশিষ। মিলির অসুস্থতাটা বিস্তারিত বুঝিয়ে বলল। আরও নানান কথাবার্তা শেষে বলল, 'তোর তো স্কুলে ভর্তি হয়ে যাওয়া উচিত। কারণ ম্যাট্রিকটা দিতে হলে ক্লাস নাইন থেকেই রেজিস্ট্রেশন করার একটা ব্যাপার থাকে। আমি তোর জন্য একটা স্কুল দেখে এসেছি। ভালো স্কুল। মেয়েদের। মেয়েদের জন্য ওদের ভালো হোস্টেলও আছে। তুই আপাতত হোস্টেলেই থাকবি।'

আরশি কোনো কথা বলল না। তবে মিলিকে ছেড়ে যেতে তার খারাপ লাগবে। আবার চোখের সামনে সেই মিলির সঙ্গে এই মিলিকে মেলাতেও তার খুব কষ্ট হয়। খুব কষ্ট। তার চেয়ে দূরে থাকাই ভালো। তাছাড়া সে পড়াশোনাটাও করতে চায়। বাইরের জগৎটা দেখতেও চায়। পরের শনিবারে আরশি স্কুলে ভর্তি হয়ে গেল। তার পরদিন উঠে এলো হোস্টেলে। যযাতিপুর গ্রামের সেই ছোট্ট আরশি যেন টুপ করে এসে পড়ল এক বিশাল সমুদ্রে! এই বিশাল সমুদ্রে সে হাবুডুবু খেতে লাগল। বয়সে সে তার ক্লাসের মেয়েদের চেয়ে বছর দুয়েকের বড়ই হবে। কিন্তু অসংখ্য দিক দিয়ে সে ছোট। তার জগৎ যেখানে এই এতটা বছর আটকে ছিল কত শত দ্বিধা আর দ্বন্দ্বের দেয়ালে, সেখানে তার চারপাশের এই মেয়েগুলো উড়ে বেড়িয়েছে যেমন ইচ্ছে রঙ আর স্বাধীনতার আকাশে। ফলে আরশির দিন কাটতে লাগল প্রবল আড়ষ্টতায়। ক্লাস নাইন থেকে টেনে উঠলেও আরশির রেজাল্ট তেমন ভালো হলো না।

এর মধ্যে মিলির বাচ্চা হয়েছে। এবারও ছেলে। আশিষ এসে বারকয়েক আরশিকে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মিলির অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি। বরং ছেলে হওয়ার পর থেকে অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। সে এখন কাউকেই তার আশপাশে ভিড়তে দেয় না। এমনকি আশিষকেও না। আরশি গেলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়। আশিষ বরং মাঝে মাঝেই আরশির হোস্টেলে আসে। আরশিকে নিয়ে হোস্টেলের বাইরে মাঠে বসে থাকে। গল্প করে। আরশির তখন মনে হয় সে একাই না, এই জগতের প্রতিটি মানুষই একা, ভীষণ একা আর অসহায়।

টেনের ক্লাস শুরু হওয়ার সপ্তাহখানেক পর আবার আশিষ এলো। আরশি বাইরে এসে দেখে আশিষের সঙ্গে শরিফুল আলম। আশিষের পত্রিকার সেই সহ-সম্পাদক। যার সামনে আরশি পুঁথি পড়ে শুনিয়েছিল। তারা দু'জন আরশিকে নিয়ে বের হলো। সারাদিন কত কত জায়গায় ঘুরল! একটা স্টুডিওতে নিয়ে আরশির ভয়েস পরীক্ষা করাল। দুটো বাদ্যযন্ত্রও কিনল। তারপর আবার ফিরে এলো কলেজে। হোস্টেলের হাউস টিউটরের সঙ্গে কীসব কথা হলো। যাওয়ার আগে আগে আশিষ বলল, 'তোর শরিফুল চাচা টিভিতে একটা প্রোগ্রাম করবে। এটা মূলত বাংলাদেশের লোক সঙ্গীতের প্রোগ্রাম। কিন্তু সে প্রথমেই তোকে দিয়ে শুরু করতে চায়।'

আরশি অবাক গলায় বলল, 'আমি তো গান পারি না।'

শরিফুল আলম বললেন, 'তোমাকে গান পারতে হবে না। তুমি যেটা পার, সেটা পারলেই হবে। তুমি আমার প্রথম প্রোগ্রামে সেই পুঁথির পালাটা পড়ে শোনাবা।'

আরশি বলল, 'ওটা আমার ওইটুকুই জানা, তার বেশি আমি জানি না।'

Boighar.com & ARS

শরিফুল আলম পকেট থেকে ভাঁজ করা একটা খাতা বের করে আরশির হাতে দিলেন। বললেন, 'আমি পুরোটা সংগ্রহ করতে পারিনি। তবে ওটার কিছু অংশ এখানে আছে। তুমি যতটা সম্ভব মুখস্থ করে প্র্যাকটিস কর। আর তোমার জন্য দুটো বাদ্যযন্ত্রও কেনা হয়েছে। সপ্তাহে দু'দিন এসে তোমার স্কুলের গানের শিক্ষক তোমাকে রেওয়াজ করিয়ে যাবেন।'

আরশি বলল, 'আমি তো বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে কখনও বলি নাই। শুনিও নাই।'

শরিফুল আলম বললেন, 'কিন্তু এটা তো টিভিতে যাবে, ইনস্ট্রুমেন্ট দরকার আছে। আর তাছাড়া গ্রামগঞ্জে পুঁথির সঙ্গে এই ধরনের বাদ্যযন্ত্রও ব্যবহার হয়।

আশিষ আর শরিফুল আলম এরপরও নানান পরিকল্পনা, আলাপ-আলোচনা করল। আরশি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। প্রোগ্রাম রেকর্ডিং হবে এর পরের মাসে। এতদিন সবকিছু ঠিকঠাকই চলছিল। কিন্তু গোল বাঁধল রেকর্ডিংয়ের দিন। আরশি কিছুতেই বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে সুর তুলতে পারছিল না। বাদ্যযন্ত্র শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার সুর এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল। আরশির গলার স্বর যে এমনিতে আহামরি কিছু, তা না। কিন্তু সেই সেদিন রাতে, আশিষের বাসার ড্রইংরুমে আরশির গলায় তার বুকের ভেতরের সবটা আবেগ-অনুভূতি যেন গলে গলে বের হয়ে পড়ছিল। শরিফুল আলমেরও সেই কথা, সে অসাধারণ গানের গলা অনেকেরই পাবে, কিন্তু এমন দরদমাখা গলা ক'টা পাবে?

আরশি শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিল সে পুঁথিপাঠের সঙ্গে কোনো বাদ্যযন্ত্র নেবে না। খালি গলায়ই গাইবে। শরিফুল আলম অনেক বোঝাল। কিন্তু লাভ হলো না। গম্ভীর শরিফুল আলম শেষ পর্যন্ত খালি গলায়ই রেকর্ডিং করালেন। আরশি জানে না কেমন হয়েছে! সে কী পাঠ করেছে! এতগুলো ক্যামেরার সামনে তার খুব ভয় হচ্ছিল। কিন্তু সে একবারেই শেষ করেছে। চলে আসার সময়ও শরিফুল আলম গম্ভীর হয়েই থাকলেন। কিছু বললেন না কেমন হয়েছে। আরশিও জানতে চাইল না। জেনে কী হবে! সে তো আর কখনও এসব করবে না। এর পনের দিন পর অনুষ্ঠানটি সম্প্রচারিত হলো টিভিতে। হোস্টেলের টিভি নষ্ট থাকায় আরশি অনুষ্ঠানটি দেখতে পারল না। তবে তার পরের কয়েকদিনে আরশিকে নিয়ে কয়েকটি পত্রিকার বিনোদন পাতায় প্রতিবেদন ছাপা হলো। টেলিভিশন চ্যানেলে অসংখ্য দর্শকের ফোন আর চিঠি আসতে লাগল। দর্শকরা প্রোগ্রামটি আবার দেখতে চায়। প্রোগ্রামটি পরের মাসে পুনঃপ্রচারিত হলো। কোনো এক অদ্ভুত কারণে বাংলাদেশের মানুষ তাদের ঘরের লাইট অফ করে দিয়ে টেলিভিশনের আবছা আলোয় খালি গলায় আরশির পাঠ করা সেই পুঁথি শুনতে শুনতে কেঁদে বুক ভাসাল। তাদের বুকের ভেতর যেন হু হু করে বইতে লাগল উত্তুরে হাওয়া। কী এক অধরা হাহাকার ভেসে রইল তাদের বুকের অলি-গলি, মাঠ, ঘাট, বিরান প্রান্তরজুড়ে।

বিস্মৃত অনুভূতিরা যে আবার জেগে উঠল অপার মমতায়।

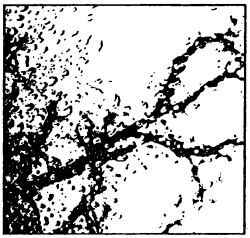

যযাতিপুরে ঘটনা নতুন মোড় নিয়েছে। খুবই অপ্রত্যাশিতভাবে এই ঘটনায় প্রভাবক হয়েছেন বৃদ্ধ এছাহাকের মা। ঠিক এছাহাকের মাও না, আসলে প্রভাবক হয়েছে তার মৃত্যু। তিনি মারা গেছেন। মৃত্যুর সময় তার বয়স কত হয়েছিল এই নিয়ে লোকমুখে নানা কথা শোনা যায়। কারও মতে তিনি একশ' বছর পেয়েছিলেন। কারও মতে একশ' না হলেও কাছাকাছি। তবে সারাজীবন অন্যের বিপদে শক্ত হয়ে পাশে দাঁড়ানো এছাহাকের মা মারা গেছেন আক্ষেপ নিয়ে। তার ছেলে এছাহাককে তিনি রেখে গেছেন একা। শেষ দিকে অসুস্থ হয়ে পড়া এছাহাকের মা দেখেছেন তার দেবর-ভাসুরের ছেলেপুলেরা কেমন পায়ে পাড়া দিয়ে শত্রুতা করছে এছাহাকের সঙ্গে। সবটাই যে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সামান্য সম্পত্তি জবরদখল করার কৌশল, তা এছাহাকের মা জানতেন। তিনি আরও জানতেন, যেদিন তিনি চোখটা বুজবেন, সেদিনই বারো ভূতে লুটেপুটে খেতে চাইবে এছাহাককে। এই গাঁয়ে এখন লতু হাওলাদারের দাপট। কিন্তু লতু হাওলাদার কেমন লোক সেটা এছাহাকের মায়ের চেয়ে ভালো আর কে জানে! মরার দিনকয়েক আগে এছাহাকের মা তাই দুলাল মেম্বারকে খবর দিয়ে আনালেন। এছাহাকের ভাগের জমির দলিলটা তার হাতে দিয়ে বললেন, 'ভাইরে, এই জগতে আমার এছাহাকরে দেখার আর কেউ রইল না।'

দুলাল মেম্বার অল্প কথার মানুষ। সে খুব একটা কথা বলল না। দলিলটা নিয়ে বাড়ির সিন্দুকে পুরে রাখল। এছাহাকের মা মারা যাওয়ার মাসদুয়েকের মধ্যে এছাহাকের চাচাত ভাইরা উঠেপড়ে লাগল। সবচেয়ে বিপজ্জনক তার বড় চাচার ছেলে ছত্তার। সে গাঁয়ের উঠতি মাতুব্বর। ছত্তারের দাবি এছাহাকের ঘরের বেড়া ঘেঁষে যে বিশাল জাম গাছ, সেটির মালিকানা আসলে তার। এই নিয়ে নানান ঝগড়া-বিবাদ। শেষ পর্যন্ত গ্রাম্য সালিশে সিদ্ধান্ত হলো আমিন এনে জমি মাপা হবে। জমি মাপলেই বোঝা যাবে গাছ আসলে কার ভাগে পড়েছে! এর মধ্যে এছাহাকের শ্বশুর অসুস্থ হয়ে পড়ল। এছাহাক তার বৌকে নিয়ে গেল শ্বশুরবাড়ি। দিন পাঁচেক পর বাড়ি ফিরে দেখে অত বড় জাম গাছটা আর নেই! ছত্তার জাম গাছ কেটে ডালপালাসুদ্ধ বিক্রি করে দিয়েছে। এই নিয়ে বাধল

www.boighar.com

বিশাল হুলস্থুল। এছাহাক দুপুরবেলা মাছ কোটার বঁটি নিয়ে গেল ছত্তারকে কোপাতে। ছত্তারকে বাড়ি না পেয়ে ভীষণ চেঁচামেচি হলো। ছত্তারের বউ চেঁচামেচি শুনে বের হয়ে এলো। এককথা-দুকথায় তাদের ঝগড়াও তেতে উঠল। হঠাৎ উঠানের কোনায় পড়ে থাকা নারকেল শলার ঝাড়ু নিয়ে তেড়ে এলো ছত্তারের বউ। এছাহাক পুরুষ মানুষ। তার সঙ্গে সে গায়ের জোরে পারবে কেন! এছাহাক নিজেকে বাঁচাতে হোক আর রেগে গিয়েই হোক, ধাক্কা দিতেই হাত-পা ছড়িয়ে উঠানে পড়ে গেল ছত্তারের বউ।

এই নিয়ে পরিস্থিতি হলো ভয়াবহ। শেষ অবধি আবার সালিশ বসল। গাঁয়ের কয়েকজন মুরব্বি লোকের সেই সালিশে ছত্তারের বউয়ের 'গায়ে হাত' দেওয়ার অপরাধে এছাহাককে কড়া শাস্তি দিল লতু হাওলাদার। দশ হাজার টাকা জরিমানা আর প্রকাশ্যে এছাহাকের বউয়ের পা ধরে মাফ চাইতে হবে। এছাহাক তার কথা বলার চেষ্টা করল। কিন্তু ছত্তারের লোকজন আর লতু হাওলাদার সেই সুযোগ তাকে দিল না। কিন্তু এছাহাক চিৎকার করে নানান কথা বলল। তার গাছ কাটার কথা বলল। কিন্তু লতু হাওলাদার মসজিদের নতুন ইমামকে সাক্ষী রেখে পরস্ত্রীর শরীরে হাত দেওয়ার অপরাধ এবং তার শাস্তি বর্ণনা করল। দু'চারজন যাও এছাহাকের পক্ষে ছিল, তারাও এরপর আর এছাহাকের কথা শুনতে চাইল না। এই সালিশে দুলাল মেম্বার ছিল না। কী এক কাজে সে গিয়েছিল মোঘলগঞ্জে! ফিরল সালিশের শেষের দিকে। আয়েশ করে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। তারপর বলল, 'তা মিয়ারা একখান সওয়াবের কামই করতেছেন আপনেরা, না কী বলেন?'

দুলাল মেম্বারের ভাবসাবে সবাই একটু নড়েচড়ে বসল। দুলাল মেম্বার এই এলাকার বর্তমান মেম্বার না। সে মেম্বার বহু আগের। কিন্তু সেই থেকে তার নামের সঙ্গে মেম্বার শব্দটি স্থায়ীভাবে জুড়ে গেছে। তার সঙ্গে সেই ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে হেরে গিয়েছিল লতু হাওলাদার। সেই থেকেই সম্পর্ক খানিক শীতল। আর বহুদিন চুপচাপ থাকার পর দুলাল মেম্বারও আজকাল যযাতিপুরের নানা বিষয়-আশয়ে নাক গলানো শুরু করেছে। যেটা লতু হাওলাদারের পছন্দ না। পছন্দ না ছত্তারেরও। ফলে দুলাল মেম্বারের এমন উপস্থিতি উপস্থিত সবার মধ্যে একটা সাড়া ফেলে দিল। লতু হাওলাদারের চেয়ে বয়সে দু'চার বছরের ছোটই হবে দুলাল মেম্বার। লতু হাওলাদার দুলাল মেম্বারকে তুমি করেই বলে।

লতু হাওলাদার বলল, 'কেন দুলাল, তুমি কি কিছু বলতে চাও নাকি?'

দুলাল মেম্বার বলল, 'না লতু ভাই। কী আর বলব? বিচার-আচার তো সব আপনেরা শেষই কইরা ফালাইছেন। তো গাঁয়ে আরও দুই-চাইরজন মান্যগণ্য মানুষ তো আছে। তাদের কাউরে না ডাইকাই বিচার কইরা ফালাইলেন। বিষয়টা কেমন হইয়া গেল না?'

লতু হাওলাদারের পাশে বসা ছিল তার ছেলে মোস্তফা। মোস্তফা পাশ থেকে বলে উঠল, 'কেন মেম্বার চাচা? এইখানে কে নাই? উত্তরপাড়ার লোক আছে, কাজী বাড়ির লোক আছে, ময়মুরব্বি কম-বেশি সবাই-ই তো আছে।'

দুলাল মেম্বার বলল, 'তার মানে হইল, এই সালিশিতে যযাতিপুরের সব গণ্যমান্য লোকজনই আছে?'

প্রশ্নের উত্তর দিতে যাচ্ছিল মোস্তফা। কিন্তু লতু হাওলাদার হাতের ঈশারায় তাকে থামিয়ে দিল। মোস্তফা দুলাল মেম্বারের চালটা ধরতে পারেনি। দুলাল মেম্বার কৌশলে মোস্তফার কাছ থেকে এই স্বীকারোক্তি আদায় করতে চাচ্ছে যে, এই সালিশে আজ যারা বিচারক হিসেবে উপস্থিত, তারাই শুধু এলাকার গণ্যমান্য লোক। বিচার-আচার করার যোগ্য। আর যারা অনুপস্থিত তারা কেউ গুরুত্বপূর্ণ না। মোস্তফা বিষয়টা ধরতে না পেরে ইতিমধ্যেই খানিকটা বোকামিটা করে ফেলেছে। যেটুকু বাকি আছে সেটুকুও করে ফেললে বিপদ। কারণ গাঁয়ে ইতিমধ্যেই লতু হাওলাদার বিরোধী শক্ত একটা জোট গড়ে উঠেছে।

লতু হাওলাদার বলল, 'তা না দুলাল। সবাইর তো আর সবসময় সব বিচার-আচারে যাওনের সুযোগ হয় না। কত কাম-কাইজ থাকে মানুষের। থাকে না? এই আমিই কি সব বিচার-আচারে যাওনের সময় সুযোগ পাই?'

দুলাল মেম্বার বলল, 'এইটা একটা ঠিক কথা বলছেন লতু ভাই। তয় জালাল কাজীরে তো বলতে পারতেন? সে আসতে পারত বিচারে। গ্রামে মুরব্বি বলেন, আর গণ্যমান্য বলেন, কোনো বিবেচনায়ই তো তারে ফালাই দেওনের সুযোগ নাই। কী বলেন?'

লতু হাওলাদার খানিকটা চুপ করে গেলেন। জালাল কাজীকে ইচ্ছে করেই বলা হয়নি। সে যযাতিপুরে লতু হাওলাদারের আরেক চক্ষুশূল। সবকিছুতেই বাগড়া দেওয়ায় ওস্তাদ। দুলাল মেম্বারের সঙ্গে জোট বেঁধেছে। কিন্তু লতু হাওলাদার স্বাভাবিক গলায় বলল, 'এইটা এমন জরুরি কোনো বিচার-আচার না রে দুলাল। নিজেদের নিজেদের ব্যাপার। সামান্য বিচার।'

দুলাল মেম্বার বলল, 'বিচার সামান্য হোক আর অসামান্য হোক, অর্ধেক বিচার কইরেন না। করলে পুরা বিচারটাই কইরেন।'

লতু হাওলাদার না বোঝার ভান করে বললেন, 'অর্ধেক বিচার কী করলাম দুলাল? এইখানে এই যে এত মানুষ, এদের সামনেই তো বিচার হইছে। ইমাম সাব নিজে উপস্থিত আছেন। এইখানে অর্ধেক বিচার কী করলাম?'

দুলাল মেম্বার বলল, 'ছত্তার যে এছাহাকের গাছ কাটল, সেই বিচার কে করব?'

লতু হাওলাদার বলল, 'সেই বিচারও হইব। কিন্তু মাইয়া লোকের গায় হাত দেওন আর গাছ কাটন কি এক জিনিস? তুমি এইটা কী বলতেছ দুলাল?'

Boighar.com & ARS

দুলাল মেম্বার বলল, 'এক জিনিস কে বলল? কোনোভাবেই এক জিনিস না। এইটা সবাই জানে। তবে এইখানে আমার দুইটা কথা আছে। এক, অপরাধ যেইটা আগে ঘটছে, সেইটার বিচার আগে হইব। দুই, ছত্তারের মুখে আমরা শুনতে চাই, এই যে এতক্ষণ ধইরা সবাই বলতেছে, এছাহাক তার বউয়ের শরীলে হাত দিছে। একটু ভালো কইরা শুনতে চাই, হাত দিছে মানে কী? কেমনে হাত দিছে? কী করছে হাত দিয়া? ছত্তারের নিজের মুখেই শুনতে চাই। নিজের বউয়ের মান-ইজ্জত নিজের কাছে, সে-ই বলুক, কী ছত্তার? কথা ঠিক আছে? নে বল? এছাহাক তোর বউয়ের শরীলে হাত দিয়া কী করছে?'

এই কথায় ছত্তার বসা থেকে ঝট করে দাঁড়িয়ে গেল। তার চোখ-মুখ শক্ত হয়ে গেছে। লতু হাওলাদার তাকে হাতের ঈশারায় বসতে বলল। তারপর দুলাল মেম্বারকে বলল, 'এইটা কী ধরনের কথা দুলাল? এই ভরা মজলিশে সে এই কথা রসাইয়া রসাইয়া বলব?'

দুলাল মেম্বার বলল, 'হাঁ, বলব। বললে সমস্যা কী? শরীলে হাত দেওয়া মানেই আপনে খারাপ কিছু ধইরা নিতেছেন কেন? ছত্তারের বউ এছাহাকের বড় ভাবী। বড় ভাবী অনেকের কাছেই নিজের মায়ের মতোন শ্রদ্ধা-ভক্তিরও হয়। এখন দেখা গেল ছত্তারের বউ হঠাৎ অসুস্থ হইয়া মাথা ঘুরাইয়া পইড়া যাইতেছে, সেইখানে যদি এছাহাক থাকে, এছাহাক দৌড়াইয়া গিয়া তারে ধরতে পারে না? সেইটাও তো শরীলে হাত দেওন। কী মিয়ারা ভুল কিছু কইলাম? শরীলে হাত দেওন মানেই তো খারাপ কিছু না। আপনেরা আগেই খারাপ কিছু ধইরা নিতেছেন কেন? আগে ছত্তাররে ঘটনা খুইলা বলতে দেন।'

উপস্থিত জনতার মধ্যে হঠাৎ হাসাহাসি শুরু হলো। লতু হাওলাদার উল্টা বাতাসের আঁচ পেয়ে বলল, 'থামেন মিয়ারা। কথা বুইঝা, কথা লন। আপনেরা এত বোঝেন, এইটা বোঝেন না, যে কাউর বউর শরীলে কেউ যদি ওইরকমভাবে নির্দোষ চিন্তায়, পরিস্থিতির কারণে বিপদ থেইকা রক্ষা করার উদ্দেশ্যে হাত দেয়, তাইলে সেইটা লইয়া সে কোনোদিন সালিশ ব্যবস্থা করতে আসে? যদি দোষের কিছুই না থাকে?'

দুলাল মেম্বার বলল, 'সবাই আসে না। তয় কেউ কেউ আসে।'

লতু হাওলাদার বলল, 'ছত্তার কি ওইরকম পোলা? কী মিয়ারা কথা বলেন না কেন?'

দুলাল মেম্বার বলল, 'হ মিয়ারা কথা বলেন না কেন? ছত্তার খুব ভালো পোলা। ভালো পোলা না হইলে সে একজনের অনুপস্থিতিতে আরেকজনের গাছ কাইটা নিয়া বেইচা ফালায়? যে এমন কাজ করতে পারে, সে ভালো পোলা না হইয়া যায় কই! সে তো দুধে ধোয়া তুলসী পাতা লতু ভাই। বিচার করতে আসছেন ভালো কথা। বিচার করলে বিচার করনের মতোন করেন। এই ভরা মজলিশে যযাতিপুরের মানুষের সামনে ছত্তার বলুক, তার বউর শরীলে এছাহাক

কেমনে হাত দিছে! অভিযোগ খোলাসা না হইলে, শাস্তিও তো খোলাসা কইরা দেওন যাইব না লতু ভাই। কী মিয়ারা ভুল কিছু বললাম?'

ভরা মজলিসে শুধু লতু মেম্বারের কারণে ছত্তারের হাত ফসকে বের হয়ে গেল এছাহাক। শুধু যে বের হয়ে গেল তাই-ই না। দুলাল মেম্বার যেন কষে অদৃশ্য শক্ত এক চড় বসালো লতু হাওলাদার আর ছত্তারের গালে। সেদিনের মতো সালিশি মুলতবি হয়ে গেল। পরে আবার দিন-তারিখ ঠিক করে সালিশি হবে। কিন্তু এবার ছত্তার নিজেই সালিশির তারিখ নিয়ে টালবাহানা করতে লাগল। দুলাল মেম্বার জানে, সে প্রকাশ্যে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। ছত্তার বা লতু হাওলাদার কেউই এর শোধ না নিয়ে ছাড়বে না। কিন্তু সে তো আর এমনি এমনি মুখোমুখি হয়নি! সে জেনে-বুঝেই মুখোমুখি হয়েছে। সে তার পায়ের তলায় শক্ত মাটি না পেয়ে সে যুদ্ধে নামেনি। এছাহাকের মায়ের মৃত্যু আর এছাহাকের জামগাছ যযাতিপুরে প্রকাশ্যে নিয়ে এলো নতুন ক্ষমতার দ্বন্দ্ব।

সেই ক্ষমতার দ্বন্দ্বের পেছনে অদৃশ্য শক্তি হয়ে রইল আরও কিছু মানুষ।

হারাধন আর তালেব মাঝির খুনের পর আবার দীর্ঘ সময়ের জন্য চুপ করে গিয়েছিল আবদুল মমিন আর তার দল। কোনো সাড়াশব্দ ছিল না। ছিল না মানে একদমই ছিল না। যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছিল। এই নিয়ে সবচেয়ে বেশি দুশ্চিন্তায় ছিল লতু হাওলাদার। তার ফাঁকামাঠে গোল দেওয়ার পরিকল্পনার তাহলে কী হবে! এতগুলো মানুষ হারিয়েও সাড়াশব্দ ছিল না গালকাটা বশিরেরও। না থাকার কারণও অবশ্য ছিল। খাসের হাটের দুটো খুন আর যযাতিপুরে দুটো খুনের পর একটা বড় ঘটনা ঘটল। যযাতিপুরে পুলিশ এলো। যযাতিপুরের জন্য এটা অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। যযাতিপুরের ইতিহাসে পুলিশ আসার ঘটনা খুবই বিরল। বড় ট্রলারে করে দশজন পুলিশ এলো। তারা অবশ্য তেমন কিছুই করল না। যযাতিপুর বাজারে চা-বিস্কুট খেয়েই চলে গেল। এমনকি তারা গ্রামের ভেতরে ঢুকল না পর্যন্ত। যেখানে হারাধন আর তালেব মাঝি খুন হয়েছে, সেখানেও গেল না। যেন এই প্রত্যন্ত দুর্গম এলাকায় তারা নিজেরাই কোনো এক অজানা ভয়ে দিশেহারা। তবে এর অনেক দিন পর এক সন্ধ্যায় আবদুল মমিনের দলের কারও সঙ্গে সম্ভবত কথা হয়েছিল লতু হাওলাদারের। লতু হাওলাদার পুরোপুরি নিশ্চিত ছিল না। তবে সে জানে, তার ধারণা ভুল হওয়ার সম্ভাবনাও কম। সে খাসের হাটে গিয়েছিল কী কাজে। কাজ শেষে এক দোকানে বসেছে চা খেতে। লুঙ্গি আর গেঞ্জি পরা এক কমবয়সী যুবক ছেলে এসে তার পাশে বসল। তারপর নানা কথাবার্তা শেষে তাকে জিজ্ঞেস করল হারাধন আর তালেব মাঝির খুনের কথা। লতু হাওলাদার বলেছিল এই বিষয়ে মানুষে যতটুকু শুনেছে, সে তার চেয়ে বেশি কিছু জানে

Boighar.com & ARS

না। সে শুনেছে ওরা দুইজন গালকাটা বশিরের গোপন সোর্স হিসেবে কাজ করত। লতু হাওলাদারের তখনই কেন যেন মনে হয়েছিল এই লোক আবদুল মমিনের দলের লোক। সে তাই আকারে-ইঙ্গিতে বোঝানোর চেষ্টা করেছিল, তারা যেকোনো প্রয়োজনে যযাতিপুর এলে সে তার সাধ্যমতো সহযোগিতা করবে। তারা তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে। কিন্তু এরপরও অনেকদিন আবদুল মমিনের তরফ থেকে কেউ তার কাছে আসেনি।

এসেছিল অনেকদিন পর। লতু হাওলাদার এশার নামাজ পড়তে যাচ্ছিল মসজিদে। তার হাতে তিন ব্যাটারির লাইট। সে মসজিদের আগে ঘন বাঁশঝাড়টার কাছে এসে কেবল লাইটটা নিভিয়েছে। এই মুহূর্তে অন্ধকার থেকে গলাটা শুনতে পেল, আবদুল মমিনের গলা, 'হাওলাদার সাব, লাইট জ্বালাইয়েন না, আমি আবদুল মমিন।'

লতু হাওলাদারের বুকের ভেতরটা হঠাৎ ভয়ে ছ্যাঁৎ করে উঠল। সে লাইট না জ্বালিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। আবদুল মমিন বলল, 'ভয় পাইলেন নাকি হাওলাদার সাব? আপনি তো আমাদের নিজেদের লোক। আপনার আর ভয় কী?'

লতু হাওলাদার অন্ধকারেই জোর করে মুখে হাসি ফোটাল। তারপর বলল, 'কী যে কন ভাই? ভয় পাব কেন? আপনি হইলেন গিয়া আমার আপনা লোক।'

আবদুল মমিন বলল, 'ঠিক কথা। আপনার সঙ্গে জরুরি কথা আছে। বাড়ি চলেন। নামাজটা বাড়িতেই পইড়েন।'

সেই রাতে আবদুল মমিন দলবল নিয়ে লতু হাওলাদারের বাড়িতে খেল, যযাতিপুরের নানান খোঁজখবর নিল। মজিবর মিয়ার খবর নিল, আরশির কোনো খোঁজ পাওয়া গেছে কিনা, সেই খোঁজ নিল। এমনকি লাইলির খবরও নিল। আর সরাসরি না নিলেও মালোপাড়ার খোঁজখবরও জানতে চাইল। অবশ্য যশোদা স্যারের কথা কিছু জিজ্ঞেস করল না। দীর্ঘ সময় নিয়ে অদ্ভুত এক পরিকল্পনার কথা বলল আবদুল মমিন। যেই পরিকল্পনায় লতু হাওলাদারের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পুরো বিষয়টি শুনে লতু হাওলাদারের মনে হলো, অবশেষে ধীরে ধীরে তার সব ইচ্ছাই পূরণ হতে যাচ্ছে। সবচেয়ে বড় কথা সেইদিনই লতু হাওলাদার নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল যে যশোদা স্যারের সঙ্গে তার সেই দেখা করার বিষয়টা তাহলে আবদুল মমিন জানে না। সবকিছু মিলিয়ে তার বুক থেকে যেন পাথর ভার নেমে গিয়েছিল। সুযোগ বুঝে মজিবর মিয়ার বিরুদ্ধে নানান বিষোদগার করেছিল। সঙ্গে দুলাল মেম্বার আর জালাল কাজীর বিরুদ্ধেও।

গভীর রাতে আবদুল মমিন চলে গিয়েছিল। চলে যাওয়ার আগে বলে গিয়েছিল সে আবার যযাতিপুর আসবে। কারণ বহু খেলা এখনও বাকি আছে।

সে এখন দল গোছাচ্ছে। দল গোছানো শেষ হলেই সে আবার যযাতিপুরেই আসবে।

এর মাসখানেকের মধ্যে আবদুল মমিন আবার এলো। এবার তার দল সংখ্যায় ভারী। দলে নতুন মুখও আছে। সে রাতে লতু হাওলাদার দুলাল মেম্বার আর জালাল কাজী সম্পর্কে নানান আজেবাজে কথা বলল আবদুল মমিনকে। যার বেশিরভাগই বানানো। সে ভাত খাওয়া শেষে আবদুল মমিনকে পান দিতে দিতে বলল, 'মমিন ভাই, পরিস্থিতি বেশি খারাপ হওনের আগেই ব্যবস্থা নেওন ভালো না?'

আবদুল মমিন বলল, 'কী পরিস্থিতি?'

লতু হাওলাদার বলল, 'আপনারে কী বলব! এই যে আপনি যযাতিপুরে আসেন, এইখানে আপনার আপন বলতে আছি এক আমি। এইটা কিন্তু অনেকেই জানে। গালকাটা বশিরও জানে। এইজন্য সে কী করছে, সে এখন দুলাল আর জালালের সঙ্গে গোপনে ঘোট পাকাইতেছে। যাতে যযাতিপুর থেইকা আপনারে আর আমারে উঠাই দিতে পারে। তাইলে এইটা হইয়া যাইব তার আসল ঘাঁটি। স্থায়ী নিরাপদ ঘাঁটি।'

লতু হাওলাদার ভেবেছিল তার এই বানানো গল্প শুনে আবদুল মমিন চমকে উঠবে এবং একই সঙ্গে রেগে যাবে। কিন্তু আবদুল মমিন উল্টো তাকেই চমকে দিল। সে নির্বিকার গলায় বলল, 'আপনি যা বললেন, আমি সেইটা আগেই জানি হাওলাদার সাব। আপনি চলেন একটু স্লো। আপনি স্লো চললে অবশ্য অসুবিধা নাই। কিন্তু আমরা স্লো চললে অসুবিধা। এক সেকেন্ডের এদিক-ওদিকের ওপর আমাদের জীবন-মরণ নির্ভর করে। সুতরাং আমরা স্লো হইলে বিপদ। এই ঘটনা আমরা আগেই জানি!'

লতু হাওলাদারের ভিরমি খাবার দশা হলো। আজকাল তার কী হয়েছে! সবকিছু এত দেরি করে জানে কেন? সেই রাতে লতু হাওলাদারের ঘুম হলো না। সে পড়ল মহা দুশ্চিন্তায়।

মজিবর মিয়া আজকাল মাঝে মাঝেই রাতেও আড়তে থাকে। সঙ্গে থাকে মনাই। সেদিন রাতে মজিবর মিয়া হঠাৎ মনাইকে বলল, 'মানুষ বাঁচে কেন রে মনাই?'

মনাই তার কথা বুঝল না। কিন্তু সে একটা অদ্ভুত উত্তর দিল। বলল, 'মানুষ বাঁইচা থাকে মইরা যাওনের লাইগা।'

মনাইয়ের উত্তর শুনে মজিবর মিয়া হঠাৎ থমকে গেল। তার মনে হলো মনাই একটা তীব্র কঠিন সত্য কথা বলেছে। এই জগতে মানুষের জন্ম, বেড়ে ওঠা, বেঁচে থাকা সবই মরে যাওয়ার জন্য। মানুষ আসলে মৃত্যুর প্রয়োজনে

Boighar.com & ARS

জন্মায়, বেঁচে থাকে। আরশির কথা আজ তার খুবই মনে পড়ছে। বুকের ভেতরটা কেমন এক তীব্র হাহাকারে ডুবে আছে। কত দিন! কতটা বছর! কেমন আছে আরশি? মজিবর মিয়ার হঠাৎ মনে হলো, আচ্ছা সেদিন লোকমান যদি তাকে মেরে ফেলত, যদি শুকরঞ্জন ডাক্তার তাকে না বাঁচাত, তাহলেও কি মৃত্যুর ওপারে বসে আরশির জন্য তার এমনই লাগত? নাকি মৃত্যুর পর পার্থিব এসব মায়া, মমতা আর ভালোবাসার কোনো হিসাব থাকে না। সবকিছু মুছে যায়। মুছে যায় অসীম শূন্যতায়! যদি তা-ই হয়, তাহলে জগতের এই এতটুকু সময়, এই এতটুকু বেঁচে থাকায় এত মায়া কেন? এত ভালোবাস কেন? বুকের ভেতরটা খাঁ খাঁ শূন্য প্রান্তরের মতো কারও কারও জন্য অবিরাম কেঁদে যায় কেন? বহুকাল পর তার আজ নিলুফা বানুর কথাও মনে পড়ল। জীবনটা কী অদ্ভুত! সে কই ছিল, আর নিলুফা বানু কই ছিল! কেউ কাউকে চিনত না, জানত না। অথচ সেই মানুষ দুটো কী আচানকভাবেই না চলে এলো জগতের সবচেয়ে কাছাকাছি। সব সুখ, দুঃখ, অভিমান, রাগ সবকিছু কি অবলীলায়ই না মিলে-মিশে একাকার হয়ে গেল। যেন দুটো মানুষের একটা মাত্র ছায়া। একটা মাত্র প্রতিবিম্ব। আবার মৃত্যু এসে কি সর্বগ্রাসীভাবেই না সবকিছু মুহূর্তে নিয়ে গেল সীমাহীন দূরত্বে। কিন্তু রেখে গেল সেই অন্তহীন মমতার চিহ্ন, আরশি। অথচ আজ নিলুফা বানু কোথায় আছে! মিশে আছে কোনো মাটির শরীরে! কোথায় আছে আরশি? আর কোথায় সে! কী বিচিত্র হিসাব-নিকাশ এই জগৎ-সংসারের! আচ্ছা মৃত্যুর ওপার থেকে নিলুফা বানু কী সব দেখছে? তারও কি মন খারাপ হয়? কষ্ট হয়? বুকের ভেতর কেমন হু হু করা অনুভূতি হয়!

www.boighar.com

এসব কী ভাবছে মজিবর মিয়া! সে যা ভাবছে তার সবাই কি অর্থহীন? মৃত্যুর পর এই জগতের কোনো কিছুরই কি আর কোনো মূল্য থাকে না? সবকিছুই কি ঢেকে যায় শ্রেফ শূন্যতায়? যদি তাই হবে, তাহলে এই রাতজাগা তীব্র কষ্ট, এই দিনমান বয়ে বেড়ানো সুদীর্ঘ দীর্ঘশ্বাস, এই মায়া, এই এত এত মমতা, এদের মূল্য কী?

অন্ধকারে ফিসফিস করে কথা বলছে লাইলি। মোস্তফা তার কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছে। লাইলি বলল, 'লুলা ব্যাটারে দেখলেই আমার শরীলটা আগুন হইয়া যায়'।

মোস্তফা ফিসফিস করে বলল, 'এখনও মজিবররে দেখলে তোমার শরীল গরম হয়! আহারে! কী পুরুষ যে হইলাম জীবনে। এই রকম তাগড়া জোয়ান হওনের পরও আমারে দেইখা কোনো মাইয়ার শরীল গরম হয় না।'

লাইলি অন্ধকারে মোস্তফার মাথায় আলতো চাটি মেরে বলে, 'সব সময় খালি ফাইজলামি।'

মোস্তফা বলে, 'আচ্ছা ফাইজলামি বাদ। তুমি যেমনে পার, জমিগুলানের ব্যবস্থা কর। এখন হাতে উপায় আছে দুইটা, এক তহুরার নামে জমি লেখাই নেওনের ব্যবস্থা কর। আর দুই, জমি আর আড়তের দলিল কই রাখছে সেইটা খুঁইজা বাইর করা। ওইগুলা হাতে পাইলে বাকি ব্যবস্থা আমার।'

লাইলি বলল, 'আর লুলা ব্যাটার ব্যবস্থা?'

মোস্তফা বলল, 'ওইটা করতেও আমারে লাগব? আমি জানি, ওইটা তে তুমি একলাই যথেষ্ট। আর বাদবাকিটা তো আব্বায়ই দেখতেছে। তোমার ভয় তো গালকাটা বশিররে? ওইটা আব্বায় দেখতেছে।'

লাইলি বলল, 'তারপর?'

মোস্তফা বলল, 'তারপর আর তোমারে ভাবী ডাকতে পারব না।'

লাইলি বলল, 'তাইলে কী ডাকবা? বউ?'

মোস্তফা অন্ধকারে লাইলির গাল টিপে ধরে বলে, 'আব্বারে রাজি করানো একটু ঝামেলা হইব। তবে ওইটা নিয়া তুমি চিন্তা কইর না। সব ব্যবস্থা কইরা ফেলব আমি।'

লাইলি আহ্লাদি গলায় বলল, 'বললা না তো, তখন কী ডাকবা, বউ?'

মোস্তফা ডান হাতে লাইলির মাথা টেনে ধরে নিচে নামিয়ে তার ঠোঁটে গভীর চুম্বন খেতে খেতে বলল না, 'লাল টুকটুকি ডাকব। লাল টুকটুকি।'

যশোদা স্যার এসব পার্টি সংক্রান্ত বিষয়াদি থেকে ঝাড়া হাত-পা হয়েছিলেন বহু আগেই। কিন্তু মজিবর মিয়ার ইস্যুতে তাকে সামান্য সময়ের জন্য হলেও যুক্ত হতে হয়েছিল। তিনি নানান ঝামেলা করে নিয়ে এসেছিলেন গালকাটা বশিরকে। সমস্যা হয়েছে তার কারণেই গালকাটা বশির পড়েছে নতুন বিপদে। লোকমান বেঁচে থাকতে তার গ্রুপের সঙ্গে দ্বন্দ্ব সামলানো যতটা সহজ ছিল, এখন বিষয়টা মোটেই ততটা সহজ না। কারণ মাথামোটা লোকমানের পরিবর্তে এখন সেই গ্রুপ চালায় ধুরন্ধর আবদুল মমিন। আবদুল মমিনের কৌশল আর বুদ্ধির সামনে নিজের বুদ্ধিতে টিকে থাকা গালকাটা বশিরের জন্য অসম্ভব। এর প্রমাণও মিলেছে গত ক'বছরে। তাছাড়া দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনেকটাই স্থিতিশীল হওয়ার কারণে এই অঞ্চলের চরমপন্থী দলগুলোর বিরুদ্ধে সরকারের অবস্থানও দিন দিন কঠোর হচ্ছে। প্রায়ই পুলিশের কড়া অভিযান চলছে। ফলে শহর কিংবা জেলা পর্যায়ে টিকে থাকা তাদের জন্য ক্রমশই কঠিন হয়ে যাচ্ছে। এই চরম বিপদের দিনে গালকাটা বশির যার সাহায্য সবচেয়ে বেশি আশা করেছিল, সে হলো যশোদা স্যার। কিন্তু যশোদা স্যারকে নিজ থেকে কিছু বলার সাহস তার নেই। তাই শত বিপদেও যশোদা স্যারকে সে কিছু বলেনি। তবে বছরখানেক আগে যশোদা স্যার তাকে হঠাৎ ডেকে

Boighar.com & ARS

বলেছিলেন, 'সময়-সুযোগ বুঝে চুপচাপ যযাতিপুর চলে যাবি। কেউ যেন না দেখে। ওইখানে দুলাল মেম্বার আর জালাল কাজী আছে। ওদের সঙ্গে যোগাযোগ কর। আমার কথা বলবি।'

গালকাটা বশির বলেছিল, 'কেন?'

যশোদা স্যার বলেছিলেন, 'কেন সেটা এখন জানার দরকার নেই। যখন জানার দরকার হবে, আমি বলব। আপাতত যা বলছি সেটা কর, ওদের সঙ্গে একটা নিয়মিত যোগাযোগ, সম্পর্ক তৈরি কর। কিন্তু খুব গোপনে। কেউ যেন না জানে। গ্রামে বিভিন্ন কাজকর্মে যুক্ত হতে বল। বল, যেকোনো প্রয়োজনে তুই সাহায্য করবি। মোট কথা তুই ওদের সঙ্গে আছিস।'

গালকাটা বশির অবাক চোখে তাকিয়ে থেকে বলল, 'আচ্ছা।'

সে জানে, যশোদা স্যার যা বলেন, তা তার জন্য অবশ্য পালনীয়। এরপর বছরখানেক কেটে গেছে। দুলাল মেম্বার আর জালাল কাজীর সঙ্গে তার একটা নিয়মিত কিন্তু অতি গোপন যোগাযোগও তৈরি হয়েছে। গালকাটা বশির যেহেতু প্রয়োজনে তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করার আশ্বাস দিয়েছে। সুতরাং গাঁয়ে বিভিন্ন সালিশ ব্যবস্থা, বিচার-আচারে তারা নিজেরা নানাভাবে যুক্তও হয়েছে। কিন্তু যশোদা স্যার এতদিনেও সেই কারণ কিছু বলেননি। আজ হঠাৎ এতদিন পর যশোদা স্যার দুলাল মেম্বার, জালাল কাজী এবং গালকাটা বশিরকে ডেকেছেন। তবে সবার আগে ডেকেছেন গালকাটা বশিরকে। গালকাটা বশির চলে এলো সন্ধ্যার আগে আগেই। যশোদা স্যার কোনো ভণিতা না করে সরাসরিই বললেন, 'শোন, দেশের যা অবস্থা। সামনে টিকে থাকতে হলে গাঁওগ্রাম ছাড়া উপায় নাই। আর প্রশাসনের সাহায্য ছাড়া টিকে থাকতেও পারবি না। বছর দুই বাদে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন। ওই নির্বাচনে চেয়ারম্যান আর মেম্বার পদে নিজেদের লোক জেতাতে পারলে অন্তত পক্ষে স্থানীয় পর্যায়ে বড় একটা প্রশাসনিক সাপোর্ট থাকবে। বুঝছিস?'

গালকাটা বশির বলল, 'একটু একটু'।

যশোদা স্যার বললেন, 'যযাতিপুর প্রত্যন্ত গ্রাম। সুতরাং এখানে দীর্ঘমেয়াদে ঘাঁটি গাড়ার চিন্তা করাই ভালো। নিচে নিচে ঘটনা অনেক দূর গড়িয়েছে। আবদুল মমিন ইতিমধ্যেই এই পরিকল্পনা ধরে এগিয়েছে। এই জন্যই লতু হাওলাদার আর তার ছেলে মোস্তফাকে দিয়ে নির্বাচন করানোর পরিকল্পনা করছে আবদুল মমিন। বাপ চেয়ারম্যান আর ছেলে মেম্বার পদে। সে তার জান দিয়ে চেষ্টা করবে এদের নির্বাচনে জেতাতে। এদের নির্বাচনে হার-জিতের ওপর তার যযাতিপুরে টিকে থাকা নির্ভর করে। তো এখন টিকে থাকতে হলে এই খেলায় আমাদেরও নামতে হবে। খেলায় হেরে গেলে বিপদ। এমনিতেই আমি তোরে বড় ঝামেলায় ফেলেছি। এখন আগেভাগে প্রস্তুতি না নিলে কিন্তু আরও বড় ঝামেলা। তুই যেটা করবি, লতু হাওলাদার আর তার

ছেলের বিরুদ্ধে দুলাল আর জালালরে দিয়ে নির্বাচন করাবি। এখন মনে হচ্ছে হাতে অনেক সময়, কিন্তু নির্বাচনের প্রস্তুতির জন্য দুই বছর কোনো সময় না। প্রস্তুতিটা এখনই নিতে হবে। কিন্তু খুব সাবধান। তুই দলবল নিয়া সবসময় গোপনে মাঠে থাকবি। আবদুল মমিন ধুরন্ধর মানুষ। একটু এদিক-সেদিক হলেই কিন্তু সব শেষ। আর লতু হাওলাদার সাক্ষাৎ গোখরা সাপ'।

গালকাটা বশির বড় বড় চোখ করে যশোদা স্যারের দিকে তাকিয়ে রইল।

দুলাল মেম্বার আর জালাল কাজী পৌছাল রাত করে। যশোদা স্যারের সঙ্গে তাদের দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা হলো। আলোচনা শেষে ভোররাতের দিকে বাড়ি ফিরল দুলাল মেম্বার আর জালাল কাজী। কাজী বাড়ির কাছের বাঁশঝাড়ের জায়গাটা অন্ধকার। এই অন্ধকার জায়গাটা পার হতে গিয়েই হুমড়ি খেয়ে পরল জালাল কাজী। হাঁটুর নিচটায় যেন ছোবল মেরে কেউ এক খাবলা মাংস তুলে নিল। সে মুহূর্তের জন্য আগুনের ফুলকিটা দেখল। বাঁশঝাড়ের ভেতর থেকে কেউ গুলি করছে! জালাল কাজী আহত পা নিয়েই বা দিকে গড়িয়ে পড়ল পাশের খালে। পানির তলায় ডুবে রইল দীর্ঘ সময়। সেই যাত্রা বেঁচে গেল জালাল কাজী। কিন্তু যযাতিপুরে শুরু হলো তুমুল অস্থির এক সময়। যার প্রতিটি মুহূর্ত প্রবল শঙ্কার। আতঙ্কের আর মৃত্যুর।

www.boighar.com

বিস্ময়কর ব্যাপার হলো সেই খেলায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল পঙ্গু অথর্ব মজিবর মিয়া!

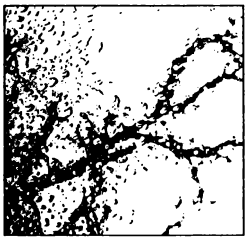

সেই পুঁথি পাঠের ঘটনায় আরশির নিস্পন্দ জগৎটা হঠাৎ যেন স্পন্দিত হয়ে উঠল। তার আশপাশের মানুষগুলো কী অদ্ভুত অচেনা দৃষ্টি মেলে তার দিকে তাকায়! এতদিনের চেনা মানুষটাও কেমন সমীহ করে কথা বলে। আরশির খুব অবাক লাগে, কত অল্পতেই মানুষের কাছে মানুষের মূল্যের, ওজনের হিসাব বদলে যায়! দিনকয়েক বাদে আশিষ এসেছিল, সেও যেন খানিকটা আলাদা করেই কথা বলল। আরশি সবই টের পায়। কিন্তু তার নিজের কি কিছু বদলাল? আরশি টের পায় না।

আশিষ এসে তাকে বাসায় নিয়ে গেল। বহুদিন বাদে আরশি দু'দিন বাসায় থাকল। মিলি ঠিকমতো কথা না বললেও আগের মতো হৈচৈ করল না। সে সারাদিন থাকে তার ছেলে নিয়ে। কাউকেই আশপাশে ঘেঁষতে দেয় না। আরশি যেদিন চলে আসবে, সেদিন মিলি হঠাৎ আরশিকে ডাকল। আরশি অবাক হলো খুব। আবার ভয়ও পেল খানিকটা। কিন্তু সে গেল। হামাগুড়ি দিয়ে হাঁটতে থাকা বাচ্চাটাকে নিয়েই পুরোটা সময় কথা বলল মিলি। মিলির চোখ, মিলির মুখ, মিলির চুল থেকে নখের ডগা পর্যন্ত যেন ঝলমল করছে অপার্থিব আনন্দে। আরশি মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। মানুষ কী অসম্ভব ভালোবাসার ক্ষমতা নিয়েই না জগতে আসে! তার সৌভাগ্য যে সে মিলির এই অপার্থিব ভালোবাসার একটা অংশ হতে পেরেছিল। আরশি এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল মিলির দিকে। ঘরের একটা ছোট্ট পরিবর্তন দেখে আরশি অবাক হলো। প্রতিটি কাঠ কিংবা স্টিলের কাঠামো সবকিছুই মোটা নরম উলের কাপড় বা তুলোর কভার দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। চেয়ার, টেবিল, আলমারি, খাট, আলনা থেকে শুরু করে সবকিছু। আরশি অনেকক্ষণ ভেবেও এই অদ্ভুত ব্যবস্থার কোনো কারণ বুঝতে পারল না। সে মৃদু গলায় জানতে চাইল। তার প্রশ্ন শুনে মিলি যেন আঁতকে উঠল। সে বলল, 'আরে, কী বলিস তুই! ওগুলোর কোনোটাতে ধাক্কা-টাক্কা লেগে বাবু যদি ব্যথা পায়!'

আরশি কথা বলল না। মিলির দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর ঘুরে তাকিয়ে আবার দেখল ঢেকে রাখা কাঠের কাঠামোগুলো। সে যেন এখনও মিলির

উৎকণ্ঠিত চোখ দেখতে পাচ্ছে, যেন শুনতে পাচ্ছে ছোট্ট বাক্যটা, 'ওগুলোর কোনোটাতে ধাক্কা-টাক্কা লেগে যদি বাবু ব্যথা পায়!' কী ছোট্ট একটা কথা, কত ছোট্ট। কিন্তু আরশির খুব জানতে ইচ্ছে করল, মায়েরা এমন বিস্ময়কর কেন হয়!

এই অতি ক্ষুদ্র ঘটনায় তার মনে হলো এই জগতের সবকিছুই তার অদেখা রয়ে গেছে। সবকিছু। এরপর সপ্তাহখানেক আরশি কেমন চুপ হয়ে রইল। সারাটা দিন হোস্টেলে রুমের ভেতর করে ডুবে রইল। এক দুপুরে হোস্টেলের দারোয়ান তাকে একটা চিঠি দিয়ে গেল। চিঠি এসেছে রেডিও থেকে। আরশির সঙ্গে একজন অনুষ্ঠান নির্মাতা কথা বলতে চান। কিন্তু এসব নিয়ে আরশি কেন যেন কোনো আগ্রহ পেল না। তখন দেশে দুয়েকটা প্রাইভেট টেলিভিশন চ্যানেলও শুরু হয়েছে। এর দু'দিন বাদে তেমনি একটি টেলিভিশন চ্যানেল থেকে লোক এলো। তারা তাদের সকালবেলার অনুষ্ঠানে আরশিকে অতিথি করতে চায়। অনুষ্ঠানে আরশিকে দুটো পুঁথি পাঠ করে শোনাতে হবে। তার জীবনের গল্প বলতে হবে। বেড়ে ওঠা, অনুপ্রেরণা এইসব। আরশি সব শুনল। শুনে বলল, 'আমার সামনে পরীক্ষা। এখন তো হবে না। পরীক্ষার পর যদি হয়, দেখা যাক।'

কিন্তু আরশি ডুবে রইল অন্য কোথাও। অন্য কোনো জগতে। সেই জগতের খবর হয়তো সে নিজেই জানে না। কিন্তু সে ডুবে রইল। সারাটা দিন তার চোখের সামনে যেন ভেসে রইল আম্বরি বেগমের মুখ। আর মাথার ভেতর তার সেই গুনগুন সুরেরা। সেই চালতা গাছ, সেই ধবধবে সাদা ফুল। আম্বরি বেগমের কবর। আর বাবা। সব যেন এক এক করে চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল। কিন্তু আরশির মনে হচ্ছিল আরও একটা কিছু আছে, আরও একটা কিছু। যার জন্য তার বুকের ভেতরটা আকণ্ঠ তৃষ্ণায় হাঁসফাঁস করছে। সে ধরতে পারছে না। আর তার মাথার ভেতরে গুনগুন করা সেই সুরটা যেন ক্রমশই বেড়ে চলেছে। বেড়েই চলেছে। কী অদ্ভুত সুর। কী হাহাকার, কী তীব্র কান্না সেই সুরের পরতে পরতে,

'ছোট্ট মেয়ে চক্ষুর জলে কি কান্দন কান্দিল।
উড়িয়া আসিল দস্যুর উড়াল পঙ্খী নাও,
সেই নাও বান্ধা নদীর ঘাটে, কারে লইয়া যাও।
লইয়া যাও, লইয়া যাও মাঝি কাহার মায়েরে!
মা হারা ছোট্ট মেয়ে... ভাসিল চোখেরও সায়রে...'।

আরশির কী হলো সে জানে না। সে তার মাথা থেকে শেষ লাইন দুটো তাড়াতেই পারছিল না। কিছুতেই না। 'লইয়া যাও, লইয়া যাও মাঝি কাহার মায়েরে! মা হারা ছোট্ট মেয়ে... ভাসিল চোখেরও সায়রে...'। আরশির মনে হচ্ছিল তার বুকের ভেতর বাষ্প জমে জমে বিস্ফোরণোন্মুখ পরিস্থিতি তৈরি

Boighar.com & ARS

হয়েছে। যেকোনো সময় এই বিস্ফোরণ হবে, সেই বিস্ফোরণে তার বুকটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে যাবে। বৃহস্পতিবার হোস্টেলের ছাদে ওঠা যায়, সে দৌড়ে ছাদে উঠল। তার মাথার ওপর বিশাল আকাশ। আকাশ জুড়ে ঘন মেঘ। একা একা একটা চিল কই উড়ে যাচ্ছে! আবার ফিরে আসছে। আবার উড়ে যাচ্ছে। আবার ফিরে আসছে। যেন কোথাও যাওয়ার নেই। আরশির হঠাৎ মনে হলো সেই চালতা গাছ, সেই ধবধবে সাদা ফুল। আম্বরি বেগম, আম্বরি বেগমের কবর, তার বাবা মজিবর মিয়া, যযাতিপুর। এ সবকিছুর ছবিই তার চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে ভেসে উঠছে। কিন্তু কিছু একটা তার চোখের সামনে ভেসে উঠছে না। অদৃশ্যই থেকে যাচ্ছে। সেই অদৃশ্য ছবিটা দেখার জন্য তার বুকটা কষ্টে ভেঙে যাচ্ছে। কে সে? যাকে সে কখনও দেখেনি। অথচ তার জন্য তার বুকের ভেতর এমন সর্বগ্রাসী প্রলয়। এমন মাতম। সেই অদৃশ্য মানুষটার স্পর্শ কেমন জানতে খুব লোভ হয় তার। মানুষটার গায়ের গন্ধ কেমন, আচলের ছোঁয়া কেমন, জানতে খুব লোভ হয়। খুব। মানুষটা তার চোখের দিকে তাকিয়ে কেমন করে হাসত? কেমন করে কাঁদত, জানতে কী যে ইচ্ছে হয় আরশির! কিন্তু সে কোনোদিন জানতে পারবে না। মানুষটা হয়তো তাকে ছুঁয়ে দেখার সুযোগটুকুও পায়নি। বুকের ওমে টিপটিপ শব্দে আগলে রাখার সময়টুকুও সে পায়নি। 'লইয়া যাও, লইয়া যাও মাঝি কাহার মায়েরে! মা হারা ছোট্ট মেয়ে... ভাসিল চোখেরও সায়রে...'। আরশি জানে না। কিচ্ছু জানে না। আজ এই এত বছরে অদেখা সেই মানুষটার জন্য তার যে কি তীব্র কষ্ট হতে লাগল! কী ভয়ঙ্কর তীব্র কষ্ট। মা। মাগো। মা। আরশি কী কাঁদল! না আরশি কাঁদল না। যযাতিপুরের সেই ভয়ঙ্কর রাত্রির পর আরশি আর কাঁদেনি। আজও কাঁদল না। তবে তার বুকের ভেতরটা ক্রমশই শূন্য হতে থাকল। নিঃসীম মহাশূন্য।

www.boighar.com

পরীক্ষা চলে এসেছে কাছে। আরশির পড়াশোনা হচ্ছে না। সে যে চেষ্টা করছে না তা না। কিন্তু মাথার ভেতর সবসময় কীসব এলোমেলো ভাবনা জট পাকিয়ে থাকে। এই ভাবনার জট কী কখনও খুলবে! সেদিন সকাল থেকে দুপুর অবধি বই নিয়ে জানালার পাশে বসে রইল আরশি। কিন্তু একটা শব্দও পড়ল না। বরং তাকিয়ে রইল জানালার বাইরে। একটা লোক ভ্যানে করে হাওয়াই মিঠাই বিক্রি করছে। দুটো ফুটফুটে বাচ্চা দাঁড়িয়ে আছে ভ্যানটার পাশে। তাদের সঙ্গে তাদের মা। মা বাচ্চাদের হাওয়াই মিঠাই কিনে দিল। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে লাল রঙের হাওয়াই মিঠাই আছে মাত্র একটা। বাদবাকিগুলো অন্য রঙের। অথচ তাদের দু'জনেরই ওই লাল রঙটাই চায়। এই নিয়ে কান্না, চিৎকার, চেঁচামেচি। একজন হঠাৎ গড়িয়ে পড়ল ধুলোয়। তার গায়ের টুকটুকে লাল ফ্রকখানা

মুহূর্তেই ধুলোয় ধূসরিত হলো। সে চোখ-মুখ ফুলিয়ে প্রবল শক্তিতে চিৎকার করে কেঁদে যাচ্ছে। হাত-পা ছুড়ছে সবেগে। মা কিছুই বলল না। কিছুক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে রইল পাশে। তারপর হাত বাড়িয়ে তুলতে গেল। কিন্তু বাচ্চাটা ছিটকে সরে গেলে পাশে। প্রবল ক্রোধে মায়ের হাত সরিয়ে দিল তার শরীর থেকে। তারপর আবার চেঁচাতে লাগল। মাও বিষয়টিকে আর পাত্তা দিল না। নির্বিকার ভঙ্গিতে পাশে দাঁড়িয়ে কথা বলতে থাকল কারও সঙ্গে। বাচ্চাটা কিছুক্ষণ পর নিজে নিজেই উঠে এলো। তারপর মায়ের হাত ধরে বারদুয়েক টানল। মা ফিরে তাকাতেই সে আবার আগের জায়গায় ফিরে গিয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ল। তারপর আবার ঠিক আগের মতোই হাত ছড়িয়ে চেঁচাতে লাগল। তার মা কাছে যেতেই আবার সেই আগের মতোই ছিটকে সরে গেল। প্রবল বিক্রমে মায়ের হাত তার শরীর থেকে সরিয়ে দিল। মা আবার আগের মতোই নির্বিকার ভঙ্গিতে পাশের মানুষটার সঙ্গে কথা বলতে থাকল।

কী সাধারণ এক দৃশ্য। অতি তুচ্ছ এক ঘটনা। কিন্তু কী আগ্রহ নিয়েই না আরশি দেখল। তার মনে হলো এই অতি সাধারণ তুচ্ছ দৃশ্যের সঙ্গে মিলির ঘরের সেই 'ওগুলোর কোনটাতে ধাক্কা-টাক্কা লেগে যদি বাবু ব্যথা পায়' দৃশ্যের আসলে কোনো পার্থক্য নেই। দুটো পুরো আলাদা ঘটনা, আলাদা দৃশ্য কিন্তু এর প্রতিটি অংশে মিশে আছে জগতের সব অকৃত্রিমতা। সব অনুভূতিরা। এই ছোট্ট শিশু, এই মা, এরা যেন কোনো এক বিস্ময়কর পদ্ধতিতে জেনে গেছে এই জগতে তাদের পরস্পরকে পরস্পরের প্রতি কী সীমাহীন অধিকার দিয়েই না পাঠানো হয়েছে!

আরশির ম্যাট্রিক পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল। পরীক্ষার পর তিনমাসের ছুটি। প্রথম সপ্তাহেই সেই টেলিভিশন চ্যানেল আর রেডিওতে তার দুটো প্রোগ্রাম হয়ে গেল। কিন্তু নিজেকে নিয়ে সে তেমন কিছুই বলল না। টেলিভিশনে সে সেই আগের পুঁথির অংশটুকুই পড়ে শোনাল। আর যা কথা হলো তাতে আরশি তেমন কিছুই বলল না। তবে রেডিওর প্রোগ্রামটাতে মজার ব্যাপার ছিল, তাকে কিম্ভুত সুরের এবং কথার কিছু অন্ত্যমিল সমৃদ্ধ পঙ্‌ক্তি লিখে দেওয়া হতো। সে তার নিজের মতো করে তা গুনগুন করে পড়ে যেত। খালি গলায়। সপ্তাহে তিন দিন হতো প্রোগ্রামটা। একেকদিন একেক টপিক। যার বেশিরভাগই সচেতনতামূলক। একদিন তারা আরশির হাতে একটা খাম ধরিয়ে দিল। আরশি সেই খাম খুলে দেখে টাকা! জীবনে প্রথম উপার্জন! কিন্তু টাকা দিয়ে আরশি কী করবে? সে সেই টাকা রেখে দিল তার গোপন বাক্সে। সপ্তাহখানেক বাদে রুবিনা ফোন দিয়েছিল আশিষকে। আরশি চাইলে ছুটির সময়টা রুপাইর সঙ্গে কাটাতে পারে। আরশির করারও কিছু ছিল না। রুপাই মেয়েটাকে তার পছন্দ।

Boighar.com & ARS

প্রাণোচ্ছল ঝলমলে এক মেয়ে। আরশির চেয়ে বয়সে ছোট হলেও সে পড়াশোনায় আরশির চেয়ে বছর দুয়েকের বড়। ইন্টারমিডিয়েটটা শেষ হলেই ইউনিভার্সিটিতে উঠে যাবে। আরশি উঠে এলো রুবিনাদের বাসায়। কিন্তু এতে ক্ষতি যা হলো তা রুপাইয়ের। দিন-রাত গল্প। গান। আড্ডা। এই সময়টায় ঢাকা শহরটাকে কিছু কিছু দেখল আরশি। রূপাই হুটহাট গাড়ি নিয়ে বের হয়। সঙ্গে জোর করে তুলে নেয় আরশিকেও। সে আরশিকে কত কিছু শেখায়। পোশাক, সাজ, ছেলেদের সঙ্গে কথা বলার ভঙ্গি, আরও কতকিছু! আরশি হাসে আর রুপাইয়ের দিকে তাকিয়ে থাকে। জীবন কত সহজ! স্বচ্ছ! সরল! সেদিন রূপাই গেল তার পরীক্ষার জন্য কী সব কেনাকাটা করতে। আরশি দোকানের বাইরে দাঁড়িয়েছিল। ছেলেটা তার পাশে এসে দাঁড়িয়ে হুট করে থমকে দাঁড়াল, 'সরি'।

আরশি চোখ তুলে তাকাল। ছেলেটাকে চিনতে তার খানিকটা সময় লাগল। আসিফ! বড় বড় লাগছে খুব। যেন ধেই করে হঠাৎ বেড়ে উঠেছে। চেহারা থেকে এই দু'বছরেই বালকসুলভ ভাবটাও বিদায় নিয়েছে। সে নিজেও কি বড় হয়নি! আজকাল আয়নায় নিজেকে দেখলে মাঝে মাঝে চিনতে পারে না আরশি। মনে হয় অন্য কেউ দাঁড়িয়ে আছে।

আরশি কথা বলল, 'আপনি বড় হয়ে গেছেন'।

আসিফ বলল, 'তুমিও'।

আরশি বলল, 'হুট করে অপরিচিত কাউকে তুমি বলায় আমার আপত্তি ছিল।'

আসিফ বলল, 'কিন্তু এতদিন বাদেও তুমি কিন্তু আমাকে প্রথম পলকেই চিনে ফেলেছ। অপরিচিত আর থাকতে দিলে কই?'

আরশি বলল, 'চেনা আর পরিচিত কি এক?'

আসিফ বলল, 'না, তা না। তবে চেনা থেকে পরিচিত হওয়াটা খুব বেশি দূরের কিছু না।'

আরশি ভ্রু বাঁকিয়ে বলল, 'আপনার কথা ঠিক না, বরং বহু দূরের। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই চেনাটা আর পরিচিত হয়ে ওঠা হয় না। আমি অনেককেই চিনি, কিন্তু তারা আমার পরিচিত না। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল এমনকি সামনে ওই যে পোস্টারটা দেখছেন, ফিল্মের ওই হিরো-হিরোইনকেও আমি চিনি। কিন্তু উনারা কেউই আমার পরিচিত না। কখনও হওয়ার সুযোগও নেই। চেনা থেকে পরিচিত হওয়াটা বহুদূরের। তাই না?'

আসিফ হাসল, 'আপনাকে টিভিতে দেখেছি। হয়তো আরও অনেকের মতোই আপনি তাহলে আমারও চেনা হয়েই থাকছেন?'

আসিফ বড় হয়ে উঠেছে। তার শরীর জুড়ে সে পরিপূর্ণ যুবক। কিন্তু তার এই ছোট্ট কথাটার কোথায় যেন খুব সূক্ষ্ম হলেও লুকিয়ে ছিল মাঠের কোনায়

জানালার গ্রিলের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সেই আসিফ। যাকে তার বয়স বোঝাতে বলতে হতো, 'আমাকে দেখে যত ছোট মনে হয়, আমি কিন্তু আসলে ততটাই বড়, ইউনিভার্সিটি সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি।'

দু'বছর অনেক সময়। কিন্তু আরশির এই ছেলেটার জন্য হঠাৎ কেমন মায়া করে উঠল বুকের ভেতর।

আসিফ বলল, 'আমি কিন্তু পরিচিত হতেই চেয়েছি। দিনের পর দিন দাঁড়িয়ে থাকতাম। খেলা টেলা ছেড়ে দিয়েছিলাম, মনে হতো, মাঠে খেলতে গিয়ে যদি মুহূর্তের জন্যও আপনাকে মিস করে ফেলি! বিকেল হলেই রোজ আপনাদের বারান্দার গ্রিলের উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে থাকতাম। আপনি মাসের পর মাস আসতেন না। আমি কিন্তু দাঁড়িয়েই থাকতাম। কিন্তু তারপরও আপনি কথা বলতেন না।' আসিফ খানিক থামল। তারপর বলল, 'এত তীব্রভাবে কেউ বোধকরি চেনা থেকে কারও সঙ্গে কখনও পরিচিত হতে চায় নি'।

আরশি কোনো কথা বলল না। তবে আসিফের চোখের দিকে তাকিয়ে রইল। আসিফ সেই চোখে চোখ রাখতে পারল না। সে অপরাধী বালকের মতোন তাকিয়ে রইল তার পায়ের দিকে। অনেকক্ষণ। ততক্ষণে রুপাই চলে এলো। সে ভীষণ অবাক হয়েছে। দৃশ্যটা কেমন যেন। আরশির সামনে এত বড় একটা ছেলে কী অদ্ভুত জড়তা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দৃশ্যটা যেন তার বিশ্বাস হলো না।

বাসায় ফেরার পুরোটা পথ জুড়েই রুপাই আরশির কান ঝালাপালা করে ফেলল। ছেলেটা কে, কী করে, ঘটনা কী! হাজারটা প্রশ্ন। আরশি কী বলবে! সে তেমন কিছুই বলল না। তবে রূপাই তাকে শক্ত করে ধরল রাতে। আরশির অবশ্য লুকানোর কিছুই ছিল না। সে ঘটনা খুলে বলল! কেবল তার চোখ নিয়ে বলা আসিফের কথাগুলো বাদ দিয়ে বলল। রূপাই এত অবাক হলো। সে তার সহজাত উচ্ছলতা নিয়ে বলল, 'হাউ লাকি ইউ আর! আই অ্যাম জেলাস। সত্যি সত্যি অমন দিনের পর দিন দাঁড়িয়ে থাকত?'

আরশি হাসল। জবাব দিল না। রূপাই চেঁচিয়ে বলল, 'ইয়ু আর সিম্পলি ইম্পসিবল! আই হেইট ইয়ু।'

আরশি এবারও হাসল। রূপাই বলল, 'ছেলেটা কী সুন্দর! দারুণ! আমি হলে কিন্তু একবারেই শেষ।'

আরশি বলল, 'এখনও সুযোগ আছে।'

রূপাই বলল, 'ধ্যাৎ। আচ্ছা তোমার মধ্যে কী আছে বল তো?'

আরশি বলল, 'কী?'

রূপাই বলল, 'কিছু একটা। ধরা যায় না, কিন্তু ফিল করা যায়। আই ফিল ইট। কেমন এক ধরনের সেরিনিটি। কি শান্ত একটা ভাব। মনে হয় তোমার কাছে আসলেই শান্তি। ব্যাপারটা কী বল তো!'

Boighar.com & ARS

আরশি বলল, 'ব্যাপার কিছু না। সব মানুষ তো আর একরকম হয় না। হয়?'

রুপাই বলল, 'তা হয় না। কিন্তু দেখ, আমার এমন কিছু নেই।'

আরশি বলল, 'ভুল। আমি তো তোমাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে থাকি। মনে হয় জীবনটা কী আনন্দময়। কী উচ্ছল!'

রূপাই হঠাৎ চুপ করে গেল। অনেক্ষণ চুপ করে রইল। তার ঝলমলে মুখটা কেমন অন্ধকার হয়ে এল। সে বলল, 'কিন্তু আমার অনেক কষ্ট জানো?'

আরশি বলল, 'জানি।'

রূপাই চমকে যাওয়া গলায় বলল, 'জানে? কীভাবে?'

আরশি বলল, 'জগতে এমন কোনো মানুষ নেই, যার কষ্ট নেই। দুঃখ নেই। জগতের সব মানুষ দুঃখে পরিপূর্ণ।'

রূপাই এবার মন খারাপ করল। সে বলল, 'তুমি বিষয়টাকে হালকাভাবে দেখছ। আর সবার সঙ্গে মিশিয়ে ফেলছ। কিন্তু আমার বিষয়টা আর সবার সঙ্গে যায় না। অনেক অন্যরকম কষ্ট। অনেক বেশি কষ্ট'।

আরশি খানিক চুপ করে থেকে বলল, 'প্রত্যেকটা মানুষের কষ্টই তার নিজের মত করে আলাদা। তীব্র। তুমি যেমন তোমার কষ্টগুলো নিয়ে কাঁদো। অন্য একজনও তার কষ্টগুলো নিয়ে কাঁদে। আবার কেউ বুকের ভেতর চেপে রেখে তোমার মত হাসে। কিন্তু কারও চেয়ে কারও কষ্ট মোটেই কম না। কিন্তু আমরা প্রত্যেকেই ভাবি, জগতে আমার মতো দুঃখী আর কেউ নেই।'

রূপাই হঠাৎ আবার ঝলমল করে উঠল। সে আরশিকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'আচ্ছা তোমার সত্যিকারের বয়স কত বল তো?'

আরশি জবাব দিল না। হাসল। রূপাই বলল, 'আমার ধারণা তুমি আসলে আমার দাদীমার বয়সী। তখন মরে গিয়ে পরে আবার ওই গ্রামে জন্মেছ। এত ভারী ভারী কথা কই শিখেছ?'

আরশি বলল, 'জীবন। সে যতটা শেখায়, আর কে পারে তার মতো শেখাতে?'

রূপাই এবার আর দুষ্টুমি করল না। সে গম্ভীর গলায় বলল, 'তোমার অনেক কষ্ট তাই না?'

আরশি বলল, 'সেটা তো আগেই বললাম, জগতে সবালই কষ্টে পরিপূর্ণ। আমিতো আলাদা কউ না। সুতরাং ওটা বিশষ কিছু না।'

রূপাই বলল, 'তুমি কি কষ্ট পেলে কাঁদ?'

আরশি হাসল, 'কেন? কান্নার সঙ্গে কষ্টের কী সম্পর্ক?'

রূপাই বলল, 'না, মানুষ তো কষ্ট পেলেই কাঁদে তাই না? যার যত তীব্র কষ্ট, সে তত বেশি কাঁদে! তাই না?'

এবার আরশি হাসল। তবে চুপ করে রইল। তারপর বলল, 'এটা আমি জানি না। সত্যিই জানি না। কষ্ট এবং কান্না, এদের সম্পর্ক নিশ্চয়ই খুব গভীর। কিন্তু প্রবল কষ্টেও যখন কেউ কাঁদতে না পারে, সেই কষ্টের সম্ভবত কোনো সীমা পরিসীমা নেই'।

সেই রাতে আরশি ঘুমাল না। কিংবা খানিকটা ঘুমিয়েছিল। কিছু একটা স্বপ্ন দেখে হয়ত তার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। বাকি রাত সে জেগেই কাটাল। কী স্বপ্ন দেখেছে সে? সে কি তার মাকে স্বপ্ন দেখেছে? স্পষ্ট করে কিছুই বলতে পারে না আরশি। কিন্তু তার মনে হলো সে ক্লান্ত, ফ্যাকাশে রক্তশূন্য একটা মুখ দেখল। তার দিকে তাকিয়ে হাসছে। কিন্তু সেই হাসিভর্তি লুকিয়ে আছে জগতের সব কান্না, সব কষ্ট। তাকিয়ে থাকা সেই মুখটা আবার মনে করতে চেষ্টা করল আরশি। খুব চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। মুহূর্তের জন্যও আর মনে করতে পারল না। বহুদিন বাদে, বহু বহুদিন বাদে ঠিক এই মুহূর্তে আরশির হঠাৎ চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে করল। বুকের ভেতরটা ভাসিয়ে দিতে ইচ্ছা করল চোখের জলে। কিন্তু কান্নার তেষ্টায় ছটফট করতে থাকা আরশির চোখ কাঁদতে পারল না। তার শরীরটা থরথর করে কাঁপতে লাগলো। আরশির বুকের সবটা জুড়ে কি ভয়াবহ অব্যক্ত যন্ত্রণার তীব্র গোঙানি। কিন্তু সেই গোঙানিরা কান্না হতে পারল না। আরশি কাঁদতে পারল না। একফোঁটা জলও না। আরশি জানালার গ্রীলে মাথা ঠেকিয়ে সারা রাত দাঁড়িয়ে রইল। সে কি কাঁদতে ভুলে গেছে?

কান্নার ফোঁটা ফোঁটা জলে লেখা যে জীবন, সে জীবন কান্না কী করে ভুলে যায়? কী করে এমন নিষ্ঠুরতায় সেই জলের জীবন কান্না কেড়ে নেয়! আরশি জানে না। এই উল্টোজগতের সে কিছুই জানে না। কিছুই না।

পরদিন ভোরে একটা চমৎকার ঘটনা ঘটল। আরশির হঠাৎ মন ভালো হয়ে গেল। সে সারারাত দাঁড়িয়ে ছিল সেই জানালার সামনে। বাইরে ভোরের আলো ফুটেছে কেবল। বাসার সামনের রাস্তাটা তখনও ফাঁকা। সেই ফাঁকা রাস্তায় একটা রিকশা এসে থামল। রিকশা থেকে লম্বা করে যেই মানুষটা নামল, তাকে দেখে চমকে গেল আরশি, ইমাম আকরাম হোসেন! সঙ্গে তার স্ত্রী কামরুন্নাহার, আর? আর জায়েদ! সেই ছোট্ট জায়েদ!! কত বড় হয়ে গেছে সে! এত বড় কেন? আরশি দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামল। নিজের হাতেই গেট খুলল। ইমাম সাহেব আর তার স্ত্রী আরশিকে দেখে থমকে গেলেন। এ কাকে দেখছেন! এই কি আরশি! কামরুন্নাহার হাতের ব্যাগ দু'খানা রেখে হঠাৎ বানের জলের মতোন ছুটে এলো। তারপর আরশিকে জড়িয়ে ধরল। সবকিছু কেমন স্বপ্নের মতোন মনে হলো আরশির। ইমাম সাহেব যে সবাইকে নিয়ে আসবেন, এই

Boighar.com & ARS

খবর রুবিনা আগে থেকেই জানত। কিন্তু আরশিকে চমকে দেওয়ার জন্যই সে কিছু জানায়নি। আরশি চমকে গেছেও। শেষ কবে এমন চমৎকার অনুভূতি তাকে ছুঁয়ে গেছে সে জানে না। তবে মন খারাপও হয়েছে। মন খারাপ হওয়ার কারণ জায়েদ। সেই গুতুমগাতুম পিচ্চি জায়েদটা কেমন ঢ্যাঙা হয়েছে। বড় হয়ে গেছে। সবচেয়ে খারাপ ব্যাপার সে আরশিকে দেখে কেমন লজ্জায় মায়ের আঁচলের ভেতর সেধিয়ে যাচ্ছে। এত করে বলার পরেও কাছে আসছে না। কথাও বলছে না। আঁরশি একবার তাকে দৌড়ে গিয়ে চেপে ধরল, কিন্তু সে একটাও কথা বলল না। আরশি বলল, 'তুই আমাকে ভুলে গেলি কি করে রে জায়েদ?'

জায়েদ কথা বলল না। সে গভীর আগ্রহে তার পায়ের নখ দেখছে। আরশি বলল, 'তোর বুবুর কথা তুই ভুলে গেলি? একবারও মনে হলো না বুবুর কষ্ট হবে? সেই যে বুবু তোকে রোজ চুলার ছাই দিয়ে দাঁত মেজে দিত? তুই ভ্যা ভ্যা করে কাঁদতি? ভাত খেতে দিলে সব ছিটিয়ে দিতি বুবুর গায়ে? তুই সব ভুলে গেলি?'

জায়েদ তারপরও কথা বলল না। আরশি বলল, 'বুবু লঞ্চে চলে আসার দিন যে তুই কত কাঁদলি, তাও ভুলে গেছিস?'

জায়েদ গভীর আগ্রহে তার একপায়ের আঙুল দিয়ে আরেক পায়ের আঙুল, নখ ঘষে যাচ্ছে। সে কোনো কথাই বলছে না। আরশি এবার ফিসফিস করে বলল, 'তুই কি আমার ওপর রেগে আছিস?'

জায়েদ যেমন ছিল, তেমন চুপ করেই রইল। আরশি বলল, 'তুই রেগে গেলে আমাকে কী বলতি তোর মনে আছে? কী করে মনে থাকবে! তুই তো আমাকেই ভুলে বসে আছিস! আচ্ছা, বলব তুই রেগে গেলে আমাকে কী বলতি?'

জায়েদ হঠাৎ মা বলে গুঙিয়ে উঠল। কামরুন্নাহার, ইমাম সাহেব, রুবিনা, রুপাই সবাই একযোগে হেসে উঠল। কামরুন্নাহার বলল, 'সে যত বড় হয়, তার লজ্জা শরম তত বাড়ে। তার সবকিছুই মনে আছে। ভুলব কেমনে? আমাদের বাসায় সারাক্ষণ তো খালি তোর কথাই হয়। ভোলার উপায় আছে? প্রথম প্রথম তো সে ভাত খাইত না, দাঁত মাজত না, খেলত না। বুবু রে ছাড়া সে কিছুই করব না। মাটিতে বুবুর ছবি আঁইকা তারপর সারাক্ষণ বুবুরে গালমন্দ করতে থাকত'।

আরশির বুকের ভেতরটা কেমন ধক করে উঠল। জগৎজুড়ে কী অপার ভালোবাসা ছড়ানোছিটানো। তার কতটুকুইবা নিতে পারি আমরা! আমরা খুঁজে খুঁজে কেবল ঘৃণা আর দুঃ নেই। ভালোবাসারা পরে থাকে আড়ালে-আবডালে। সে বলল, 'কী বলে গালমন্দ করত?'

কামরুন্নাহার বলল, 'কি রে জায়েদ, বলব? বলি?' জায়েদ ছুটে এসে কামরুন্নাহারের মুখ চেপে ধরল।

সেই কটা দিন আরশির কাছে স্বপ্নের মতো কাটল। দু'দিনের মধ্যেই জায়েদের সঙ্গে তার দুরত্ব অনেকটাই ঘুচল। সবাই মিলে হৈচৈ করে ঘুরল নানান জায়গা। আরশি তার জীবনের প্রথম উপার্জনের জমিয়ে রাখা টাকা দিয়ে জায়েদকে লাল টুকটুকে এক জামা কিনে দিল। স্কুলে যাওয়ার ব্যাগ কিনে দিল। তারপর চলে যাওয়ার সময় এলো। চলে যাওয়ার দিন জায়েদ হঠাৎ চুপিচুপি আরশির কাছে এলো। তার হাতে একটা শক্ত মলাটের খাতা। সে খাতাটা আরশির হাতে দিয়ে বলল, 'আমি যাওনের পর দেইখখো।'

রাতের বেলা সবাই যখন ঘুমালো। আরশি খাতাটা খুলল। খাতার পাতায় পাতায় লাল নীল পেন্সিলে কাঁচা হাতে আঁকা কত কত ছবি। সবগুলো ছবির নিচে লেখা ছোট্ট একটা শব্দ, 'বুবু'। কোনটাতে জায়েদের বুবু পরী হয়ে ডানা মেলে আকাশে উড়ে যাচ্ছে, কোনোটাতে ঘুমাচ্ছে, ভাত খাচ্ছে, হাঁড়ি-বাসন মাজছে, এমনকি সাইকেল চালাচ্ছে অবধি। খাতাটা উল্টেপাল্টে দেখল আরশি। কয়েক বছরের পুরনো খাতা। প্রথম থেকে ছবিগুলো আবার দেখল সে। ক'বছর থেকে আঁকছে জায়েদ? যেন এই ছবির সঙ্গেই লেখা আছে গত কবছরে জায়েদের একটু একটু করে বেড়ে ওঠার গল্পও। তার ভাবনার ছোট ছোট পরিবর্তনও। ছবির থিম বদলেছে, আঁকার দক্ষতা বদলেছে, ভাবনা বদলেছে কিন্তু প্রতিটি ছবির নিচে রঙ দিয়ে লেখা ছোট্ট একটা শব্দ 'বুবু' একটুও বদলায় নি। ঠিক যেমন ছিল, তেমনই আছে। অবিকল একই রকম। কী ছোট্ট একটা শব্দ! মাত্র দুটো অক্ষর। কিন্তু আরশি হঠাৎ পাতা উল্টে উল্টে ওই দুটো মাত্র অক্ষরের প্রতিটি শব্দকে তার গালের সঙ্গে চেপে ধরতে লাগল। যেন ওই শব্দগুলোর ভেতর বুবুর জন্য ছোট্ট জায়েদের যে রোজকার অভিমান, যে রোজকার না বলা অজস্র গল্প, যে অনাবিষ্কৃত ভালোবাসারা একটু একটু করে জমে উপচে উঠেছিল তার সবটা সে ছুঁয়ে দেখতে চায়। শুষে নিতে চায়। আরশির চোখের কোনায় তখন চিকচিক করে উঁকি দিচ্ছিল এক ফোঁটা জলের কণা।

www.boighar.com

কিন্তু সেই জলের কনাটাকে সে অশ্রু হয়ে ঝরে পড়তে দিল না।

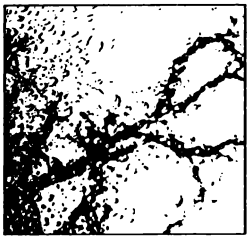

নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে। ভেতরে ভেতরে যযাতিপুর তত ফুঁসছে। কিন্তু বাইরে থেকে দেখে তা বোঝার উপায় নেই। যেন সবকিছু আগের মতোই। কিন্তু লতু হাওলাদার যেমন জানে, দুলাল মেম্বার আর জালাল কাজীর আড়ালে আছে গালকাটা বশির। তেমনি দুলাল মেম্বার আর জালাল কাজীও জানে লতু হাওলাদারের সব শক্তির উৎস আসলে আবদুল মমিন! জালাল কাজীর গুলির ঘটনায় তেমন কিছুই হলো না। যশোদা স্যার স্পষ্ট বলে দিলেন এই নিয়ে আপাতত উচ্চবাচ্য না করতে। চলাফেরায় আরও সাবধান হতে হবে। তবে হাবভাবে যা বোঝা যাচ্ছে, তাতে লতু হাওলাদারের চেয়ে দুলাল মেম্বার আর জালাল কাজীর অবস্থা ভালো। লতু হাওলাদারের তুলনায় এলাকার লোকজনের কাছে এদের গ্রহণযোগ্যতা অনেক বেশি। বিষয়টা লতু হাওলাদার পাত্তা না দিলেও আব্দুল মমিন পাত্তা দিল। এক রাতে সে লতু হাওলাদারকে ডেকে পাঠাল খাসের হাট। তারপর বলল, 'আপনি তো হাওলাদার সাব লোক ভালো না। এলাকার চেয়ারম্যান হইতে চান ভালো কথা, কিন্তু সবটাই কি গায়ের জোরে হয়? মানুষের পছন্দ-অপছন্দও তো একটা ব্যাপার আছে। আছে না?'

লতু হাওলাদার বলল, 'পছন্দ-অপছন্দ দিয়া আইজকাইল ইলেকশন জেতা যায় না। ইলেকশন জিততে হইলে গায়ের বল লাগে। সেইটাই আসল কথা। আর গাঁওগ্রামে আরও একটা জিনিস লাগে।'

আবদুল মমিন বলল, 'সেই আরও একটা জিনিস কী?'

লতু হাওলাদার বলল, 'সেই আরও একটা জিনিস হইল গুষ্ঠি। গুষ্ঠি মানে হইল গিয়া বংশ। গাঁওগ্রামে যার গুষ্ঠি যত বড়, সে তত শক্তিশালী। একটা কথাই আছে, যার নাই গুষ্ঠি, তার নাই ফুষ্টি। ফুষ্টি মানে হইল গিয়া ভাব, মানমর্যাদা। বুঝছেন মমিন ভাই? আমার গুষ্ঠি মাশালস্নাহ বড়'।

আবদুল মমিন বলল, 'বুঝছি। আর বুঝছি বইলাই আপনারে ডাইকা আনছি। আমার মাথায় নতুন একটা বুদ্ধি আসছে'।

লতু হাওলাদার আগ্রহ নিয়ে বলল, 'কী বুদ্ধি?'

আবদুল মমিন বলল, 'আপনার গুষ্ঠি যা, আপনার ছেলে মোস্তফার গুষ্ঠিও কিন্তু একই। এখন, আপনাদের একই গুষ্ঠি হওনের কারণে আমরা কিন্তু দুইজন

মানুষের বদলে একটা মাত্র গুষ্ঠির মানুষের সাপোর্ট পাইতেছি। ঠিক না? আর ওইদিকে দেখেন, দুলাল মেম্বার এক গুষ্ঠির, জালাল কাজী আরেক গুষ্ঠীর। তাইলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াইল? তারা দুইজন আলাদা দুইটা গুষ্ঠীর সমর্থন পাইতেছে। সংখ্যায় বাইরা যাইতেছে। বিষয়টা পরিষ্কার?'

লতু হাওলাদার বিষয়টা এভাবে ভাবেনি। আব্দুল মমিনের চিন্তাভাবনার কাছে তার নিজেকেও মাঝে মাঝে নিজের কাছেই শিশু মনে হয়। সে বলল, 'তাইলে?'

আবদুল মমিন বলল, 'তাইলে অন্য উপায় বাইর করতে হইব'।

লতু হাওলাদার বলল, 'কি উপায়?'

আবদুল মমিন খানিক চুপ করে থেকে বলল, 'আমাদের মেম্বার ইলেকশনের জন্য আপাতত মোস্তফারে বাদ দিয়া, অন্য কাউরে চিন্তা করতে হইব। যার বংশ বড়।'

লতু হাওলাদার এই কথা শুনে খানিকটা দমে গেলেন। তবে আবদুল মমিনের কথায় যুক্তি আছে। এর বিকল্প কোনো বুদ্ধিও তার মাথায় নাই। আব্দুল মমিন বলল, 'আমরা একটা কাজ করতে পারি, সেইটা হইল মোস্তফার বদলে ছত্তাররে দিয়া মেম্বার ইলেকশন করাইতে পারি। ছত্তার বড় গুষ্ঠির পোলা। আর কিছু শক্তপক্ত পোলাপানও আছে ওর। লাভে লাভ। তারওপর আপনেরেও মানগণ্য করে। এখন আপনে চিন্তা ভাবনা কইরা বলেন হাওলাদার সাব।'

বিষয়টা লতু হাওলাদারের পছন্দ হলো না। বাপ-বেটা চেয়ারম্যান-মেম্বার হলে ব্যাপারটাই অন্যরকম ছিল। সবকিছুর হিসাব-নিকাশ নিজেদের ঘরের মধ্যে। আর এখন! কিন্তু অতি লোভে না শেষ অবধি তাতি নষ্ট হয়! আলাপ-আলোচনা শেষে এই সিদ্ধান্তই পাকা হল, মোস্তফার পরিবর্তে মেম্বার পদে নির্বাচন করবে ছত্তার। তবে বাড়ি ফিরে লতু হাওলাদারের মনে হল, সিদ্ধান্ত খুব একটা খারাপ হয় নাই। বরং নানাদিক বিবেচনায় ভালোই হয়েছে। ছত্তার তাকে খুব মান্যগণ্য করে। সুতরাং অখুশি হওয়ার কিছু নাই।

তহুরা তার বাবা মজিবর মিয়ার চেয়ে মা লাইলির কাছেই বেশি থাকে। বাবাকে খুব একটা পছন্দও করে না। না করার কারণও অবশ্য আছে। তহুরার জন্মের সময় থেকেই মজিবর মিয়া যে জীবনে বেঁচে আছে, তাকে আসলে মানুষের জীবন বলা চলে না। ফলে তহুরার প্রতি মজিবর মিয়া নজরও দিতে পারেনি। তাছাড়া দীর্ঘদিন নানানভাবেই মানসিকভাবে অসুস্থ সময় কেটেছে মজিবর মিয়ার। ধীরে ধীরে সে একটু একটু করে সুস্থ হলেও তহুরার বেড়ে ওঠার ওই সময়টায় সে যেন অন্য মানুষ হয়েই ছিল। আজকাল তহুরার প্রতি সে একটা তীব্র আকর্ষণ বোধ করে, কিন্তু তহুরা তাকে খুব একটা পছন্দ করে না। এর

একটা কারণ হতে পারে, তার মুখের এমন ভাঙাচোরা অবস্থা, আরেকটা তার গলার শব্দ। সে কথা বলে বিচিত্র এক উচ্চারণে এবং শব্দে। তহুরা যেটা শুনলেই ভয়ে ছুটে পালায়। মজিবর মিয়ার সেদিন হঠাৎ মনে হলো, তার জীবনে সবচেয়ে বড় ভুল আসলে কী?

অনেক ভেবে সে সিদ্ধান্ত নিল, তার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল লাইলিকে বিয়ে করা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আবার মনে হলো, লাইলিকে বিয়ে করা এই বিষয়টিকে বিচ্ছিন্নভাবে চিন্তা করা ঠিক হবে না। এই বিষয়টার সঙ্গে আরও অনেকগুলো বিষয় জড়িত। প্রশ্ন হচ্ছে লাইলিকে বিয়ে করার অনুঘটকগুলো কী ছিল? মজিবর মিয়া আজকাল খুব ভাবে। সারাক্ষণ নানান ভাবনা মাথায় গিজগিজ করে। তার মনে হল লাইলিকে বিয়ে করার ঘটনা যদি না ঘটত, তাহলে তার আগে আরও অনেকগুলো ঘটনা ঘটার কথা ছিল না। সেক্ষেত্রে সেবার হয়ত সেই বন্যা হতো না। তার ঘর ভেঙে পড়ত না। তার গাই বিক্রি করার কথা ভাবতে হতো না। এমনকি সেই যে বন্যার সময়ের সেই স্বেচ্ছাসেবক দলটার নেতা, সে হয়তো তাহলে তাকে তার গরুসহ স্টিমারঘাটা নামিয়েও দিতে চাইত না। সে ট্রলার কিনত না। এত এত কিছু হত না। তারপর আরও কত কত ঘটনা! আসলে জগতে বিচ্ছিন্ন ভুল বা শুদ্ধ বলতে কি কিছু আছে? না কি সকল কিছু আগে থেকেই নির্ধারিত? পুরো জীবনের এই যে গল্প, এই যে সুখ, দুৎখ, হাসি, কান্না, এ সবই কি পূর্বনির্ধারিত! আমরা কি কেবল পূর্বনির্ধারিত সেই হাসি কান্না সুখ দু:খের সাজানো পাণ্ডুলিপিতে অভিনয় করে যাই!

মানুষের শরীর যখন অক্ষম হয়ে পরে, তার ইন্দ্রিয়রা নাকি তখন জেগে উঠে আরও বেশি সক্রিয় হয়ে। মজিবর মিয়ারও আজকাল তাই মনে হয়। তার মনে হয়, সে চুপচাপ থেকেও আশেপাশের ঘটনাপ্রবাহ অন্যদের চেয়ে অনেক দ্রুত বুঝতে পারে। অনেক সহজে বুঝতে পারে। আজ সন্ধ্যাবেলা তার হঠাৎ মনে হল, সে জানে না আরশি কই আছে! তবে তার কেন যেন মনে হয় আরশি ভালো আছে। কিন্তু সে যদি না থাকে তাহলে তহুরার কী হবে! সে জানে, লাইলি কোথাও থিতু হওয়ার মতো মেয়ে না। সে হয়তো এ ঘাট থেকে ও ঘাটে এমন ভেসেই বেড়াবে। সেক্ষেত্রে তহুরার কী হবে! মজিবর মিয়া ঘুণাক্ষরেও চায় না, তহুরা তার মায়ের মতো তার সঙ্গেই ঘাটে ঘাটে ভেসে বেড়াক।

মজিবর মিয়া আজকাল বেশিরভাগ সময়ই আড়তে বসে থাকে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, তার সেই ভয়াবহ ঘটনার কারণেই হোক, কিংবা সেই সুস্থ সুপুরুষ মজিবর মিয়ার বর্তমান করুণ দশার কারণেই হোক, সে যতক্ষণ আড়তে থাকে, ততক্ষণ আড়তে বেচাবিক্রি ভালো হয়। লোকজন আসে। গল্প করে। বসে। এমনিতে মজিবর মিয়া মিশুক মানুষ। দশজনের সঙ্গে তার চেনা জানা ভালো। সম্পর্ক ভালো। কিছুদিন আগেই তার আড়তের দোকানটার

পাশেই একটা চায়ের দোকান হয়েছে। সেখানে সকাল বিকাল ভিড় লাগে থাকে। এই ভিড়ে মাঝে মধ্যেই মজিবর মিয়া একটা কাজ করে। এক টাকা কাপ চা। সে উপস্থিত সবাইকে নিজের খরচে চা খাওয়ায়। অল্প পয়সায় অনেক কিছুই যেন কেনা হয়ে যায়। গাঁওগ্রামের খেঁটে খাওয়া মানুষগুলো মজিবর মিয়ার কাছে যেন অদৃশ্য কোন ঋণে বাঁধা পড়ে থাকে। কিন্তু সেই ঋণ আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখে না। মজিবর মিয়ার সঙ্গে দুটো কথা বললে, গল্প বললে সেই বাঁধা পড়া ঋণ বরং বন্ধন হয়ে যায়।

নির্বাচনের বিষয়টা থেকে তাকে বাদ দেওয়ায় মোস্তফার যে খুব খারাপ লেগেছে তা না। সে আমোদ-ফুর্তির মানুষ। তার এত ঝামেলা ভালো লাগে না। সে নিজের মতো একটু আরাম আয়েশ করতে পারলেই খুশি। লতু হাওলাদার যখন তাকে খবরটা দিয়েছিল, সে খুশিই হয়েছিল। তবে সেটা সে প্রকাশ করল না। বরং মন খারাপ করে রইল। লতু হাওলাদার ছেলেকে চেনেন। সে এখন লাইলির প্রেমে বুঁদ হয়ে আছে। সব জেনেশুনেও লতু হাওলাদার না জানার ভান ধরে আছেন। মোস্তফা লাইলর প্রেমে পরেছে। বিয়ে করার কথাও ভাবছে। তবে বিয়ে তো দূরে থাক, লতু হাওলাদার লাইলিকে ভুলেও তার বাড়ির ত্রিসীমানায় পা রাখতে দেবে না। কোনো অবস্থাতেই না। এখন সব মেনে নিচ্ছে শুধুই উদ্দেশ্য সাধনে।

লতু হওলাদারের জীবনের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ মজিবর মিয়াকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া। তার কাছ থেকে তার পূর্বপুরুষের সেই জমি আদায় করা। তার একটা অপমানের শোধ লতু হাওলাদার কীভাবে নিয়েছে, মজিবর মিয়া তা সারা জীবন মনে রাখবে। যতদিন বেঁচে থাকবে। কিন্তু সেটা তো শারীরিক শাস্তি। প্রথম প্রথম শরীরের মতোই শরীরের ভেতরেও ভেঙেচুরে চুরমার হয়ে গিয়েছিল মজিবর মিয়া। কিন্তু অফুরন্ত প্রাণশক্তি তার। দিন যত গিয়েছে, ততই যেন ভেতরে ভেতরে রোজ জেগে উঠেছে একটু একটু করে। লতু হাওলাদারের এটা সহ্য হয় না। সে চায় মজিবর মিয়া তাকে দেখলে ভয়ে চোখ নামিয়ে ফেলুক। তার কাছে করুণা ভিক্ষায় হাত পাতুক। যে মজিবর মিয়া তার বাড়িতে কামলার কাজ করেছে সে এখন তার জমির মালিক। লতু হাওলাদারের সেই এক পুরনো খেদ। সেই পুরনো তীব্র খেদ, তীব্র জিঘাংসাকে সে দমিয়ে রাখতে পারে না। তার ধারণা ছিল, ওই ভয়াবহ ঘটনার পর মজিবর মিয়া জলের মতো সহজ হয়ে যাবে। কিন্তু সে সে রকম কিছুই হয়নি। একটা দীর্ঘ সময় অবধি পাগল সেজে বা হয়ে থাকা মজিবর মিয়া যেন দিন দিন হয়ে উঠছে আরও কঠিন। অনমনীয়। কিন্তু লতু হাওলাদার কঠিন জিনিস বাঁকা করতে জানে। সে শুধু অপেক্ষায় আছে। সময়ের অপেক্ষা আছে। আগেরবারও

ছিল। সে যেমন জানে তার সেই আগেরবারের অপেক্ষার ফলাফল কেমন ছিল। জানে, মজিবর মিয়াও। সুতরাং অপেক্ষা করতে সমস্যা নেই লতু হাওলাদারের। ইলেকশনটা আসুক। চেয়ারম্যান সে হবেই। আর তাছাড়া মোস্তফা ইতিমধ্যেই মজিবর মিয়ার ঘরে ঢুকে পড়েছে। ঘরে-বাইরের এই যুগপৎ আঘাতে মজিবর মিয়ার মতোন একজন পঙ্গু অপরিপূর্ণ মানুষ কোনোভাবেই টিকে থাকতে পারবে না। সে তার মানসিক শক্তি যত বড়ই হোক না কেন!

মোস্তফা লাইলিকে বলল, 'কী ব্যাপার, ব্যবস্থা কিছু হইল?'

লাইলি বলল, 'ব্যবস্থা পরে। আগে একটা ব্যাপার। কাইল রাইতে হঠাৎ মাথায় এক প্রশ্ন এলো।'

মোস্তফা বলল, 'কী প্রশ্ন?'

লাইলি বলল, 'তোমার সঙ্গে আমার বিয়ার পর তহুরার কী হইব?'

মোস্তফা বলল, 'কী আবার হইব! তহুরা আমাদের সঙ্গেই থাকব।'

লাইলি বলল, 'কিন্তু সেইটা তোমার বাড়ির কেউ মাইনা নিব না। তোমার কী ধারণা, তোমার বাপরে আমি চিনি না? নাম্বার ওয়ান হারামি ব্যাটা। আমারেই মাইনা নিব না। তারপর আমার মাইয়া!'

মোস্তফা বলল, 'আরে নিব নিব। না নিয়া যাইব কই! আমার বাপরে আমি চিনি। এক ছটাক জমির জন্যও সে করতে পারে না এমন কোনো কাজ নাই।'

লাইলি বলল, 'কিন্তু তহুরার তোমাদের বাড়িতে থাকনের সঙ্গে জমির কী সম্পর্ক?'

মোস্তফা এই কথায় থতমত খেয়ে গেল। সে বলল, 'আরে বুঝতেছ না। জমিটা যদি তহুরার নামে থাকে, আর তহুরা তো তোমার মাইয়া। তুমি তখন আমাদের বাড়ির বউ। তাইলে কী দাঁড়াইল? তহুরা তো তখন আমাদের বাড়ির মাইয়াই, নাকি? তখন জমির দলিল-পর্চা সব থাকব অর নামে, কিন্তু এমন একটা ভাব থাকব যে ওইটা আমাগোই জমি। আব্বায় তো ধরো এই ভাবটাই চায়। তার কাছে ভাব, মান-মর্যাদা, বংশের নাম এইসবের একটা আলাদা মূল্য আছে। সে বুড়া বয়সে নাইলে জমি দিয়া কী করব?'

মোস্তফা নানান কথা বলতে থাকল কিন্তু লাইলির তাতে মন ভরল না। তার মনে হলো লতু হাওলাদার তাকে নিয়েও কোনো ফন্দি আঁটছে না তো! সেই ফন্দির একটা টোপ হচ্ছে মোস্তফা! মোস্তফা আসলে লাইলির কাছে স্বার্থ আদায়ের একটা কৌশল মাত্র! লাইলি চকিতে সতর্ক হয়ে উঠল। এই সহজ জিনিসটা এতদিন তার মাথায় আসেনি! মোস্তফা আবারও বলল, 'আরে বাপ! এইটুকুতেই এত অস্থির হইলে কেমনে হইব? জমি তো তহুরার নামেই

থাকতেছে। সে বড় হইলে জমি দিয়া সে যা ইচ্ছা করব। এইটা তো জটিল কিছু না।'

লাইলি বলল, 'তাইলে তোমার বাপের লাভ কী?'

মোস্তফা বলল, 'আমার বাপের লাভ একটাই, মজিবর মিয়ারে পথে বসানো। মজিবর মিয়া তার বাড়িতে কাম কইরা খাইছে, তার এখন খুব হ্যাডম বাড়ছে। এই হ্যাডম ভাঙাই হইছে তার লাভ।'

লাইলি বলল, 'মজিবর মিয়ার যা ছিল, সব তো ভাঙছেই। ভাঙনের মতোন আর কী বাকি আছে?'

মোস্তফা বলল, 'সুন্দরী মাইয়ারা নাকি বোকা হয়, তোমারে দেইখা সেই ধারণা ভাঙছিল। কিন্তু এখন মনে হইল, না, ধারণা ভাঙে নাই, ধারণা ঠিকই আছে। আরে বোকা মাইয়া, হাত-পাও ভাঙা খুব সহজ। খুব সহজ কাম। চাইপা ধইরা দুইখান বাড়ি দিলেই শ্যাষ। কিন্তু মনের শক্তি ভাঙন কঠিন। সেইটা বাড়ি দিলেই ভাঙন যায় না। সেইটা ভাঙনের আলাদা সিস্টেম আছে। সেই সিস্টেম খুঁইজা পাওন সহজ না। মজিবর ভেতরে ভেতরে অতি কঠিন মানুষ। আমার বাপে চায় তার ভেতরের মানুষটারে ভাইঙা দিতে।'

লাইলির কাছে মোস্তফার এই কথাটা পছন্দ হলো। মজিবর মিয়া আসলেই ভেতরে ভেতরে পাথর কঠিন এক মানুষ। না হলে ওই পঙ্গু অথর্ব মানুষটা সেই ভয়াবহ বিপর্যয়ের পরও গত এতগুলা বছর তার সামনে কী ভয়াবহ শক্ত হয়েই না দাঁড়িয়ে আছে! একমুহূর্তের জন্যও টলেনি। আরশির নামের সেই চার বিঘা জমি, আড়ত কিছু নিয়েই একটা কথা পর্যন্ত বলেনি। ভাবলেই হেরে যাওয়ার তিক্ত স্বাদে নিজের ভেতরটা যেন বিস্বাদ হয়ে ওঠে। গা জ্বালা করে ওঠে। ওই তো ওই একরত্তি মানুষ! কিন্তু এত শক্তি কোথা থেকে আসে! লাইলি আবারও যেন দপ করে জ্বলে ওঠে। যে করেই হোক, সে মজিবর মিয়ার কাছ থেকে জমিটা বুঝে নেবেই নেবে। কিন্তু এই পুরো ঘটনাটায় তাকে পা ফেলতে হবে আরও সতর্ক হয়ে। মোস্তফাকে তার বোকাসোকা মনে হলেও সে জানে লতু হাওলাদার কী জিনিস! সে বিনা লাভে একটা পাও কারও জন্য ফেলে না। লাইলি বলল, 'তোমার বাপের লাভ বুঝলাম, এইবার তোমার লাভ কী সেইটা বল?'

মোস্তফা লাইলির গাল টিপে ধরে বলল, 'আমার লাভ কি তুমি জানো না? এই দুনিয়ায় আমার লাভ-লোকসান তো এখন এই একটাই। তুমি। কি বিশ্বাস হয়? না হয় না?'

লাইলির হঠাৎ মনে হলো এই এত এত মিথ্যা, এত এত চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র, লাভ-লোকসানের হিসাবের মাঝেও এই একটা কথাই আসলে সত্য। বাকি সব মিথ্যা, ভান। মোস্তফা নামের এই আপাতদৃষ্টিতে চালাক-চতুর কিন্তু বোকাসোকা মানুষটা তাকে আসলেই ভালোবাসে। কোনো কিছুর স্বার্থ ছাড়াই ভালোবাসে।

Boighar.com & ARS

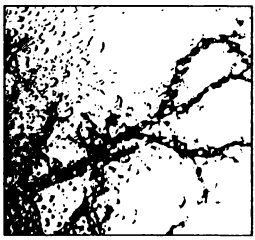

আরশির রেজাল্ট দিয়ে দিয়েছে। রেজাল্ট যে খুব ভালো হয়েছে তা না। তবে খুব খারাপও হয়নি। আরশি কলেজে ভর্তি হয়ে গেল। আলাদা কোনো কলেজ না। সে যেই স্কুলে পড়ত, সেই স্কুলের কলেজ সেকশনেই। তার হোস্টেলও বদলেছে। স্কুলের হোস্টেল ছেড়ে সে উঠে এসেছে উচ্চমাধ্যমিকের ছাত্রীদের জন্য বরাদ্দকৃত হোস্টেলে। স্কুল-কলেজ একই কম্পাউন্ডে বলেই বোধহয় কলেজে উঠে তার আলাদা কিছু মনে হলো না। আরশি কলেজে ভর্তি হওয়ার আগে রুবিনা দেখা করল আশিষের সঙ্গে। আরশির পড়াশোনার খরচ নিয়ে কথা বলল। পুরো খরচটাই রুবিনা দিতে চাইল। কিন্তু আশিষ রাজী হল না। শেষ অবধি তাদের মধ্যে একটা সমঝোতা হলো। তবে তাতে আশিষের আপত্তি সত্ত্বেও বেশিরভাগ খরচই বহন করল রুবিনা।

আরশি বিকেল বেলা কিছু একটা করছিল। এই মুহূর্তে নিচ থেকে তার ডাক এলো। সেই টেলিভিশন চ্যানেলটা থেকে লোক এসেছে। আরশি নেমে দেখল অন্য এক লোক। এই লোককে সে চেনে না। সে বলল, 'আগেরবার তো আপনি আসেননি?'

লোকটা বলল, 'জি না। এটা অন্য একটা প্রোগ্রাম। এই জন্য আমি আসছি।'

আরশি বলল, 'বলেন? কেন এসেছেন?'

লোকটা বলল, 'আমরা নতুন একটা প্রোগ্রাম করছি। খালি গলায় রবীন্দ্রনাথের গান। এই বিষয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলতে আসছি।'

আরশি বলল, 'আমি শিল্পী না। আর সেই অর্থে আমি কখনও গানও গাইনি। তাছাড়া আপনারা যারা আমার সেই পুঁথি শুনে বিভ্রান্ত হয়েছেন তারা খেয়াল করেননি, আমার কিন্তু সেই অর্থে সুরেলা কণ্ঠ না। এই কণ্ঠে আর যা-ই হোক, রবীন্দ্রসঙ্গীত হয় না।'

লোকটা বলল, 'আমাদের টেলিভিশনে নতুন একটা ছেলে জয়েন করেছে। ও-ই সম্ভবত প্রথম আপনার কথা বলে। আপনার খালি গলার সেই পুঁথির অনুষ্ঠানটা ও-ই আমাদের দেখায়। আসলে ওটা ছিল সবার জন্যই নতুন একটা

অভিজ্ঞতা। হঠাৎ করেই যেন সবাই একটা তীব্র ধাক্কা খেয়েছে। আপনি হয়তো প্রচলিত অর্থে সুকণ্ঠি নন, কিন্তু আপনার গলায় কোথায় যেন কিছু একটা আছে। ধক করে বুকের ভেতর গিয়ে লাগে। রেশটা থেকে যায়। দীর্ঘসময় ধরে কানে বাজতে থাকে। আমাদের নতুন প্রোগ্রাম এটা। আমরা চাচ্ছি প্রোগ্রামটা আপনাকে দিয়েই শুরু করতে। আপনি রাজি থাকলে প্রোগ্রামটার উপস্থাপনাতেও আমরা আপনাকে রাখতে চাই।'

আরশি সঙ্গে সঙ্গে কোনো সিদ্ধান্ত দিল না। সে কথা বলল আশিষ আর রুবিনার সঙ্গে। তারা দু'জনই আগ্রহ দেখাল। এর পরের শুক্রবার আশিষের সঙ্গে সে চ্যানেলটাতে গেল। বড় মিটিংরুম। সেখানে দু'জন লোক বসে আছে। কিছুক্ষণ পর আরও দু'জন এলো। দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা শেষে আরশির মনে হলো সে কাজটা করবে। সপ্তাহে একদিন। শুক্রবার বিকেলে। তার জন্য খুব একটা সমস্যা হবে না। সমস্যা যা হবে, তা হলো সে আগে কখনও উপস্থাপনা করেনি। তবে সে বিষয়েও কথা হলো। প্রশিক্ষণসহ প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা হবে চ্যানেলটার পক্ষ থেকেই। সে কিছু টাকাও পাবে। আরশি আসলে নিজের পড়ার খরচটা নিজেই চালাতে চায়। এটা অবশ্য আশিষ বা রুবিনাকে সে বলেনি। তবে সুযোগ থাকলে চেষ্টাটা তো অন্তত করে দেখা যায়। আরশি রাজি হয়ে গেল। একটা লিখিত চুক্তিও হয়ে গেল। কিন্তু অফিস থেকে বের হতে গিয়ে চমকে গেল সে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কারও সঙ্গে কথা বলছে আসিফ! আসিফ তাকে খেয়াল করেছে কিনা আরশি জানে না। তবে সে কোনো কথা বলল না। চুপচাপ চলে এলো। www.boighar.com

তবে পরের শুক্রবার আরশি বুঝল, ঘটনা কাকতালীয় ছিল না। আসিফের সঙ্গে তার আবার দেখা হলো। আসিফ নিজে থেকেই এগিয়ে এসে বলল, 'ওয়েলকাম, আমি আসিফ। এখানেই কাজ করি। নিউজে। আগে পার্ট টাইমার ছিলাম। আপনি বোধহয় জানেন না, আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে সাংবাদিকতায় পড়ি। গ্র্যাজুয়েশন প্রায় শেষের দিকে। তাই কিছুদিন হলো ফুলটাইমার হয়ে গেছি।'

আরশি বলল, 'এসবের মানে কী?'

আসিফ বলল, 'চেনা থেকে পরিচিত হচ্ছি। আমরা তো এখন কলিগ, তাই না? এবার আপনার পরিচয়ের পালা।'

আরশি কোনো কথা বলল না। তবে সে কিছুদিনেই আবিষ্কার করে ফেলল এই পুরো বিষয়টির পেছনে আসলে ছিল আসিফ। আসিফকে এখানে সবাই খুবই পছন্দ করে। এখানে সে সংবাদ বিভাগে কাজ করলেও সব বিভাগেই তার দারুণ জনপ্রিয়তা। আরশি যে অনুষ্ঠানটায় কাজ করবে, সেটি আসলে তারই আইডিয়া। শুধু তা-ই না, এর আগেরবার আরশির যে ইন্টারভিউটা নেওয়া হয়েছিল, সেটিও আসিফের কারণেই। পুরো ব্যাপারটায় আরশি প্রচণ্ড বিরক্ত

Boighar.com I ARS

হয়েছে। কিন্তু এখন কিছু করার নেই। চুক্তি-টুক্তি কি সব হয়ে গেছে? তাছাড়া বিষয়টা নিয়ে তার রোখ চেপে গেছে। তবে আসিফের সঙ্গে সে আর কথা বলল না। দেখা হলেও না। সেদিন রেকর্ডিং হলো সন্ধ্যায়। শেষ হতে হতে রাত হয়ে গেল। অফিস থেকে বের হতেই তুমুল বৃষ্টি। রিকশা, বাস কিছুই পাচ্ছিল না আরশি। এই মুহূর্তে আসিফও বের হলো। তবে আরশিকে দেখেও সে এগিয়ে গেল না। তুমুল বৃষ্টির ভেতর নেমে গেল আসিফ। একবারও ফিরে তাকাল না। আরশি অবাক চোখে তাকিয়ে রইল। তার হঠাৎ মনে হলো সে ছেলেটার প্রতি খুব অবিচার করছে। এতটা উপেক্ষা অবহেলা কি আসিফের প্রাপ্য?

আজ এই তুমুল বৃষ্টির রাতে অফিসের সামনের গাড়ির ছাউনিটার নিচে দাঁড়িয়ে আরশি একটা বিস্ময়কর জিনিস আবিষ্কার করল। সে কি এই এতটা দিন ধরে অবচেতন মনে হলেও কারও জন্য অপেক্ষা করছে? অন্য কারও জন্য? কিন্তু কে সে? তার এই ছোট্ট জীবনে আসিফ ছাড়া আর কেউ তো এমন প্রবল আগ্রহ নিয়ে তার কাছে আসেনি। কেউ না। তাহলে? কাছেই কোথাও বাজ পড়ল। অন্ধকার শহর আলো করে দিয়ে বিদ্যুৎ চমকালো। আর ঠিক সেই মুহূর্তে আরশির বুকের ভেতরটা কাঁপিয়ে দেওয়া একটা অনাকাঙ্ক্ষিত রূঢ় সত্য তার সামনে এসে দাঁড়াল। বিধানচন্দ্র! বিধানচন্দ্র!!

আরশি নিজের অজান্তেই মাথা নাড়িয়ে এই সত্যটাকে অস্বীকার করতে চাইল। কিন্তু পারল না। সে এই এতটা সময় ধরে তার বুকের ভেতরের সবগুলো ভালোবাসার দরজা ওই মানুষটার জন্য এমন শক্ত করে বন্ধ করে রেখেছিল! বিধানচন্দ্রের জন্য! সেই এলোমেলো, বোহেমিয়ান, উন্মাদ আপাতদৃষ্টিতে বৃদ্ধ মানুষটার জন্য? না। সেই প্রবল বৃষ্টির রাতে হঠাৎ ফণা তুলে ভাবনার পথ আগলে দাঁড়ানো এই সত্যটাকে আরশি কোনোভাবেই স্বীকার করতে চাইল না। তার মনে হলো সে কোনো একটা ঘোরের মধ্যে আছে। তার বুকের ভেতরে লুকিয়ে লুকিয়ে অন্য কেউ এই ভাবনা ভাবছে। সেই রাতে বিধানচন্দ্র যখন তাকে বলেছিল 'জগতে তোমার চোখের চেয়ে সুন্দর কিছু আর কখনই সৃষ্টি হয়নি' তখন তার যেই অনুভূতিটা হয়েছিল, এখন এই মুহূর্তে যেন তার ঠিক সেই অনুভূতিটা হচ্ছে। মনে হচ্ছে যে সত্যটা সে এই মুহূর্তে আবিষ্কার করল, এই সত্যটা তার না। এটা তার ভেতরের অন্য কারও সত্য। অন্য কারও। এ অন্য কারও ভাবনা। এই অন্য কাউকে সে চেনে না।

বৃষ্টির তোড় বেড়েছে। জল ছিটকে আসছে আরশির শরীরে। কিন্তু আরশি ডুবে আছে তার নিজের মনের এক গভীর রহস্যময়তায়। সেই রহস্যের সমাধান সে জানে না। মানব মন কী অদ্ভুত সব রহস্যেই না মোড়া! আরশির হঠাৎ মনে হলো, একটা মানব জনমের সবটা জুড়ে মানুষ কেবল অন্য মানুষকেই চিনতে চায়, অন্য মানুষকেই জানতে চায়। কিন্তু সে কী কখনও টের পায়, এই এক জীবনে সে তার নিজেকেই কতটা কম চেনে! কতটা অচেনা-অজানা রয়ে যায়

নিজের কাছেই! কী অনাবিষ্কৃত বিস্ময়কর সব রহস্যে ডুবে থাকে তার গোটাটা জীবন!

'রিকশা'।

আচমকা কারও কণ্ঠ শুনে আরশি মুখ তুলে তাকাল। এতক্ষণ কোথায় ডুবে ছিল সে! তার সামনে আসিফ দাঁড়িয়ে। কাকভেজা হয়ে আছে সে। আরশি চোখ তুলে আসিফের চোখে চাইল। কিন্তু চকিতে চোখ সরিয়ে নিল আসিফ। বলল, 'স্কুটার খুঁজলাম, নেই। অফিসের সবগুলো গাড়িও আজ বাইরে।'

আরশি কোনো কথা বলল না। তাকিয়ে রইল। এই বিশাল ছেলেটা কেমন এলোমেলো হয়ে যায় তার সামনে এলে। অথচ বাদবাকি জগৎটা দাপিয়ে বেড়ায় কী অবলীলায়। কী বিশুদ্ধ স্পর্ধায়! এর নামই বোধহয় ভালোবাসা। কিন্তু ভালোবাসারা এমন কেন? এমন রহস্যময়। এমন অপাঠ্য। এমন নির্ণয়ক। এমন গন্তব্যহীন কিংবা অগম্য?

রিকশাটা দাঁড়িয়ে ছিল পাশে। আরশি গিয়ে রিকশায় উঠল। রিকশাওয়ালা হুড তুলে দিল। তারপর প্লাস্টিকের নীল পলিথিন দিয়ে ঢেকে দিল। আসিফ দাঁড়িয়ে রইল যেমন ছিল। আরশি আসিফের দিকে তাকিয়ে নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল, 'যাই'। তারপর রিকশাওয়ালাকে বলল, 'মামা চলেন।'

রিকশাটা অফিসের গেট দিয়ে বেরিয়ে গেল। আসিফ নড়ল না। তবে মাথা তুলে চাইল। অফিসের সামনের সোডিয়াম লাইটের হলুদ আলোয় ভিজে আরশির রিকশাটা চলে গেল। আসিফ দাঁড়িয়ে রইল। তার হঠাৎ মনে হলো এই বিশ্বচরাচরে সে একা। ভীষণ একা। এখানে আর একটাও মনুষ নেই, একটাও বৃক্ষ নেই, পাখি নেই, প্রাণ নেই। আলো নেই কোনো। যেন একা এক নিঃসীম অন্ধকার আর সে। আর কিচ্ছু নেই। কিচ্ছু না। আসিফ মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকাল। তুমুল বৃষ্টিতে ভেসে যাওয়া সেই রাতে আসিফের বুকের ভেতর জমে থাকা কান্নারা হঠাৎ বানের জলের মতোন ছুটে এলো। ভাসিয়ে নিল জীবন ও জগৎ। আসিফ হুহু করে কাঁদল। এই কান্না কেউ দেখল না। কেউ শুনল না। কেউ জানল না। মিশে গেল বৃষ্টির জলে।

আরশি সারাটা পথ ভাবল, সে কি বিধানচন্দ্রকে ভালোবাসে? সে জানে অবচেতন আরশি কোনো এক অদ্ভুত রহস্যময়তায় বিধানচন্দ্রের অপেক্ষায় ছিল। কিন্তু সেই অপেক্ষা কিসের? ভালোবাসার? একসঙ্গে থাকার? বিয়ের? শরীরের? কিসের অপেক্ষা? সে কি বিধানচন্দ্রকে ভালোবাসে? তাকে চায়? আরশির মনে হলো তার অপেক্ষার বিষয়টা যতটা স্পষ্ট, ঠিক ততটাই অস্পষ্ট এই প্রশ্নটা! এই অদ্ভুত অপেক্ষার অর্থ সে জানে না। গভীর রাতে আরশি তার সেই গোপন বাক্সটা খুলে বসল। বাক্সের ভেতর থেকে সেই লাল মলাটের খাতাটা বের করল

Boighar.com & ARS

সে। এই খাতাটা এই এত এত দিনে সে একবারের জন্যও খুলে দেখেনি। সে একটা বিশেষ দিনের অপেক্ষায় ছিল। আরশির মনে হলো আজ সেই দিন। সে খাতাটা খুলল। কতদিন পর বিধানচন্দ্রের হাতের লেখা দেখল সে? প্রথম পাতায় গোটা গোটা অক্ষরে সে লিখে রেখেছে, 'জগতের সবকিছুর ঋণ চোখের কাছে। আর চোখের ঋণ আয়নার কাছে। জীবন ও জগতের সবটা দেখা এই চোখ শুধু আয়নাতেই তার নিজেকে দেখতে পায়। কী অদ্ভুত হিসাব! এই ঋণ তাই এই জগতেরও। আমি এই জগতের নাম দিয়েছি আরশিনগর। যে নগরে হেঁটে যাই আমি ও আমার মতোন ঘোরগ্রস্ত তাবৎ নাগরিক।'

আরশি লেখাটা পড়ে খানিক চমকালো। বহুদিন আগে আয়নায় চোখ দেখে তার ঠিক এই কথাটাই মনে হয়েছিল। কিন্তু তার নিজেকে কখনও ঘোরগ্রস্ত নাগরিক মনে হয়নি। আরশি পরের পাতা উল্টাল। তার পরের পাতা। পাতার পর পাতা জুড়ে কবিতা। তার সবটা জুড়েই চোখ। আরশির চোখ। আরশি দীর্ঘ সময় নিয়ে পড়ল–

'এক জোড়া ভবঘুরে নদী; বহু পথ ঘুরে এসে যদি;
লুটায় তোমার চোখে, হাহাকারে ভেসে যাওয়া শোকে,
তুমি তাকে অশ্রু না ডেকে, ভালোবাসা ডেকো।
খুঁজে দেখ কোনো এক পলাতক মন, ডুবেছে তোমার ওই নেশাঘোর চোখে'।

সে পাতা ওল্টাল, www.boighar.com

নেশায় ডুবে যাক শহর, গলির শিস কাটা লাল চোখ বৃদ্ধ কিংবা যুবক।
ডুবে যাক শ্মশান কিংবা গোরস্তান। বুঁদ হয়ে থাক সকাল, সন্ধ্যা, রাত। রোদ কিংবা অজস্র বৃষ্টিপাত। বুঁদ হয়ে থাক উদ্ভ্রান্ত বুক।
নেশায় ডুবে থাকা মানুষ, চুমুকে চুমুকে সব দুঃখ শুষুক। মাতাল মাদকে কাটুক জমে থাকা পুরাতন শোক,
আজ চৌদিকে নেশাদের বান ডেকে যাক তোমার অমন মাদক চোখ।

আরশি পাতার পর পাতা উল্টাতে থাকল। উল্টাতেই থাকল। শেষ কবিতাটা যখন পড়ছে, তখন চারদিকে ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে। আরশি পড়ল,

'শোন কাজল চোখের মেয়ে;
আমার দিবস কাটে, বিবশ হয়ে, তোমার চোখে চেয়ে'।

আরশি দীর্ঘ সময় চুপ করে বসে রইল। তার বুকের ভেতর কী এক প্রবল ঝড়ে সব ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে সে শেকড়সহ উপড়ে পড়বে। এই প্রথম একটা পুরুষ মানুষকে তার ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে করছে। পুরুষ মানুষকে। কোনো পুরুষকে এভাবে, এমনভাবে এর আগে কখনও ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে হয়নি তার। কী এক প্রবল তেষ্টায় সারাটা শরীর জুড়ে হাঁসফাঁস লাগতে

লাগল আরশির! প্রবল তেষ্টা। এক তরুণী মেয়ের পুরুষ ছুঁয়ে দেখার তেষ্টা। কিংবা এক পরিপূর্ণ নারীর পরিপূর্ণ এক পুরুষে পুরোপুরি ডুবে যাওয়ার তেষ্টা। কিন্তু এই এতকিছুর পরও অনুভূতির কোথায় যেন একটা আবছায়া থেকে গেল। আরশি ধরতে পারল না। সে বিধানচন্দ্রের খাতার শেষ পাতাটা ওল্টাল। সেখালে লাল কালির অক্ষরে আরশির ধরতে না পারা সেই আবছায়াটা কী স্পষ্ট করেই না লেখা আছে! লেখা আছে এই চাওয়া আর পাওয়ার অদ্ভুত এক ডিলেমা।

বছর ঘুরে এলো। আরশির পড়াশোনা চলছে ঢিমেতালে। ইয়ার ফাইনাল হয়ে গেছে। নানাকারণে পিছিয়ে পড়া আরশি স্কুল শুরু করেছিল দেরিতে, না হলে এতদিনে সে হয়তো ইউনিভার্সিটিতেই থাকত। কিন্তু এই নিয়ে আরশির কোনো আক্ষেপ নেই। জীবনের কাছ থেকে সে যা পেয়েছে, তার সবটুকুকেই সে প্রাপ্তি মানে। এখানে অতৃপ্তির কিছু নেই। টেলিভিশনের প্রোগ্রামটা জমে উঠেছে। প্রথমেই হৈচৈ ফেলে দেওয়ার মতো কিছু ছিল না এটা। কিন্তু দিন যত গেছে, মানুষ তত যেন একটু একটু করে ডুবেছে এর প্রতিটি পর্বে। আরশির উপস্থাপনায় যে খুব আহামরি কিছু আছে, তা না। কিন্তু তারপরও কী যেন একটা আছে! এই কী যেন একটাই অনুষ্ঠানটাকে জমিয়ে দিল। আরশি অবশ্য এই কী যেন একটার ব্যাখ্যা নিজের মতো করে খুঁজে নিয়েছে। তার ধারণা রেডিও-টেলিভিশনে যারা কাজ করে তাদের সবাই কোনো না কোনোভাবে আরোপিত ভঙ্গি, উচ্চারণ, বাচনকেই ভাবে নিজেকে প্রদর্শন বা উপস্থাপনের ধরন। কিন্তু আরশি এর কিছুই করেনি। সে খুব সাধারণ, যেমন করে ভাবে, হাঁটে, কথা বলে, ঠিক তেমন। অবিকল। আরোপিত কিচ্ছু নেই। তার ভালোও লাগে না। করতে গেলেও সব কেমন গুলিয়ে যায়। তার ধারণা মানুষ অবচেতনভাবেই এমন কিছুই চাইছিল। এই আটপৌরে সাধারণটাকে। অকৃত্রিমতাকে। আর তার সেই অকৃত্রিম সাধারণটাকেই এখন সবাই ভাবছে কী যেন একটা!

আসিফের সঙ্গে তার টুকটাক কথা হয়। তবে আসিফ খুব একটা তার সামনে পড়তে চায় না। তবে আরশি টের পায়, আড়ালে-আবডালে আসিফের চোখ তাকে খুঁজে বেড়ায়। কিন্তু সে তার নিজেকে এইক্ষেত্রে জানে, চেনে। আর চেনে বলেই কখনও কখনও হঠাৎ করে উড়াল দিতে চাওয়া ক্ষণস্থায়ী অনুভূতির ডানাগুলোকে শক্ত করে বেঁধে রাখতে পারে। কিন্তু কখনও কখনও এলোমেলো হতে ইচ্ছে হয়। এত কিছু ভাবতে ইচ্ছে হয় না। কী হবে এই এতকিছু ভেবে! দিন শেষে কে কার হিসাব মনে রাখে! নাকি রাখে? আরশি জানে না। আজকাল অনেক কিছুই জানতে ইচ্ছে হয় না। মনে হয় জীবনে ভাবনা যত কম, জানার

Boighar.com & ARS

ইচ্ছে যত কম, জীবনের জটিলতা তত কম। জীবন তত সহজ। তবুও জীবন ভাবায়। অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটায়। জটিলতা না চাইলেও বাড়ায়। জীবনটাকে বুঝে উঠতে পারে না আরশি। কেউ কি পারে?

বছর ঘুরে আবার সেই শ্রাবণ মাস। জীবন ঘটাল অদ্ভুত এক ঘটনা। সেদিন শহর জুড়ে ইলেক্ট্রিসিটির কি ঝামেলা হয়েছে। দুপুর থেকে পুরো শহরে ইলেক্ট্রিসিটি নেই। সন্ধ্যা থেকে শুরু হলো মুষলধারে বৃষ্টি। আরশি বাইরে বেরিয়ে দেখল রাত আটটায়ই পথঘাট ফাঁকা। একটা কাঁকপক্ষি অবধি নেই। সে দারোয়ানকে বলল একটা রিকশা ডেকে দিতে। কিন্তু এই বর্ষায় রিকশা কই পাবে? আরশি অফিসের সামনে সেই ছাউনির নিচে দাঁড়িয়ে রইল। এই মুহূর্তে নীল প্লাস্টিকে মোড়া একটা রিকশা এলো। রিকশা থেকে নামল আসিফ। এত করে ঢেকেঢুকে আসার পরও ভেজা থেকে পুরোপুরি রক্ষা পায়নি আসিফ। সে রিকশা থেকে নামতেই আরশি এগিয়ে গেল। বলল, 'আপনি তো দেখি আমার ত্রাণকর্তা। যখনই বিপদে পড়ি, ঠিক ঠিক হাজির।'

আসিফ কথা বলল না। মৃদু হাসল। মানিব্যাগ খুলে ভাড়া চুকাল। আরশি বলল, 'অবশ্য আজকের উপকারটা কিন্তু ইচ্ছাকৃত না। ঘটনাচক্রে, তাই না? তারপরও আজ ধন্যবাদ দিচ্ছি। কারণ একবছর আগের ঠিক এমন বৃষ্টির দিনে করা ইচ্ছাকৃত উপকারের ধন্যবাদটা দিতে ভুলে গেছিলাম।'

আসিফ আবারও হাসল। আজ প্রথম আরশিকে শাড়িতে দেখল সে। আরশি পরেছে নীল রঙের শাড়ি। তার গায়ের রঙ সেই অর্থে ফর্সা না। শ্যামলা কিংবা উজ্জ্বল শ্যামলা। কিন্তু তাকে নীল শাড়িতে লাগছে ভয়ানক সুন্দর। আসিফের মনে হলো, নীল শাড়িতে আরশিকে যতটা সুন্দর লাগছে, ততটা সুন্দর কি তাকে লাগার কথা? নাকি সমস্যাটা তার নিজের! আরশি যেমনই থাকুক, তার মনে হবে জগতের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েটা তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। যে তাকালেই তার দমবন্ধ হয়ে আসে। শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। বুকের ভেতর হাজার হাজার প্রজাপতি ডানা ঝাপটায়। আরশি রিকশায় উঠল। তারপর হুড টেনে দিল। রিকশাওয়ালা প্লাস্টিকের নীল পলিথিনটা টেনে আরশির কোমর অবধি ঢেকে দিল। আসিফ হঠাৎ একটা অদ্ভুত কথা ভাবল, খানিক আগে ওই পলিথিনটা তাকে ছুঁয়ে ছিল, এখন আবার ছুঁয়ে আছে আরশিকে। আচ্ছা, ওই নীল পলিথিনের কোথাও কি তার স্পর্শরা লেগে নেই? তার সেই স্পর্শরা কি একটু হলেও আরশিকে ছুঁয়ে দিচ্ছে না?

আরশি হুডের ভেতর থেকে মাথা বের করে বলল, 'আপনার কি আজ নাইট?'

আসিফ মাথা নাড়ল, 'হুম।'

আরশি বলল, 'ওকে। যাচ্ছি তাহলে।'

আসিফ আবারও মাথা নাড়ল। অফিসের সামনে জেনারেটরে কতগুলো বাতি জ্বলছে। তার আলোয় লম্বা দীর্ঘ ছায়া পড়েছে আসিফের। আরশির রিকশাটা ধীরে ধীরে সেই ছায়া মাড়িয়ে চলে যেতে থাকল। আসিফ দেখল, রিকশাটা তার দীর্ঘ ছায়া পেরিয়ে রাস্তার অন্ধকারে হারিয়ে গেল। কিন্তু আসিফ দাঁড়িয়েই রইল তার দীর্ঘ লম্বা ছায়াটার দিকে তাকিয়ে। তার ছায়াটা বৃষ্টিতে ভিজে যাচ্ছে। অথচ কি অদ্ভুত, সেই ছায়ার মানুষটা দাঁড়িয়ে আছে না ভিজে। শুকনো খটখটে। আসিফের মনে হলো, ঘটনাটা উল্টো হওয়া উচিত ছিল, আসলে মানুষটা ভিজে যাচ্ছে, কিন্তু কেউ তা দেখছে না। সবাই দেখছে মানুষটার শুকনো খটখটে ছায়াটাকে। আসলে সবাই ছায়াই দেখতে চায়। মানুষটাকে কে দেখতে চায়? কেউ না।

রাস্তার ইলেক্ট্রিসিটি চলে এসেছে। সোডিয়াম লাইটগুলো এক এক করে জ্বলে উঠছে। আসিফ ঘুরে অফিসের দিকে পা বাড়াতে যাবে। এই মুহূর্তে অফিসের গেটে হলুদ সোডিয়াম লাইটের আলোয় তার চোখ আটকে গেল। আরশির রিকশাটা ফিরে আসছে। আসিফ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। কোনো বিপদ না তো! রিকশাটা আসিফের সামনে এসে দাঁড়াল। নীল প্লাস্টিকের পলিথিনের ভেতর থেকে মাথা বের করল আরশি। তারপর বলল, 'আপনি কি একটু আমার সঙ্গে আসবেন?'

আসিফ এতটাই ভড়কে গেছে, সে জানে না সে কী বলবে। সে জড়ানো গলায় বলল, 'কেন, কোনো সমস্যা?'

আরশি বলল, 'হ্যাঁ, ভয়াবহ সমস্যা।'

আসিফ ভীত গলায় বলল, 'কী সমস্যা?'

আরশি বলল, 'কেন, আসতে ভয় পাচ্ছেন?'

আসিফ ঢোক গিলে বলল, 'না, তা না।'

আরশি বলল, 'তাহলে আসুন।'

আসিফ রিকশায় উঠল। সে একপাশে জড়সড় হয়ে বসল। আরশি বলল, 'হুডের কারণে বসতে সমস্যা হচ্ছে?'

আসিফ বলল, 'না, ঠিক আছে।'

আরশি বলল, 'হুড ফেলে দেই?'

আসিফ আঁতকে ওঠা গলায় বলল, 'না না, বৃষ্টি।'

আরশি হেসে বলল, 'বৃষ্টিই তো।'

আরশি রিকশাওয়ালাকে ডেকে বলল, 'মামা, হুডটা ফেলে দেন তো'।

রিকশাওয়ালা বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে বলল, 'খালা, বিষ্টি তো!'

আরশি অবিকল আগের মতো করেই বলল, 'বিষ্টিই তো!'

হুড ফেলে দেওয়া রিকশা চলতে শুরু করেছে। প্রবল বৃষ্টিতে ভিজে যাচ্ছে সোডিয়াম লাইটের হলদে আলো। রাস্তার ফুটপাত। আরশি হঠাৎ রিকশাওয়ালাকে বলল, 'আপনার এই নীল প্লাস্টিকের দাম কত?'

Boighar.com & ARS

রিকশাওয়ালা বলল, 'কুড়ি ট্যাকা।'

আরশি বলল, আমি যদি আপনাকে কুড়ি টাকার ডাবল দেই, তাহলে কি আমি এই নীল প্লাস্টিকটাকে ছুড়ে ফেলে দিতে পারব?'

রিকশাওয়ালা বলল, 'আপনে কি পাগল নাকি খালা?'

আরশি নীল প্লাস্টিকটা ছুড়ে ফেলে দিতে দিতে বলল, 'আমরা সবাই পাগল মামা।'

আসিফ একটা কথাও বলল না। সে তার পাশে বসা মেয়েটাকে দেখতে পারছে না। তার খুব ইচ্ছে হচ্ছে মেয়েটাকে দেখতে। কিন্তু প্রবল বৃষ্টিতে ভিজে নীল শাড়িটা আরশির শরীরের সঙ্গে লেপ্টে আছে। আরশির শরীরের উঁচু-নিচু বাঁক, ভাঁজগুলো তাতে স্পষ্ট হয়ে আছে। আসিফ কী করে তাকাবে! সে তাকিয়ে আছে তার পায়ের দিকে। আরশি হঠাৎ বলল, 'আপনার কি আমার দিকে তাকাতে ইচ্ছে করছে?'

আসিফ কথা বলল না। সে যেমন তাকিয়েছিল, তেমন তার পায়ের দিকে তাকিয়েই রইল। আরশি বলল, 'আপনি চাইলে আমার দিকে তাকাতে পারেন। আমি কিছু মনে করব না।'

আসিফ তাও কথা বলল না। আরশি খানিক চুপ থেকে বলল, 'একটা গোপন এবং নির্লজ্জ কথা বলি? আপনি আমাকে বেহায়া ভাবতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। আপনি আমার দিকে তাকালে আমার অসম্ভব ভালো লাগবে। আমি খুব করে চাই আপনি আমাকে দেখুন।'

আসিফ কী করবে, সে বুঝে উঠতে পারছে না। এই মেয়েটার কাছে আসলে তার সবকিছু কেমন এলোমেলো হয়ে যায়। ওলট-পালট হয়ে যায়। সেই প্রবল বৃষ্টির রাতে, আসিফ ঘোরগ্রস্ত মানুষের মতোন আরশির দিকে তাকাল। আরশির চোখের দিকে তাকাল। এই চোখে সে কখনই তাকতে পারে না। চোখ রাখতে পারে না। কিন্তু আজ, এই মুহূর্তে পারল। সে তাকিয়েই থাকল। মুহূর্তের জন্য চোখ সরাল না। আরশির সেই চোখভর্তি কী ছিল আসিফ জানে না। কিন্তু সে তার হাত বাড়িয়ে আরশির ভেজা কোমর চেপে ধরল। তারপর কাছে টানল। আরও কাছে। আরশিও যেন অপেক্ষায় ছিল। সে আসিফের শরীরের ভেতর ডুবে গেল। আসিফ একহাতে আরশির মুখ তুলে ধরল। সেখানে কী প্রবল তেষ্টায় থরথর করে কাঁপছে আরশির ঠোঁট। আসিফ আরশির সেই তৃষ্ণার্ত ঠোঁটের ভেতর তার ঠোঁট ডুবিয়ে দিল। ঝড়ো হাওয়ায় তখন মাতম লেগেছে। যেন বৃষ্টির প্রতিটি ফোঁটারা মাতাল হয়ে গেছে। যেন মাতাল করে দিতে চাইছে এই দুই মাতাল হৃদয়কে। সেই প্রবল ঝড়-বৃষ্টির মাতাল রাতে আকণ্ঠ তৃষ্ণা মিটিয়ে নিতে লাগল একজাড়া তৃষ্ণার্ত ঠোঁট।

যেন শুষে নিতে লাগল অপেক্ষার চাতক জীবন।

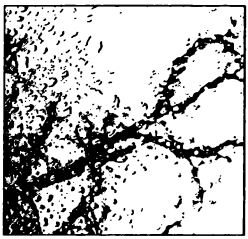

যশোদা স্যার বললেন, 'সামনে সময় খুব খারাপ।'

দুলাল মেম্বার বলল, 'খারাপ কেমনে? নির্বাচনের মাঠ তো আমাদের পক্ষে।'

যশোদা স্যার বললেন, 'পক্ষে বলেই বেশি খারাপ। আবদুল মমিন ভাবছিল, মোস্তফার বদলে ছত্তাররে দিলে মাঠ পর্যায়ে সমর্থনটা বাড়বে। কিন্তু বাস্তবে সেটা পুরোপুরি ঘটে নাই। না ঘটার কারণ অবশ্য ছত্তার নিজেই। সে নিজেদের বংশের মানুষের সঙ্গেই নানান ঝামেলা বাধাই রাখছে। যারা একটু দুর্বল, শক্তি দিয়ে তাদের সঙ্গে বিভিন্ন সময় জোর-জবরদস্তি করছে। ফলে তার নিজের লোকেরাই অনেকেই তার পক্ষে নাই।'

গালকাটা বশির বলল, 'এইটা তো আমাদের জন্যই ভালো।'

যশোদা স্যার বললেন, 'সব ভালোরই একটা মন্দ দিক থাকে। আমাদের এই ভালোর মন্দ দিক হলো আবদুল মমিন এবার বেপরোয়া হয়ে যাবে। কারণ সে জানে সে ভোটে জিততে পারবে না। সুতরাং সে এখন এমন কোনো কাজ নেই যেটা প্রয়োজন হলে করবে না।'

জালাল কাজী বলল, 'তাহলে?'

যশোদা স্যার বললেন, 'খুব সাবধানে থাকতে হবে। চলাফেরা করতে হবে। একা কোথাও যাওয়া যাবে না। রাতে বাইরে ঘোরা ফেরা করা যাবে না। খুব সাবধান।'

দুলাল মেম্বার বলল, 'আপনি চিন্তা করবেন না মাস্টার সাব। আমরা সাবধানই আছি।'

দুলাল মেম্বার আর জালাল কাজী এসেছিল দুপুরের দিকে। কথাবার্তা শেষে তারা বাড়ি ফিরল এশার পরপর। সেই রাতেই জালাল কাজী খুন হয়ে গেল। সে ঘুমিয়েছিল তার ঘরে। বাইরের ঘরে নিজের লোকজনও ছিল। কিন্তু তার লাশ পাওয়া গেল তার নিজের ঘরেই। যেমন শুয়ে ছিল তেমনই শুয়ে ছিল। কেবল গলার নালিটা ধারাল কিছু দিয়ে ফাঁক করে ফেলা হয়েছে। তার পাশে তার স্ত্রী শুয়েছিল, সে পর্যন্ত টের পায়নি। এই ভয়ঙ্কর খুনের ঘটনা বোঝা গেল না। খুনে

একজন মাত্র মানুষ জড়িত ছিল না, এটা পরিষ্কার। কিন্তু এতগুলো মানুষ কীভাবে এলো! কীভাবে খুন করে আবার চলেও গেল, কারও মাথায়ই কিছুই ঢুকল না। এই ঘটনায় দুলাল মেম্বার প্রচণ্ডরকম ভয় পেয়ে গেল। খুনের সপ্তাহখানেক পর আবার যশোদা স্যারের বাড়িতে মিটিং বসল। দুলাল মেম্বার খুনের ঘটনা যতটা সম্ভব বিস্তারিত বলল। যশোদা স্যার তারপরও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নানান প্রশ্ন করলেন, 'জালাল কাজীর বাড়ি কত বড়?'

দুলাল মেম্বার বলল, 'বিশাল বাড়ি। চাইরদিকে জঙ্গল। সামনে রাস্তা। বাড়ি ঢোকার পথের সঙ্গেই দহলিজ ঘর। তারপর ভিতর বাড়ি।'

যশোদা স্যার বললেন, 'ভেতর বাড়ির ঘর কেমন?'

দুলাল মেম্বার বলল, ' ভেতর বাড়ির ঘরও বড়ই। টিনের দোতলা ঘর। ওপরে কাঠের পাটাতন।'

যশোদা স্যার বললেন, 'ঘরে কে কে থাকত?'

দুলাল মেম্বার বলল, 'জালাল কাজী, তার বউ, এক মাইয়া, সেয়ানা। আর বড় পোলা। আরেক মাইয়া আছে। বিয়া হইয়া গেছে।'

যশোদা স্যার বললেন, 'বাড়ির পেছন দিক দিয়ে বাড়ি ঢোকার ব্যবস্থা কী?'

দুলাল মেম্বার বলল, 'ওই দিক দিয়া বাড়ি ঢোকা নানান ঝামেলা। এমনিতেই ঘন জঙ্গল। জঙ্গলের সঙ্গেই বিল। পাশ দিয়া ঘন কাশবন। খুবই অগম্য জায়গা।'

যশোদা স্যার বললেন, 'ওই দিকে কোনো পাহারা-টাহারা ছিল না, না?'

দুলাল মেম্বার বলল, 'গরুর ঘর আর রান্নাঘর বাড়ির পেছন দিকে। রান্নাঘরে এক মহিলা ঘুমায়। বাড়ির কাজটাজ করে। এই তো।'

যশোদা স্যার বললেন, 'খুনের পর লাশ কখন দেখছে জালাল কাজীর বউ?'

দুলাল মেম্বার বলল, 'বাড়ির সঙ্গেই মসজিদ। মাইকে ফজরের আজান শুইনা সে নামাজ পড়তে উঠছে। তখন অন্ধকারে জালাল কাজীরে ডাক দিছে, দেখে ওঠে না। ধাক্কা দিতে গিয়া দেখে বিছানা রক্তে ভিজা।'

যশোদা স্যার বললেন, 'ঘরের দরজা তো খোলা ছিল। তা কোন দরজা? সামনের দরজা? না পেছনের?'

দুলাল মেম্বার বলল, 'পেছনের দরজা। সে তখন চিৎকার দিয়া বারান্দায় গেছে। গিয়া দেখে পেছনের দিকের দরজা খোলা।'

যশোদা স্যার দীর্ঘ সময় চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, 'ঘটনা খুবই সোজা। দিনের বেলা কোনো একটা সময়, বা সন্ধ্যার দিকে আবদুল মমিনের দলের একজন পেছন দিক দিয়ে বাড়িতে ঢুকছে। দিনের বেলা ঘরের দরজা সবসময় খোলাই থাকে। দরজা খোলা রেখেই মানুষ কাজকর্ম করে। গোসল করতে যায়। নানান কাজ করে। এইরকম কোনো এক ফাঁকে আবদুল মমিনের লোক লুকিয়ে ঘরে ঢুকে পড়েছিল। যেহেতু দোতলা বড় ঘর। সেই লোক

সারাদিন লুকিয়ে ছিল দোতলায় বা খাটের তলায়। আর তার দলের বাদবাকিরা অপেক্ষায় ছিল বাড়ির পেছনের জঙ্গলে বা নৌকায় করে কাশবনে। রাত যখন গভীর হয়েছে তখন জঙ্গলে বা কাশবনে লুকিয়ে থাকারা বাড়িতে ঢুকছে। তারা কোনো একটা সঙ্কেত দিছে। সঙ্কেত শুনে ঘরে যে সারাদিন লুকিয়ে ছিল, সে চুপচাপ গিয়ে দরজা খুলে দিছে। ওরা সংখ্যায় পাঁচ ছয়জন ছিল। ঘুমের মধ্যে শক্ত করে জালাল কাজীর হাত-পা চেপে ধরেছে। কেউ বালিশ দিয়ে মুখ চেপে ধরেছে। বা মুখের ভেতর কাপড়-টাপড় কিছু একটা ঢুকিয়ে দিয়েছিল। গলা কাটতে এক মিনিট সময় লাগছে। এমনও হতে পারে ঘরে যে লুকিয়ে ছিল সে ঘরের খাবার পানির সঙ্গে ঘুমের ওষুধ-টষুধ কিছু মিশিয়ে রেখেছিল। খুবই সহজ হিসাব। জটিল হওয়ার তো কিছু নাই।'

যশোদা স্যার থামলেও কেউ কোনো কথা বলল না। যশোদা স্যারের যুক্তি অকাট্য। এমন ভৌতিক মনে হওয়া রহস্যের ব্যাখ্যাটা এমন সহজ হতে পারে এটা কারও মাথায় আসেনি। কিন্তু ব্যাখ্যা যা-ই হোক, আবদুল মমিন যেন এই খুনের মাধ্যমে স্পষ্ট বার্তা পাঠাল, তার পথ থেকে সরে না দাঁড়ালে রক্ষা নেই। এটা এক ভয়াবহ বার্তা। এরপরও মাঠে থাকার মতো সাহস দুলাল মেম্বারের আর নেই। সে সরাসরি কথাটা যশোদা স্যারকে বলল। সঙ্গে এটাও বলল যে, জালাল কাজীর বিকল্প কে হবে? মেম্বার পদের জন্য এখন তার বিকল্প কাউকেও তো পাওয়া যাবে না।

যশোদা স্যার বললেন, 'উপায় নাই বলার আগেও একবার চেষ্টা করে দেখতে হয়। এত অল্পতে হাল ছেড়ে দিলে তো বিপদ।'

দুলাল মেম্বার বলল, 'কিন্তু জালাল কাজীর বদলে আপনে লোক পাইবেন কই? জাইনা-শুইনা কেউ কি এখন আর মরতে আসব?'

যশোদা স্যার খানিক চুপ থেকে বললেন, 'আসব। যে একবার মরে গেছে সে আসব।'

গালকাটা বশির এবং দুলাল মেম্বার হাঁ করে তাকিয়ে রইল, 'একবার মরে গেছে?'

যশোদা স্যার বললেন, 'হাঁ, মজিবর মিয়া। জালাল কাজীর বদলে মেম্বার ইলেকশন করবে মজিবর মিয়া।'www.boighar.com

গালকাটা বশির এবং দুলাল মেম্বার যারপরনাই বিস্মিত হলো। কিন্তু যশোদা স্যার স্বাভাবিক গলায় বললেন, 'আমি কাল নিজে যযাতিপুর যাব। আর রাখঢাক করার কিছু নাই। বশির, তুই দলবল নিয়ে যযাতিপুর চলে আয়। তোর দল তিনটা ভাগ করবি। একটা থাকবে দুলালের বাড়ি। একটা যযাতিপুর হাটে। আরেকটা মজিবর মিয়ার বাড়ি।'

গালকাটা বশির বলল, 'আচ্ছা।'

পরদিন যশোদা স্যার যযাতিপুর এলেন। তিনি এলেন সরাসরি মজিবর মিয়ার আড়তে। মজিবর মিয়া যশোদা স্যারকে দেখে ভূত দেখার মতো চমকে উঠল! যশোদা স্যার মজিবর মিয়াকে সবকিছু খুলে বললেন। তারপর গালকাটা বশিরকে বললেন, 'আমি দুইটা দিন এইখানে থাকতে চাই।'

গালকাটা বশির এই কথা শুনে খুবই খুশি হলো। সে বলল, 'কিন্তু আপনি থাকবেন কই?'

যশোদা স্যার বললেন, 'আমার সঙ্গে দুইজন লোক দে। আমি আতাহার তালুকদারের ভাঙা বাড়িতে উঠব।'

যশোদা স্যার উঠে গেলেন আতাহার তালুকদারের ভাঙা বাড়িতে। পরদিন যযাতিপুর বাজারে হাটবার। বিকেলে হাটে প্রচুর মানুষ হলো। যশোদা স্যার নদীর পারে বটগাছের বেদিতে গিয়ে দাঁড়ালেন। তার সঙ্গে মজিবর মিয়া আর দুলাল মেম্বার। মনাই টিনের বাক্স পিটিয়ে শব্দ করে বাজারে আসা লোকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। বটগাছ তলায় লোকজন জড়ো হতেই দুলাল মেম্বার গলা উঁচিয়ে বলল, 'আপনেরা যারা এই গ্রামের তারা আমারে চেনেন। আমি বছর পনের আগে এই গ্রামে একবার মেম্বার হইছিলাম। সেই সময়ের কথা যাদের মনে আছে, তারাই ভালো বলতে পারবেন, আমি খারাপ লোক না ভালো লোক। খারাপ-ভালোর সিদ্ধান্ত আপনাদের। আমি সেই সিদ্ধান্ত জানার জন্য একটা সিদ্ধান্ত নিছি। সামনের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে আমি চেয়ারম্যান পদে নির্বাচন করতে চাই। যারা জানেন আমি লোক খারাপ, তাদের আমারে ভোট দেওনের দরকার নাই। কিন্তু যারা আমারে এতটুকুও ভালো জানেন, তাদের কাছে আমার একটা অনুরোধ।'

সম্মিলিত লোকজন খানিকটা চমকে গেছে। এর কারণ নির্বাচন যে চলে এসেছে এই বিষয়টিই অনেকের মাথায় ছিল না। আরেকটা বিষয় হলো যযাতিপুরে কেউ কখনও এইভাবে কথা বলেনি। কথা না বলার কারণও অবশ্য ছিল। তখন এমন হাটও ছিল না। তারা অনেকেই বলল, 'কী অনুরোধ?'

দুলাল মেম্বার সবার উদ্দেশে প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে বলল, 'এ গাঁয়ের এখন হর্তকর্তা কে? লতু হাওলাদার, তাই তো? বছর কয়েক আগেও কিন্তু সে ছিল না। দীর্ঘদিন ধইরাই এই গাঁয়ের মাথা ছিল আতাহার তালুকদার। আপনারাই বলেন, এই গাঁয়ে কোনোদিন কেউ কোনো বড় ধরনের মারামারি, কাইজ্জা বিবাদের কথা শুনছে? শুনে নাই। কিন্তু গত কয়েক বছরে কী হইল? আপনারাই বলেন? এই যে দুলাল কাজী খুন হইল, তালেব, হারাধন খুন হইল। শুধু তা-ই না, এই যে আতাহার তালুকদার রাইতের অন্ধকারে যযাতিপুর ছাড়ল, কেন?'

পুরো হাটের সব মানুষ যেন চলে এসেছে এই বটগাছ তলায়। এমন করে কেউ তাদের কখনও বলেনি। যযাতিপুরের মতোন শান্ত নিরুপদ্রব গ্রামখানা হঠাৎ করেই কী ভয়ঙ্কর জনপদে পরিণত হয়েছে! অথচ কেউ এমন করে

কারণগুলো ধরিয়ে দেয়নি। সমস্যা সমাধানের কথা বলে দেয়নি। কিন্তু তারা জানে, হঠাৎ করে সন্ধ্যা হলেই যেন মনে হয় এখানে-সেখানে ওঁৎ পেতে আছে মৃত্যু। পারতপক্ষে কেউ ঘর থেকে বের হয় না। কী বিভীষিকাময় সময়! এর থেকে মুক্তির পথ তাদের জানা নেই। তারা সবাই গোগ্রাসে শুনছিল। দুলাল মেম্বার বলল, 'এর কারণ লতু হাওলাদার আর আবদুল মমিন। আপনারা লোকমানরে দেখছেন। আমার পাশে দাঁড়ানো মজিবর মিয়ারেও সবাই চেনেন, জানেন। সে কেমন মানুষ সেইটা আপনাদের নতুন কইরা আমি কী বলব, আপনারাই ভালো জানেন। এই বাজারে, আপনাদের সবাইর সামনে বইসা লোকমান আর তার দল মজিবর মিয়ার কী করছে, আশা করি আপনারা ভোলেন নাই। আর ভুইলা গেলেও এখন একটু তাকাই দেখেন, আর মনে করার চেষ্টা করেন সেই আগের মজিবর মিয়া, আর আপনাদের সামনে দাঁড়ানো এই এখনকার মজিবর মিয়া। কি কোনো পার্থক্য পান? এই অবস্থার পেছনে কে দায়ী জানেন? দায়ী ওই লতু হাওলাদার।'

এই ঘটনার অনেক কিছুই উপস্থিত গ্রামবাসীর অনেকে জানে, আবার অনেকে জানে না। কিন্তু এই মুহূর্তে দুলাল মেম্বারের কাছ থেকে এমন গোছানো ভাষায় কথা শুনে তাদের সবার ভেতরেই কেমন যেন এক সাড়া লেগে গেল। দুলাল মেম্বার বলল, 'এর মাইয়া আরশির কথা মনে আছে? মা মরা সেই মাইয়াটা? সেই মাইয়াটা কই? তার কোনো খোঁজখবর আর কেউ পাইছে? সে তো সেই মাইয়ার বাপ। তার কেমনে এই এতগুলা বছর কাটছে, একবার চিন্তা কইরা দেখেন তো? তার জায়গায় নিজেরে চিন্তা কইরা দেখেন একবার।'

দুলাল মেম্বার এবার শেষ কথাটা বলল, 'মজিবর মিয়া সামনের নির্বাচনে মেম্বার ইলেকশন করব। আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ, যযাতিপুরটারে আবার আগের যযাতিপুরে ফিরাই নিতে একটু সহযোগিতা কইরেন।'

উপস্থিত জনতার কেউ কেউ জানাল তারা সঙ্গে আছে। কেউ কেউ কোনো কথা বলল না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। কিংবা পাশের জনের প্রতিক্রিয়ার অপেক্ষায় আছে। তবে যশোদা স্যার ভালো করেই জানেন, তাদের আজকের এই প্রকাশ্য উপস্থিতি ছিল আবদুল মমিনের বিপক্ষে একটা অভাবিত ট্রাম্পকার্ড। জালাল কাজীর খুনের প্রতিশোধ হিসেবে তারা যে এইরকম একটা খেলা খেলতে পারে সেটা আবদুল মমিন চিন্তাই করতে পারবে না। কিন্তু এর জবাব হিসেবে সে এখন লতু হাওলাদারকে নিয়ে এভাবে প্রকাশ্যে আসতেও পারবে না। সুতরাং সে খেলার চেষ্টা করবে অন্য কোনো পথে। যশোদা স্যারের ধারণা সেই অন্যপথের খেলাটা তিনি ধরতে পেরেছেন। তবে আবদুল মমিন বহু খেলেছে। তিনি আর তাকে খেলতে দিতে চান না।

সেই রাতে তিনি মজিবর মিয়াকে আড়ত থেকে বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন। বললেন মজিবর মিয়া এখন থেকে বাড়িতেই থাকবে। যশোদা স্যারও রাতটা

Boighar.com I.ARS

নিশ্চিন্তে ঘুমালেন। পরদিন দুপুর নাগাদ দুলাল মেম্বার আর গালকাটা বশিরকে ডেকে পাঠালেন যশোদা স্যার। তাদের মধ্যে অতি গোপনে কী কথা হলো তা জানা গেল না। তবে বিকেল বেলা যশোদা স্যার আর গালকাটা বশিরসহ ছয়জনের একটা দল চলে এলো মজিবর মিয়ার বাড়িতে। তারপর মজিবর মিয়াকে ডেকে যশোদা স্যার বললেন, 'তোমার শ্বশুরবাড়িতে খবর দাও। কাল-পরশুর মধ্যে তোমার শ্বশুর মজিদ বেপারীকে আসতে বল। তারপর তোমার মেয়ে তহুরা আর বউ লাইলিকে আপাতত কিছুদিনের জন্য স্টিমারঘাটা পাঠাই দাও।'

মজিবর মিয়া বলল, 'আচ্ছা। এইটা আমিও একবার চিন্তা করছিলাম।'

যশোদা স্যার বললেন, 'আরেকটা কথা। আজ রাতে এই বাড়িতে যেন কেউ না ঢোকে। কেউ যেন বেরও না হয়। তোমার বউও না।'

মজিবর মিয়া বলল, 'আচ্ছা।'

কথাবার্তা শেষে ছয়জনের দলটা নেমে গেল মজিবর মিয়ার বাড়ির পেছন দিকের নিচু জমিতে। পানি বাড়ছে। তবে এখনও হাঁটু পানির বেশি ওঠেনি। হাঁটু পানিতেই বড় লম্বা হোগলা ঘাষের পাতা জন্মেছে। সেই হোগলা পাতার আড়ালে আড়ালে ছয়জনের দলটা গিয়ে উঠল সেই হিন্দু পরিত্যক্ত বাড়িতে। তারপর তারা লুকিয়ে রইল ভাঙা মন্দিরটার ধ্বংসাবশেষের ভেতর। প্রতিটি মুহূর্ত যেন দমবন্ধ অপেক্ষার প্রহর। বিকেল থেকে সন্ধ্যা গড়াল। সন্ধ্যা থেকে রাত। প্রচণ্ড মশার উৎপাতে পাগলপ্রায় অবস্থা। কিন্তু উপায় নেই। মুহূর্তের ভুল ডেকে আনতে পারে মৃত্যু। রাত ১০টার দিকে সেই হাঁটু পানিতে ছপ ছপ শব্দ তুলে একটা ডিঙি নৌকা এসে ভিড়ল পরিত্যক্ত বাড়ির ভিটেতে। দু'জন লোক নামল নৌকা থেকে। বাকি জন নৌকা বেয়ে আবার ফিরে গেল। লোক দু'জন অন্ধকারে এসে ঠিক মন্দিরটার সামনেই বসল। একজন বিড়ি ধরাতে ধরাতে নিচু গলায় বলল, 'মজিবর মিয়া বাড়িতেই তো আছে?'

আরেকজন বলল, 'হ, এই ঘণ্টাখানেক আগেও খবর পাইছি।'

প্রথমজন বলল, 'সে না এতদিন আড়তে থাকত?'

দ্বিতীয়জন বলল, 'মরণ থাকলে মানুষরে বিলাত থেইকাও টাইনা যযাতিপুর নিয়াসতে পারে।'

প্রথমজন বলল, 'অপারেশন কখন শুরু করব? এখনই যাই? কাম শেষ কইরা গিয়া ঘুমাই থাকব।'

দ্বিতীয়জন বলল, 'মমিন ভাইয়ের কড়া নির্দেশ। মাঝরাইত ছাড়া কাম করন যাইব না।'

তারা মাঝরাতের অপেক্ষা করতে থাকল। কিন্তু তাদের জীবনে আর মাঝরাত এলো না। গালকাটা বশির নিজের হাতে তাদের খুন করল। তালেব মাঝি, হারাধন আর জালাল কাজীর মতো এই দু'জনেরও গলার নালি কেটে খুন

করা হলো। লাশ দুটি সেখানে ফেলে রাখা হলো না। কাঁধে করে নিয়ে আসা হলো যযাতিপুর বাজারে। তারপর ভোররাতের দিকে বাড়ি থেকে ডেকে আনা হলো দুলাল মেম্বার আর মজিবর মিয়াকে। ভোরের আলো ফুটল যযাতিপুর বাজারে। সেই বটগাছের তলায় মানুষের ভিড় বাড়তে থাকল। বটগাছের নিচের বাঁধানো বেদিতে দুটো লাশ পড়ে আছে। এদের খুনের ধরন অবিকল জালাল কাজী, তালেব মাঝি কিংবা হারাধনকে খুনের ধরনের মতো। গলার নালি কেটে খুন!

লোক সমাগম বাড়তে দুলাল মেম্বার আবার উঠে দাঁড়াল সেই বট গাছের বেদিতে, তারপর বলল, 'দুইটা দিন আগে আপনাদের বলছিলাম ইলেকশন করতে চাই। এই গ্রামে খুনাখুনি চাই না। সেই আগের যযাতিপুর চাই। কিন্তু আজকে কী অবস্থা দেখেন। এদের কী দোষ? তালেব, হারাধন আর জালাল কাজীর খুনের কথা তো সবারই মনে আছে! দুইদিন আগেই খবর পাইলাম মজিবর মিয়ার আড়ত লুট হইব। তাই বশির ভাইরে বললাম একটু সাহায্য করতে। সে তার দলের এই দুইজনরে পাঠাইল পাহারায় থাকতে। এখন দেখেন আইজ রাইতে সেই দুইজনের অবস্থা! আপনারা বুঝছেন তো এই কাজের পেছনে কে আছে? নাকি নাম ধইরা কওন লাগব?'

মৃত দুইজনকে গাঁয়ের লোকজন চেনে না। কারণ এই দুইজন হলো আবদুল মমিনের দলের নতুন লোক। এরা কখনও প্রকাশ্যে আসেনি। ফলে এদের গালকাটা বশিরের লোক বলে চালিয়ে দিতে কোনোই সমস্যা হলো না। সবচেয়ে বড় কথা গ্রামের মানুষ যেন তীব্র ক্ষোভে ফুঁসে উঠল। নিরীহ, খেটে খাওয়া মানুষগুলো হঠাৎ যেন জেগে উঠল। মজিবর মিয়া তাদের শান্ত করল। তারপর ভাঙা ভাঙা উচ্চারণে সে বলল, 'আপনারা যদি বিপদে-আপদে এক জোট হইয়া পাশে দাঁড়ান। তাইলেই আর কিছু লাগব না। আমারে যখন এই বাজারে এতগুলান মানুষের সামনে বইসা, মাত্র পাঁচ-ছয়জন মানুষ মিলা মারল, তখন যদি আপনারা সবাই গিয়া আমার পাশে দাঁড়াইতেন, সবাই এক সঙ্গে মিলা, তাইলে ওই পাঁচ-ছয়জনে কী করত? পারত কিছু করতে?'

এবার সমস্বরে আওয়াজ উঠল, 'না।'

আবদুল মমিন আর লতু হাওলাদারের হাতে থাকা খেলার তাস হঠাৎ ধপ করে পাল্টে গেল। যশোদা স্যার এমন অবিশ্বাস্য চাল চালবেন, এটা তাদের কল্পনায়ও ছিল না। তারা বুঝে গেল যে এই খেলায় তারা হেরে গেছে। এই খেলায় তাদের আর জেতার আশা নেই। কোনোভাবেই না। কিন্তু দৃশ্যপটে আবারও সেই মজিবর মিয়া? লতু হাওলাদারের শুকনো ক্ষতে নতুন করে যেন

প্রদাহ শুরু হলো। সে আবদুল মমিনের সামনে হাত জোড় করে বসে বলল, 'যা করার এখনই করতে হবে মমিন ভাই।'

আবদুল মমিন বলল, 'করার তো আর কিছু নাই। আমরা জীবনেও আর ইলেকশনে জিততে পারব না।'

লতু হাওলাদার বলল, 'ইলেকশনে জেতার কথা বাদ দেন। কিন্তু পুরা খেলায়ই তো আমরা হাইরা যাইতেছি।'

আবদুল মমিন বলল, 'কিন্তু কোনো খেলায়ই তো আর জেতার কোনো উপায় নাই।'

লতু হাওলাদার বলল, 'আছে। উপায় আছে।'

আবদুল মমিন মনোযোগ দিয়ে তার উপায় শুনল। উপায় শুনে আবদুল মমিনের কপাল কুঁচকে গেল। সে বলল, 'তার সম্পর্কে আপনার ধারণা নাই। সে কে এইটা আপনে জানেন না। জানি আমি। এই ঘটনা ঘটাইলে পুরা দেশে জিনিসটা ছড়াইয়া যাইব। তখন অবস্থা হইব আরও খারাপ।'

www.boighar.com

লতু হাওলাদার বলল, 'কিন্তু এই সবকিছুর মূলে একমাত্র সে। চিন্তা কইরা দেখেন। বাদবাকি আপনের বিবেচনা। সে শেষ মানে আরগুলা এমনিতেই শেষ। তয় জিনিসটা অন্য কোনোভাবে ঘটানো যায় কিনা সেইটাও দেখতে পারেন।' আবদুল মমিন গভীর চিন্তায় পড়ে গেল। গভীর চিন্তা শেষে সে সিদ্ধান্ত নিল, কাজটা সে করবে। সে এমনিতেও শেষ, ওমনিতেও শেষ।

তাছাড়া মৃত লোকমানের সেই নৃশংস খুনের আসল প্রতিশোধটাইবা বাকি থাকবে কেন?'

মজিবর মিয়া তার বড় মামা বা শ্বশুর মজিদ বেপারীকে খবর দিয়ে আনাল। সে তার হাতে একটা গোপন দলিল দিল। দলিলে তহুরার নামে পাঁচ বিঘা জমি লিখে দেওয়া। এই জমি মজিবর মিয়া কিনেছিল তার ট্রলার কেনার একদম প্রথম দিকে। মজিদ বেপারীর হাতে দলিলখানা দিয়ে মজিবর মিয়া বলল, 'আমি চাইছিলাম আপনে লাইলি আর তহুরারে স্টিমারঘাটা নিয়া যান। এইখানকার পরিস্থিতি খুব খারাপ। কখন কী হয় বলা যায় না। কিন্তু আমার ধারণা লাইলি যাইব না। তয় কিছুতেই তহুরারে রাইখা যাইয়েন না। তহুরারে নিয়া যাইয়েন।' মজিদ বেপারী গম্ভীর গলায় বলল, 'দেখি কী করন যায়।'

কিন্তু মজিদ বেপারীও কিছু করতে পারল না। মজিবর মিয়ার কথাই সত্যি হলো। লাইলি যেতে রাজি হলো না। মজিদ বেপারী তহুরাকে নিয়ে চলে গেল।

যযাতিপুরে যশোদা স্যারের কাজ গোছানো হয়ে গেছে। মাত্র কয়েকটা দিনে তিনি সব হিসাব-নিকাশ পাল্টে দিয়ে সবাইকে চমকে দিলেন। যেহেতু যযাতিপুরে তার আর কোনো কাজ নেই। সুতরাং দিন তিনেক বাদে তিনি

মালোপাড়া ফিরে গেলেন। কয়েকদিন পর কী এক জরুরি কাজে তাকে ঢাকায় যেতে হবে। এর এক সপ্তাহ পর যশোদা স্যার ঢাকার উদ্দেশে রওনা দিলেন। কিন্তু এরপর থেকে তার আর কোনো খোঁজখবর পাওয়া গেল না। কোথাও না। তার খোঁজখবর পাওয়া গেল দিন পনের বাদে। যশোদা স্যারের খোঁজ পাওয়া গেল মোঘলগঞ্জ থেকে মাইল তিনেক উত্তরে মিয়াপুর গাঁয়ের দিকে। সেখানে নতুন বড় রাস্তা হচ্ছে। ইট-বালু-সিমেন্ট নিয়ে বড় বড় ট্রাক আসছে। যশোদা স্যারের লাশ পড়ে ছিল সেই নতুন রাস্তায়।

লাশ দেখে মনে হলো তিনি মারা গেছেন ট্রাকচাপায়।

তার মৃত্যুতে নড়েচড়ে বসল দেশের প্রশাসন, মিডিয়া, রাজনৈতিক দল। যৌবনে এই মানুষটা কত বড় বড় জাতীয় আন্দোলনে দাপিয়ে বেড়িয়েছিলেন ঢাকার রাজপথ! সেই মানুষটার এমন মৃত্যু হলো দেশের কোনো এক বিচ্ছিন্ন প্রত্যন্ত এলাকায়! এতদিন ধরে আড়ালে থাকা এই বিশাল প্রত্যন্ত জনপদ হঠাৎ করেই যেন উঠে এলো আলোচনায়।

Boighar.com & ARS

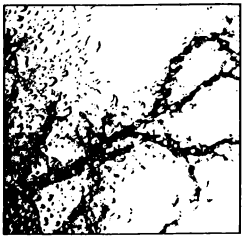

সুজাতা রানী মারা গেছেন। খবর পেয়ে আশিষ মিলিকে নিয়েই কলকাতা গেল। ফিরল মাসখানেক পর। সঙ্গে ফিরলেন শুকরঞ্জন ডাক্তারও। কিন্তু এই শুকরঞ্জন ডাক্তারকে যেন আশিষ চেনে না। আসলে সময় কখন চলে যায়। চলে যায় কী দ্রুত! তখন বোঝা যায় না। বোঝা যায় সময়ের ফেলে যাওয়া আঁচড় দেখে। শুকরঞ্জন ডাক্তারের মতোন প্রাণোচ্ছল মানুষটা কেমন বুড়িয়ে গেছেন। যেন সোজা হয়ে হাঁটতে পারেন না। অনেকটাই ঝুঁকে গেছেন সামনের দিকে। চোখেও যেন ঠিকমতো দেখেন না। কত মানুষকে ছায়া দিয়ে আগলে রাখা সেই বিশাল বটবৃক্ষের মতো মানুষটা নিজেই যেন আজকাল আশ্রয় খুঁজছেন, ছায়া খুঁজছেন। এই হলো জগতের রীতি। এক অদ্ভুত চক্র। এই চক্র চলতেই থাকে। এই একই চক্র। কেবল মানুষগুলো ভিন্ন। এই চক্রের চালক হচ্ছে সময়। সময় তোমাকে বীজ করবে, চারা করবে, গাছ করবে, বিশাল ছায়াদায়ী বটবৃক্ষ করবে। তারপর ধীরে ধীরে বিস্তৃত শেকড় জুড়ে ঘুণপোকা ধরবে। ডালপালা পাতারা ক্রমশই শুকিয়ে ঝরে পড়বে। তারপর একসময় মৃত্যু। এই গল্প চলতেই থাকে। অসীম মহাকালের গল্প। শুকরঞ্জন ডাক্তার সেই গল্পের খুব ছোট্ট একটা অংশ। খুব ছোট্ট। কিন্তু ঘুরে-ফিরে গল্পগুলো তো সবারই সেই এক। জন্ম, শৈশব, কৈশোর, যৌবন, বার্ধক্য তারপর মৃত্যু। আবার কারও জন্ম। আবার সেই একই গল্প। চক্রের গল্প।

www.boighar.com

শুকরঞ্জন ডাক্তারের আজকাল কিছুতেই যেন কোনো আগ্রহ নেই। সারাদিন ড্রইংরুমে বসে থাকেন। কারও সঙ্গে ইচ্ছে করে কথাও বলেন না। মাঝে মাঝে একা একা হাঁটতে বের হন। তখন মালোপাড়ার কথা খুব মনে পড়ে। তবে খুব একটা আগ্রহ পান না। কই যাবেন? সেখানে কিছুই কি আগের মতো আছে? সেই বাড়ি, ঘর, গৃহস্থালি? সেই মানুষগুলো? তারা কেউ কি শুকরঞ্জন ডাক্তারের কথা মনে করে? অসুখ হলে? কিংবা ক্ষেতে লাউ, আলু, মুলার ফলন হলে কি তারা ভাবে, 'যাই, আগে ডাক্তার সাবরে দিয়া তারপর নিজেরা খাই?' ভাবে তারা? নাকি তাকে ভুলেই গেছে! শুকরঞ্জন ডাক্তার পরিবর্তন মেনে নিতে পারেন

না। পরিবর্তন মেনে নিতে তার এত কষ্ট হয়। এত কষ্ট! কিন্তু জগতের সবকিছুর নিয়ন্তা যেখানে সময়, সেখানে পরিবর্ত না মেনে উপায় কী?

এক রাতে খাবার টেবিলে বসে শুকরঞ্জন ডাক্তার হঠাৎ আরশির কথা জানতে চাইলেন। আশিষ তাকে আরশির পুরো ঘটনা বিভিন্ন সময় জানিয়েছে। কিন্তু শেষ বছর দুই ধরে আর তেমন কিছু জানানো হয়নি। আজ সে মোটামুটি জানাল। চারপাশের বিষাদ জগৎ থেকে এই একটামাত্র জিনিস যেন শুকরঞ্জন ডাক্তারকে আগ্রহী করে তুলল। তার হঠাৎ মনে হলো এই মানব জীবন কী বিচিত্র! কী বিস্ময়কর! সেই আরশি! এই তো যেন সেদিনের কথা, বৃষ্টি-কাদায় মাখামাখি হয়ে মজিবর মিয়া ছুটে এলো, তার স্ত্রী নিলুফা বানু অসুস্থ। বাচ্চা হবে। তার ব্যাগ নিয়ে আগে আগে দৌড়ে গেল মজিবর মিয়া। উঠানে পাড়া দিয়ে শোনে বাচ্চা কাঁদছে, বাচ্চার মা মারা গেছে। সেই আরশি!

কী অদ্ভুত অবিশ্বাস্য এই জীবন, এই সময়।

আরশি এতটা বছর ধরে আর একবারের জন্যও যযাতিপুর যায়নি! মজিবর মিয়ার সঙ্গে আর কখনই দেখা হয়নি? আচ্ছা মজিবর মিয়া কেমন আছে? বেঁচে আছে তো? শুকরঞ্জন ডাক্তারের বুকের ভেতর থিতিয়ে আসা রক্তরা মুহূর্তেই যেন আবার উষ্ণ হয়ে উঠল। সেই চেনা পথ, চেনা মানুষ, চেনা গন্ধের জন্য বুকের ভেতরটা কেমন হাহাকার করে উঠল। সে আশিষকে বলল আরশিকে একদিন বাসায় নিয়ে আসতে।

আরশি এলো এক সন্ধ্যাবেলা। সে ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়াল। শুকরঞ্জন ডাক্তার বসে আছেন ড্রইংরুমে। তার মাথায় শুকরঞ্জন ডাক্তারের একটা ছবি সবসময়ই গেঁথে ছিল। কিন্তু আজ এত বছর পর মানুষটাকে সামনাসামনি দেখে মানুষটার জন্য তার কেমন যেন মায়া হতে লাগল। মনে হলো বিশাল শূন্য চরাচরে একা একটা বুড়ো বৃক্ষ। ঝড়-ঝাপ্টায় ক্লান্ত। যেকোনো সময় শেকড়সহ উপড়ে পড়বে। এখন কেবল সেই উপড়ে পড়ার অপেক্ষা। শুকরঞ্জন ডাক্তারের সঙ্গে আরশির কখনও কথা হয়নি। কিন্তু তিনি চোখ তুলে একপলক তাকিয়ে খুব চেনা মানুষের মতো করেই বললেন, 'আয়, বয়।'

আরশি বসল। শুকরঞ্জন ডাক্তার বললেন, 'তুই কি জানস যে তুই একটা বিরাট বড় অন্যায় করছস! আমার ক্ষমতা থাকলে আমি তোরে কঠিন শাস্তি দিতাম।'

আরশি খানিকটা বিভ্রান্ত হয়েছে। সে বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে শুকরঞ্জন ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে রইল। শুকরঞ্জন ডাক্তার বললেন, 'মানুষের জীবন খুব ছোট। এই ছোট্ট জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস কি জানস?'

আরশি বলল, 'জানি।'

শুকরঞ্জন ডাক্তার বললেন, 'বল।'

Boighar.com & ARS

আরশি খুব ধীরে কিন্তু খুব স্বাভাবিক গলায় বলল, 'সময়।'

শুকরঞ্জন ডাক্তার খানিক অবাক হলেন। এই সময়ের এই বয়সী একটা মেয়ের কাছ থেকে এমন উত্তর তিনি আশা করেননি। তিনি গম্ভীর গলায় বললেন, 'যা তোর শাস্তি মাফ করে দিলাম। যদিও তুই সেই সময়ের সঙ্গে বড় অন্যায় করছস।'

আরশি কিছু বলল না। সে চুপচাপ বসে রইল। শুকরঞ্জন ডাক্তার বললেন, 'এই এতটা বছর, একবারও মনে হয় নাই যে বাবার সঙ্গে দেখা করা দরকার! যেকোনো উপায়ে হোক তারে জানানো দরকার তুই কই আছস? কেমন আছস! একবারও মনে হয় নাই? এই এতটা সময়, সেই মানুষটা কেমন কইরা বাঁইচা আছে, না মইরা গেছে, একবারও জানতে ইচ্ছা করে নাই?'

আরশি জানে না সে কী বলবে। ঠিক এই মুহূর্তে তার মনে হলো, জগতে মানুষের চেয়ে বিচিত্র প্রাণী আর নেই। এই ছোট্ট, সহজ অথচ অবশ্যম্ভাবী বিষয়টা কী করে কী করে যেন এই এতটা দিন ধোঁয়াশা হয়েছিল। শুধু তার কাছে কেন? তার চারপাশে থাকা রুবিনা, আশিষের কাছেও। অবশ্য প্রথম দিকের নানান ঘটনা, পরিস্থিতি আর হিসাব-নিকাশের বেড়াজালে আটকে ছিল বিষয়টা। কিন্তু তারপর যত দিন গড়িয়েছে সবাই যার যার কাজে কী ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়েছে! সে মুখ ফুটে কারও কাছে কখনও কিছু বলতেও পারত না। কত কত রাত কী ভয়ঙ্কর তীব্র যন্ত্রণায় ছটফট করেছে সে। কিন্তু কারও কাছে বলতে ইচ্ছে হতো না। কারও কাছেই না। কেন হতো না সে জানে না। কিন্তু আজ এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে মানুষ হিসেবে কী ভয়ঙ্কর স্বার্থপরই না সে! জগতে কত কিছুরই কোনো উত্তর নেই। হয়তো সেইসব উত্তরহীন কতকিছুর ভেতর টুপ করে ডুবে রইবে তার এই অব্যাখ্যেয় আচরণ। কিন্তু আসলেই কি অব্যাখ্যেয়? নাকি সে প্রতিটি দিন, প্রতিটি মুহূর্ত কী নিদারুণ তেষ্টায় অপেক্ষা করে গেছে সময়ের। তার সময়ের। একান্ত নিজের সময়ের। সে জানে না। সবকিছু কেমন এলোমেলো লাগে আরশির।

শুকরঞ্জন ডাক্তার বললেন, 'আমি কিছুদিনের মধ্যেই মালোপাড়া যাব। তুই আমার সঙ্গে যাবি।' www.boighar.com

আরশির মনে হলো সে একটা তীব্র ঝাঁকুনি খেল। তার পায়ের আঙুল থেকে মাথার চুল অবধি সেই ঝাঁকুনিতে কেঁপে উঠল। যযাতিপুর! এই এতটা দিন সে অজস্রবার যযাতিপুরের কথা ভেবেছে। কিন্তু কোনো এক অদৃশ্য পর্দা যেন ঝুলেছিল বাস্তব আর ভাবনার মাঝখানে। তার কখনই মনে হতো না যে যযাতিপুর যাওয়া সম্ভব! মনে হতো ওটা বাস্তব কোনো জগৎ নয়। এ তার কল্পনার সৃষ্ট এক জগৎ। বাস্তবে যযাতিপুর বলতে কিছু নেই। এমনকি এই ভাবনাগুলো একটা সময়ে এসে অবচেতন মনের ভেতরও হয়তো বাসা গেড়ে

বসেছিল। তার বাবা, সেই চালতা গাছ, আম্বরি বেগমের কবর, এই সবকিছুই যেন বাস্তব জগতের কিছু নয়। এই সবকিছুই যেন অন্য কোনো জগতের। যেন কেবলই তার চিন্তার জগৎ, কল্পনার জগৎ, মনখারাপের একলা মুহূর্তগুলোয় একান্ত ভাবনার জগৎ। যার বাস্তব কোনো অস্তিত্ব নেই। কখনও ছিলও না। সে কল্পনায় যার প্রতিটি দৃশ্য, প্রতিটি চরিত্র নিজে নিজেই তৈরি করেছে। তৈরি করেছে হাসি, কান্না, আনন্দ-বেদনার গল্পগুলোও। আজ এই মুহূর্তে এসে তার হঠাৎ মনে হলো তার অবচেতন মনে গেড়ে বসা সেই বাস্তব আর ভাবনার মাঝখানে থাকা অদৃশ্য কিন্তু শক্তিশালী পর্দাটা যেন হঠাৎ খসে পড়ল। যেন সে ছুটে এই ঘর থেকে বেরোলেই পৌঁছে যেতে পারবে তার বাড়ির উঠানে।

শুধু এই ঘরের দরজাটুকু ডিঙানোর পালা।

আরশি হোস্টেলে ফিরল পরদিন। তার বুকের ভেতরটা কেমন ছটফট করতে লাগল। এই ছটফটানির দিনগুলোতে তার বাড়ির কথা মনে হয়। আম্বরি বেগমের কথা মনে হয়। বাবার কথা মনে হয়। আর মনে হয় চালতা গাছটার কথা। তার তলায় পরে থাকা ধবধবে সাদা ফুলগুলোর কথা। আর কিছু কি মনে হয়? আরশি অনেকক্ষণ ভাবল। আজকাল সবচেয়ে বেশি বোধ হয় মনে হয় না দেখা সেই মানুষটার কথা। আচ্ছা সে তো বলতে গেলে মানুষটাকে দেখেইনি। তার জন্মের কিছুক্ষণের মধ্যে মানুষটা মারা গিয়েছিল। তাহলে কেন তার এমন হয়? আরশি বোঝে না। এই জগৎ-সংসারের অনেক নিয়মই সে আজকাল বোঝে না।

আরশির হঠাৎ অদ্ভুত একটা ইচ্ছে হলো। তার এই মুহূর্তে চুপচাপ তার মায়ের কবরটার পাশে বসে থাকতে ইচ্ছে হচ্ছে। চুপচাপ। একা। একদম একা। দীর্ঘ সময়। কিন্তু কীভাবে? সে তার মার কথা কখনও কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করেনি। না আম্বরি বেগমকে, না মজিবর মিয়াকে। তবে অনেক কথাই সে শুনেছে। সে জানে, মোঘলগঞ্জের উত্তরে মাইল পাঁচেক গেলেই মিয়াপুর গ্রাম। সেখানে তার মায়ের নানা বাড়ি। সেই বাড়ির কোথাও না কোথাও তার মা নিলুফা বানু শুয়ে আছে। তার কবরটা কি এখনও আছে? নাকি ঝড়, বাদল, বন্যায় মিশে গেছে মাটির গভীরে। হতভাগ্য এক মানুষ। যার কবরটাও হতভাগ্য। যেই হতভাগ্য কবরটার পাশে প্রবল ভালোবাসা নিয়ে তার স্বামী কখনও দাঁড়িয়ে থাকেনি। প্রবল মমতা নিয়ে তার সন্তান কখনও দাঁড়িয়ে থাকেনি। এমনকি তারা জানেই না, কোথায় কোন মাটির উদরে শুয়ে আছে সে! প্রবল ভালোবাসাময় প্রার্থনা নিয়ে সেই মাটি হয়তো কেউই কোনোদিন

Boighar.com & ARS

একটুখানি ছুঁয়ে দেয়নি। আচ্ছা মার কবরটা যদি সে ছোঁয়, তাহলে কি সে মায়ের স্পর্শ পাবে? এই এতটুকু স্পর্শ। এতটুকু!

সামনেই পরীক্ষা। টেলিভিশন প্রোগ্রামটা নিয়ে কী করবে ভাবছে আরশি। পুরোপুরি ছেড়ে দিতে চাইলে ওরা বিপদে পড়ে যাবে। তাছাড়া এটা এখন তার দরকারও। সে আজকাল ভালোই টাকা পায় ওখান থেকে। রুবিনা বা আশিষের কাছ থেকে আর নিতে হয় না। বরং যা টাকা পায় নিজের খরচ শেষে কিছু বেঁচেও যায়। আসিফের সঙ্গে দেখা হলো অনেক দিন পর। সেই উথাল-পাতাল বৃষ্টির মাতাল রাতের পর আসিফের সঙ্গে তার সম্পর্কটাও পাল্টে গেল। তাদের মধ্যে কি প্রেম হয়ে গেল? তারা তুমি করে বলে। একজন আরেকজনের হাত ধরে বসে থাকে, রাস্তায় হাঁটে। নিয়মিত যোগাযোগ হয়। কথা হয়। দেখা হয়। কিন্তু আরশি জানে না, এই সম্পর্কের নাম ভালোবাসা কিনা! সবকিছুর পরও কোথায় যেন একটা ফাঁক রয়ে গেছে। এটা আসিফও টের পায়। যে প্রবল ভালোবাসার আকুতি নিয়ে সে এসেছিল তা যেন ঠিক মেলাতে পারে না। কোথায় যেন কিছু একটা নেই! নাকি মানুষের ভাবনাটাই এমন। সে থাকে ঘোরের জগতে। সেখানে সবকিছু তেমনই থাকে, যেমন সে চায়। কিন্তু বাস্তব সেই ঘোরটাকে ভেঙে ফেলে দেখায় চাওয়া আর পাওয়ার হিসাব মেলানো কত কঠিন! নাকি এই হিসাব কখনই আর মেলে না।

আসিফের সঙ্গে আরশির দেখা হলো দীর্ঘদিন পর। আশিফ ওর ফাইনাল পরীক্ষার জন্য ছুটি নিয়েছিল। পড়াশোনার ব্যস্ততাও ছিল খুব। আরশি বলল, 'তুমি মোটা হয়ে গেছ।'

আসিফ বলল, 'তুমি শুকিয়েছ।'

আরশি হাসল, 'আমরা সবসময় খুব উল্টো তাই না?'

আসিফ বলল, 'উল্টো কিনা জানি না। তবে আলাদা।'

আরশি বলল, 'আমরা সবাই তো আলাদা।'

আসিফ বলল, 'হ্যাঁ। অথচ তা জেনেও আমরা সবসময় নিজের মতো কাউকে খুঁজি।'

আরশি বলল, 'এর কারণ, মানুষ নিজেকেই সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে।'

আসিফ বলল, 'তাই কি?'

আরশি বলল 'হু। মানুষ এই জগতে নিজের চেয়ে বেশি ভালো আর কাউকে বাসে না। ধরো একজন মা, সে তার সন্তানের অসুস্থতায় উৎকণ্ঠিত হয়, পাশে সারারাত জেগে রয়, মারা গেলে চিৎকার করে কাঁদে। আবার সুস্থ হয়ে গেলে আনন্দিত হয়। এর কারণ কী? এটা কি সন্তানের জন্য? আমার কিন্তু তা মনে হয় না। আমার কী মনে হয় জানো? আমার মনে হয় সে আসলে তার

নিজের কষ্টের জন্য কাঁদে। তার সন্তান যদি কষ্ট পায় তাহলে সেও কষ্ট পায়। যদি এমন হতো সে তার সন্তানের অসুস্থাতায় কষ্ট পাচ্ছে না, তাহলে সে কিন্তু কাঁদত না।'

আসিফ বলল, 'অনুভূতি তো এমনই। মানুষ নিজেকে ভালোবাসে বলেই অন্যকে ভালোবাসে, অন্যকে ঘৃণা করে।'

আরশি বলল, 'ঠিক তাই। তাহলে কী দাঁড়াল? মানুষ নিজেকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে বলেই সে তার সারাজীবনের জন্য নিজের মতো কাউকে চায়। কিন্তু সে কখনই অন্যের মতো হতে চায় না।'

আরশি আর আসিফ হঠাৎ চুপ করে রইল। অনেক্ষণ। তারপর আসিফ বলল, 'আমি জানি, আমি তোমাকে ছুঁতে পারি না।'

আরশি হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'এই নাও। ছুঁয়ে দাও।'

আসিফ বলল, 'ছুঁয়ে দেওয়া এত কঠিন কেন?'

আরশি বলল, 'আমি কি তোমাকে ছুঁয়ে দিতে পারি?'

আসিফ বলল, 'হুম পারো।'

আরশি বলল, 'তাহলে তুমি পার না কেন?'

আসিফ বলল, 'হয়তো তোমাকে বুঝে উঠতে পারি না বলে।'

আরশির কেন যেন মনে হলো, আসিফের এই কথাটা খুব সত্যি। খুব। মানুষ যতক্ষণ না অবধি অন্য মানুষকে বুঝে উঠতে পারে, ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ কাউকে ছুঁয়ে দিতে পারে না। মানুষ বেশিরভাগ সময়ই মোহগ্রস্ততাকে ছুঁয়ে যাওয়া ভেবে ভুল করে।

আরশি বাড়ি যাওয়ার জন্য গোছগাছ করছে। আর দিন দশেকের মধ্যেই সে বাড়ি যাবে। প্রতিটি মুহূর্ত তার যে কী অস্থিরতায় কাটছে। অবাক করা বিষয় হচ্ছে বাড়ি যেতে তার কেন যেন ভয় ভয়ও করছে! মনে হচ্ছে যদি বাড়িতে গিয়ে এমন কিছু দেখে যেটা সে দেখতে চায় না। যেটা ভয়ঙ্কর! সবচেয়ে ভালো হয় সবকিছুর জন্য নিজের মনে মনে প্রস্তুতি নিয়ে রাখলে। সেদিন সন্ধ্যায় হঠাৎ হোস্টেলে এসে হাজির আসিফ। আরশি গেস্টরুমে তাকে দেখে অবাক। আসিফের সঙ্গে ঢাউস সাইজের ব্যাগ। আরশি বলল, 'কী ব্যাপার? কোথাও যাচ্ছ?'

আসিফ বলল, 'হ্যাঁ। অফিসের বিশেষ অ্যাসাইনমেন্ট। মোঘলগঞ্জ যাচ্ছি।'

আরশি চমকে উঠল 'মোঘলগঞ্জ?'

আসিফ বলল, 'হ্যাঁ। বাবু যশোদা জীবন দে নামের বিখ্যাত একজন মারা গেছেন। এককালে ডাকসাইটে কমিউনিস্ট ছিলেন। তবে ধারণা করা হচ্ছে এটা

Boighar.com & ARS

খুন। উনি একসময় জাতীয় রাজনীতিতেও নানানভাবে সক্রিয় ছিলেন। তারপর দীর্ঘদিন আর সেইভাবে খোঁজখবর ছিল না। এখন ওইরকম একটা প্রত্যন্ত জায়গায় উনি মারা গেলেন। মৃত্যুটাও স্বাভাবিক মনে হচ্ছে না। বড় অ্যাসাইনমেন্ট।'

আরশি চমকে ওঠা গলায় বলল, 'মোঘলগঞ্জের কোথায়?'

আসিফ বলল, 'বিস্তারিত তেমন কিছুই জানি না। গিয়ে বের করতে হবে। তবে গ্রামটার নাম সম্ভবত মিয়াপুর। মোঘলগঞ্জ থেকে খানিকটা উত্তরে।'

আরশি হঠাৎ বলল, 'তুমি কি একটু লেট করতে পারবে?'

আসিফ অবাক গলায় বলল, 'কেন?'

আরশি আসিফের কথার কোনো জবাব দিল না। সে হোস্টেলের ফোন থেকে আশিষের বাসায় ফোন করল। ফোন ধরলেন শুকরঞ্জন ডাক্তার। আরশি তাকে কীসব জিজ্ঞেস করল। তারপর ফোন রেখে এসে একটা কাগজ হাতে দিল আসিফের। তারপর বলল, 'কাগজের ঠিকানায় যেই বাড়িটার কথা লেখা আছে, এই বাড়িটা একটু কষ্ট করে খুঁজে বের করবে। আমার ধারণা মোঘলগঞ্জ বাজারের কোথাও না কোথাও এখন মোবাইল ফোনে কথা বলার ব্যবস্থা হয়েছে। তুমি বাড়িটার খোঁজ পেলে আমাকে একটু কষ্ট করে ফোন করে জানিও। খুবই গুরুত্বপূর্ণ।'

আসিফ কাগজটা চোখের সামনে ধরল। সেখানে গোটাগোটা অক্ষরে লেখা, 'জাহাঙ্গীর মাতুব্বরের বাড়ি, মিয়াপুর। কাঠের ব্যবসা করতেন।'

শুকরঞ্জন আর আরশির যাওয়া পেছাল। কারণ গত ক'দিন ধরে একটানা বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টি কমল তিন দিনের দিন। আরশি গাঁয়ে যাচ্ছে। যযাতিপুর! কত বছর পর? কত বছর? আরশি কোনোকিছুই ভাবতে পারছে না। তার সবকিছু কেমন যেন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে! মনে হচ্ছে একটা মানব জনমে কিছু মানুষের জন্য রয়েছে অনেকগুলো জগৎ। সেই অনেকগুলো জগতের মধ্যে একটামাত্র জগৎ সত্যি, আর বাদবাকি জগৎগুলো সব মিথ্যে, সব বিভ্রম, সব মায়া। তার মতো মানুষগুলোর সেই প্রত্যেকটা জগতেই কখনও না কখনও বাস করতে হয়। আরশির মনে হচ্ছে সে তেমনি এক জগৎ থেকে অন্য আরেক জগতে যাচ্ছে। কিন্তু সে আসলে জানে না, তার কোন জগৎটা সত্যি! আর কোন জগৎটা বিভ্রম!!

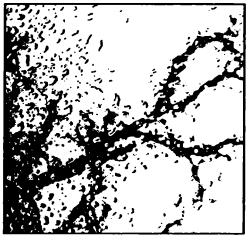

যশোদা স্যার নেই!

গালকাটা বশির যেন মুহূর্তেই উন্মাদ হয়ে গেল। এই বশিরকে এতদিন দেখেনি দুলাল মেম্বার কিংবা মজিবর মিয়া কেউই। যশোদা স্যারের সামনে সুবোধ শিষ্য হয়ে থাকা গালকাটা বশির যেন মুহূর্তেই হয়ে উঠল উন্মত্ত আগুন। রীতিমতো বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেল সে। সেই রাতেই দলবল নিয়ে মোঘলগঞ্জ গেল গালকাটা বশির। এই মুহূর্তে মোঘলগঞ্জ যাওয়ার মত বড় বোকামি আর নেই। কারণ চারদিকে পুলিশ, সরকারি গুপ্তচর, সাংবাদিক, নানান ঝামেলা। কিন্তু সে গেল। গত ক'মাসে চুল-দাড়ি না কাটা বশিরকে অবশ্য কেউ চিনতে পারল না। সন্ধ্যার অন্ধকারে সে একা মিয়াপুর গ্রামের সেই জায়গাটাতে গেল। তখনও শুকনো রক্তের দাগ পড়ে আছে রাস্তায়। গালকাটা বশির কী ভাবল কে জানে, তবে মোঘলগঞ্জ থেকে সে আর যযাতিপুর ফিরল না। কেউ তার কোনো খবরও দিতে পারল না।

যযাতিপুরে পুরোপুরি অরক্ষিত হয়ে রইল মজিবর মিয়া আর দুলাল মেম্বার। সবাই জানত, মজিবর মিয়া আর দুলাল মেম্বারের করুণ পরিণতি সময়ের ব্যাপার মাত্র। ঘটনার তৃতীয় দিন রাতে দুলাল মেম্বার তার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা নিয়ে পালিয়ে গেল। যযাতিপুরে তখন লতু হাওলাদার আর আবদুল মমিনের ভয়ঙ্কর জিঘাংসার মুখে একা অসহায় দাঁড়িয়ে অথর্ব মজিবর মিয়া। কিন্তু কী কারণে যেন আবদুল মমিনকেও আর দেখা গেল না। এলো না লতু হাওলাদারও। মজিবর মিয়া তার শেষ পরিণতির জন্য অপেক্ষা করছিল। এই প্রথম তার মনে হলো তার জীবন একটা অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি হয়েই শেষ হবে। সেই পাণ্ডুলিপিতে তার সঙ্গে আরশির দেখা হওয়া হয়তো আর লেখা নেই।

www.boighar.com

লতু হাওলাদার আর আবদুল মমিনের কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে মজিবর মিয়ার কেমন একটা রুদ্ধশ্বাস সময় কাটাচ্ছিল। তার সেই রুদ্ধশ্বাস সময় কাটল অন্যভাবে। গত ক'দিন হলো সে আর আড়তে যায় না। আজও গেল না। মেঘলা আকাশ থেকে সারাদিন ঝিরিঝিরি বৃষ্টি ঝরছে। ঘরের দাওয়ায় বসে চুপচাপ সেই বৃষ্টির ফোঁটা দেখছিল মজিবর মিয়া। এই সময়ে বাড়ি ঢুকল মোস্ত

Boighar.com & ARS

ফা। সে সরাসরি তার সামনে এসে দাঁড়াল। তারপর বলল, 'আব্বায় জরুরি কাজে খাসের হাট গেছে। আবদুল মমিনের সঙ্গে আছে। তো যাওনের আগে একটা কথা বইলা গেছিল, সেইটার কথাই বলতে আসছি।'

মজিবর মিয়া বলল, 'কী কথা?'

মোস্তফা বলল, 'সেই চাইর বিঘা জমি। আর আড়ত। তিন দিন সময়, তিন দিনের মধ্যে ফয়সালা করবি। নাইলে তোর লাশ কুত্তা-বিলাইতেও খাইতে পারব না?'

মজিবর মিয়া বলল, 'কেন তোরা বাপ-বেটা কি আইজ-কাইল মানুষের মাংসও খাওয়া শুরু করছস নাকি?'

মোস্তফা যেন তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল। সে বলল, 'সাহস ভালো মজিবর। কিন্তু অতিরিক্ত কোনো কিছুই ভালো না।'

মজিবর মিয়া বলল, 'এই কথাটাই তোরা নিজেরা একটু বোঝনের চেষ্টা করস না কেন?'

মোস্তফা বলল, 'মজিবর তোর মতো পঙ্গু লুলা মাইনসের গায়ে হাত দিতেও শরম করে। এই জন্য কিছু কইলাম না। নাইলে...'

মজিবর মিয়া মোস্তফার কথা শেষ করতে দিল না। সে তার মুখের কথা টেনে নিয়ে বলল, 'নাইলে আমার সামনে এইভাবে কথা বলনের জন্য চাবকাইয়া তোর জিহ্বা বাইর কইরা ফালাইতাম। পঙ্গু লুলা হওনে বাঁইচ্যা গেলি।'

মোস্তফা হতভম্ব হয়ে গেল! সে মজিবর মিয়ার সাহস দেখে রীতিমতো স্তব্ধ! মজিবর মিয়া বলল, 'বুঝস নাই? আমি যদি লুলা খোঁড়া না হইতাম, তাইলে নাকি তুই আমার গায়ে হাত দিতি। এইটা ভুল কথা এইটা তুই নিজেই জানস। আমি সুস্থ থাকলে এই পরিস্থিতিতে তুই আমার থেইকা একশ' হাত দূরে থাকতি। কথা মিথ্যা বললাম?'

মোস্তফা হঠাৎ মজিবর মিয়ার গলা চেপে ধরল। মজিবর মিয়া টের পেল তার দমবন্ধ হয়ে আসছে। মোস্তফা কি তাকে এখুনি মেরে ফেলবে! তার এখন আর জীবন মৃত্যু নিয়ে কোনো ভাবনা নেই। সে জানে, এটা যেকোনো মুহূর্তে অবধারিত। তার পা যেখানে কাটা হয়েছিল, সেই জায়গাতে কিছুদিন থেকে চুলকানি দেখা দিয়েছে। ঘায়ের মতোন কী যেন হচ্ছে। সারা শরীরই কেমন নিস্তেজ লাগে আজকাল। শেষ পর্যন্ত কী হয় কে জানে! এরচেয়েও যদি শরীর খারাপ হয়ে যায় তো বিপদ! ঘরে পড়ে থাকলে তাকে দেখার তো আর কেউ নেই। পায়ের ঘাগুলো যদি আরও বাড়ে, তাহলে মৃত্যুটা হয়তো আরও ভয়ঙ্কর হতে পারে। তারচেয়ে এই ভালো। কিন্তু মানুষ খুন করার সাহস মোস্তফার নেই এটা মজিবর মিয়া ভালো করেই জানে। মোস্তফা তার গলা ছেড়ে দিয়ে বলল,

'তোর ব্যবস্থা আব্বায় আইসা করব। তার আগে আমি যেইটা বলি সেইটা শোন। ওই জমির আর আড়তের দলিল কই?'

মজিবর মিয়া ভালো ব্যথা পেয়েছে গলায়। সে সময় নিয়ে কাশল। তারপর বলল, 'দলিলগুলা ছিল তালেব মাঝির কাছে। সে পরে রাখতে দিছিল যশোদা স্যারের কাছে। এখন সে সেই দলিল কই রাইখা গেছে, কেমনে বলব?'

মোস্তফা যেন সাপের মতোন ফুঁসে উঠল। বলল, 'মজিবর এখনও ত্যাড়ামি করতেছস! তোর যে কী দশা হইব রে মজিবর? খালি আবদুল মমিন আর আব্বায় আসুক।'

মজিবর মিয়া এবার আর কোনো কথা বলল না। মোস্তফা কিছুটা দূর গিয়ে আবার ফিরে এলো। তারপর বলল, 'আরেকটা কথা। লাইলিরে আমি বিয়া করতাছি। তালাক দেওনের ব্যবস্থা কর।'

মোস্তফা ঘুরে চলে গেল। লাইলি হঠাৎ জানালার ফাঁক দিয়ে মোস্তফাকে ডাকল। তারপর তারা ফিসফিস করে অনেকক্ষণ কী সব কথা বলল! মজিবর মিয়া সেদিকে তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিল। লাইলি এখন পর্যন্তও তার বিয়ে করা বউ! অথচ কি অবলীলায় তার চোখের সামনে কি সীমাহীন ঔদ্ধত্য! এই ঔদ্ধত্যের পরিণাম কী! তবে মজিবর মিয়া লাইলির এই এত এত পাপ, এই এত এত অন্যায়, এর কোনোটারই কোনো শাস্তি দিতে চায় না। তার কেন যেন মনে হয় কিছু পাপের, কিছু অপরাধের শাস্তি সরাসরি তিনিই দেন, যিনি জগৎ সংসারের সবচেয়ে বড় বিচারক। সবচেয়ে সঠিক বিচারক!

সেদিন রাতে লাইলি এলো তার কাছে। তারপর ফিসফিস করে বলল, 'এখনও সময় আছে মজিবর মিয়া। এখনও সময় আছে। এখন তাও শ্বাসটুকু বইতেছে। সেইটুকও থাকব না।'

মজিবর মিয়া শব্দ করে হাসল, 'শ্বাস থাকলে কী হয় লাইলি?'

লাইলি বলল, 'তোমার অত ভাবের কথায় আমার কাম নাই। ভালোয় ভালোয় আমারে বল, জমির দলিল কই!'

মজিবর মিয়া বলল, 'জমির দলিল নিলে তোমার লাভ কী? এই জমি তো তুমি পাইবা না! পাইব লতু-হাওলাদার। তুমি তার সঙ্গে পারবা না।'

লাইলি সাপের মতো হিসহিস করে উঠল, 'লাইলিরে তুমি চিন নাই মজিবর মিয়া! লাইলিরে চেনা অত সহজ কাম না।' www.boighar.com

মজিবর মিয়া বলল, 'তুমি নিজে তোমারে চেন লাইলি?'

লাইলি যেন মুহূর্তেই আবার জ্বলে উঠল। সে বলল, 'আমি আমারে খুব ভালো কইরাই চিনি। চিনি বইলাই বলতেছি।'

Boighar.com & ARS

মজিবর মিয়া বলল, 'আমার কেন জানি মনে হইতেছে, তোমার সামনে কোন বড় বিপদ লাইলি। খুব বড় কোনো বিপদ।'

লাইলি যেন মুহূর্তের জন্য হলেও থমকে গেল। সে কি ভয় পেয়েছে! কিন্তু নিজেকে সামলে নিল লাইলি। বলল, 'নিজের কথা চিন্তা কর মজিবর মিয়া। এই যে এখন শ্বাস নিতেছ। এই যে এখনও বাঁইচা আছ। কার জন্য জানো? এই লাইলির জন্য।'

মজিবর মিয়া হাসল। বলল, 'যদি সেইটাই হয়, তাইলে এই মুহূর্তে মইরা যাইতে চাই লাইলি। এর চাইতে জঘন্য জিনিস আর দুনিয়াতে থাকতে পারে না।' মজিবর মিয়া একদলা থুতু ফেলল লাইলির সামনে মাটিতে।

লাইলি আর কোনো কথা বলল না। সে ঝড়ের বেগে চলে গেল।

মজিবর মিয়া খবরটা পেল বুধবার রাতে। খাসের হাটে আবদুল মমিনের গ্রুপের ওপর গভীর রাতে হামলা হয়েছে। তারা সবাই ঘুমিয়েছিল খাসের হাট জমির মোল্লার কাছারি ঘরে। মাঝরাতে গালকাটা বশির দলবল নিয়ে হাজির হয়। তবে একজন পাহারায় ছিল বলে শেষ রক্ষা হয়েছে। তারপরও আবদুল মমিনের দলের চারজন মারা গেছে। বাকিদের অবস্থাও সুবিধার না। গালকাটা বশিরের দলেরও দুয়েকজন মারা গিয়ে থাকতে পারে। কিন্তু তাদের কাউকে সেখানে পাওয়া যায়নি। তারা কাজ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আহত-নিহতদের নিয়ে ট্রলারে সরে পড়েছে। এই ঘটনায় মজিবর মিয়া যেন আবার একটু জোর পেল। গালকাটা বশির তাহলে উধাও হয়ে যায়নি। সে আছে প্রতিশোধের নেশায়। সে রাতে মজিবর মিয়ার ভালো ঘুম হলো। ঘুম ভাঙল ফজরের আজানের সঙ্গে সঙ্গে। সে ঘুম থেকে উঠে ওজু করল। নামাজ পড়ল। নামাজ শেষে সুবহে সাদিকের আধো আলো আধো অন্ধকারে মজিবর মিয়া ঘরের দাওয়ায় এলো। উঠানের মাঝখানে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে! ধবধবে সাদা সালোয়ার-কামিজ পরা মেয়েটা কে! মজিবর মিয়ার কী হলো সে জানে না। তার বুকের ভেতর হঠাৎ রক্ত ছলকে উঠল। দম বন্ধ হয়ে এলো। কাটাগাছের মতোন কেঁপে উঠল তার অথর্ব শরীর। তার পুরো জগৎটা মুহূর্তেই এলোমেলো হয়ে গেল। সে যেন হুড়মুড় করে শেকড়সহ উপড়ে পড়ল। উপড়ে যাওয়ার আগে মজিবর মিয়া একটা মাত্র শব্দ বলল। একটা মাত্র শব্দ, 'মাগো!'www.boighar.com

মজিবর মিয়া ঘরের দাওয়া থেকে হুমড়ি খেয়ে পড়ল উঠানে। ভর দেওয়ার লাঠিটা তার হাতের কাছে নেই। উঠানে গড়িয়ে পড়া মজিবর মিয়া হামাগুড়ি দিয়ে উঠতে চাইছিল। কিন্তু পারছিল না। বারবার হুমড়ি খেয়ে পড়ছিল মাটিতে। আরশি ঝড়ের বেগে ছুটে এলো, সে কথা বলতে পারল না। একটা

শব্দও না। সে শুধু মজিবর মিয়ার মাথাটা কোলে তুলে নিল। তখন ভোরের আলো ফুটেছে কেবল। সেই আলোতে মজিবর মিয়া চোখ তুলে চাইল। তার মুখের ওপর একটা মুখ ঝুঁকে আছে! একটা মুখ! এই জগতের অসংখ্য মানুষের মাঝে, অজস্র মুখের মাঝে এই একটামাত্র মুখ তার। এই একটামাত্র মুখ।

মজিবর মিয়া মুহূর্তের জন্য চোখ বন্ধ করল। তার সেই বন্ধ চোখের পাতার ভেতর থেকে স্রোতের মতোন বেরিয়ে আসতে লাগল জলেরা। আজ মজিবর মিয়ার কান্নার দিন। জগতের সব কান্না, সব অশ্রুদের ঝরিয়ে বিদায় দেওয়ার দিন। আরশি তাকিয়ে রইল মজিবর মিয়ার ভাঙাচোরা বীভৎস মুখটার দিকে। সেই মুখ থেকে ভকভক করে দুর্গন্ধ আসছে। মানুষটা নিজের হাতে দাঁত মাজতে পারে না। কতদিন দাঁত মাজে না কে জানে! মানুষটার গা ভর্তি গন্ধ। কী ভয়ঙ্কর বীভৎস মুখ। কিন্তু আরশির মনে হলো এই জগতে এর চেয়ে সুন্দর আর কিছু নেই। এরচেয়ে মমতাময় আর কিছু নেই। এই মানুষটা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম মানুষ। এর তুল্য জগতে আর কিছু নেই। সে তার মুখটা নামিয়ে আনল মজিবর মিয়ার মুখের কাছে। তারপর তার গালটা চেপে ধরল মজিবর মিয়ার মুখের ওপর। এবং সে কাঁদল! আরশি কাঁদল! এই জীবনে আর কখনও না কাঁদার প্রতিজ্ঞা সে রাখতে পারল না। সে ঝড়ঝড় করে কাঁদল। সে তার বুকের ভেতর বেঁধে রাখা সব পাথর, সব কঠিন পাহাড় ভাসিয়ে একাকার করে দিয়ে কাঁদল। তার সেই কান্নার জলেরা তার গাল বেয়ে টুপটাপ ঝরে পড়ল। ঝরে পড়ল মজিবর মিয়ার গালে। গলায়। চোখে। মিশে গেল মজিবর মিয়ার চোখের জলের উষ্ণ স্রোতে।

জগতের সুখীতম এই দুই মানবপ্রাণ তখন দেখল না, জানল না, চালতা গাছের তলায়, আবছা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আরও একজন মানুষও তখন কাঁদছে। সেই মানুষটার নাম শুকরঞ্জন ডাক্তার।

শুকরঞ্জন ডাক্তার চলে গেলেন খানিক পরই। লাইলি একবারের জন্যও এলো না আরশির কাছে। আরশি বার দুই গিয়ে দরজায় কড়া নেড়েছে। কিন্তু সে সাড়া পর্যন্ত দিল না। সেই সারাটা দিন আরশি চুপচাপ বসে রইল মজিবর মিয়ার পাশে। চালতা গাছের তলায় পাটি বিছিয়ে আম্বরি বেগমের কবরের পাশে বসে রইল দু'জন নির্বাক মানুষ। পিতা-কন্যা। তারা বসে রইল সারাটা তিন। কিন্তু কেউ কোনো কথা বলল না। একটা কথাও না। অথচ তারা যেন পুরোটা সময় ধরে নিঃশব্দে বলে গেল অনেক কিছু। শুনে গেল পরস্পরকে। শুধু ওই দুটিমাত্র মানুষ। তবে আরশির মনে হলো তাদের সঙ্গে আরও একজন আছে। তাদের দু'জনের মতো করেই সেও নিঃশব্দে কথা বলে যাচ্ছে, ছুঁয়ে যাচ্ছে, অনুভব করে

Boighar.com & ARS

যাচ্ছে। সেই আরও একজন আম্বরি বেগম। তাদের এই তিনজনের মাঝে এই জীব ও জগতের আর কেউ নেই। কেউ না। আরশির দুপুরবেলাও ঘরে গেল না। তার কেমন ঘুম পেয়ে গেল। সে সেই ছোট্ট পাটির ওপর দু'পা ভাঁজ করে বাবার কোলের ভেতর মাথা ডুবিয়ে ঘুমিয়ে রইল। মজিবর মিয়া ভেঙে উল্টো হয়ে যাওয়া তার সেই ডান হাতেই আরশির মাথায় বিলি কেটে দিতে লাগল। এই নশ্বর জগতের কাছে মজিবর মিয়ার আর কিছুই চাওয়ার নেই। তার মনে হল সে যা পেয়েছে তা অবিনশ্বর! কোথাও কোনো কিছু নিয়ে তার আর কোনো আক্ষেপ নেই। এই জগৎ তার কাছে পরিপূর্ণ প্রাপ্তির এক জগৎ। এই জগতে তার মতো সুখী মানুষ বলতে আর কেউ নেই।

মাঝরাতে প্রবল আলোর ঝলকানিতে আরশির ঘুম ভেঙে গেল। সে ঘুমিয়েছিল ঠিক সেই মেঝেতে। চৌকির ওপরে তার বাবা। আরশি চট করে উঠে বসল। তার চারদিকে দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুনের লেলিহান শিখা। বিপদ! ভয়ঙ্কর বিপদ! আরশি ঝট করে উঠে দাঁড়ালো। ঘরের চারধারের সবগুলো বেড়াতেই কেরোসিন ঢেলে আগুন দেওয়া হয়েছে! উন্মত্ত আগুন টিনের চালা ছুঁয়েছে। ডানপাশের বেড়াটা খুঁটি আর বাঁশের আড়াসহ ঢলে পড়ল বাইরে। আরশির মাথার ওপর কিছু একটা পড়ল। এক টুকরো কাঠ। আরশি আগুনসহ কাঠের টুকরোটাকে দূরে ছুড়ে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। চিৎকার করে বাবাকে ডাকল। মজিবর মিয়া হতভম্ব চোখে উঠে বসল। তার গায়ের গেঞ্জিতে আগুন ধরে গেছে। আর ঠিক তখুনি মাথার ওপরের বাঁশের আড়াটা ধাম করে পড়ল। আরশি ধাক্কা দিয়ে সরাতে গিয়েও পারল না। পরপর দুটি আড়া ছুটে এসে পড়ল মজিবর মিয়ার মাথায়। কতটা আঘাত লাগল বোঝা গেল না। তবে মজিবর মিয়া হামাগুড়ি দিয়ে আরশির দিকে এগোলো। আরশি তার সর্বশক্তি দিয়ে টেনে মজিবর মিয়াকে মেঝেতে ফেলল। চৌকির পুরোটা জুড়ে তখন আগুন। মজিবর মিয়ার গায়ের গেঞ্জি টান দিয়ে খুলে ফেলল আরশি। তারপর ধাক্কা দিয়ে মজিবর মিয়াকে ঘরের বাইরে গড়িয়ে দিল। মজিবর মিয়া কিছুটা সময় নিশ্চুপ শুয়ে রইল। তারপর গড়িয়ে সরে গেল চালতা গাছটার আড়ালে। আরশিও গেল। দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকা ঘরটার দিকে বিমূঢ় দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল আরশি আর মজিবর মিয়া। কতক্ষণ তাকিয়ে আছে জানে না। ঠিক এই মুহূর্তে দৃশ্যটা দেখল তারা। লাইলির ঘরের ভেতর থেকে তীব্র চিৎকার ভেসে আসছে। চিৎকার মিলিয়ে যাওয়ার আগেই একটা জীবন্ত আগুনের কুণ্ড যেন ছিটকে বেরিয়ে এলো ঘরের ভেতর থেকে। লাইলি! কিন্তু খোলা বারান্দায় ধসে পড়া একখানা জ্বলন্ত বেড়া আর কতগুলো কাঠের ভেতর আটকে গেল সে।

www.boighar.com

প্রবল আতঙ্কে যেন দিশেহারা হয়ে গেল আরশি। ছুটে যেতে গিয়ে আবিষ্কার করল মজিবর মিয়া তার হাতখানা শক্ত করে টেনে ধরে আছে! ঘরের উত্তরপাশের কোনা দিয়ে মানুষটা বেরিয়ে এলো, লতু হাওলাদার! বেশিক্ষণ থাকল না সে। বীভৎস এক প্রশান্তির চিহ্ন মুখে নিয়ে চলে গেল সে। মজিবর মিয়া ফিসফিস করে বলল, 'মাগো এই গ্রাম ছাড়তে হইব। এই মুহূর্তে ছাড়তে হইব। তুমি বাড়িতে আসছ, এই কথা এরা জানে না। জানলে আরও বড় বিপদ। তুমি মালোপাড়া যাও মা। কোনোমতে শুকরঞ্জন ডাক্তারের বাড়ি পর্যন্ত যাও।'

আরশি জড়ানো গলায় ডাকল, 'আব্বা!'

মজিবর মিয়া বলল, 'আমার কথা চিন্তা কইরো না। আমারে আর কী করব! কিন্তু মা তোমারে পাইলে সর্বনাশ। আবদুল মমিন জানলে...'

মজিবর মিয়া কথা শেষ করতে পারল না। আরশি রান্নাঘরের কোনা থেকে একটা শক্ত মোটা শুকনো বাঁশের কঞ্চি টেনে বের করে নিয়ে এলো। তারপর মজিবর মিয়ার ডানহাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'একদিকে লাঠিতে ভর দেবেন, আরেকদিকে আমার কাঁধে ভর দেবেন। পারবেন না?'

মজিবর মিয়া বলল, 'কী বল মা? মালোপাড়া কি এইটুক পথ? আর রাস্তা জুইড়া প্যাঁচপেঁচে কাদা। ভালো মানুষই হাঁটতে পারে না।'

আরশি বলল, 'আপনার মনে আছে? এক বৃষ্টির দিনে আপনি আমারে হাঁটু পর্যন্ত কাদার মধ্য দিয়ে পুরোটা পথ কাঁধে করে নিয়ে হেঁটে আসছিলেন? মনে আছে? আজ আমি কেন পারব না আব্বা? আপনি পারলে আমি কেন পারব না?'

মজিবর মিয়া কোনো কথা বলল না। তবে তার চোখের কোনায় চিকচিক করে উঠল জল। এই জল আরশি দেখল না। বাপ-বেটি সেই অন্ধকার রাতে হাঁটা শুরু করল। মজিবর মিয়া জানে এ এক অসম্ভব যাত্রা! পুরো রাস্তা জুড়ে জল-কাদায় সয়লাব। মজিবর মিয়ার মনে হলো সে তার শরীরটা আর টেনে নিতে পারছে না। তার মাথাটা ভারী হয়ে আসছে। একটা সময় আর হাঁটতে পারল না মজিবর মিয়া। বাঁশের কঞ্চিটাও ধরে রাখতে পারল না। তার সারা শরীর যেন ভেঙে পড়তে চাইছে। কতটা পথ হেঁটেছে আরশি জানে না। তবে www.boighar.com ভোরের আলো ফুটতে দেখল মজিবর মিয়ার সারা শরীর জুড়ে রক্ত! ক্লান্ত-বিধ্বস্ত আরশি দেখল মজিবর মিয়ার মাথার ঠিক মাঝ বরাবর বাঁশের আড়া দুটো পড়েছিল। একটা বড় চিড় ধরেছে জায়গাটাতে। এই এতটা পথ অবিরাম রক্ত ঝরেছে। আরশি খেয়াল করেনি। মজিবর মিয়াও কিছু বলেনি। মানুষটা নেতিয়ে পড়ল ঘাসের মধ্যে।

আরশি মজিবর মিয়ার মুখটা বুকের মধ্যে চেপে ধরে ফিসফিস করে বলল, 'আব্বা, আর একটুখানি আব্বা। আর একটুখানি। তারপরই শুকরঞ্জন দাদুর

Boighar.com & ARS

ঘর। আব্বা। আব্বা।' মজিবর মিয়া অনেকক্ষণ কোনো সাড়া-শব্দ করল না। তারপর হঠাৎ অতি কষ্টে আরশির কানের কাছে মুখ নিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে বিড়বিড় করে কিছু বলল। মজিবর মিয়ার কথা আরশি বুঝল কিনা বোঝা গেল না। তবে এরপর মজিবর মিয়া আর কিছু বলতে পারল না। ঢলে পড়ল আরশির কোলে। কিন্তু আরশি এখন কী করবে? তার সাধ্য নেই এই মজিবর মিয়াকে বাকিটা পথ টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যায়। সে সেই কাদাজলের বিরান পথের মাঝখানে মজিবর মিয়ার মাথাটা বুকের মধ্যে চেপে ধরে বসে রইল। আর তাকিয়ে রইল পথের দিকে। www.boighar.com

মজিবর মিয়া মারা গেল শুকরঞ্জন ডাক্তারের বাড়িতে পৌঁছানোরও কিছু সময় পর। আরশি দীর্ঘ সময় তাকে নিয়ে বসে ছিল সেই রাস্তায়। রাস্তার পাশের জমিতে কাজ করতে আসা দুই কৃষক তাদের পৌঁছে দিয়েছিল মালোপাড়া। শুকরঞ্জন ডাক্তার আরশিকে খবরটা দেওয়ার আগে নানান কথা বললেন। আরশি ততক্ষণে বুঝে গিয়েছিল। সে কাঁদল না। চিৎকার করল না। চুপচাপ বাবার পাশে বসে রইল। কত কত স্মৃতি এই এক জীবনের! কত কত হাসি, কান্না, দুঃখ। সবই মুহূর্তেই শেষ! কী অদ্ভুত হিসাব-নিকাশ। কী অদ্ভুত!

লতু হাওলাদারের বাড়িতে আবদুল মমিন একাই থাকছে। গালকাটা বশির পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে। কিন্তু তার আগে আবদুল মমিনের ক্ষতি যা করার সে করে গেছে। দলে দু'চারজন যাও ছিল। তারাও যশোদা স্যারের ঘটনার পর পুলিশের অভিযানের ভয়ে গা-ঢাকা দিয়েছে। সেদিন রাতে প্রচণ্ড বৃষ্টি। শেষ রাতে লতু হাওলাদারকে ডেকে তুলল আবদুল মমিন। বলল, 'হাওলাদার সাব, ফজরের আজানের আর কত বাকি?'

লতু হাওলাদার বলল, 'আবদুল মমিন ভাই কি নামাজ পড়বেন নাকি?'

আবদুল মমিন বলল, 'বুঝতেছি না লতু ভাই। পরানডা খুব অস্থির লাগতেছে।'

লতু হাওলাদার বলল, 'কী বলেন আবদুল মমিন ভাই! এখন অস্থির লাগলে হইব? এখন তো সবকিছু পরিষ্কার।'

আবদুল মমিন বলল, 'সেইটাই। তারপরও কেন জানি খুব অস্থির লাগতেছে!'

লতু হাওলাদার বলল, 'চলেন, দুই রাকাত নামাজ পড়েন। মন শান্ত হইব।'

আবদুল মমিন বলল, 'মসজিদে নামাজ না পড়লে মন শান্ত হয় না। চলেন মসজিদে যাই।'

সেই বৃষ্টির রাতে তারা অনেকটা পথ হেঁটে মসজিদে এলো। মসজিদে ঢোকার আগমুহূর্তে আবদুল মমিন বলল, 'এক কাজ করি চলেন, যযাতিপুর বাজারে যাই। বাজারের মসজিদে নামাজ পড়লাম। তারপর সকাল সকাল নদীর টাটকা মাছ নিয়া বাড়ি ফিরলাম। কী বলেন? ফজরের তো আর দেরি নাই বেশি।'

লতু হাওলাদার কিছু বুঝল না। কিন্তু তারা দীর্ঘ পথ হেঁটে যযাতিপুর বাজারে এলো। তখনও ফজরের আজান হয়নি। আবদুল মমিন বলল, 'চলেন দেখি, জাইল্যারা এখনও মাছ ধরতেছে কিনা। একসঙ্গে নদীরঘাট থেইকা ওজুও কইরা আসলাম।'

লতু হাওলাদার নদীর ঘাটে গিয়ে দাঁড়াল। আবদুল মমিন বলল, 'হাওলাদার সাব, আমার খুব অস্থির লাগতেছে, অস্থির লাগার কারণটা বুঝতে পারছিলাম না। এখন বুঝতে পারতেছি।'

লতু হাওলাদার বলল, 'কী কারণ?'

আবদুল মমিন বলল, 'এই যযাতিপুরটা আমার আর ভাল্লাগতেছে না। এইজন্যই অস্থির লাগতেছে। ভাবতেছি চইলা যাব।'

লতু হাওলাদার বলল, 'কই চইলা যাবেন? কখন চইলা যাবেন?'

আবদুল মমিন বলল, 'ধরেন এই নৌকা দিয়া নদী পার হইয়া রাঙ্গারোড চইলা গেলাম। তারপর যেদিক ইচ্ছা সেদিক। আর চইলাই যদি যাই, তাইলে আর দেরি কইরা লাভ কী?'

লতু হাওলাদার বলল, 'এখনই?'

আবদুল মমিন বলল, 'হ, এখনই। যাওনের আগে আপনার কাছ থেকে চির বিদায় নিয়া যাই। আসেন।'

লতু হাওলাদার বলল, 'চির বিদায় কেন আবদুল মমিন ভাই। বাঁইচ্যা থাকলে আপনার সঙ্গে আমার হাজারবার দেখা হইব।'

আবদুল মমিন বলল, 'সেইটা তো বাঁইচা থাকলে। আর বাঁইচা না থাকলে? হায়াত-মউতের কথা কি কওন যায়?'

লতু হাওলাদার বলল, 'এইটা অবশ্য ঠিক কথা বলছেন।'

আবদুল মমিন বলল, 'যাওনের আগে দেনা-পাওনাটা শোধ কইরা গেলে ভালো হইত না হাওলাদার সাব!'

আবদুল মমিনের কথার ভঙ্গিটা যেন কেমন ছিল। লতু হাওলাদারের বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল। আবদুল মমিন বলল, 'যশোদা মাস্টার মরার আগে আপনার কথাটা বইলা গেছিল। আসেন কাছে আসেন। ঋণটা শোধ করি। লোকমান আমার মায়ের পেটের আপন ভাইয়ের চেয়ে বেশি আছিল।'

Boighar.com & ARS

লতু হালাদার কী কী যেন বলতে চেয়েছিল। কিন্তু আবদুল মমিন চোখের পলকে চাকুটা বের করে লতু হাওলাদারের গলাটা দু'ফাঁক করে দিল। লতু হাওলাদারের গলা দিয়ে যখন ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছিল তখনও লতু হাওলাদারের বিশ্বাস হচ্ছিল না যে আবদুল মমিন তার সঙ্গে এই কাজ করতে পারে। সে বড় বড় চোখে পৃথিবীর সব অবিশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে রইল। তার লাশ পড়ে রইল যযাতিপুর নদীর ঘাটে। যতক্ষণে লোকজন লাশটা দেখল, ততক্ষণে আবদুল মমিন রাঙ্গারোড পেরিয়ে অনিশ্চিত গন্তব্যে।

নিলুফা বানুকে যে মানুষটা এত ভালোবাসত সেই মজিবর মিয়া নিলুফা বানুর মৃত্যুর পর তার লাশটা একবারও দেখেনি। তার কবরটা পর্যন্ত দেখতে যায়নি। মাটি দিতে নিয়ে যাওয়া লাশের ট্রলারে উঠতে গিয়েও ওঠেনি মজিবর মিয়া। কী অদ্ভুত আচরণ মানুষের! কিন্তু কারণটা কী! কারণটাও অদ্ভুত। মজিবর মিয়া মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ার আগে শেষবার যখন আরশির কানের কাছে মুখ নিয়ে কথা বলল, তখন সে বিড়বিড় করে কারণটা বলেছিল। সে বলেছিল, জীবিত যে নিলুফা বানু তার চোখের সামনে হাসত, খেলত, কথা বলত সেই নিলুফা বানুর নিথর দেহ সে সহ্য করতে পারত না। যে মানুষটা রোজ তার পাশে শুয়ে থাকত, সেই মানুষটাকে সে কীভাবে মাটির ভেতর শুইয়ে রেখে আসবে! তারচেয়ে এই ভালো ছিল, সে ভাবত নিলুফা বানু আছে কোথাও। আশপাশে কোথাও। নিলুফা বানুর মৃত মুখ কিংবা সাদা কাফনের কাপড়ে কবরে শুইয়ে রাখার ছবিটা তো আর সারাজীবন তার বুকের ভেতর গেঁথে থাকবে না! নিলুফা বানু তার কাছে তার পুরোটা জীবনজুড়ে বেঁচে থাকার স্মৃতি হয়েই ছিল। কিন্তু মৃত্যুর পর সে নিলুফা বানুর কাছেই থাকতে চায়।

আকাশভর্তি মেঘ। যেকোনো সময় বৃষ্টি নামবে। ঝুম বৃষ্টি। মিয়াপুরের মাতুব্বর বাড়ির আমবাগানে পাশাপাশি দুটো কবর। একটা নতুন। আর একটা পুরনো। সেই দুটো কবরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে আরশি। এই বামপাশের পুরনো কবরটা তার মায়ের। যাকে সে কখনও দেখেনি। ছুঁয়ে দেয়নি। মা বলে ডাকেনি। আর এই ডানপাশের নতুন কবরটা তার বাবার। যাকে সে ছুঁয়ে দেখেছে। যার কাঁধে চড়ে মাইলের পর মাইল হেঁটে গেছে। যার গায়ের গন্ধে সে ডুবে থাকত। যাকে আব্বা বলে ডাকতেই তার বুকের ভেতরটা থই থই মমতায় ভরে যেত। কিন্তু কী অদ্ভুত ব্যাপার, আজ এই মুহূর্তে এই দুটো কবরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সে যেন এই দু'জনের কাউকে আর আলাদা করতে পারল না। তার মনে হলো এই দু'জন মানুষ আলাদা কেউ ছিল না। একজন চলে যাওয়ার সময় তার সব ভালোবাসা, সব মমতাদের আরেকজনের কাছে জমা

দিয়ে গিয়েছিল। সে পরম মমতায় তা তুলে রেখেছিল আরশির জন্য। আরশি হাত বাড়িয়ে দুটো কবর ছুঁয়ে দিল। সে তার এই জনমে এই এতটা বছরে যা পারেনি, এখন কি তা পেরেছে? এই এই মুহূর্তে? সে কি একসঙ্গে ছুঁয়ে দিতে পেরেছে তার বাবা আর মাকে? এক সঙ্গে। হাত দু'খানা একটুখানি বাড়িয়েই কি সে নাগাল পেয়ে যাচ্ছে না, তার মা আর বাবাকে? সে কি এখন সেই ছোট্ট ফুটফুটে মেয়েটি যে তার ছোট্ট হাত দুটি উঁচু করে তার মা আর বাবার হাতের আঙুল ধরে তাদের দু'জনের মাঝখানে গুটিগুটি পায়ে হেঁটে যায়?

www.boighar.com

আরশির চোখ কেন যেন ঝাপসা হয়ে আসছে। বৃষ্টি কি শুরু হয়েছে? প্রবল বৃষ্টি। আরশি জানে না। তবে তার ঝাপসা চোখের দৃষ্টিতেই সে দেখল মানুষটা হেঁটে আসছে। খুব স্বাভাবিক পায়ে হেঁটে আসছে। মানুষটা কি হেঁটে এসে তার কাঁধে হাত রাখবে! নাকি তার হাত ধরবে! মুহূর্তেই তার মনে হবে সে এক বিশাল বৃক্ষের কোটরে ছোট্ট পাখির মতোন মিশে আছে। মানুষটা হেঁটে এলো। তার সামনে এসে দাঁড়াল। তারপর কী অসম্ভব নাড়িয়ে দেওয়া ক্ষমতায় তার কাঁধে হাত রাখল। আরশি মন্ত্রমুগ্ধের মতোন উঠে দাঁড়াল। মানুষটা তাকে ধরে বেশ খানিকটা দূরে নিয়ে গিয়ে দাঁড়াল। সেখানে আরশির সামনে বিস্তৃত খোলা প্রান্তর। ধু ধু চরাচর। নাকি মানবজীবন! সেই বিশাল বিস্তৃত চরাচর ভেসে যাচ্ছে তুমুল বৃষ্টিতে। কিংবা ভেসে যাচ্ছে কান্নায়। মানুষটা প্রবল ছায়াদায়ী বৃক্ষের মতোন হঠাৎ তাকে বুকের ভেতর নিয়ে নিল। আরশি সেই বৃক্ষের বুকের ভেতর মিশে রইল। বিশাল বৃক্ষের কোটরে ছোট্ট সেই পাখির মতোই। তুমুল সেই বৃষ্টিতে আরশি মানুষটার বুকের ডুবে রইল। সে জানে, এই বুক থেকে মাথা তুললেই সে হয়ত দেখবে অন্য কোনো মানুষ। তারচেয়ে থাকুক। এই উল্টোজগতে এইটুকু উল্টো না হয় থাকুক। একটা আসিফের ভেতর না হয় অল্পকিছু মিশে থাকুক আরেকটা মানুষ। মিশে থাকুক অল্প কিছু কষ্ট। অল্প কিছু প্রতিবিম্ব। মিশে থাকুক। মানুষটা তো কি স্পষ্ট করেই না লাল কালির অক্ষরে লিখে গেছে, 'জীবন রোজ খানিকটা করে আয়নার সামনে দাঁড়ানোর মতোন। আমরা তাতে শুধু শরীরটাই দেখতে পাই। বুকের ভেতরটা না। অথচ আমাদের দেখার কথা ছিল চোখে। সে দুটোই দেখে, শরীর ও মন।'

আরশির সামনে বিস্তৃত খোলা মাঠ। পেছনে দু'খানা কবর। সামনের ওই বিশাল খোলা মাঠ আর পেছনের ওই মৃত্যু সবকিছুই ভিজে যাচ্ছে বৃষ্টিতে। আরশি এখন এই বিশাল খোলা মাঠ পেরিয়ে হেঁটে যাবে। হাঁটতেই থাকবে। হাঁটতেই থাকবে। কিন্তু সে আসলে হেঁটে যেতে থাকবে পেছনে। এই খোলা মাঠের

Boighar.com & ARS

পথটুকু আসলে তার বাকি জীবনের বেঁচে থাকা অধ্যায়টুকু। কিন্তু সে যতটা হেঁটে যাবে সামনে, সে আসলে জানে সে হেঁটে যাচ্ছে ঠিক ততটাই ওই পেছনে। কী উল্টো নিয়ম এই জগতের! সে জানে তাকে এই হাঁটা শেষে ঠিক ঠিক ফিরে আসতে হবে পেছনের ওই জায়গাটুকুতেই। পৃথিবীর কোথাও না কোথাও ওই জায়গাটুকুই শুধু শেষ পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকে। অপেক্ষায় থাকে একটা মানবজীবনের সবটা সময় জুড়ে। তবুও মানুষ কত কত অপেক্ষায় নির্ঘুম রাত কাটায়। কত কত অপেক্ষার তৃষ্ণায় দিন কাটায়। কী অদ্ভুত এই মানবজনম! কী অদ্ভুত! এ যেন আয়নার মতোন এক উল্টো জগৎ।

এই উল্টো জগতের নাম আসলে আরশিনগর! www.boighar.com

www.boighar.com

সাদাত হোসাইন

স্নাতকোত্তর- নৃবিজ্ঞান, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

দুটো ইচ্ছে নিয়ে স্বপ্নযাত্রার শুরু। এক- খেয়ানৌকার মাঝি হওয়া, দুই- নিজের নামটি ছাপার অক্ষরে দেখতে পাওয়া। মাদারীপুরের কালকিনি থানার কয়ারিয়া নামের যে গ্রামে জন্ম, তার পাশ দিয়েই তিরতির করে বয়ে গেছে ছোট্ট এক নদী। খেয়ানৌকার মাঝি হওয়ার স্বপ্নটা তাই সত্যি হওয়াই ছিল সহজ। কিন্তু হলো উল্টোটা। পূরণ হলো দ্বিতীয় স্বপ্নটি! সাদাত হোসাইন হয়ে গেলেন লেখক। এ পর্যন্ত তার প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ছয়। লিখেছেন, কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাস। শুধু লেখালেখিই নয়, দুর্দান্ত আলোকচিত্রী সাদাত হোসাইন নিজের স্বপ্নের সীমানাটাকে বাড়িয়ে নিয়ে গেলেন স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণেও। বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে প্রচারিত তার **'বোধ'** শর্টফিল্মটি রীতিমত প্রশংসার ঝড় তুলেছে সমালোচক ও দর্শক মহলে। কাজ করছেন একাধীক নতুন ফিল্ম নিয়ে। সাদাত হোসাইনের জগত জুড়ে অমিত স্বপ্নে বসবাস। সেই স্বপ্নের সবটা ছুঁয়ে ছুটে যতে চান অবিরাম। সম্প্রতি আলোকচিত্র, লেখালেখি এবং স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের জন্য জিতেছেন **'জুনিয়র চেম্বার ইন্টারন্যশনাল অ্যাওয়ার্ড'**। www.boighar.com

প্রচ্ছদ ■ সাইফুল হালিম জেলীন
লেখকের ছবি ■ জামীন হোসাইন
Boighar.com